

শিকড়

কাজী মায়মুর হোসেন

সঙ্কট

সায়েম সোলায়মান

ওয়েস্টার্ন

দুটি বই
একত্রে



জাদুকর

ওয়েস্টার্ন

[দুটি বই একত্রে]

শিকড়/কাজী মায়মুর হোসেন

ছোটবেলার প্রতিদ্বন্দ্বী, চিরশত্রু মার্শাল ক্লিভ হেস্টিংসের নির্দেশটা চূড়ান্ত—
পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে পারে রন মার্লো, তাতে পথের ফকির হয়ে
গেলেও জানে বাঁচবে সে; আর যদি ঘাড়-ত্যাড়ামি করে, শহর ছেড়ে
পালিয়ে না যায়, তার ঠাই হবে বুটহিলের গোরস্তানে।

পিস্তল ফ্ল্যাট শহরে যা খুশি তা-ই করছে মার্শাল হেস্টিংস এবং
তার গলাকাটা খুনির দল, কারও সাধ্য নেই তাদের বিরুদ্ধে মুখ ফুটে
কিছু বলে। রন যদি ক্লিভ হেস্টিংস ও তার খুনেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়,
তা হলে ওর বাঁচবার আশা শূন্যের কোঠায়। কিন্তু কখনোই পিছিয়ে
যায় না রন। জীবনে কখনও পিছায়নি। কাজেই এবারও ও ঠিক করল,
পিছাবে না। টেক্সাসের ঘূর্ণিঝড়ের মত ভয়ঙ্করভাবে এল শো-ডাউন।

সঙ্কট/সায়াম সোলায়মান

কাজ খুঁজতে মারফায় যাচ্ছিল ভবঘুরে দুই বন্ধু—স্যাম আর জেক।
পথে দেখল, অপরূপা এক তরুণীর সম্ভ্রম হানির মতলবে আছে
বিশালকায় এক বদমাশ। গোলাগুলির পর পালাল লোকটা...
এর পরপরই কারও চক্রান্তে জড়িয়ে গেল ওরা, খুনের অভিযোগে
গ্রেফতার হলো স্যাম। ঘটতে শুরু করল নাটকীয় সব ঘটনা।
স্যামকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পরলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।
এদিকে জেকের পিছনেও লেগে গেছে নির্মম, বেপরোয়া, ধূর্ত আততায়ী।
হাতে সময় নেই, রাত হলেই হামলা হবে জেলহাউসে,
ছিনিয়ে নিয়ে খুন করা হবে অসহায় স্যামকে।
কী করতে পারবে একা জেক?

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

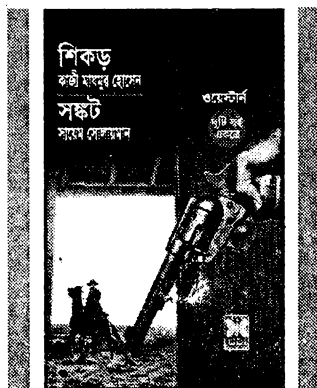
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

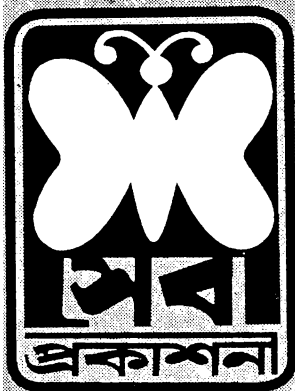
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন
দুটি বই একত্রে
শিকড়
কাজী মায়মুর হোসেন

সঙ্কট
সায়েম সোলায়মান



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8324-5



তিরানবাই টাকা

প্রকাশক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকদ্বয়ের

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ডিক্টর নীল

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দরদালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪

সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩

জি. পি ও বক্স: ৮৫০

mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

SHIKOD

By: Qazi Maimur Husain

SHANKAT

By: Sayem Solaiman

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

EXCLUSIVE

वशे

SCANN

EDIT



धर

Visit Us at
boighar.com

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

শিকড় ৫-১৮৪
সঙ্কট ১৮৫-৩২৮

ওয়েস্টার্ন

শিকড় ও সঙ্কট

কাজী মায়মুর হোসেন ও

সায়েম সোলায়মান

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

<https://www.facebook.com/groups/Boighar> - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM



প্রকাশিত কয়েকটি ওয়েস্টার্ন

কাজী শাহনুর হোসেন		গোলাম মাওলা নঈম	
কারসাজি	২৬/-	দুঃসাহস+শোধ+ত্রাস	
শয়তানের চক্র	২৬/-	দাবদাহ	
লোভের ফাঁদে	২৬/-	ইসমাইল আরমান সম্পাদিত	
কাজী মায়মুর হোসেন		দেশান্তর	
শায়েস্তা	২৭/-	শওকত হোসেন	
ধাওয়া	২৮/-	দমন+নিষিদ্ধ প্রান্তর	৭৩/-
দুর্গম যাত্রা	২৮/-	কাজী শাহনুর হোসেন/	
প্রহসন	২৬/-	কাজী মায়মুর হোসেন/	
লুটোনা+দুর্বিপাক+খলনায়ক	৯০/-	গোলাম মাওলা নঈম	
ইফতেখার আমিন		প্রতিযোগী+কুটচাল+মাশুল	৯৫/-
প্রায়শ্চিত্ত	২৭/-	কাজী মায়মুর হোসেন/সায়েম সোলায়মান	
টিপু কিবরিয়া		স্বপ্নের খামার+	
অন্তত চক্র	২৬/-	সীমান্তে বিরোধ+শক্তপাহা	১১৬/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্লি) সাটানো হয় না।

এক

ভেজা, জোরাল দমকা হাওয়া ধেয়ে আসছে সুউচ্চ এলিফ্যান্ট-হেড রাট ছেয়ে থাকা ঘন-কালো মেঘরাশি থেকে, দুলিয়ে দিচ্ছে ন্যারো গেজ ট্র্যাকের উপর দিয়ে ছুটে চলা কমরিনেশন কোচটাকে। সিটের পিছনে ডানহাত রেখে ট্রেইনের দোলা সামলাচ্ছে রন মার্লো, জানালা দিয়ে দেখছে গম্ভীরদর্শন ঝড়ের মেঘ—মিউল হিল-এর চূড়োও ঢেকে ফেলেছে ওগুলো, চারপাশে এক শ' মাইল ছেয়ে রেখেছে পাগলা হাওয়ার তাড়া খেয়ে।

মালপত্র-ভরা ফ্ল্যাটকার আর খালি গণ্ডোলা নিয়ে ডিপোর কাছে এসে গতি কমাল ট্রেইন। শেষ-বিকেলের মৃদু আলোয় জানালা দিয়ে ভালমত দেখা গেল না পিস্তল ফ্ল্যাট শহরটা।

গতি আরও কমল ট্রেইনের, ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে থেমে দাঁড়াল। চাপা কান্নার মত শোনাগল ছোট্ট ইঞ্জিনটার আওয়াজ, তারপর থেমেই গেল।

এতক্ষণ কোলের উপর রাখা কাগজগুলো মাঝে মাঝে দেখছিল রন মার্লো, এবার ব্রিফকেস তুলে ওটার ভিতর ভরল জরুরি কাগজ।

এর আগেও সামান্য মুনাফা হবে জেনে অনেক কাজ করেছে রন মার্লো, তবে এই পিস্তল ফ্ল্যাটে যে-রকম ঝুঁকি ওকে নিতে হবে, সেরকম ঝুঁকি আগে কখনও নেয়নি। পুরনো, বাতিল-প্রায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাইলের পর মাইল পাতাল-সুড়ঙ্গ থেকে খনিজ উত্তোলন করতে হবে। মুনাফা তোলা হবে খুবই কঠিন।

ট্রেইন থেমে যেতেই রনের পিছনে উঠে দাঁড়াল নীল, কৌতূহলী চোখওয়ালা এক প্রকাণ্ডদেহী লোক, মাথা ঠুকে গেল তার উপরের র্যাকের সঙ্গে। গাল দিয়ে উঠেছিল সে, মাঝপথে থেমে গেল বগিতে একজন ভদ্রমহিলা আছে মনে পড়ে যাওয়ায়। চিৎকার করে বলল, 'মালপত্র নামাও, সুইডিশ গাধারা, ফ্লিগ্টস্টোন ফেনটনের পেছনে এসো। কালকে ভোরেই কাজ শুরু, পাথর কাটতে হবে সবাইকে, তার আগে চলো খানিক তাস পিটিয়ে নিই!'

রন ঘোষণা দিল: 'রানিং আয়ার্নে প্রথম রাউণ্ড ড্রিঙ্ক আমার তরফ থেকে।'

হে-হে' করে সিট ছাড়ল সবক'জন সুইডিশ মাইনার ও মেকানিক। তামা উত্তোলনকে পেশা হিসাবে নিয়েছে তারা, আজকাল তামার খনি-ব্যবসা লাভজনক না হওয়ায় নিয়মিত বেতন পায় না। বিনা পরসায় ড্রিঙ্কের সুযোগ

ছাড়তে রাজি নয় কেউ, যে-যার বেডরোল, কার্পেট-ব্যাগ, স্যাচেল আর লাঞ্চ-বাস্কেট নামিয়ে ফেলল র্যাক থেকে, তারপর হালকা মেজাজে ঠেলাঠেলি করতে করতে ফ্লিণ্টস্টোন ফেনটনের পিছু নিল।

সবাই তারা মৃতপ্রায় খনি-শহর পিস্তল ফ্ল্যাটে এসেছে রন মার্লোর বিজ্ঞাপন দেখে। নতুন করে খনি চালু করবার ঘোষণা ছিল ওসব বিজ্ঞাপনে। এখনও ছাপা হচ্ছে বিজ্ঞাপনগুলো। আরও অনেকেই আসবে। শহরে তাদের থাকবার ব্যবস্থা আছে কি না কে জানে, ভাবল রন।

দুই মিনিট পুরো হবার আগেই প্রায় খালি হয়ে গেল বগি। রন ছাড়া রইল এক যুবতী, আর যুবতীর উল্টোদিকের সিটে বসা এক নিষ্ঠুর চেহারার লোক।

উঠে দাঁড়িয়ে লাস্যময়ী ভঙ্গিতে রনের দিকেই এগোল যুবতী। অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে চাইল রন। ওর কালো চোখে দেখা দিল অতীত স্মৃতির ঝড়।

লম্বা মানুষ রন, দেখে ব্যাক্সারের বদলে মনে হয় বড় কোনও রানশার। মাথায় একটা পানামা হ্যাট পরে আছে এখন, হ্যাটের কানায় গরুর দেশের কোঁকড়ানো একটা ভাব। সাদা শার্টের গলার বোতামটা খোলা। চামড়া রঙের ট্রাউজার্স নেমে এসে ঢেকে দিয়েছে হিল ছাড়া বুটজুতোর উপরের অংশ। এলমেলো চুল আর তামাটে চামড়া রনের, দেখতে সুদর্শন-সুপুরুষ— ভাঙা নাকটা যদি উপেক্ষা করা যায়। বেশ একটা ফুলবাবুর মত ভাব আছে ওর পোশাকে, কিন্তু লোহা-কাঠের মতই শক্ত মানুষ আসলে, হাতুড়ির মত নিরেট। মঁনটা অবশ্য নরম, জীবনে কারও কাছ থেকে উপকার পেলে ভোলেনি কখনও। আর লিজা ট্রেইসি ওসব উপকারী মানুষদেরই একজন।

রনের মনে হলো, আরও আগেই লিজা ট্রেইসিকে চেনা উচিত ছিল ওর। তবে এটাও বুঝল, অন্য সব ব্যাপারে ব্যস্ত না থাকলে ঠিকই চিনতে পারত লিজাকে।

যুবতীকে এগিয়ে আসতে দেখে ভাল লাগার একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল ওর অন্তর। পিঠে ছড়িয়ে পড়ে চিকচিক করছে লিজার কালো চুল। বাদামী চোখ দুটোতে যেন ধূসর মেঘের আনাগোনা, ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাবটা লুকিয়ে রাখছে নারীদের সহজাত চিরন্তন রহস্যময়তা। ধূসর রঙের লম্বা একটা স্কার্ট পরেছে লিজা, ওর হাঁটবার রমণীয় ভঙ্গি দেখে বুকুর ভিতর পুরনো সেই উত্তেজনা অনুভব করল রন।

পাশ কাটাতে শুরু করতেই হাত বাড়িয়ে খপ করে লিজার কজি চেপে ধরল বগির অন্য লোকটা।

উঠে দাঁড়াতেই পাশ থেকে তাকে চিনতে পারল রন। অতীতের আরেকটা স্মৃতি এই ক্লার্ক ফাওল। তবে তিন্ত স্মৃতি।

ক্লার্ক ফাওলের চোয়াল-ভাঙা শেয়াল-শেয়াল চেহারা রনকে বলে দিল, এল

পাসোর কোনও লাইব্রেরিতে বইয়ের র‍্যাকের মাঝখানে, -কিংবা টেক্সাসের কোনও থিয়েটারের সামনের সারিতে দর্শক হিসেবে মানায় না ক্লার্ক ফাওলকে, মানায় মেইমির ব্রেকম্যান্স হোটেল-এর জেন্ট'স পার্লার বা রানিং আয়ার্ন সেলুনে।

কর্কশ গলা ক্লার্ক ফাওলের, বলবার ভঙ্গিতে কর্তৃত্ব আর নির্দেশের সুর। 'রূপসী তা হলে ফিরল!' লিজার গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াল সে, মেয়েটার হাত থেকে হাতব্যাগটা নিতে ছোঁ মারল। 'ক্লার্ক ফাওল সবসময় রেডি। বিশেষ করে যে-মেয়েকে বহু দিন আগে থেকে কাছে চায়, তার জন্যে এই বান্দা সব সময় হাজির।'

মুহূর্তে লিজার গাঢ় রঙের চোখ থেকে প্রসন্ন ভাবটা বিদায় নিল, দৃষ্টি হয়ে উঠল এলিফ্যান্ট-হেড বাট ছেয়ে থাকা বরফের মত শীতল। একটু পিছিয়ে মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়াল লিজা, চাপা গলায় বলল, 'যদি কখনও কোনও সময় কোনও কথায় তোমাকে প্রশ্ন দিয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে তা আমার ভুল ছিল, ক্লার্ক। ...ছাড়ো আমাকে!'

গাল-নাক কুঁচকে যাওয়ায় বিশী চেহারা হলো ক্লার্ক ফাওলের। সবসময় মেজাজ অনিয়ন্ত্রিত থাকে তার, রেগে যায় অল্পতেই। লিজা ট্রেইসির কজিতে হাতের চাপ বাড়িয়ে দেয়ায় রক্ত সরে সাদা হয়ে গেল তার আঙুলগুলো।

ব্যথা পেয়ে ফুঁপিয়ে উঠল লিজা।

'আমার সঙ্গে দাম দেখাতে এসো না,' ঠোট বাঁকা করে বলে উঠল ক্লার্ক ফাওল। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এত জোরে হাত ঝটকা দিল লিজা যে, ওর কজিটা ছুটে গেল ক্লার্ক ফাওলের হাত থেকে। সোজা হয়ে দাঁড়াল লিজা, ব্যাপারটা ইচ্ছেকৃত নয়, তবে চেষ্টা করলেও এর চেয়ে ভাল কেউ করতে পারত না— ক্লার্ক ফাওল ঝুঁকে আসতেই তার খুতনির নীচের নরম মাংসে জোরে খোঁচা লাগাল লিজার কাঁধ। তীব্র ব্যথায় ধূসর হয়ে গেল ক্লার্ক ফাওল, রাগে গর্জন ছেড়ে দু'হাত তুলে সামনে বাড়ল লিজাকে জাপ্টে ধরতে।

আর দেরি না করে ব্রিফকেসটা নামিয়ে রেখেই ঝড়ের মত সামনে বাড়ল রন, খপ করে ধরে ফেলল ক্লার্ক ফাওলের বোতাম আঁটা পিনস্ট্রিপ কোটের সামনের অংশ, তারপর সামনে-পিছনে ঝাঁকি দিল জোরে জোরে।

হাতাহাতি লড়াইয়ে অনভিজ্ঞ নয় ক্লার্ক ফাওল, আর এখন প্রচণ্ড রেগে আছে, প্রতিপক্ষকে অপ্রস্তুত করে দিতে পিছন দিকে হেলে পড়ল সে, রন বাধ্য হয়ে সামনে ঝুঁকতেই হাতের তালুর কিনারা দিয়ে রনের ভাঙা নাকের হাড়ে আঘাত করল গায়ের জোরে।

ব্যথায় রনের মনে হলো আগুন ধরে গেছে নাকে। উন্মত্তের মত সামনে বাড়ল ও, ঘনঘন মাথা ঝাঁকাল দৃষ্টি পরিষ্কার করতে। তারই ফাঁকে ঘুসি ছুঁড়ল

ডানহাতে ।

সরে গিয়ে নাক বরাবর ঘুসিটা এড়িয়ে গেল ক্লার্ক ফাওল । মাথা থেকে ডাবি হ্যাট পড়ে গেল, দু'পাশ দিয়ে নেমে আসা লাল জট পাকানো চুলের গোছা দেখে মনে হলো টেক্সাসের বুনো ঘাঁড়ের অস্বাভাবিক দুটো শিং । রনের বকে ধাক্কা দিল ক্লার্ক ফাওল, রন পিছিয়ে যেতে বাধ্য হওয়ায় দুই সারি সিটের মাঝ থেকে বেরিয়ে এল ক্ষিপ্ত চিতার মত ।

মাথা নিচু করে নিল রন, বামহাত ভাঁজ করে মাথা আর মুখ আড়াল করল । ওর বাঁহুর পেশি আর হাড়ের উপর পড়ল ক্লার্ক ফাওলের কয়েকটা ঘুসি । ব্যথা পেল রন, তবে আঘাতগুলো গুরুতর কোনও ক্ষতি করল না ।

ক্ষিপ্ত ক্লার্ক ফাওলের আক্রমণ ঠেকাতে শুরু করল রন, মিনিট পাঁচেক রক্ষা করল নিজেকে, তারপর লোকটা হাঁপিয়ে যাওয়ায় জোরে ঠেলা দিয়ে আবার তাকে ঢুকিয়ে দিল দু'সারি সিটের মাঝখানে, সরু জায়গাটায় । এবার আক্রমণে গেল রন, চোয়ালে ওর প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে সিধে হয়ে গেল ক্লার্ক ফাওল । ঠোঁটের কোণে এক ছোপ লাল রক্ত দেখা দিল । জ্যাব করল রন, তার পর পরই ডানহাতে ক্রস । ক্রসটা লাগল ঠিক যেখানে লাগাতে চেয়েছিল— ক্লার্ক ফাওলের সরু ঠোঁট দুটোর উপর । দাঁতের সঙ্গে সংঘর্ষে চ্যাপ্টা হয়ে গেল লোকটার দুই ঠোঁট । পর পর আরও দু'বার ডানহাতি ক্রস করল রন । প্রত্যেকটা ক্রস লক্ষ্যে আঘাত হানল— খেঁতলে গেল ক্লার্ক ফাওলের গালের মাংস । হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল লোকটা । আরেকবার আঘাত করল রন । ওর স্ট্রেইট দড়াম কর্‌রে নামল প্রতিপক্ষের চিবুকে ।

ইঞ্জিনের পোড়া-কয়লার ধুলো আর সিগারেটের টুকরো ভরা বগির মেঝেতে ধূপ করে চিত হয়ে পড়ল ক্লার্ক ফাওল । চোখদুটো খোলা । জ্ঞান হারানোয় চোখে মণি নেই, শুধুই সাদা অংশ দেখা গেল ।

হাঁপরের মত হাঁপাচ্ছে রন, শত্রু পর্যুদস্ত হয়েছে দেখে পিছিয়ে এল এবার, ছড়ে যাওয়া রক্তাক্ত মুঠো জিভ দিয়ে ভিজানোর ফাঁকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল ক্লার্ক ফাওলকে ।

রনের পাশে এসে দাঁড়াল লিজা ।

পাইনগাছে ভরা ক্যানিয়নের মিষ্টি, সতেজ সুবাস যেন লিজার আকর্ষণীয়, সুডৌল শরীর থেকে ভেসে আসছে, টের পেল রন । স্মৃতির দোলা আবারও জাগল ওর বুকে ।

লিজার ঠোঁটে হাসির মৃদু রেখা, অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে যেন সে-ও; ভাবছে, এই প্রথম নয় যে ওর সম্মান রক্ষা করতে রুখে দাঁড়িয়েছে বেপরোয়া রন মার্লো । জুয়াড়ীর মেয়ে বলে উচ্ছৃঙ্খল খনি-শহর পিস্তল ফ্ল্যাটের গরীবদের বসতি ক্যানিয়ন স্ট্রিটে বাবার সঙ্গে থাকত সে । ধনী-গরীব সব শ্রেণীর

তরুণদের হয়রানির শিকার হতে হয়েছে ওকে। সুযোগ নেবার চেষ্টায় বাদ যায়নি সে-সময়ের পিস্তল ফ্ল্যাটের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ডিয়ান হেস্টিংসের ছেলেও।

লিজার হাসি যেন আরেকটা কথা বলে দিল রনকে। কখনোই সাধারণ সাদাসিধে মেয়ে ছিল না লিজা, আর এখন যৌবনে পড়ে কোনও পুরুষকে ভয় পায় না, ভয় পায় না পুরুষ-শাসিত দুনিয়াটাকে।

লিজার দৃঢ় মনোভাবটা ভাল লাগল রনের।

গুড়িয়ে নড়াচড়া করে উঠে বসল ক্লার্ক ফাওল, আপনা থেকেই চিবুকে হাত চলে গেল তার। ঠোঁটের কোনা থেকে দু'দিকের চোয়াল পর্যন্ত চামড়া ছড়ে লাল হয়ে গেছে। চোখে গনগনে আশ্রয় নিয়ে রনের দিকে চাইল সে।

বদমাশটার চোখে কীসের যেন ছায়া দেখল রন।

সতর্কতা?

ব্যথা?

ভয়?

হাতের উল্টোপিঠে ঠোঁটের রক্ত মুছল ক্লার্ক ফাওল, চিন্তা-ভাবনা পরিস্কার করতে মাথা ঝাঁকাল।

‘যেখান থেকে আদরটুকু পেয়েছ, সেখানে আরও অনেক আদর জমা আছে,’ ঠাণ্ডা গলায় বলল রন। ‘চাইলে আরও পাবে।’

উঠে দাঁড়াতে চাইল না ক্লার্ক ফাওল। লড়াইয়ের ইচ্ছা আপাতত দূর হয়েছে তার। তবে চেহারা বলে দিচ্ছে, শোধ নেবার সুযোগ পেলে ছাড়বে না কখনও।

লিজা ট্রেইসি বিড়বিড় করে বলল, ‘রন, ওকে নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট কোরো না, যা দিয়েছ তার চেয়ে বেশি পাওনা আছে অনেকদিন থেকে।’ কথাটা বলে বিরক্ত চেহারায় ক্লার্ক ফাওলকে পাশ কাটিয়ে আইল ধরে পিছনের প্ল্যাটফর্মের দিকে হাঁটতে শুরু করল লিজা।

ক্লার্ক ফাওলের চোখ অনুসরণ করল তাকে।

লিজার পিছু নিল রন, ক্লার্ক ফাওলকে পাশ কাটানোর সময় বলল, ‘আমাকে যদি খোঁজো, পেতে কোনও অসুবিধে হবে না তোমার, ক্লার্ক।’

বগির প্ল্যাটফর্মে রনের জন্য অপেক্ষা করছিল লিজা। আস্তে করে মেয়েটার বাহু ছুলো রন, মৃদু গলায় বলল, ‘যা ঘটল সেজন্যে আমি সত্যি দুঃখিত, লিজা।’

‘দুঃখিত হবে কেন?’ কাঁধ ঝাঁকাল লিজা ট্রেইসি। ‘মনে হলো যেন অতীতের পুরনো ঘটনা আবারও ঘটল।’ রক্তিম হয়ে উঠল যুবতীর গাল দুটো। মনে হলো অস্বস্তিতে ভুগছে। তারপর কাটিয়ে উঠল দ্বিধা, রনের পরিচিত সেই রহস্যময়, আকর্ষণীয় আন্তরিক হাসি ঠোঁটে।

‘কিছু স্মৃতি থাকে যেগুলো চিরজীবন মনে রয়ে যায়,’ বলে লিজাকে পাশ কাটাল রন, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। দেখতে পেল, প্ল্যাটফর্মের পুব

দিকে একটা ‘ওর’ ওয়্যাগনের পাশে কোদালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে বেশ কয়েকজন লোক।

ডিপোর হলুদ বিল্ডিংয়ের পাশে ভারী মেশিন-পত্র বাদামী তারপুলিন দিয়ে ঢাকতে একজন কুলিকে সাহায্য করছে ডোরাকাটা ওভারঅল পরা এক লালচে চেহারার লোক।

প্ল্যাটফর্মের মাঝে এক সাদাচুলো বুড়োর সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে কণ্ঠস্বর জ্যাক ওয়েড। তার পাশের মানুষটাকে চিনতে পারল রন। বুড়ো জিমি টমসন।

ট্রেইন খালি করে নেমে পড়েছে সব যাত্রী, ডিপোর ওয়েইটিং রুমে গিয়ে চুকেছে অনেকে, আবার অনেকে ওখান থেকে বেরিয়েও গেছে, শহরের রাস্তা ধরে চলেছে নিজ গন্তব্যে। তাদের কথার টুকরো আওয়াজ বাতাসে ছিঁড়েখুঁড়ে তেলে এল।

বিদ্যুৎ ঝলকে উঠতেই গুড়-গুড়-গুড়ুম করে গর্জন ছাড়ল আকাশ। ঝড়ো বাতাসের তাড়া খেয়ে কাত হয়ে মাটিতে পড়ল কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি।

লিজাকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামাতে হাত বাড়িয়ে দিল রন। ওর দু’হাতের ভিতর ধরা পড়ল লিজা। নারী-দেহের উষ্ণতাটুকু চমৎকার লাগল রনের, যতক্ষণ প্রয়োজন তার চেয়ে একটু বেশিক্ষণ লিজাকে ধরে রাখল, তারপর ছেড়ে দিল অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

মৃদু হাসল লিজা, ‘বৃষ্টি এড়াতে হলে তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাদের,’ বলে হাঁটতে শুরু করল।

ক্যানিয়নের ওদিক থেকে ধেয়ে আসছে ঝড়ো হাওয়া, সেই হাওয়া তাড়িয়ে আনছে শীতল বৃষ্টির ধূসর পর্দা। যত কাছে আসছে, তত পুরু দেখাচ্ছে পর্দাটা। বাতাসের ঝাপ্টায় হেলছে-দুলছে উঁচু কটনউড গাছগুলো, সরসর করে আওয়াজ করছে পাতাগুলো।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো দুই বুড়ো পাশ কাটাতে দেখল রন ও লিজাকে। কণ্ঠস্বর জ্যাক ওয়েডের খানিক কথা কানে এল রনের। ‘...আরেকটা ডলার। এজেন্টের চেয়ারে বসে পাছায় ফোস্কা তুলে রোজগার করো তুমি। আর আমি করি চলন্ত ট্রেইনে পায়চারি করে— ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজতে হোক বা রোদে পুড়তে হোক, মাফ নেই।’

আপনমনে মাথা দোলাল জিমি টমসন, তারপর লিজার দিকে চেয়ে দ্রুত বলল, ‘তোমার ব্যাগ আমি ক্লার্কের ওখানে পৌঁছে দেব।’ নীল, বিষণ্ণ চোখে রনকে দেখল সে। ‘হ্যালো, রন।’

জিমি টমসনকে ধন্যবাদ দিল লিজা। জ্যাক ওয়েড ও জিমি টমসনের সঙ্গে ভদ্রতা করে দু’একটা কথা বলল রন, তারপর লিজার পাশে চলল আবার। ওরা দু’জন ডিপোর কাছে পৌঁছতেই শুকনো কাঠের প্ল্যাটফর্মে পটপট আওয়াজ

তুলল বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো।

ওয়েইটিং রুমের দরজা বন্ধ করে দেয়ার পর বাতাস আর বৃষ্টির আওয়াজ কমে গেল, রন জিজ্ঞেস করল, ‘বিয়ে করেছে, লিজা?’ শেষ দিকে ওর গলার আওয়াজ মিশে গেল বজ্রপাতের গর্জনে।

‘আমার জীবনের আরেকটা ভুল,’ কিছুক্ষণ চুপ করে তারপর বলল লিজা। ‘প্যাট্রিক টমসনের দরকার ছিল রান্না করা আর কাপড় ধোয়ার জন্যে মেয়েমানুষ, এ ছাড়া আর কিছু নয়। সবসময় আমার বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে জুয়া খেলায় মগ্ন থাকত। সংসারের কোনও দায়িত্ব পালন করতে কখনোই চায়নি। সংসারের দিকে কোনও খেয়াল ছিল না ওর।’

ওয়েইটিং রুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল বুড়ো টমসন, বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে। ভাঁজ করা কনুই থেকে পানি ঝরছে, পানি ঝরছে হাতের দামি স্ট্র সুটকেস থেকেও। ‘আর কিছু নেই তো, লিজা?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘খুব কম জিনিসই আছে আমার,’ মৃদু গলায় বলল লিজা।

দুগুণিত চেহারায় মাথা দোলাল বুড়ো টমসন, ভাবুক চোখে মুখোমুখি দাঁড়ানো রন ও লিজাকে দেখল।

আঁধাখোলা দরজা দিয়ে ঢুকল বাতাসের ঝাপ্টা, লিজার এক গোছা চুল তুলে নিয়ে খেলা করে চলে গেল ঘরের কোনায়, ওখানে নিভন্ত স্টোভের পিছনে জড় হওয়া কাগজের টুকরো ওড়াল।

দরজাটা বন্ধ করে দিল বুড়ো টমসন। ‘তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না, রন, ববিকে দিয়ে তোমার ব্যাগ-ব্যাগেজ নামিয়ে রেখেছি। ওগুলো পৌঁছে দেবে ও।’

‘হাওয়ার্ডস হোটেলে উঠব,’ জানাল রন।

‘তা তো উঠবেই,’ বলল বুড়ো টমসন, ‘বড়লোক ব্যাঙ্কার আর কোথায় উঠবে?’

জিমি টমসনের কণ্ঠে খানিকটা হিংসা টের পেয়ে একটু অবাক হলো রন।

লিজার দিকে ফিরল টমসন। ‘আসছি আমি, দেরি হবে না, লিজা। ...একটু অপেক্ষা করতে পারবে?’

লম্বা স্কাট মেঝে থেকে দু’ইঞ্চি উপরে তুলে আস্তে আস্তে নাড়তে শুরু করল লিজা, মেঝের দিকে চেয়ে রইল চিন্তিত চোখে, তারপর মুখ তুলল, চিবুক উঁচু করে বলল, ‘দরকার নেই, আমি রনের সঙ্গে যাচ্ছি।’

মুখটা নির্বিকার রেখে মাথা দোলাল বুড়ো টমসন, ঘরটা আড়াআড়ি পেরিয়ে চলে গেল এজেন্টের অফিসের দরজায়, ঢুকে যাবার আগে ওখান থেকে বলল, ‘হয়তো শেষপর্যন্ত লাভ হবে না, লিজা।’

বন্ধ দরজাটার দিকে চাইল লিজা, ভাবতে গিয়ে চেপে বসল ঠোট দুটো।

রনের দিকে চেয়ে বলল, ‘আমার মন-মানসিকতা এমন নয় যে মেইমি জেন্টস পার্লার-এর মেয়েদের সঙ্গে বাকি জীবন প্রতিযোগিতা করে কাটাব। কিন্তু মিস্টার টমসনের ধারণা তার ছেলেকে ত্যাগ করা আমার নিষ্ঠুরতা। আগেও আমি নর্দমা থেকে প্যাট্রিককে তোলার চেষ্টা করতে পিস্তল ফ্ল্যাটে এসেছি। মিস্টার টমসন মনে করে চেষ্টা করলে প্যাট্রিককে আমি বদলাতে পারব। কিন্তু এখন আর ততটা নিশ্চিত নই আমি।’ রনের চোখে চাইল লিজা। ‘সত্যি বলতে এটাও আর জানি না যে, চেষ্টা করে দেখতে চাই কি না।’

নরম গলায় বলল রন, ‘তুমি সবসময় আমার কাছে সেই ছোট লিজা ট্রেইসিই থাকবে, কারও মিসেস নয়।’

আন্তরিক মিষ্টি হাসি দেখা দিল লিজার ঠোঁটে। বেশিক্ষণ মন খারাপ করে থাকবার মেয়ে নয় সে। ‘দশ বছর আসলে যেন ছিল এক শ’ বছর, রন। ...বড় হয়ে যাওয়া লিজাকে তুমি কতটুকু চেনো?’

‘আমার সম্বন্ধেই বা কী জানো তুমি?’ পাল্টা জিজ্ঞেস করল রন।

‘মাটিতে কান রাখি আমি,’ বলল লিজা। ‘আর ছোটবেলায় যেমন থাকে, তার চেয়ে খুব বদলায় না পুরুষমানুষ। বড়জোর একটু ভাল বা মন্দ হয়।’ হাসিটা চওড়া হলো লিজার। দু’গালে টোল পড়ল। ‘সেই ছোটবেলায় দু’হাত বোঝাই এল পাসোর খবরের কাগজ নিয়ে যে-ছেলেকে মেইমি জেন্টস থেকে গুরু করে সবখানে বিলি করতে দেখতাম, তার চেয়ে আজকের তোমাকে বেশি সম্মানী লোক ভাবতে পারছি না, রন।’

‘কাগজের কারবার করা ব্যাঙ্কার হবার জন্যে খুব দরকারী, লিজা,’ মৃদু হাসল রন।

‘তা-ই?’ হাসিটা মুছে গেল লিজার ঠোঁট থেকে। ওর ডিম্বাকৃতি মুখে দেখা দিল বিষণ্ণতার ছাপ। ‘ছেলেবেলায় আর সবার মত খেলাধুলোর সময় পাওনি তুমি। হয় কাজ করেছে, নয়তো লড়াই— কখনও নিজের জন্যে, কখনও আমার জন্যে।’

হঠাৎ সজোরে খুলে গেল ওয়েইটিং রুমের দরজা, তেড়েফুঁড়ে ভিতরে ঢুকল ক্লার্ক ফাওল। তোবড়ানো, ভেজা ডার্বি হ্যাট কুঁচকে আছে, বামহাতে ধরা রুমাল দিয়ে মুখের নীচের অংশ ঢেকে রেখেছে। নীল চোখ দুটো জ্বলছে তার প্রতিহিংসার আগুনে। ডানহাতে ধরে রেখেছে কালো একটা ছোট ব্যাগ। ক্লার্ক ফাওলের জ্বলন্ত দৃষ্টি লিজার উপর থেকে ঘুরে স্থির হলো রনের উপর, তারপর দ্রুত হেঁটে এজেন্টের অফিসে ঢুকে গেল সে।

দরজাটা খুলতেই টেলিগ্রাফ মেশিনের খটাখট আওয়াজ ঢুকল ওয়েইটিং রুমে। চকিত বিদ্যুৎ-চমকে ঝিকিয়ে উঠল ছোট অফিসের ভিতরটা। সেই উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, বুড়ো টমসন ডেস্কের দিক থেকে মুখ তুলে চাইল ক্লার্ক

ফাওলের দিকে।

পরের বজ্রপাতের আওয়াজ শুরু হতেই অফিসে ঢুকে গায়ের জোরে দরজাটা বন্ধ করে দিল ক্লার্ক ফাওল।

রন বলল, 'ক্লার্কের আচরণে মনে হচ্ছে না আগের পরিচয় ঝালিয়ে নিতে খুব একটা আগ্রহী।'

রেইলরোড অ্যাভিনিউতে বেরুনোর দরজার কাছে গিয়েও আবার ফিরে এল লিজা; রনের সামনে এসে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়াল, হাত রাখল রনের বাহুতে। 'আমি তোমার সঙ্গে শীতল আচরণ করিনি, রন। তবে আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভাল বলে পিস্তল ফ্ল্যাটে কোনও সুবিধে পাবে না তুমি। তুমি এ-শহর থেকে চলে যাবার পর আমার পেছনে উঠে পড়ে লেগেছিল ক্লার্ক ফাওল। কীভাবে যেন ওর ধারণা হয়েছে আমার ওপর অধিকার আছে ওর। একবারের জন্যেও হাল ছাড়েনি তারপর থেকে।' চিবুক নিচু করে নিল লিজা, গলার স্বর নামাল। 'নিষ্ঠুর শোনাতেও এটা সত্যি যে, বলতে গেলে ক্লার্ক ফাওলকে এড়াতেই প্যাট্রিক টমসনকে বিয়ে করেছিলাম আমি অনেকই এ-কথা বলে তিরস্কারও করেছে আমাকে।'

বাহুতে রাখা লিজার হাতটা অন্যহাতে আলতো করে ধরল রন, নিচু গলায় বলল, 'তা হলে হয়তো ঠিক সময়েই ফিরেছি আমি।'

'আমার বোঝা উচিত ছিল যে তুমি ফিরবে,' প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিক্ষণ রনের চোখে চাইল লিজা, তারপর নামিয়ে নিল দৃষ্টি। 'তুমি সবসময় জেদী মানুষ ছিলে, রন। একবার কোনওকিছু করবে ঠিক করলে কেউ তোমাকে ফেরাতে পারত না।' রনের বাহু থেকে হাত সরিয়ে নিল সে। 'কখনও তোমার কোনও সাহায্যে আসিনি আমি। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই অথচ দেখো, এই আমার জন্যে আবারও বিপদে জড়িয়ে গেলে।'

'ক্লার্ক ফাওল বিপদ ঘটাবে আমার?' হেসে ফেলল রন। 'কখনও আমাকে বিপদে ফেলতে পারেনি। এখনই বা কেন ওর কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করব!'

'হয়তো ক্লার্কের ক্ষতি করার সাধ্য নেই,' সরে দাঁড়িয়ে বলল লিজা, 'তবে পিস্তল ফ্ল্যাটের ডেপুটি শেরিফ ও। আর ওর পেছনে আছে তোমার পুরনো শত্রু— ক্রাইভ হেস্টিংস। সে...

এজেন্টের অফিসের দরজা খুলে গেল, একবারও রন বা লিজার দিকে না চোঁয়ে রেইলরোড অ্যাভিনিউর দিকের দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল ক্লার্ক ফাওল। ক্ষণিকের জন্য দমকা বাতাস ঢুকল ঘরে, তারপর সুইং দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আবার অস্পষ্ট হয়ে গেল ঝড়ের আওয়াজ।

লিজা বেসুরো গলায় বলল, 'ওর হাতে ওটা নিশ্চয়ই আমার সুটকেস ছিল না?'

অফিস থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে দু'জনের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো জিমি টমসন। 'এবার সে বলে উঠল, 'ক্লার্ক বলল ও বিলের বাড়ির ওদিকে যাচ্ছে। সুটকেসটা নিয়ে যাওয়ায় কোনও সমস্যা হয়নি নিশ্চয়ই?' বুড়োর বলবার সুরে পরাজয়ের সুর স্পষ্ট চিনল রন।

কী ঘটেছে লিজাও বুঝতে পেরেছে, বুড়ো টমসনকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে তাড়াতাড়ি করে বলল, 'না, কোনও সমস্যা নেই!' জিমি টমসন ধীরে ধীরে অফিসের দিকে ফিরছে। পিছন থেকে তাকে দেখল লিজা, তারপর এজেন্টের অফিসের দরজা আবার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রনের দিকে চেয়ে বলল, 'ভাবছি...' কথাটা শেষ না করেই রেইলরোড অ্যাভিনিউর দিকের দরজা খুলে বাইরে পা রাখল ও।

লিজার পিছু নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল রন।

দুই

তুমুল ঝড়-বৃষ্টির কারণে ব্রেকম্যানের হোটেলে মেইমির পার্লার থেকে হেস্টিংসদের প্রকাণ্ড ম্যানসন পর্যন্ত রেইলরোড অ্যাভিনিউর রাস্তা পরিণত হয়েছে লালচে কাদার নদীতে। পিস্তল ফ্ল্যাটের অতি ধনী ও অতি গরীবদের বসতি দুটোর সংযোগ রক্ষা করছে এই রাস্তা। দু'পাশে অ্যাডোবি আর কাঁচাহাতে তৈরি কাঠের বাড়ি-ঘরগুলোয় একসময় ছিল জমজমাট সেলুন, দোকান, থ্রোসারি স্টোর ও বোর্ডিং হাউস। এখন ডেভ বেল-এর মার্কেন্টাইল কোম্পানি, নিভেন হাওয়ার্ড-এর হোটেল, ম্যাক পিলারের হার্ডওয়্যার, টিন শপ ও রানিং আয়ার্ন সেলুন ছাড়া পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সব বাড়ি। উপার্জনের উপায় না দেখে পশ্চিমের উর্বর, নিচু সমতল ভূমিতে গরুর ব্যবসা করতে ছড়িয়ে পড়েছে শহরের বেশিরভাগ বাসিন্দা। মাত্র কয়েকটা পরিবার এখনও রয়ে গেছে পিস্তল ফ্ল্যাটে।

রন যে-শহরটা চিনত, সেটা ছিল ছোট জামা গায়ে দ্রুত বেড়ে ওঠা একটা বাচ্চার মত। এখন শহরের পরিত্যক্ত এই জীর্ণ অবস্থা দেখে ওর মনে হলো বৃদ্ধ কোনও কঙ্কালসার মানুষকে দেখছে। ঝড়ের শেষ-বিকেলের মৃদু আলোয় জনশূন্য শহর যেন নীরবে বলছে, এখানে নতুন করে জনবসতি গড়ে উঠবার

কোনও সম্ভাবনা নেই।

তারপরও, পরিত্যক্ত খনির তামা উত্তোলন করে শহরকে আবারও নতুন জীবন দিতে চাইছে রন।

এ-শহর গড়ে তুলেছিল তামার খনি। তামার খনি আবারও শহরকে জীবন দিতে পারবে।

ডিয়ান হেস্টিংসের মত কিছু মানুষ তামা মাইনিং করে সমৃদ্ধ করেছে অ্যারিয়োনাকে। কিন্তু সেটা ছিল তখন, যে-সময় মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যেত দলা দলা তামা। প্রচুর খনিজ পাওয়ায় তামার দাম পড়ে গেল। এখন অ্যারিয়োনার তামার খনি-শিল্প বড় ব্যবসা হিসাবে শুধুই অতীতের স্মৃতি।

খনিজ ফুরিয়ে যাওয়ায় ক্রিফটন, মোরেসি, বিসবি বা জেরোম-এর মত জমজমাট শহর রাতারাতি পরিণত হয়েছে প্রায়-জনশূন্য গ্রামে। এখন পিস্তল ফ্ল্যাটের তামার প্রাচুর্য নেই, মাইনারদের শাবল এখন আর খুঁজে পায় না চাক চাক তামা। সেই কবেই নিভে গেছে স্মেলটারের আগুন, হাজার হাজার ডলারের যন্ত্রপাতি ফেলে রেখে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে ডিয়ান হেস্টিংসের ইউনাইটেড ফেডারাল কপার মাইনিং কম্পানি।

মিউল হিলের খনিতে এখন তামা আছে শুধু শত শত বহুতল সুড়ঙ্গের ছাত ধরে রাখা অসংখ্য পিলারগুলোতে।

অনেকদিন হলো ডিয়ান হেস্টিংসকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে কবরে। পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে নিচু জমিতে রানশ করে চলে গেছে দশ হাজার মানুষ, ঠিক যেমনি করে বানের পানি সরে যায় ভাটির দিকে। ইউনাইটেড ফেডারালের মালিকানা হারিয়ে গেছে নানা আইনী বিরোধে।

পিস্তল ফ্ল্যাটে এখন আর হৈ-হুল্লোড় ও গোলমাল নেই। বেতনের দিনগুলোতে ভিড়-ভরা রেল-রাস্তা, ক্যানিয়ন বা হোগান্স অ্যালিতে টহল দিতে বের হয় না রন মার্লোর বাবার মত শক্ত কোনও দৃঢ়চিন্তা ল-ম্যান। ঠিক তেমনিই, কোনও দরকার নেই ইউনাইটেড ফেডারাল-এর তৈরি ধসে পড়া খনি-মুখের সামনে জড় করা জং ধরা যন্ত্রপাতিগুলোর।

একসময় পঞ্চাশ মাইল দূরের জংশন থেকে মিউল হিল খনি পর্যন্ত প্রায় বিরতিহীন ভাবে চলত ট্রেনের আনাগোনা। এখন জ্যাক ওয়েড এবং তার মত কয়েকজন বয়স্ক ট্রেনম্যান সপ্তাহে দু'দিন খনির নাছোড়বান্দা কিছু মজুরকে নিয়ে আসে, নিয়ে যায়।

মৃত-প্রায় শহরের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ঝড়ো হাওয়া, রোদে শুকনো বিল্ডিংগুলো নানা রকম আওয়াজ করছে, রেল-রাস্তা আর ক্যানিয়নের সংস্ফূর্ত পুঁতে রাখা লোহার খুঁটিতে সরসর আওয়াজ তুলে বাড়ি মারছে দড়ি। কিন্তু এসব দিকে খেয়াল নেই রনের। ওর মন জুড়ে আছে হোগান্স অ্যালি। এখানে, এই

পিস্তল ফ্ল্যাটেই ওর শিকড়।

চোখের সামনে অতীতের দৃশ্য ভেসে উঠল।

ঠিক এরকমই এক বৃষ্টিভেজা দিনে ঝড়ো বাতাস বইছিল আজ থেকে এগারো বছর আগে। বুড়ো টমসন তার ডেস্ক আর টেলিগ্রাফ যন্ত্র ছেড়ে গিয়েছিল খানিকক্ষণের জন্য, রনকে জানিয়েছিল একটা দুঃসংবাদ।

সীমান্তের কোনও এক গানম্যান তার নামডাক আরেকটু বাড়িয়ে নিয়েছে। মারা গেছে ওর বাবা ডিক মার্লো।

লিজাও বোধহয় অতীতের কথাই ভাবছে, কারণ একটু পর মুখ খুলল: ‘মনে পড়ে, ঠিক এখানে ক্লাইভ হেস্টিংস, ক্লার্ক ফাওল আর লিউট ফেরিস ইঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেটাতে চেয়েছিল তোমাকে?’

‘হ্যাঁ, মনে আছে,’ মৃদু গলায় বলল রন। আরেকটা কথা মনে পড়ল ওর। সেদিন যেন নতুন সেই কবরটা থেকে ডিক মার্লোর গলা শুনেছিল: ‘‘তুমি যখন বিপদে পড়বে, তখন নিয়ম ধরে সবকিছু করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। জলদি করে সবচেয়ে শক্ত লাঠিটা তুলে নাও, ওটা দিয়ে পিটিয়ে পথ করে নাও নিজের।’’

রন বলল, ‘ইয়েটস্ স্যামসনের জ্বালানী কাঠের ওয়্যাগন থেকে তুলে নেয়া মেসকিটের ডাল ওই লড়াইয়ের ফলাফল আমার দিকে এনেছিল।’

‘মিস্টার মার্লোর কবরের মাটি শুকাবার আগেই তোমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে চেয়েছিল ওরা,’ মৃদু গলায় বলল লিজা।

‘বাবার বা আমার সহজে বন্ধুত্ব হতো না কারও সঙ্গে। বাবা বলত, এটা ভাল অইনের লোক হবার মাসুল। তুমি আর তোমার বাবা ছাড়া আমাদের প্রতি কোনও সহানুভূতি ছিল না ক্যানিয়নের কারও। বাবা ধনী-গরীব সবাইকে এক মাপকাঠিতে মাপত, বাড়তি খাতির করত না কাউকে, ‘ছাড়ও দিত না কাউকে, তাই হেস্টিংসদের মত বড়লোকদের সঙ্গেও মিশতে পারতাম না আমরা।’

‘আসলেই,’ সায় দিল লিজা ট্রেইসি। ‘মিস্টার মার্লো এ-শহরে এসে পরিস্থিতি শান্ত করার আগে যারা একটু শান্তির আশায় অস্থির ছিল, সেই তারাই মিস্টার মার্লো মারা যাবার বারো ঘণ্টা পেরুনের আগেই হয়ে গেল শহরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ডিয়ান হেস্টিংস! লী ফাওল! টম ফেরিস! এখন তাদের ছেলেরা চালাচ্ছে পিস্তল ফ্ল্যাট। ...আরেক মার্লো এখানে শান্তিতে থাকতে পারবে না, রন। এরই মধ্যে ক্লার্ক ফাওলের পা মাড়িয়ে দিয়েছ তুমি।’

রানিং আয়ার্ন সেলুনের কাছে চলে এসেছে রন ও লিজা। অনেক আগে বোতল থেকে পড়ে যাওয়া হুইস্কির বাসি গন্ধ পেল ওরা। মাইনারদের প্রথম রাউণ্ড ড্রিস্ক বোধহয় শেষ হয়েছে, গল্পগুজবে মত্ত হয়ে হৈ-হল্লা করছে তারা।

সেলুনটাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা, বনিলাস সেতু পেরুতে শুরু করল।

ক্রীকের উপর সরু সেতু। দু'পাশে রেইলিং। দু'জন পাশাপাশি হাঁটলে শরীরে শরীর ঘষা লাগে। সেতু পেরুবার সময় পুরনো দিনের রোমাঞ্চকর স্মৃতি জাগল রন ও লিজার মনে।

লিজার বাবা বিল ট্রেইসি ও রনের বাবা ডিক মার্লোকে প্রায় বন্ধুই বলা যায়, কিন্তু দু'জনের চলবার পথ ছিল দু' দিকে।

বিল ট্রেইসি ছিল সীমান্তের সং একজন পেশাদার জুয়াড়ী। ডিক মার্লো যখন মারা গেল, খেলা বাদ দিয়ে উঠে পড়ল বিল ট্রেইসি, খুঁজে বের করে অদ্ভুত একটা প্রস্তাব দিল রনকে।

'কেউ নেই তোমার। মা-ও নেই, বাবাও নেই। যাবার কোনও জায়গা নেই তোমার। লিজারও মা নেই। ওর শুধু আমি আছি, আর আমি বেশিরভাগ সময়ই বাইরে বাইরে থাকি। সতেরো বছর বয়সের তুলনায় বেশ শক্তপোক্ত হয়ে উঠেছ তুমি, কাউকে ভয়ও পাও না। আর এখন, আমার মনে হচ্ছে এই ক্যানিয়নে মায়ের চেয়ে লিজার অনেক বেশি দরকার একজন সাহসী বড় ভাই। ...তো কী বলো, থাকবে তুমি আমাদের সঙ্গে?'

সেই থেকে ট্রেইসি পরিবারের সঙ্গে একই বাসায় বসবাস শুরু করল রন— ছিল, যতদিন না ছটফটে কিশোরী থেকে হঠাৎ করে রহস্যময়ী এক অদ্ভুত সুন্দরী তরুণী হয়ে গেল লিজা।

তারপর এক দুপুরে কিচেনে ঢুকল তরুণ রন। ব্যস্ত হয়ে বাসন ধুচ্ছিল লিজা। দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমবারের মত লিজার পরিপূর্ণ দু'ঠোঁট, কোমরের রমণীয় বাঁক, বাসায় পরবার পুরনো পোশাকের নীচে সুডৌল উরু খেয়াল করল রন। লিজা ঘুরে দাঁড়াতেই ওর চোখ আটকে গেল তরুণীর সুউন্নত বুকে। পোশাক ছাড়া লিজাকে কল্পনায় দেখল ও। খোলা কালো চুল ছড়িয়ে আছে ধবধবে সাদা দু'কাঁধে...

পুরনো সেই সহজ সম্পর্কটা হারিয়ে গেল কোথায় যেন। আর... যত দ্রুত সম্ভব শহর থেকে হারিয়ে গেল রন মার্লো।

সেতু পেরিয়ে নিভেন হাওয়ার্ডের হোটেলের দিকে বাঁক নিল রন ও লিজা। ঝমঝমিয়ে নেমেছে বৃষ্টি, সে সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ার দাপট। লিজার চুলগুলো কালো দড়ির মত হয়ে গেল বৃষ্টিতে ভিজে। হাওয়ায় উড়ছে সেই দড়ি, রনের মুখ স্পর্শ করছে। মিষ্টি একটা সুবাস পেল রন।

'তুমি চলে যাওয়ার পর আবারও বাবার ওপরে বর্তাল আমার সমস্ত দায়িত্ব', নিচু গলায় বলল লিজা। 'সাধ্যমত আমাকে আগলে রাখতে চেষ্টা করেছে বাবা, কিন্তু এমন সব জিনিস আমি শুনলাম, দেখলাম, যেগুলো পৃথিবীতে আছে বলে জানতাম না। তুমি থাকলে কখনও শুনতাম না বা জানতাম না ওসব।'

‘এ-ই হয়তো ভাল হয়েছে, লিজা। দুনিয়া চেনা ভাল একটা শিক্ষা। এমন কী মেয়েদের জন্যেও।’

‘হতে পারে। ওসব জেনে আমার কোনও ক্ষতি হয়েছে তা বলব না, রন।’ গ্রীবা ঘুরিয়ে রনের দিকে চেয়ে হাসল লিজা। দু’জনের সম্পর্কের আড়ষ্টতা কমল এতে খানিক।

চুটকি বাজিয়ে রন বলল, ‘আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম! ছেলেদের একটা ড্রিল কিনে দেব কথা দিয়েছি। ব্রিফকেসটা হোটলে রেখেই সেলুনে ফিরতে হবে।’

‘কোনও দরকার নেই, রন, আমিই ওটা পৌঁছে দেব ওখানে,’ বলল লিজা। ‘ওরা তোমার জন্যে সেলুনে অপেক্ষা করবে।’

‘আচ্ছা,’ একটু দ্বিধা করল রন, তারপর বলল, ‘তাড়াতাড়িই ফিরব, হয়তো ফিরে এসে দেখব তুমি হোটেল ছেড়ে রওনা হওনি। তোমাকে মিস্টার ট্রেইসির ওখানে পৌঁছে দিতে পারব।’

‘অপেক্ষা করতে কোনও অসুবিধে নেই আমার,’ মিষ্টি করে হাসল লিজা। রনের হাত থেকে নিয়ে নিল ব্রিফকেসটা।

হ্যাট খুলে লিজাকে সম্মান দেখাল রন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল রানিং আয়ার্ন সেলুনের দিকে।

রন মার্লো ও লিজা ট্রেইসি রানিং আয়ার্ন পেরুনোর মিনিটখানেক পর কাঁধের ধাক্কায় সেলুনের ব্যাটউইং ডোর খুলে বোর্ডওয়াকে পা রাখল মাতাল জুয়াড়ী প্যাট্রিক টমসন। দামাল হাওয়ার তাড়া খেয়ে বরফ-শীতল বৃষ্টি আছড়ে পড়ল ফ্যাকাসে মুখে। যতক্ষণ পেরেছে নতুন আসা মাইনারদের আশাব্যঞ্জক কথা শুনেছে প্যাট্রিক টমসন, এবং শেষে তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে। তামা-শূন্য ফোঁপড়া খনির উপর পড়ে আছে পিস্তল ফ্ল্যাট শহরটা, কাজেই নিঃশ্বাস খনিটা থেকে কীভাবে প্রচুর তামা পাওয়া যাবে, কীভাবে বড় গর্ত খুঁড়ে তামা উত্তোলন করলে লাভ হবে, বা যেসব বুয় টাউনের নামও শোনেনি কখনও— সব এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে তার।

বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল প্যাট্রিক টমসন। সন্ধ্যার নেমে আসা আধারে অগ্নসরমান পায়ের আওয়াজ পেয়ে উত্তর দিকে চাইল। সারাদিন বেশ মদ গিলেছে সে, সেই মদ পেটের ভিতরে এখন পাক দিল তার। টের পেল, শরীরটা হঠাৎ করেই থরথর কাঁপতে শুরু করেছে।

ওই মহিলা! সেই একই হাঁটবার ভঙ্গি! প্রতিটা পদক্ষেপ ওকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে তার কাছ থেকে! বোতলের ভূত নয় ওই মেয়ে। লিজা না হয়েই যায় না ও!

ঘুরে দাঁড়িয়ে লিজার দিকে এক পা ফেলল সে, তারপর চিনতে পারল

লিজার পাশে হেঁটে যাওয়া চওড়া কাঁধের শক্ত গড়নের লোকটাকে। সহজ ভঙ্গিতে লিজার সঙ্গে হাঁটছে সে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হুড়মুড় করে আবার সেলুনে ঢুকল প্যাট্রিক টমসন। দরজার পাশে ধমকে দাঁড়াল। মদের নেশার সঙ্গে মিতালী করে তার মনের ভিতরে বাড়তে শুরু করল রাগ ও হতাশা। নেশা ও তিক্ত অনুভূতি তাকে আরও নীচ করে তুলল। প্যাট্রিক টমসন দেখল না যে, লিজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবারও রানিং আয়ার্নের দিকে ফিরতি পথ ধরেছে রন মার্লো।

রন যখন রানিং আয়ার্ন সেলুনে এসে ঢুকল, ভিড় করা লোকজন দেখতে দেখতে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে সরতে শুরু করেছে মাতাল প্যাট্রিক টমসন।

কাউন্টারের সামনে গিয়ে প্রকাণ্ডদেহী ফ্লিস্টেটোন ফেলটনের সঙ্গে কথা বলল রন। মাতাল টমসন চলে গেল একটা টেবিলের কাছে। ওটাতে বসে আছে ক্যানভাসের কোট পরা এক লোক। তার কোটের পকেটে রূপার নক্ষত্র। এক দৃষ্টিতে কোথায় যেন চেয়ে আছে সে, কিন্তু মনে হয় দেখছে না আসলে কিছুই।

রনের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল ফ্লিস্টেটোন ফেলটন: ‘আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করিনি।’

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বারম্যানের বাড়িয়ে দেয়া হুইস্কির বোতল ও গ্লাস নিল রন, ঘুরে দাঁড়িয়ে মার্শালের দিকে চাইল।

ক্লিভ হেস্টিংস পরিণত বয়সে চওড়া, ভারী এক লোকে পরিণত হয়েছে। তার বিছের মত মোটা, কালো ভুরু দুটোর নীচে সার্বক্ষণিক অধৈর্যের দৃষ্টি। ফোলা চেহারা থেকে ফুটে বেরুচ্ছে অনমনীয় জেদ। ওই জেদ তার জন্মগত, সেই ছেলেবেলা থেকে সোনার চামচ ঠোঁটে নিয়ে বেড়ে উঠবার ফল। কখনও ছেলের কোনও চাওয়া অপূর্ণ রাখেনি কোটিপতি ডিয়ান হেস্টিংস।

রন দেখল, প্যাট্রিক টমসনের কথার জবাবে ভাবলেশহীন চেহারায় কী যেন বলল ক্লিভ হেস্টিংস। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল প্যাট্রিক টমসন, হাত বাড়াল ক্লিভ হেস্টিংসের সামনে রাখা হুইস্কির বোতলের দিকে।

ধপ করে টমসনের হাত ধরল ক্লিভ হেস্টিংস, তার ভারী, কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রন: ‘অনেক খেয়েছ আমার কাছ থেকে।’ ক্লিভ হেস্টিংসের গলার আওয়াজ অন্য সবার কথাগুলোকে তলিয়ে দিল, নড়ে গেল বারের উপরে রাখা কাঁচের গ্লাস-বোতল।

গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢালল রন, গ্লাসটা নিয়ে বারের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল খালি এক টুলের কাছে, ওখানেই বসল। সেখান থেকে ক্লিভ হেস্টিংসের টেবিলটার দৃষ্টি সামান্যই। প্যাট্রিক টমসনকে বলতে শুনল: ‘রন মার্লো এসেছে পিস্তল ফ্যাটে।’

কাউন্টারে রাখা গ্লাসটার দিকে ঝুঁকে বসল রন, বারের পিছনের পুরনো,

কালচে আয়নায় দেখতে পেল, প্যাট্রিক টমসনের কজি ছেড়ে দিয়েছে ক্লিভ হেস্টিংস।

বোতল কাত করে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল প্যাট্রিক টমসন, তারপর গ্লাস তুলে দীর্ঘ দিনের অভ্যস্ততায় জিভে না ছুঁইয়ে ঢক করে গিলে নিল হুইস্কি। মদ বোধহয় তাকে সাহস এনে দিল, কারণ ক্লিভ হেস্টিংসের চোখে এক দৃষ্টিতে চাওয়ার চেষ্টা করল সে। ‘মনে হচ্ছে না তুমি খুব চিন্তিত।’

‘চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ আছে?’

‘রন মার্লোর কাছে একসময় খুব নাজেহাল হতে তুমি— তুমি, ফাওল আর ফেরিস।’

‘জুতো এখন অন্য পায়ে— যে-পায়ে আমি লাখি মারি।’

মনে হলো কথাটা কানে যায়নি প্যাট্রিক টমসনের, নিজের চিন্তায় ডুবে গেল সে। একটু পরে বলল, ‘রন যদি না থাকত, লিজা কখনোই ছেড়ে যেত না আমাকে।’ টমসনের বলবার ভঙ্গিতে ঝগড়াটে একটা ভাব প্রকাশ পেল। সেই সঙ্গে বিস্ময়ও আছে, যেন চিন্তাটা এই প্রথম মাথায় এসেছে তার।

ভুরু কুঁচকে তাকে দেখল ক্লিভ হেস্টিংস। ‘রন’ মার্লো তখন ছিল নিউ ইয়র্কে। আট বছর তার সঙ্গে কোনও দেখা হয়নি লিজার। ...কী বলতে চাও আসলে, টমসন?’

‘ও আমার আর লিজার সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছে,’ জেদী স্বরে বলল প্যাট্রিক টমসন। ‘সবসময় লিজা বলত রন এরকম, রন ওরকম— এমন কী রন মার্লো বাথরুম থেকে বেরুলে কীভাবে তোয়ালে ভাঁজ করে রেখে আসত, তাও মনে রেখেছে লিজা। মনে হতো ওরা যেন আসলে বিবাহিত ছিল।’

ঠোঁট নাকা হয়ে গেল ক্লিভ হেস্টিংসের। চোখের ভারী পাতা নামিয়ে সরু চোখে টমসনকে দেখল। ‘হয়তো বিয়ে করাই উচিত ছিল ওদের— যেভাবে একসঙ্গে সময় কাটাত ওরা... আর বিল ট্রেইসি প্রায় সারাক্ষণ বাইরে বাইরে থাকত।’

বারের উপর গ্লাস নামিয়ে রেখে ঘুরে বসল রন, কিন্তু প্যাট্রিক টমসনকে টেবিলের উপর জোরে ঘুসি মারতে দেখেও নড়ল না। টেবিলের উপর লাফ দিয়ে উঠল হুইস্কির বোতল। চোখ গরম করে ক্লিভ হেস্টিংসের দিকে চেয়ে টলতে টলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্যাট্রিক। তার কোমরের ধাক্কা লাগল টেবিলের কোনায়। ‘পড়ে যাচ্ছিল বোতল, কিন্তু দশাসই শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক দ্রুততায় বোতল ধরে ফেলল ক্লিভ হেস্টিংস। বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল তার চেহায়ায়, ঘড়ঘড়ে গলায় ‘বলল, ‘কী হচ্ছে!’

যেমন দ্রুত জ্বলে উঠেছিল, তেমনি চট করে রাগের আগুন নিভে গেল প্যাট্রিক টমসনের। রাগ নৈই হয়ে যেতেই উজ্জ্বলের মত চেহারা হলো তার,

অনিশ্চয়তা আর ভয়ের দোলাচলে দুলতে শুরু করল সে, তাঁরপর কী বলবে ভেবে না পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যাট উইং দরজার দিকে রওনা হলো, বেত খাওয়া কুকুরের মত বেরিয়ে গেল সেলুন ছেড়ে।

বোতলটা এক হাতে ধরে এক দৃষ্টিতে টলটলায়মান প্যাট্রিক টমসনের চলে যাওয়া দেখল ক্লিভ হেস্টিংস, তারপর পকেট হাতড়ে বিশী গন্ধওয়ালা সস্তা তামাকের ফাটা চুরুট বের করল, কামড়ে ধরল বড় বড় চৌকো দাঁতে। গভীর ভাবে চিন্তা করছে সে এখন, কিন্তু চোখের দৃষ্টি মরা মাছের মত ভাষাহীন, ভারী চেহারায় কোনও ধরনের অনুভূতির সামান্যতম বহিঃপ্রকাশ নেই। একটু পর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল সে। চিবানোর ভঙ্গিতে চোয়াল নাড়ছে, সে সঙ্গে আস্তে আস্তে ঘুরছে দাঁতে ধরা চুরুট।

রনের মনে হলো, ক্লিভের হাতে আসলে কোনও কাজ নেই, ধীরেসুস্থে মজা করে হুইস্কি গিলছে, অবসর কাটাচ্ছে শহরের একমাত্র সেলুনে।

আরও কয়েক মিনিট পার হওয়ার পর ঘরের ভিতর চোখ বুলাতে শুরু করল ক্লিভ হেস্টিংস। তার চোখ স্থির হলো রনের উপর।

দু'জন দু'জনের দিকে নিষ্পলক চাইল রন মার্লো ও ক্লিভ হেস্টিংস।

বারের আরেক দিকে সরব হয়ে উঠেছে ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন। হঠাৎ অন্য সবার গলার আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর: 'কী করে করবে? ...বাস্পের কোদাল ব্যবহার করবে মিস্টার মার্লো, রেলগাড়ির বগি ব্যবহার করবে। ইলেকট্রিসিটি তো আছেই। আর আমরা দেব রক্ত-ঘাম।'

তার পাশের আরেক মাইনার কী যেন বলল। জবাবে হেঁকে উঠল ফেনটন: 'খরচ বেশি! তাতে তোমার কী? খরচ তো আর তোমাকে দিতে হচ্ছে না! খরচ তো দেবে মিস্টার মার্লো। টাকা জোগাড় করা তার কাজ। আর কাজটা সে খুব ভাল মতই জানে। ওই টিলার যেখানে সবচেয়ে বেশি তামা আছে, সেখানেও তামার পরিমাণ শতকরা দু'ভাগের বেশি নেই। কিন্তু মিস্টার মার্লোর পার্টনার জানে কীভাবে ওখান থেকে লাভ তুলতে হবে।'

আরেকজন প্রশ্ন করায় ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ফেনটন বারের উপর হাতের চাপড় মেরে জোর গলায় বলল, 'যন্ত্রপাতি? যন্ত্রপাতি কোথেকে এল তাতে কার কী? মিস্টার মার্লো হয়তো তার পানামা হ্যাটের ভেতর থেকে বের করবে ওসব— তো?' প্রশ্নকারী মাইনারের পিঠে আন্তরিক চাপড় দিল ফেনটন। চাপড় খাওয়া মাইনার উবু হয়ে প্রায় মিশে গেল বার কাউন্টারের সঙ্গে। 'আরে, মজা করে ড্রিল্ল করো! আগেও আমি ওই দু'জনের সঙ্গে কাজ করেছি। মিস্টার মার্লো পকেটের পয়সা আর হিসেব-নিকেশ দিয়ে জাদু দেখায়, আর তার পার্টনার দেখায় বোতল-ভরা অ্যাসিড দিয়ে। দু'জনের কাজ শেষ হওয়ার আগেই তাদের পকেটে আসতে শুরু করে কচকচে ডলার। সেই সঙ্গে ডলার আসে আমাদের

পকেটে । ...এবারও আসবে । সবাই অনেক টাকা পাব আমরা ।’

রনের উপর থেকে সরে গেল ক্লিভ হেস্টিংসের কঠোর দৃষ্টি । টানটান স্নায়ু খানিক শিথিল হলো রনের, ক্লিভ কার দিকে চেয়েছে দেখতে ঘাড় ফেরাল ও ।

কাঁধের ধাক্কায় ব্যাট উইং দরজা খুলে সেলুনে ঢুকেছে ক্লার্ক ফাওল, পিস্তল ফ্ল্যাট শহরের ডেপুটি শেরিফ সে বৃষ্টিতে ভিজে গায়ের কোট কুচকুচে কালো হয়ে গেছে তার । ভেজা স্ট্রি সুটকেস হাতে দ্রুতপায়ে ঘর পেরিয়ে হেস্টিংসের টেবিলে গিয়ে চেয়ার টেনে বসল সে । মাথায় এখনও তোবড়ানো, কোঁচকানো ডার্বি হ্যাট, ঠোঁটের কোণে রক্ত ।

‘কী ব্যাপার?’ জিজ্ঞেস করল ক্লিভ হেস্টিংস ।

‘রন মার্লো শহরে এসেছে!’

‘জানি,’ বলল হেস্টিংস । তবে কথাটা ক্লার্ক ফাওল বোধহয় শুনতে পায়নি, আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল, গুড়গুড় করে উঠল হেস্টিংসের গলা: ‘সাবধান, ক্লার্ক ।’

কিন্তু রাগে স্বাভাবিক সতর্কতা হারিয়েছে ক্লার্ক ফাওল । হেস্টিংসের দিকে ঝুঁকে এল সে, কানের কাছে মুখ এনে বলল, ‘ঠিক আমাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে মার্লো, যেখানে ওকে চেয়েছিলাম আমরা ।’ উঠে দাঁড়িয়ে সুটকেস তুলে নিতে হাত বাড়াল সে ।

হেস্টিংস নিচু গলায় বলল, ‘তুমি সবসময় মাথা গরম করে সব কাজ ভুল করো, ক্লার্ক ।’ ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল হেস্টিংস । দাঁড়ানোয় বোঝা গেল কত প্রকাণ্ড আকারের লোক সে । অবশ্য বেশ মোটা হয়ে গেছে । নিচু করে ঝোলানো কার্ট্রিজ বেল্টের উপর দিয়ে নেমে এসেছে তার বিরাট বপু । নেড়েচেড়ে হোলস্টার ঠিক করে নিল ক্লিভ হেস্টিংস, রিভলভারের সাদা বাঁটে আলতো চাপড় মারল, তারপর ঠিকমত মাথায় বসিয়ে নিল চওড়া ব্রিমের কালো রঙের হ্যাট ।

ক্লার্ক ফাওল অপমানিত গলায় বলল, ‘আমি জানি কী করতে হবে ।’

তার কাঁধে কোদালের ফলার মত প্রকাণ্ড, ভারী হাতটা রাখল ক্লিভ হেস্টিংস, তারপর বলল, ‘মাথা ঠাণ্ডা করো ।’ ঘুরে চাইল সে রনের দিকে, ক্লার্ক ফাওলকে জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে ও, তা-ই না? আমার সঙ্গে এসো, নইলে তোমার হাত ভেঙে বেরিয়ে যাবে ও ।’

রনের উপর থেকে দাস্তিক দৃষ্টি সরিয়ে নিল হেস্টিংস, তারপর রওনা হলো দরজার দিকে । প্রশিক্ষণ দেয়া বাদরের মত তার পিছু নিল ক্লার্ক ফাওল ।

দু’জনের আকস্মিক চলে যাওয়াটা রানিং আয়ার্নের পরিবেশে বাহ্যিক কোনও পরিবর্তন আনল না । তবে রন মার্লো মনে রাখল কথাটা । ক্লিভ হেস্টিংসের অপ্রকাশিত শত্রুতাটা অন্তর দিয়ে অনুভব করেছে, টের পেয়েছে

পরিণত বয়সেও ওকে সেই আগের মতই প্রচণ্ড ঘৃণা করে ক্লিভ হেস্টিংস। ওর কাজে বিরোধিতা করবার সুযোগ পেলে খুব খুশি হবে লোকটা।

তিন

ড্রিঙ্ক শেষ করে সবার বিল মিটিয়ে রানিং আয়ার্ন সেলুন থেকে বেরুল রন মার্লো, ক্লার্ক ফাওল ও ক্লিভ হেস্টিংসের টুকরো কথা শুনে চিন্তিত বোধ করছে। পিস্তল ফ্ল্যাটে খুব একটা বিরোধিতা আশা করেনি। ভেবেছিল নদীর স্রোতের মত বয়ে যাওয়া বছরগুলোয় পুরনো শত্রুতার পলি ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে।

এখন রেল-রাস্তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, সময় শুধুই ওর বিপক্ষে কাজ করেছে।

নিভেন হাওয়ার্ডের হোটেলের ঘের-দেয়া বারান্দা থেকে রাস্তার দিকে চাইল রন। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। দমকা হাওয়ায় দুলছে বৃষ্টির ভারী পর্দা, রাস্তায় বইয়ে দিচ্ছে স্রোত। বৃষ্টির পর্দাটার কারণে দূর দেখা যায় না। রেল-সড়ক ও তার পরের ডেভ বেল-এর মার্কেন্টাইল কোম্পানি অদৃশ্য হয়েছে দৃশ্যপট থেকে।

হাওয়ার্ডস হোটেলের লবিতে ঢুকল রন। ভিতরে একেবারেই অস্পষ্ট ঝড়ের আওয়াজ, মনে হয় বহুদূরে গোঙাচ্ছে কেউ। জুলাই মাসের উষ্ণতা এখনও রয়ে গেছে লবিতে। বাতাসে পোড়া তামাকের বাসি গন্ধ। বাতাসের দাপটে ছিন্নভিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে অন্তগামী সূর্যের এক চিলতে লাল রশ্মি ঢুকেছে এককোণের জানালা গলে। পুরনো কার্পেটে বিচিত্র নক্সা তৈরি করেছে রশ্মিটুকু, শেষপ্রান্ত ছুঁয়ে দিয়েছে হোটেলের ডেস্কটাকে। পিছনে বসে কবুতরের খোপের মত ছোট ছোট খুপরিতে চিঠি ভরছে এক লোক। রনের পদশব্দ পেয়ে ঘুরে চেয়ে হাসল সে।

হাসিটা পুরোপুরি পেশাদারী, কিন্তু তাতে খানিক উষ্ণতা নেই, তা নয়। নিক হাওয়ার্ডকে চিনতে পারল রন। যখন জমজমাট পিস্তল ফ্ল্যাটের ব্যস্ত সড়কে খবরের কাগজ বিক্রি করত, হোটেলের কাজে বাবাকে সাহায্য করত নিক হাওয়ার্ড। গত কয়েকবছরে বয়সের ছাপ পড়ে গেছে নিক হাওয়ার্ডের চেহারায়। ডেস্কে বসে থাকতে থাকতে সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে দু'কাঁধ। তবে

গালদুটো এখনও নিটোল, লালচে। অবশ্য পাতলা হতে শুরু করেছে সোনালী চুল।

‘তিনজন অপেক্ষা করেছে তোমার জন্যে, রন,’ বলল সে।

হোটেলের ফাটলধরা চামড়ার এক চেয়ারে চুপচাপ সলজ্জ ভঙ্গিতে বসে আছে লিজা ট্রেইসি, কোলের উপর ফেলে রেখেছে শিথিল দু’হাত।

‘অপেক্ষা করেছে তুমি,’ বলে লিজার দিকে চেয়ে হাসল রন।

লিজা ট্রেইসির দিকে চাওয়ায় নিক হাওয়ার্ডের হাসিটা একটু স্নান হলো। রনের মনে পড়ল, অভিজাত শ্রেণীর জন্য তৈরি হয়েছিল হাওয়ার্ডস হোটেল। আগে হলে এ-হোটেলে কোনও জুয়াড়ীর মেয়েকে স্বাগত জানানো হতো না।

ডেস্কের উপর একটা চাবি রেখে নিক হাওয়ার্ড বলল, ‘সত্যি কথা বলতে যে-কোনও ঘরে উঠতে পারো, রন। হোটেলে এখন দু’তিনজনের বেশি অতিথি কখনোই থাকেনা।’

মৃদু হাসল রন, নিক হাওয়ার্ডের চেহারা থেকে বরফ গলে গেছে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল। ‘টের পাবার আগেই দেখবে তোমার কয়লা রাখার জায়গাটাও দখল হয়ে গেছে, নিক। অনেক দিন থাকব বলে এখানে এসেছি। দু’জন আমরা একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করব।’

ক্লান্ত ভঙ্গিতে রনের হাতটা ধরল নিক হাওয়ার্ড, চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, ‘কী বলছিলে, রন?’

‘টাকার কথা বলছিলাম,’ বলল রন, ‘বলছিলাম নতুন পিস্তল ফ্ল্যাটের কথা।’

‘টাকার রোজগার করতে কোনও আপত্তি নেই আমার, রন,’ বলল নিক হাওয়ার্ড। ‘আর পিস্তল ফ্ল্যাট যদি আবারও নতুন জীবন পায়, তো খুবই ভাল।’ একটু ইতস্তত করল সে, খুকখুক করে কেশে নিয়ে বলল, ‘তোমার ব্যাপারে খারাপ কোনও মনোভাব নেই আমার, কিন্তু শহরের কারও কারও আছে। ডিক মার্লো আমার চেয়ে মাত্র বছর দশেকের বড় ছিল, কিন্তু তাকে সত্যিকারের একজন সাহসী পুরুষ মনে করতাম আমি।’

‘আমিও তা-ই মনে করতাম, এখনও করি,’ বলল রন।

‘এই ডেস্কে বসে ওই জানালা দিয়ে দেখেছি কীভাবে ডিয়ান হেস্টিংসকে হারিয়ে দিয়েছিল তোমার বাবা,’ বলল নিক হাওয়ার্ড। ‘তোমার হয়তো মনে আছে, এখানে তখন বার ছিল আমাদের। সারাদিন বারে পড়ে ছিল ডিয়ান হেস্টিংস, ফুঁসছিল তোমার বাবার ওপর।’ ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টিতে লিজার দিকে চাইল নিক হাওয়ার্ড। ‘প্রচুর হারছিল বিল ট্রেইসির কাছে, চাইছিল বিল ট্রেইসিকে শহর থেকে বের করে দেবে মার্শাল। কিন্তু ডিক মার্লোর কাছে কে কী, তার চেয়ে মানুষের নাগরিক অধিকার সবসময় বেশি গুরুত্ব পেত। ডিয়ান হেস্টিংসকে তোমার বাবা মুখের ওপর বলে দিল, ‘ডিয়ান’ হেস্টিংসের অনেক

ব্যবসায়িক চুক্তির চেয়ে সংভাবে খেলেছে বিল ট্রেইসি; হুঁশিয়ার 'করে দিল, আবারও যদি শোনে কেউ বিল ট্রেইসিকে উত্ত্যক্ত করছে, দেরি না করে ডিয়ান হেস্টিংসকে খুঁজে বের করে জবাবদিহি করবে সে। সে সন্ধ্যায় অভ্যাসমত রেল-রাস্তায় পায়চারি করতে বের হলো তোমার বাবা।

'তাকে দেখতে পেয়েই বার থেকে বেরিয়ে গেল ডিয়ান হেস্টিংস। আগেই অস্ত্র বের করে ফেলেছিল। তোমার বাবা তখন সেতুর ওদিকে দাঁড়িয়ে। হেস্টিংসকে ঠাট্টা করল ডিক। হেস্টিংস হাতের অস্ত্র খালি করে ফেলার আগে ড্র-ই করল না। দু'জনের দূরত্ব ছিল বড়জোর পঞ্চাশ গজ। অল্প আলো আর হেস্টিংসের উত্তেজনা, এ দুটোর ওপর জুয়া খেলেছিল তোমার বাবা। সবগুলো গুলি লক্ষ্যচ্যুত হলো ডিয়ান হেস্টিংসের, কিন্তু তোমার বাবা ফুটো করে দিল তাকে। ইচ্ছে করলে হেস্টিংসকে খুন করতে পারত, কিন্তু করেনি। এরকম একটা অশান্ত শহরে হাসির পাত্র হওয়ায় কখনোই তোমার বাবাকে ক্ষমা করতে পারেনি ডিয়ান হেস্টিংস। এক মাসের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল সে, তবে বিছানায় পড়ে থাকলেই ভাল হতো।'

নিক হাওয়ার্ডের চোখে কীসের যেন ছায়া ঘনাল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, বিষণ্ণ গলায় বলল, 'পিস্তল ফ্ল্যাটে আমরা অতীত আঁকড়ে ধরে বাস করি।' হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাল সে, 'আমি গরম পানি পাঠিয়ে দেব, রন।'

'পরে, নিক,' মৃদু স্বরে বলল রন। 'আগে আমি লিজাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

দু' আঙুলে তুড়ি বাজাল নিক হাওয়ার্ড। 'ভুলেই গিয়েছিলাম, কর্নেল মার্শল্যাও বলেছেন তুমি এলেই' যেন তাঁকে খবর দিই।' ডেস্কে রাখা একটা রূপার ঘণ্টি বাজাল সে। শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার আগেই ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল, এগিয়ে আসছে। করিডর থেকে বেরিয়ে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল কোঁকড়ানো চুলের এক কিশোর। লিজার দিকে চাইল নিক হাওয়ার্ড, কিন্তু কথা বলল রনের উদ্দেশ্যে: 'কর্নেলের মেয়ে শনিবার পৌঁছেছে, আমাদের বলে রেখেছে, তুমি এলে যেন তাকেও খবর দিই।' ছেলেটার দিকে ঘাড় ফেরাল সে। 'স্যামি, মার্শল্যাওদের জানাও মিস্টার মার্লো পৌঁছেছেন।'

মিশেল মার্শল্যাও মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বা, পপলার গাছের মত ঝজু, ভরাট দেহ, হাঁটাচলায় ধীর, আকর্ষণীয়া। মায়ের দিক থেকে স্নাভ ও স্ক্যাগিনেভিয়ান রক্ত পেয়েছে, ফলে চোয়াল একটু উঁচু, চুলগুলো কাঁচা সোনার মত সোনালী। রনকে অবাক করে দিয়ে করিডর থেকে বেরুল সে, ঠোঁটে অভ্যর্থনার হাসি।

মিশেলকে আন্তরিক আলিঙ্গন করল রন।

'অবাক হয়েছ?' রনকে জিজ্ঞেস করল মিশেল, সঙ্গীর কাঁধের উপর দিয়ে

চাইল লিজা ট্রেইসির দিকে।

‘একটু অবাক হয়েছি,’ বলল রন। ‘হাওয়ার্ড’স পিস্তল ফ্ল্যাটের সেরা হোটেল, তবে আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে আসার আগেই তোমার জন্যে সুন্দর কোনও বাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলব।’

হাসিটা চওড়া হওয়ায় চোখের কোণ কুঁচকে উঠল মিশেলের। ‘বাকি জীবন যদি আমাকে করিডরের শেষ মাথায় বাথরুমের রাজ্যে যেতে হয়, আর ফাটা বেসিনে মুখ-হাত ধুতে হয়, তা হলে এখনই অভ্যস্ত হয়ে নেয়া ভাল।’

‘কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মিশেল, আগামী কিছু দিন কর্নেল বা আমি মোটেই সময় দিতে পারব না তোমাকে।’

রনের বাহুডোরে হেলান দিল মিশেল, আলতো করে রনের দু’ঠোটে রাখল আঙুল। ‘তোমাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে কাউকে না কাউকে তো দরকার হতোই। বাবা আমাদের বিয়ের জন্যে এরইমধ্যে হেস্টিংস ম্যানশন কিনে নেবার কথাবার্তা চালাচ্ছে।’

পিছিয়ে দাঁড়াল রন। ‘ক্লিভ হেস্টিংস যদি জানে বাড়িটা আমার জন্যে কেনার কথা ভাবা হচ্ছে, আকাশছোঁয়া দাম হেঁকে বসবে।’

মিশেলের নীল চোখ স্থির হলো লিজার বাদামী চোখে। রন নিচু গলায় বলল, ‘ও মিসেস টমসন, আমার পুরনো বান্ধবী। লিজা, মিস মার্শল্যাণ্ড, আমার বাগদত্তা।’

‘মিসেস টমসন! আচ্ছা! তোমার কথা অনেকবার রনের মুখে শুনেছি, কিন্তু একবারও রন বলেনি তুমি এত সুন্দরী।’ মিশেলের গলা শুনলে যে-কেউ বলবে নিখাদ প্রশংসা করেছে, কিন্তু লিজার বুঝতে অসুবিধে হলো না, আসলে নিজের সঙ্গে ওকে তুলনা করে দেখছে মিশেল মার্শল্যাণ্ড।

হঠাৎ কিছু একটা হারানোর অনুভূতি হলো লিজার, তবে সেটা কী, বুঝতে পারল না। একটু আড়ষ্ট গলায় বলল, ‘আশা করি রন আমার সম্বন্ধে ভাল কথাই বলেছে।’

নিষ্পাপ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল মিশেল মার্শল্যাণ্ডের চোখ। ‘অন্য কিছু বলারও উপায় ছিল?’

নিজের ভিতর একটা বাঘিনীর গর্জন শুনল লিজা। মিষ্টি হেসে রনের দিকে চেয়ে বলল, ‘রন, আমাকে সঙ্গ দিতে ক্যানিয়ন পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই। ক্যানিয়ন তো আমি হাতের তালুর মতই চিনি।’

চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল লিজা, কিন্তু কর্নেল মার্শল্যাণ্ডকে লবিতে ঢুকতে দেখে থামতে হলো ওকে।

কর্নেল হেনরি মার্শল্যাণ্ড বেশ বেঁটে লোক, সবসময় ভাল খাবার, ভাল মদ আর মাঝেমধ্যে তেমন ভাল নয় এরকম মেয়েমানুষের সঙ্গ তার খুব পছন্দের।

উচ্ছ্বল জীবনযাপনের ফলে মনমেজাজের কোনও স্থিরতা নেই কর্নেলের, বেহিসাবী খাওয়া ও মদ্যপানের কারণে গোল একটা ভুঁড়ি হয়েছে, সর্বক্ষণ তিরতির করে কাঁপে তার হাত।

আরও দুটো ব্যাপারে কর্নেলের প্রবল আগ্রহ আছে। একটা হচ্ছে তার মেয়ে মিশেল, দ্বিতীয়টা ধাতু বিষয়ক যে-কোনও জটিল সমস্যা।

খনির কাজে জড়িতরা কর্নেল মার্শল্যাণ্ডকে বলে ভূতত্ত্বের জাদুকর, অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন মানুষ। তবে সামাজিক পরিমণ্ডলে ওরকম উঁচু চোখে দেখা হয় না তাকে।

লিজাকে দেখে থমকে দাঁড়াল কর্নেল মার্শল্যাণ্ড, ভাব দেখে মনে হলো পুরনো কোনও বন্ধুকে বলছে, গমগম করে উঠল তার কণ্ঠ: 'একা যাবে! কী বলছ, মাই ডিয়ার! একসঙ্গে ডিনার করব আমরা।' রনের উপর থেকে আবার লিজার দেহে সঁটে গেল কর্নেলের দৃষ্টি। 'ডিনারের পর রন হয়তো ভদ্রতা করে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেবে।'

লিজার মনে হলো কর্নেলের আন্তরিক আচরণে কোথায় যেন খাদ আছে, ঠিক যেমন গলদ পেয়েছে মিশেলের উষ্ণ, অথচ কপট ভাল ব্যবহারে। কিন্তু দু'জনের আচরণের কী ওকে বিব্রত করছে, বুঝতে পারল না লিজা।

'ধন্যবাদ,' বলে চুপ হয়ে গেল। বুঝতে পারছে, ওর কথা শুনছে না কর্নেল, ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে ওর ঠোঁটের নড়াচড়া দেখছে। তাত্ক্ষণিক ভাবে কর্নেলের প্রতি অপছন্দের অনুভূতি সৃষ্টি হলো ওর।

কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের পুরা একখানা স্বাস্থ্যবান গোঁফ আছে, সেটার দু'প্রান্ত দুই তর্জনী বাঁকিয়ে উঁচু করে চওড়া হাসল সে। তামাকের দাগ পড়া আঁকাবাঁকা ছোট ছোট হলদে দাঁতগুলো দেখতে পেল লিজা। চশমার পিছনে চকচক করছে লোকটার চোখ, ঠিক যেন তুষার বা বরফে প্রতিফলিত সূর্যের আলো— ঝকঝকে ভাবের আড়ালে পুরোপুরি শীতল।

নীরবতা ভাঙল রন: 'লিজার বাবা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, কর্নেল। বাসায় ফিরতে দেরিও করতে চাইছে না।'

'স্বাভাবিক,' বলল কর্নেল, 'মেয়েদের যা কর্তব্য।'

'একটু পরেই ফিরে আসব আমি,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে মিশেলকে বলল রন।

অল্প একটু মাথা দোলাল মিশেল, আড়ষ্ট দেখাল ওর হাসিটা। 'দেরি কোরো না, রন। অনেক কিছু আলোচনা করে ঠিক করতে হবে।'

দরজার দিকে ফিরে মনে মনে বলল লিজা, তোমাদের আলোচনায় আমার নাম আসবেই। মাথায় দুই বুদ্ধি চাপল লিজার, শক্ত করে রনের হাতটা আঁকড়ে ধরল, নিচু গলায় কথা বলল, কিন্তু মিশেল শুনতে পাবে এমনভাবে: 'রন, আমাদের ওর কথা আগে বলোনি কেন?'

‘বলার সময় পেলাম কই বলো, আসলে... কথা শুরু করেও থেমে গেল রন, একটু দেরিতে বুঝতে পেরেছে, ওর অস্বস্তিটা উপভোগ করছে লিজা, প্রশ্নটা করেছে মিশেলকে শুনিয়ে।

গমগম করে উঠল কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের কণ্ঠ: ‘রাতের খাবার খেয়েই প্ল্যান নিয়ে বসতে হবে, রন। সময় কিন্তু খুব কম।’ গোল ভুঁড়িতে চাপড় দিল সে। ‘মিস্টার হাওয়ার্ডকে মিটিঙে ডেকেছি। মিস্টার ডেভ বেল আর ম্যাক পিলারকেও ডাকা হয়েছে। ন’টায় মিটিং। মিটিঙে ঠিক করতে হবে কীভাবে আমরা...’

রন বলল, ‘লিজা, তোমাকে বলা হয়নি, কর্নেল মার্শল্যাণ্ড আসলে আমার পার্টনার।’

গ্রীবা ঘুরিয়ে কর্নেলের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল লিজা, মার্শল্যাণ্ডের চোখে সেই পুরনো ঝকমকে আলো আবারও দেখ। নিচু গলায় বলল লিজা, ‘সরব পার্টনার, কোনও সন্দেহ নেই।’

হো-হো করে হেসে উঠল কর্নেল, জবাবে রসিকতা করে কিছু বলত, কিন্তু দ্রুত এগিয়ে লিজার জন্য দরজা মেলে ধরল রন।

দু’সেকেণ্ড লবির আরেক দিকে দাঁড়ানো মিশেলকে দেখল লিজা, তারপর সোজাসাপ্টা বলল, ‘আশা করি তুমি সুখী হবে, রন।’ ওর কথায় সন্দেহের সুরটা চাপা থাকল না। মাথা উঁচু রেখে লবি থেকে বেরিয়ে এল লিজা।

পিছু নিল রন। বাড়িগুলোর ছাতের উপর দিয়ে হুকার ছেড়ে বয়ে চলেছে ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টি যেন ধূসর একটা নিরেট দেয়াল। লিজা হঠাৎ থেমে দাঁড়ানোয় ওর পিঠে হোঁচট খেল রন।

বৃষ্টির দেয়ালের কারণে থমকে দাঁড়ায়নি লিজা। অন্য একটা দেয়াল ওকে থামিয়ে দিয়েছে।

তারা দু’জন হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি বা ঝড়ো হাওয়ার দিকে দু’জনের একজনেরও মনোযোগ নেই। ক্লার্ক ফাওল ও ক্লিভ হেস্টিংস।

দু’জনের নিষ্পলক চোখের হিংস্র ভাষা হাতুড়ির মত বাড়ি দিল রনের বুকে। লিজার বাহুতে হাত রেখে দুই ল-ম্যানের মুখোমুখি দাঁড়াল ও। অস্বস্তিকর নীরবতায় কাটল কিছুক্ষণ। শুধু শোঁ-শোঁ শব্দ করছে ঝড়ো হাওয়া। রনের চুপচাপ ভাব দেখে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ক্লার্ক ফাওল, হাতে তার লিজার স্ট্র সুটকেস, ওটা সামনে এনে দেখাল সে।

তার পিছনে, ভরসা দিতেই বোধহয়, নজরদারীতে থাকা ম্যাসটিফের মত নির্বিকার চেহারা দাঁড়িয়ে আছে ক্লিভ হেস্টিংস, যেন অটল পাহাড়।

‘আমার সুটকেস নিয়ে কী করছ তুমি, ক্লার্ক?’ তীক্ষ্ণ শোনা লিজার গলা।

রেগে যাচ্ছে, টের পেল রন। আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকাল, অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে ক্লার্ক ফাওল ও ক্লিভ হেস্টিংসের উপস্থিতির কারণ বুঝতে চেষ্টা করল, সেই সঙ্গে

তৈরি হয়ে গেল, প্রয়োজনে লড়বে।

‘সাবধান, রন,’ গম্ভীর গলায় সতর্ক করল হেস্টিংস। ‘পিস্তল ফ্ল্যাটে আসার পর বিশ মিনিট পেরুনোর আগেই গোলমাল শুরু করেছ। পিছু হটো, লবিতে ঢোকো।’

নির্দেশটা মানবে কি মানবে না পুরো এক মিনিট ভাবল রন, তারপর সিদ্ধান্ত নিল, মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে অপকার ছাড়া উপকার হবে না ওর। লিজার উপস্থিতি এবং হেস্টিংসের হাত রিভলভারের বাঁটে— দুটো ব্যাপার ওর সিদ্ধান্তকে তরান্বিত করল। লিজাকে ঘুরিয়ে আবার লবিতে ঢুকল রন।

করিডর হয়ে ঘরের দিকে রওনা হয়েও লবিতে লোক ঢুকবার আওয়াজে ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল মার্শল্যাও ও মিশেল। করিডরের অন্ধকারের সামনে দাঁড়ানোয় মিশেলের ফরসা চেহারা ও চুড়ো করে বাঁধা সোনালী চুল পরিষ্কার দেখা গেল। কর্নেলের মন চলে গিয়েছিল টেস্ট টিউব, খনিজের নমুনা, নান্না রকম ফর্মুলায়; চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল তার। অবশ্য বিরক্তির চিহ্ন মুখ থেকে দ্রুতই মুছে ফেলল সে।

হঠাৎ করেই উত্তেজনা দেখা দিল ডেস্কের পিছনে বসা নিক হাওয়ার্ডের চেহারায়।

ডেস্কের সামনে এসে ঘুরে দাঁড়াল রন। ওর এক পাশে লিজা, আরেক পাশে কর্নেল ও মিশেল।

মার্শাল হেস্টিংসের বটজুতোর উপরের অংশ হাঁটু-সমান উঁচু, ওটার ভিতরে ডাক ট্রাউজার্স গুঁজে রেখেছে সে। ঢোলা জ্যাকেট ও শিথিল হ্যাট বৃষ্টিতে ভিজে কালো দেখাচ্ছে। এক কালের প্রতাপশালী হেস্টিংস পরিবারের উত্তরসূরী মনে হচ্ছে না তাকে, মনে হচ্ছে ভবঘুরে কোনও বেকার কাউবয়। হেস্টিংসের পোশাকের তুলনায় রনের সাধারণ বেশভূষাও টুয়েন্টোর মত জাঁকজমকপূর্ণ লাগছে।

খুতনিতে গঁজানো খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত ঘষল ক্লিভ হেস্টিংস, লবির নীরবতায় খসখস আওয়াজটা স্পষ্ট শোনা গেল। ধীর গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে, ‘ব্যাকিং ব্যবসা হয়তো অনেক টাকা এনে দিয়েছে তোমার পকেটে, রন, কিন্তু টাকার গরমে তোমার মগজ ভরে গেছে বাসি মুতে, যে-কারণে ঠিকমত চিন্তা-ভাবনা করতে পারো না তুমি। মার্লোদের কখনোই পাস্তা দেয়নি এ-শহরের কেউ, এখানে ফিরে এসে বুদ্ধিমানের কাজ করোনি তুমি।’

ক্লিভ হেস্টিংসের প্রচলন হুমকি রাগিয়ে দিল রনকে, নিচু গলায় বলল ও, ‘টাকা রোজগার করতে হলে যোগ্যতা লাগে, ক্লিভ।’ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে লোকটার পোশাকের দিকে চাইল। ‘তুমি হয়তো শুধু নিজের মনের কথাই বলেছ। অন্যরা শূন্য থেকে ওপরে উঠতে চায়, সম্পদের পাহাড়ের ওপর থেকে

জীবন শুরু করে নোঙরা নর্দমায় নামতে চায় না।’

কথাগুলো শুনে ক্লিভ হেস্টিংসের ফোলা গালের লাল-লাল শিরাগুলো নীল রং ধরল। ঘড়ঘড়ে গলায় হেস্টিংস বলল, ‘তা হলে তা-ই হোক।’ চাইল সে ক্লার্ক ফাওলের দিকে। ‘একটা একটা করে কাজ সারো, ক্লার্ক। শীঘ্রি রন মার্শো বুঝবে তার সম্বন্ধে অন্যদের কী মনোভাব।’

চোখ সরু করে রনের দিকে চাইল ক্লার্ক ফাওল, দৃষ্টিতে ঘৃণা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ‘তুমি যদি ট্রেইনে মহান জাণকর্তা সাজতে ব্যস্ত হয়ে না উঠতে, তা হলে এটা দেখতে পেতে।’ হাতের মুঠো খুলে ডেপুটি শেরিফের রূপার তারা দেখাল সে। এবার নিচু গলায় বলল, ‘আমি এদিকের এলাকায় আইনের প্রতিনিধিত্ব করি।’

ফ্যাকাসে চেহারায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে কী ঘটে দেখছে মিশেল। ঘনঘন শ্বাস পড়ছে তার। কর্নেল জড়িয়ে পড়েছে ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে। মনোযোগ বাড়ছে বলে হাসি দূর হয়ে যাচ্ছে ঠোঁট থেকে, বিদায় নিচ্ছে চোখের ঝিলমিলে ছটা।

ডেস্কের পিছনে কাঠ হয়ে বসে আছে উত্তেজিত নিক হাওয়ার্ড। রনের পাশে চুপ করে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আশঙ্কায় সময় কাটাচ্ছে লিজা।

‘আইনের লোক আমার কাছে কী চায়?’ নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল রন। ‘তুমি নাক গলানোয় আরেকটু হলেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সুপরিকল্পিত একটা ফাঁদ,’ বলল হেস্টিংস। ‘গোয়েন্দা হিসেবে রেল ডিপোতে নিজ দায়িত্ব পালন করছিল ফাওল।’

ডেপুটি শেরিফের ব্যাজ পকেটে পুরল ক্লার্ক ফাওল।

হঠাৎ করেই লিজাকে জিজ্ঞেস করল হেস্টিংস, ‘তা হলে এটা তোমার সূটকেস?’

লিজা বিপদে আছে বুঝে রনের মনে হলো ও নিজে ফাঁদে পড়েছে। বুঝল না ঘটনা কোনদিকে মোড় নিচ্ছে। টানটান হয়ে উঠল ওর স্নায়ু। ঠিক যেন অতীতের পিস্তল ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছে, ওকে বিপদে ফেলতে বয়সের তুলনায় ইঁচড়েপাকা ক্লিভ হেস্টিংস জোট বেঁধেছে ক্লার্ক ফাওলের সঙ্গে। বরাবরের মতই দু’জন তারা ক্যানিয়নে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের শত্রুদের শায়েস্তা করতে। বিশেষ করে ওকে আর লিজাকে হেনস্তা করতে।

চাপা গলায় বলল রন, ‘কোনও স্বীকারোক্তি দিয়ো না, লিজা।’

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ক্লার্ক ফাওল। তার ডানহাতি ঘুসি আসতে দেখল রন, কিন্তু সরে যাবার তুলনায় দেরি হয়ে গেছে। ওর চোয়ালে লাগল ঘুসিটা। পাল্টা মারতে হাত তুলবার আগেই পাশ থেকে ওর হাতদুটো পিছমোড়া করে আটকে ফেলল ক্লিভ হেস্টিংস।

ফাওলের ফাঁকাসে রঙের চোখ দুটো রক্ত-লাল হয়ে উঠেছে রাগে, চোখের ভাষায় একইসঙ্গে ফুটে বেরুল অনিয়ন্ত্রিত প্রচণ্ড রাগ ও বিজয়ের উল্লাস। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বামহাত ঘুরিয়ে দ্বিতীয় ঘুসি মারল সে।

ঘরটা চোখের সামনে আবছা হয়ে মিলিয়ে গিয়ে আবার দৃশ্যপটে ফিরে এল রনের, ক্লিভ হেস্টিংসের গায়ে নেতিয়ে পড়ল ও।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে ডানহাতে তৃতীয় ঘুসিটা ছুঁড়ল ক্লার্ক ফাওল। রনের চোয়ালের হাড়ের উপর দড়াম করে পড়ল ঘুসি। হাঁটুর সমস্ত শক্তি হারাল রন, পড়ে যেত, কিন্তু ওকে তুলে ধরে কায়দামত আটকে রাখল ক্লিভ হেস্টিংস। মনে মনে আশা করছে, এবার দেরি না করে ঘুসির পর ঘুসি চালাবে ক্লার্ক ফাওল।

বিস্ময় সামলে নিয়ে এগোতে শুরু করেছে কর্নেল মার্শল্যাণ্ড, দ্বিধায় ভুগছে, চেষ্টা করে দেখবে হবু জামাইয়ের উপর এই অন্যায় আক্রমণ ঠেকানো যায় কি না।

নিক হাওয়ার্ড চৈঁচিয়ে উঠল: 'এখানে এসব চলবে না, হেস্টিংস!' কথাটা শেষ করেই ডেস্কে চাপড় মারল সে। আওয়াজটা শুনে মনে হলো গুলি ছোঁড়া হয়েছে পয়েন্ট টুটু বোর পিস্তল থেকে।

'আমি কিছু করছি না,' ঘড়ঘড় করে উঠল ক্লিভ হেস্টিংস। 'মার্লোকে বলো, যাতে ধস্তাধস্তি না করে।'

রনকে পাশ কাটিয়ে ক্লার্ক ফাওলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল দুঃসাহসী লিজা, চ্যালেঞ্জ করবার সুরে বলল, 'পারলে আমাকে মারো দেখি!'

দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসায় লিজার মাথার উপর দিয়ে ফাওলকে দেখতে পেল রন। শরীরটা ঢিল করে দিল ও, হেস্টিংসের দেহে ভর দিয়ে শক্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করল। কয়েক সেকেন্ড পর একটু সুস্থির হয়ে টের পেল, ফোঁস-ফোঁস করে ওর ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে হেস্টিংস।

টানটান উত্তেজনাময় পরিবেশে লিজার কণ্ঠস্বর যেন তপ্ত কড়াইতে তেল পড়বার মত আওয়াজ করল: 'ওটা আমার সুটকেস নয়।'

চরকির মত ঘুরে লিজার দিকে ফিরল ক্লার্ক ফাওল, এত দ্রুত হাঁ করা মুখটা বন্ধ করল, স্পষ্ট শোনা গেল দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার আওয়াজ।

'ওই চাপা আমার সঙ্গে মেরো না, লিজা,' হিসহিস করে বলল সে। 'সেই রিয়ো গ্র্যাণ্ড থেকে সিউড্যাড পর্যন্ত ওটাকে চোখে চোখে রেখেছি। নিজে দেখেছি ডিপোতে ওটার রিসিট তোমাকে দিয়েছে সৌকো হান। তারপর সেই এল পাসো থেকে তোমাকে অনুসরণ করে এসেছি।' বড় করে শ্বাস নিল ফাওল। 'সুটকেসের রিসিট দাও।'

লিজাকে উদ্ধারের কোনও উপায় নেই, অনুভব করল রন। কে জানে কী

আছে সুটকেসে! ভিতরের জিনিসটা হয়তো ক্লার্ক ফাওলই রেখেছে লিজাকে ফাঁসানোর জন্য। সুটকেসের রিসিট প্রমাণ করে দেবে, সুটকেস আসলেই লিজার। তাতে ক্ষতি কী সেটা জানে না রন, তবে গোটা ব্যাপারটায় নোংরামির গন্ধ পেল। বলে উঠল: ‘লিজা, সুটকেসটা...’ আর কিছু বলতে পারল না, একহাতে ওর মুখ চেপে ধরল ক্লিভ হেস্টিংস।

হঠাৎ পিছু হটে পিঠ দিয়ে হাঁকাকা লোকটার পেটে গুঁতো দিল রন, ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল নিজে। কিন্তু হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে ফেলেছে ক্লার্ক ফাওল, অস্ত্রটার নল দিয়ে ওর খুতনির নীচে জোরে খোঁচা মেরে বসল।

তীক্ষ্ণ ব্যথা প্রায় অচেতন করে তুলল রনকে। অস্পষ্টভাবে টের পেল, শীতল ধাতু স্পর্শ করেছে ওর দুই কজি।

কয়েক সেকেন্ড পর ওর পিছন থেকে সরে গেল ক্লিভ হেস্টিংস। টলতে থাকল রন, ভারসাম্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে, সেই ফাঁকে দম নিল বড় করে। দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হতে কজিতে আটকানো হ্যাণ্ডকাফের দিকে বোকার মত চাইল।

ওর অবস্থা দেখে ছুটে এসে চিৎকার করে উঠল মিশেল: ‘রন!’

অপ্রত্যাশিত এই নিষ্ঠুর আক্রমণের পর মিশেলের তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ যেন সবার ভিতর একটা সচেতনতা সৃষ্টি করল। প্রত্যেকে বুঝল, ক্লার্ক ফাওল যা করেছে, সেটার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জন্য।

দ্রুতহাতে লিজার কাছ থেকে হাতব্যাগ কেড়ে নিল ক্লার্ক ফাওল, ওটা খুলে ভিতরের জিনিসপত্র ডেস্কের উপর ছড়িয়ে দিয়ে আঙুল চালান ব্যস্ত ভঙ্গিতে। দ্বিতীয়বার খুঁজল সে, তারপর মুখ তুলে টিটকারির হাসি হেসে বলল, ‘লিজা, ভেবো না রিসিট এখানে নেই বলে পার পেয়ে গেলে। কোনও মহিলাকে দিয়ে তল্লাশী করা তোমাকে। তোমার শরীরের সবখানে খুঁজে দেখবে সে। জানি, শরীরেরই কোথাও লুকিয়ে রেখেছ রিসিট।’

শান্ত গলায় কর্নেল মার্শল্যাণ্ড বলল, ‘ডেপুটি শেরিফ, সবকিছুরই একটা নিয়ম আছে। ...এমন কী এই পিস্তল ফ্ল্যাটেণ্ড।’

রাগে লাল চেহারার ক্লার্ক ফাওলের দিকে নিম্পলক চেয়ে রইল লিজা, কথটা বলতে পারল না, তারপর ভাষা ফিরে পেয়ে বলল, ‘মনে তো হচ্ছে তুমি নিজেই আমাকে তল্লাশী করার সুযোগটা হাতছাড়া করবে না।’ বাঁকা হাসি হাসল লিজা। ‘তুমি আর তোমার সঙ্গী ওই ষাঁড়টা— যে-ষাঁড় মানুষের দু’হাত আটকে রাখে, আর সে সুযোগে তুমি মানুষটাকে মারো— ওই ষাঁড়...’ হাঁপিয়ে যাওয়ায় থেমে গেল লিজা।

মাথা নিচু হয়ে গেল ক্লিভ হেস্টিংসের, কালো প্যাপড়ির নীচ দিয়ে লিজার

দিকে চাইল, কপালে গভীর কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। আবার ভাষা ফিরে পেয়ে টিটকারির সুরে বলল লিজা, ‘ডিয়ান হেস্টিংসের টাকাগুলো খুইয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের স্বাভাবিক সাহসও হারিয়ে বসেছ, নাকি ক্লিভ?’

জুনিয়র হেস্টিংসের চোখে ভয়ঙ্কর অসন্তোষ দেখল রন, বুঝতে ওর দেরি হলো না, লিজার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মত মাথা দোলাল ক্লিভ হেস্টিংস, চেহারা দেখে মনে হলো এখন নিরস্ত্র কাউকে খুন করতেও বাধবে না তার।

আরেকবার লবিতে যুক্তির উপরে বন্যতা স্থান পাচ্ছে, চেষ্টায়ে উঠল নিক হাওয়ার্ড: ‘এখানে আর কিছু নয়, খবরদার!’

‘নাক গলাতে এসো না, হাওয়ার্ড!’ কর্কশ, ঘড়ঘড়ে গলায় নিক হাওয়ার্ডের উপর রাগ ঝাড়ল ক্লিভ হেস্টিংস।

কাঁপা-কাঁপা গভীর শ্বাস টানল ক্লার্ক ফাওল। ‘তোমাকে শ্রেফতার করা হলো, লিজা।’ কথাটা শেষ করেই ঘুরে দাঁড়াল সে, পিস্তলের নলের মত করে তর্জনী তাক করল রনের দিকে। ‘তোমাকেও। পিস্তল ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে নোংরা নাকটা যেখানে খুশি গলাচ্ছ তুমি। এবার বুঝবে...’ শয়তানি হাসি নিয়ে কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের দিকে ফিরল সে। ‘এমন কী পিস্তল ফ্ল্যাটেও নিয়ম আছে, কর্নেল।’ এবার বিজয়ীর গর্ব চেপে রেখে মাথা কাত করে ক্লিভ হেস্টিংসকে খুশি খুশি গলায় বলল, ‘ক্লিভ, এখনই কমিশনার টম ফেরিসের কাছে বন্দিদের নিয়ে যাব আমরা।’

চার

রেইলরোড অ্যাভিনিউর রাস্তাটা ফাঁকা পড়ে আছে, হাওয়ার তাড়া খেয়ে দু’পাশের পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর সামনে বেড়ে থাকা ছাউনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে বৃষ্টির ছাঁট। নীরবে রন মার্লোর পাশে হাঁটছে ক্লিভ হেস্টিংস, ঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। লিজার পাশে ভিজা সুটকেস হাতে মার্শল্যাণ্ডের হনহন করে চলেছে ক্লার্ক ফাওল। সবার পিছনে কর্নেল মার্শল্যাণ্ড, বেঁটে মানুষ বলে অন্যদের সঙ্গে ভাল মেলাতে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে তাকে।

চিবুকের যেখানে ক্লার্ক ফাওলের রিভলভারের নল খোঁচা দিয়েছে, সে-

জায়গাটা দপদপ করছে রনের, গা গুলাচ্ছে, মনে হচ্ছে বমি হয়ে যাবে যে-কোনও সময়। এখনও কাঁপছে ওর দু'হাঁটু। তারপরও ধৈর্য ধরল। মানসিকভাবে যত অসুস্থ বোধ করছে, শারীরিকভাবে ততটা নয়।

হতে পারে রন মার্লো: নিজ জন্মস্থানে, এই পিস্তল ফ্ল্যাটে শিকড়ে ফিরে আসা একজন যুবক, যে অচেনা দুনিয়ায় চলে ফিরে বেড়িয়ে ভাল করেছে অর্থনৈতিক ভাবে, কিন্তু এ-মুহূর্তে তার প্রত্যাগমনে আর যা-ই হোক, 'অভ্যর্থনা জানাতে খুশিতে ট্রাম্পেট বাজাচ্ছে না কেউ।

বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজে সবার জুতোর খটখট শব্দ চাপা পড়ছে। ম্যাক পিলারের হার্ডওয়্যার ও টিন শপের পর মার্শালের অফিস, সেটার সামনে পৌছে লালচে কাদার নদীতে পরিণত রেল-রাস্তায় পড়ল সবাই। রাস্তার আরেকদিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে পার হতে চাইল এক লোক, কিন্তু দ্রুত ছুটে আসা এক অশ্বারোহীকে এড়াতে পিছিয়ে যেতে হলো তাকে।

সঙ্ক্যার অঙ্ককারে হাত মুঠো করে ছুটন্ত অশ্বারোহীকে গাল দিল পিছিয়ে যাওয়া ঘোড়সওয়ার: 'মর শালা, মাতাল প্যাট্রিক টমসন!'

ঝড়ো বাতাস গলার আওয়াজটা পরিষ্কার ভাসিয়ে আনল রন মার্লোর কানে।

সামনেই রেইলট্রাকের উঁচু বাঁধ। বৃষ্টিতে ভিজে পিছলা হয়ে আছে দূরমুজ 'করা ঢালের লাল মাটি। কাদার কারণে ভারসাম্য বজায় রেখে বাঁধে উঠতে-নামতে গিয়ে সতর্ক থাকতে হলো সবাইকে।

বাঁধ থেকে নেমে ছোট চার্চটা পার হলো দলটা, ক্লিভ হেস্টিংসের নির্দেশে রাস্তার ধারে একটা বাড়ির সামনে থামল সবাই। 'এ-বাড়িতেই ঢুকতে হবে,' নির্দেশের সুরে বলল হেস্টিংস।

যখন তখন খসে আসবে এরকম একটা স্ক্রিন ডোর দিয়ে আবছা আলোকিত ঘরটায় ঢুকল রন। রোলটপ টেরিলের উপর বসানো লণ্ঠনটার মৃদু আলোয় চার দেয়ালে বইয়ের র‍্যাক দেখা গেল। রনের ঠিক পিছনেই থাকল লিজা। বাড়ির ভিতর কোথায় যেন বেজে উঠল একটা ঘণ্টা। কর্কশ একটা গলা সাড়া দিল: 'আসছি।'

টেবিলের পিছনের পর্দা-ঢাকা দরজা খুলে মাঝারি উচ্চতার এক লোক ঢুকল ঘরে। চিনতে পারল রন, এ-ই লিউট ফেরিস।

তরুণ আর মাঝবয়সী লিউট ফেরিসের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, তাতে বিস্মিত হয়ে গেল রন। ফেরিসের চোখের নীচে বড় বড় পুটুলি। ঠোঁটের দু'পাশ ও চোখের কোণে অসংখ্য ভাঁজ। ক্লান্ত ব্লাডহাউন্ডের মত বিষণ্ণ দেখাল তাকে। খুব সাবধানে ভারসাম্য বজায় রেখে চেয়ারের কাছে হেঁটে গেল সে, কিন্তু চেয়ারে বসবার সময় টলে উঠল। বাসি ছইস্কির টক গন্ধ নাকে এল রনের।

চেয়ারে বসবার আগে কারা এসেছে সেটা খেয়ালও করল না লিউট ফেরিস, বসে পড়ে চট করে দেখে নিল আগন্তুকদের, তারপর ছোট্ট করে মাথা দোলাল ক্লিভ হেস্টিংসের উদ্দেশ্যে।

‘মার্শাল?’

গোটা ব্যাপারটা সাজানো বলে মনে হলো রনের। যা আশা করেছিল, ক্লিভ হেস্টিংস ভারী গলায় বলল, ‘আমার কেস নয়, জাজ। ক্লার্ক ফাওলের।’

রনের চোখে স্থির হলো লিউট ফেরিসের দৃষ্টি। লষ্ঠনের আলায় হলদে চোখের পটভূমিতে ধূসর-নীল দেখাল লিউট ফেরিসের মণিদুটো। লোকটার অপলক দৃষ্টি তাকে ফিরিয়ে দিল রন, চোখ দেখে বুঝল, একটুও বদলায়নি লিউট ফেরিস, ছোটবেলায় যেরকম ভাবে মার্বেল খেলায় চুরি করত, সেরকমই অসৎ আছে এখনও।

কীভাবে জিতছে, কার কী ক্ষতি হচ্ছে, সেসব-ধর্তব্যের বিষয় নয়, লিউট ফেরিসকে জিততেই হবে সবসময়।

‘বিবাদী পক্ষ, আগেই বলে দিচ্ছি, আপনারা যা বলবেন সেটা পরে আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে,’ অভ্যস্ত সুরেলা গলায় বলল লিউট ফেরিস, কথা শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ রাখল সামনের দেয়ালে। ‘গুরু করো, ডেপুটি শেরিফ।’

ফেরিসের সামনে টেবিলের উপর লিজার সুটকেসটা রেখে ফিতে খুলল ক্লার্ক ফাওল, ডালা খুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে আঙুল তাক করল সুটকেসের ভিতরে। লিউট ফেরিস ঝুঁকল কী আছে দেখতে, তবে ক্লিভ হেস্টিংসের কোনও গরজ দেখা গেল না। সুটকেসে মহিলাদের পোশাকের উপরে চারকোনা বেশ কয়েকটা কোটো দেখতে পেল রন।

‘ওপিয়াম,’ বলে উঠল ক্লার্ক ফাওল। ‘ইউএস ট্রেজারির স্ট্যাম্প নেই একটাতেও। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এগুলোর জন্যে কর দেয়া হয়নি। বেআইনী জাবে স্মোকিং ওপিয়াম বহনের দায়ে লিজা ট্রেইসিকে অভিযুক্ত করছি আমি।’

লষ্ঠনের হলদে আলো পড়ছে উপস্থিত সবার মুখে, খানিকটা হলদে আভা যেন গলিত মোমের মত লেগে থাকছে চোখে-মুখে। আলোটা লিউট ফেরিসের চেহারায় এনে দিয়েছে পিশাচ-সাধকের নীচতা, ক্লার্ক ফাওলকে দেখে মনে হচ্ছে আজন্মের ক্ষুধার্ত, ক্লিভ হেস্টিংসের ফোলা চেহারাটা আলো-ছায়ায় বিদঘুটে কোনও জন্তুর মত দেখাচ্ছে।

ক্লার্ক ফাওল বলল, ‘এটা, এবং আরও কিছু ব্যাপার— যেগুলো আপাতত জানাচ্ছি না আমি— সবকিছু স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেবে অভিযুক্ত লিজা ট্রেইসি আসলে দোষী।’

ঠোট বাঁকা করে হাসল লিউট ফেরিস, বলল, ‘লিজা, গ্র্যাণ্ড জুরি ঠিক হলে

তাদের সামনে দাঁড়াতে হবে তোমাকে। ততক্ষণ তোমাকে আমি আটকে রাখছি না, তবে কেউ জামিনদার না হলে পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে যেতে পারবে না তুমি।' একটু থেমে সে বলল, 'এবার পরেরজনের কেস, ডেপুটি শেরিফ।'

স্বভাবের বিরুদ্ধে এতক্ষণ চুপ করে ছিল কর্নেল মার্শল্যাণ্ড, এবার সে হঠাৎ করেই বলে উঠল: 'বিচারের নামে লজ্জাজনক প্রহসন হচ্ছে এখানে, নিয়মের নামে অনিয়ম হচ্ছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার আছে অভিযুক্তদের, উকিল নিয়োগের অধিকার আছে।'

টেরিলের উপর কিল বসাল লিউট ফেরিস, টেবিল নড়ে ওঠায় কালো কালির একটা দোয়াত পড়ে গেল মেঝেতে, পুরনো কার্পেটে ছড়িয়ে গেল কালি। নিজেকে সামলে নিল ফেরিস, তবে ফ্যাকাসে হয়ে রইল তার চেহারা। 'এই এলাকায় আইনের সব কাজ আমিই করি,' প্রায় চোঁচিয়ে বলল সে। 'বাইরের কারও মতামতের কোনও দরকার নেই আমাদের। কারও উপদেশও দরকার নেই।'

কর্নেল পাষ্টা জবাব দিল, 'সাবধানে কথা বলুন, জাজ। এমন কী আপনিও বাড়াবাড়ি করে ফেলতে পারেন। তখন কিন্তু বিচারকের আসন রক্ষা করতে পারবে না আপনাকে।' কথাগুলো বলতে গিয়ে আরও খেপে গেল কর্নেল, স্বভাবসুলভ বড় বড় কথা ঝাড়তে শুরু করল। তার ছোটখাটো শরীরটা থেকে যেন ছিটকে বেরুল অমিত তেজ। হঠাৎ করেই অনিশ্চয়তায় ভুগতে শুরু করল লিউট ফেরিস।

ভারী গলায় বলে উঠল ক্লিভ হেস্টিংস: 'ডেপুটি, বিবাদীর বিরুদ্ধে কী কেস আছে সেটা জাজকে জানাও।' আসলে ফেরিসকে সামলে উঠতে সময় দিল সে।

দ্রুত বলে চলল ক্লার্ক ফাওল। জানাল ট্রেইনে কী ঘটেছে। তার নিজের বিরুদ্ধে যায় এমন সব কথা চেপে গেল সতর্কতার সঙ্গে। তার কথা শেষ হওয়ার পর লিউট ফেরিস বলল, 'মোটাই বদলাওনি, রন মার্লো। সবসময় মারামারি করতে মুখিয়ে থাকো।'

'মনে পড়ে না এমন কাউকে কখনও মেরেছি, যার পিটি পাওনা ছিল না,' বলল রন। 'আজকে যা হয়েছে সেটা ভুল বোঝাবুঝি। ক্লার্ক ফাওল গায়ে হাত দিয়েছিল লি...'

'আইনের অফিসারের গায়ে হাত তোলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ,' বলে উঠল হেস্টিংস।

তার দিকে ফিরল না রন, লিউট ফেরিসের উদ্দেশে বলল, 'আমি তখন জানতাম না ক্লার্ক ফাওল আইনের লোক। তবে জানলেও পরিস্থিতি পাষ্টাত না। কোনও মহিলা লাল্হিত হচ্ছে দেখলে আমি যা করেছি, সেটাই করত অন্য যেকোনো।'

‘নিজের দোষ স্বীকার করে নিলে তুমি,’ বলল লিউট ফেরিস। ‘তুমি হয়তো বদলাওনি, রন, কিন্তু আমরা বদলেছি। বড়দের দুনিয়ায় বাস করি আমরা। একটু আগে ডেপুটি শেরিফ ক্লার্ক ফাওল যা বলল, তার ফলে তোমাকে গ্র্যাও জুরির সামনে উপস্থিত করাতে আমি বাধ্য। জেলখানায় থাকতে না চাইলে জামিন দিতে পারো। জামিন এক হাজার ডলার।’

নীরবতা নামল ঘরে। একঝলক খাতাস ঝটকা দিয়ে খুলে দিল স্ক্রিন ডোর। ঝড়ের আওয়াজ বাড়ল ঘরে। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা, দূরে কোথায় যেন ঘণ্টি বেজে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের দিকে চাইল লিউট ফেরিস, চোখে শোধ নেবার দৃষ্টি।

হতবাক হয়ে গেল রন। ভেবে পেল না কাউকে প্রাপ্য পিটি দেয়ায় এক হাজার ডলার জামিন কীভাবে ধরা হতে পারে।

টিটকারির সুরে বলল ক্লিভ হেস্টিংস, ‘তুমি তো বিরাট ব্যাঙ্কার, তা-ই না? জামিন দিতে তো কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়!’

সম্মিত ফিরে পেয়ে রন জিজ্ঞেস করল, ‘ব্যাঙ্ক-ড্রাফট দিলে চলবে নিশ্চয়ই?’

‘এখানে কোনও ব্যাঙ্ক নেই,’ ফেরিসের হয়ে জবাব দিল হেস্টিংস।

কলমের নিব দিয়ে নখের ময়লা পরিষ্কার করছে লিউট ফেরিস।

‘নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কের ড্রাফট দেব,’ বলল রন।

‘ওই ব্যাঙ্কে তোমার আসলেই টাকা আছে কি না তা নিশ্চিত হবার কোনও উপায় নেই আমাদের,’ বলল হেস্টিংস।

রাগে গা জ্বলে গেল রনের, তবে চেহারায তার কোনও ছাপ পড়ল না।

লিজার গলায় টিটকারি ঝরল, ‘তুমি একটুও বদলাওনি, ক্লিভ। তোমাদের একজন রনকে ধরে রাখো, অন্যরা লাথি মারে।’ আড়ষ্ট পরিবেশে সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে করে রনের বাহুতে হাত রাখল লিজা। ‘আবারও তোমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছি, রন। চলে যাচ্ছি। আমি চলে গেলে ওরা হয়তো তোমার সঙ্গে শত্রুতা কম করবে।’ ঘুরে দাঁড়িয়ে স্ক্রিন দরজার কাছে চলে গেল ও।

কর্নেল মার্শল্যাণ্ড তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খুলে ধরল ওর জন্য। ঘণ্টির শব্দ নীরবতা ভেঙে দিল। লিজা বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠে থেমে গেল অপ্রস্তুত ক্লার্ক ফাওল। সবাই তার দিকে বিরক্তি নিয়ে চাইল।

কপালের শিরাগুলোর ভিতর রক্তের দাপাদাপি টের পেল রন। কিন্তু কথা বলল শান্ত গলায়: ‘উকিল চাইছি আমি।’

আস্তে করে মাথা নাড়ল লিউট ফেরিস, বড় করে শ্বাস ফেলে বলল, ‘আমি এ-শহরের একমাত্র উকিল। তোমার কেস নিতে আগ্রহ বোধ করছি না।’ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে টেবিলের উপর কলম নামিয়ে রাখল সে।

‘মার্শাল, বিবাদী যদি জামিন না দিতে পারে, যথাসময় আসার আগে পর্যন্ত তাকে জেলখানায় রাখবে। গ্র্যাণ্ড জুরি ঠিক হলে তখন বিচারের কাজ শুরু হবে।’

ভুরুর উপরে ঘামের বিন্দু জমাছে, আঙুল দিয়ে ওগুলো মুছে ফেলল রন। বুঝতে পারছে, ওকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে, সেটার কারণ শুধুই ছেলেবেলার শত্রুতা নয়। আপাতত এ নিয়ে চিন্তা করবে না, ঠিক করল রন। প্রথম কাজ মুক্ত থাকা। মুক্ত-স্বাধীন থাকতে হবে ওকে, নইলে সমস্ত কাজ পণ্ড হবে।

জনসমক্ষে বক্তৃতাকারী রাজনৈতিক নেতাদের মত জোর গলায় ঘর কাঁপিয়ে বলল কর্নেল মার্শল্যাণ্ড, ‘বিচারের নামে প্রহসনের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম নিজ চোখে দেখলাম। ...এখন ধরা যাক রন মার্লোর জামিন আমি দেব— এল পাসোর ব্যাক্সের ড্রাফট— তা হলে চলবে?’

অনিশ্চয়তা পেয়ে বসল লিউট ফেরিসকে, চট্ করে হেস্টিংসের দিকে চাইল।

হেস্টিংস বলল, ‘এই লোকের ব্যাপারে কিছুই জানেন না আপনি, কর্নেল।’

‘যা জানি সেটা যথেষ্ট,’ গমগম করে উঠল কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর। ‘ক’দিন পর আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে ওর।’

পরবর্তী নৈঃশব্দ্যে বাড়ির পিছন থেকে তক্তা ককানোর আওয়াজ শোনা গেল।

‘বন্দির হাত থেকে হ্যাণ্ডকাফ খুলে দাও, ডেপুটি,’ বলল ফেরিস।

ধাতব একটা আওয়াজ হলো হ্যাণ্ডকাফ খোলায়। খসখস আওয়াজ তুলল লিউট ফেরিসের কলম। ওটা দিয়ে দ্রুত ব্যাক্স-ড্রাফট লিখছে কর্নেল মার্শল্যাণ্ড।

কর্নেল মার্শল্যাণ্ড ও রন যখন জাজ লিউট ফেরিসের বাড়ি থেকে বেরুল, দক্ষিণ দিক থেকে আটটার ঘণ্টা দিল একটা ঘড়ি— সুরেলা আওয়াজটা ঝড়ো হাওয়ায় ভেসে এল। উত্তর ও পূবে মেঘের কোলে ঘনঘন ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুৎশিখা। বৃষ্টি কমে ইলশে-গুঁড়িতে পরিণত হয়েছে। ছোট ছোট কণাগুলো চোখে-মুখে এসে পড়ছে বলে ভাল দেখতে পেল না ওরা।

রন বলল, ‘মনে হচ্ছে এবারের অভিযানে তুমি এমন এক লোকের সঙ্গে যোগ দিয়েছ, যার শত্রুর অভাব নেই এ-শহরে।’

‘কোনও কাজে বাধা না এলে সে-কাজ শেষে মূল্যবান কিছু পাওয়া যায় না,’ বলল কর্নেল। বরাবরের মতই গমগম করল তার গলা, কিন্তু রন টের পেল, উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠেছে মার্শল্যাণ্ড।

ওরা হাওয়ার্ড হোটেলের লবিতে ঢুকতেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মিশেল। ডেস্কে হাওয়ার্ডকে দেখা গেল না।

‘তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, রন,’ বলল মিশেল। মেয়েটার গলায় একইসঙ্গে প্রকাশ পেল উদ্বেগ, অভিযোগ, ধৈর্যহীনতা ও রাগ। মিশেলের বলবার ভঙ্গি রনের ভিতরেও ওই একইধরনের প্রচ্ছন্ন অনুভূতি জন্ম দিল।

কর্নেল মার্শল্যাও যখন বলল, ‘আমি যাচ্ছি, রাতের মিটিঙের জন্যে তৈরি হতে হবে,’ নিজেকে অবহেলিত মনে হলো রনের। কর্নেল যোগ করল, ‘ডিনার বাদ দিচ্ছি আমরা। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, রন। অনেক কাজ পড়ে আছে। এখনও কীভাবে কী করব, তা-ই ঠিক করা হয়নি।’ মেয়ের উদ্দেশ্যে মৃদু মাথা দুলিয়ে রওনা হয়ে গেল সে। বেঁটেমত মোটা এক লোক, দৃঢ়পায়ে হাঁটছে।

মিশেলের সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল রন। মেয়েটা ওর কাঁধ সমান উঁচু। বড় বড় চোখে ওকেই দেখছে, কী যেন খুঁজছে চোখে। তারপর আলতো করে আঙুল বুলিয়ে দিল কেটে-ছড়ে যাওয়া ক্ষতে। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘ওরা কি তোমাকে খুব ব্যথা দিয়েছে, রন?’

‘আমাকে ব্যথা দিতে হলে ওদের দলে দু’জনের বেশি লোক থাকতে হবে,’ শুকনো গলায় বলল রন।

বুকের মাঝে হাত রাখল মিশেল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘ওরা আমাকে এখানে ব্যথা দিয়েছে। প্রার্থনা করি, এরকম ঘটনা যেন আর কখনও না ঘটে।’ একটু থেমে জিজ্ঞেস করল মিশেল, ‘কী কারণে এমনটা হলো, রন?’

শুরু থেকে খুলে বলল রন। জানাল ট্রেইনে ক্লার্ক ফাওলের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে জাজ ফেরিসের বাড়িতে জামিন দেয়া পর্যন্ত, সবই।

পুরো সময় চুপচাপ শুনল মিশেল, একবারের জন্যও ওর চোখ সরল না রনের মুখ থেকে, তারপর বিস্মিত গলায় বলল, ‘তা হলে সব ওই মেয়েলোকটার জন্যে? একটা ওপিয়াম চোরা-কারবারীর জন্যে?’

ধৈর্য ধরে বোঝানোর চেষ্টা করল রন: ‘লিজা ওপিয়াম চোরা-কারবারী নয়, মিশেল। ব্যাপারটা সাজানো। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আছে ক্লিভ হেস্টিংস।’

‘কিন্তু কেন? ছোটবেলায় তোমাকে পছন্দ করত না, শুধু সে-কারণে?’

‘সেটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ, ওর পরিবারের সম্পত্তি ছিল ওই তামার খনি। এখন ওটা থেকে মুনাফা তুলে বিরাট বড়লোক হব আমরা। আরও কোনও জোরাল কারণও আছে— আমি এখনও ঠিক ধরতে পারছি না।’

রনের শার্টের বোতামগুলোতে আঙুল বোলাল মিশেল। হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল, ‘রন, লিজা মেয়েটার ব্যাপারে আগে কখনও আমাকে কিছু বলোনি কেন?’

‘জানতাম না পিস্তল ফ্ল্যাটের হাজার মাইলের ভিতর আছে ও,’ বলল রন, অস্বস্তি বোধ করছে। ‘ওর কথা বলার কোনও দরকার বোধ করিনি।’

হাত দুটো রনের দু’কাঁধে রাখল মিশেল, আস্তে করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিচু গলায় বলল, ‘আজকেই মাত্র বুঝতে শুরু করেছি, কতখানি কম জানি তোমার

সম্বন্ধে ।’

বড় করে শ্বাস ফেলল রন । ‘মিশেল, আমি...’

দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়ল মিশেল । ‘তোমার কঠোরতা সম্বন্ধেও, রন । নিউ ইয়র্কে...’

‘পিস্তল ফ্ল্যাট একটা আলাদা দুনিয়া, মিশেল,’ অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করছে রন । ‘তুমি যে-ধরনের সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত, সেসবের কথা এখানে কেউ শোনেওনি কখনও ।’

‘থাক, আর বোলো না । মানিয়ে তো নিচ্ছি । তা ছাড়া, এখন শোনার সময় নেই একদম । বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করতে চাইছে ।’

‘পরিচ্ছন্ন হয়ে নিয়ে কর্নেলের সঙ্গে বসতে দেরি হবে না আমার ।’

মিশেলের হাসিতে মিশে থাকল বিষণ্ণতা । ‘চলো, আমি তোমার সঙ্গে হাত লাগাচ্ছি ।’

রন আপত্তির সুরে বলল, ‘মানুষ কী বলবে, মিশেল?’

কাঁধ ঝাঁকাল মিশেল । ‘পুরুষমানুষের ঘরে কোনও মেয়েমানুষ গেলে যা বলে তা-ই বলবে । বলতে দাও ওদের । আর তুমিই তো বলেছ, আমরা নিউ ইয়র্কে নেই ।’ এবার রনের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল মিশেল । ‘চলো ।’

আবছা আলোকিত করিডর ধরে রনের পাশে হাঁটল মিশেল । শেষমাথায় শুধু জ্বলছে একটা বাতি । ওটা পার হয়ে মিশেল বলল, ‘আমি জানি তোমার রুম কোনটা । মিস্টার হাওয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি । মনে হয় আমার কৌতূহল দেখে অতি উৎসাহী অভদ্র মেয়ে মনে করেছেন ভদ্রলোক ।’

মিশেলের সঙ্গ সচেতন করে তুলল রনকে । মেয়েটির দেহের সুবাস নাকে এল ওর । দু’জন ওরা পৌছে গেল নির্দিষ্ট ঘরের সামনে । দরজাটা খোলা দেখল রন । বিছানার পাশে গাদা করে রাখা ওর ব্যাগেজ ।

‘দাঁড়াও একটু, মিশেল, বাতিটা জ্বলে নিই ।’

উষ্ণ ঘরে ঢুকে ম্যাচের কাঠি জ্বলে লণ্ঠনটা খুঁজে সলতেয় আগুন দিল রন । পিছনে, দরজায় শিকল লাগানোর অস্পষ্ট আওয়াজ কানে এল । ফিরে চেয়ে দেখল, দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে মিশেল, লণ্ঠনের আলোয় ওর সোনালী চুলগুলো ঝিকমিক করছে । নীল গাউন পরেছে, কলারটা চওড়া কাট-এর । কলারে কিছু একটা করেছে, যে-কারণে এখন আর ওখানটা আগের মত কারুকার্যময় নেই, স্পষ্ট দেখা গেল বুকের মাঝের গভীর খাঁজ, স্তনের গোলচে আভাস । দরজার কালো প্যানেলের সামনে ও যেন দক্ষ কোনও চিত্রশিল্পীর বহুযত্নে সৃষ্টি কোনও তৈলচিত্র ।

মৃদু মাথা নেড়ে হাসল রন, নরম গলায় বলল, ‘এখন তো মনে হচ্ছে এমন

কী তুমিও আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছ!'

‘উহুঁ,’ দুট্ট হাসল মিশেল। ‘যাদের ক’দিন পর বিয়ে, তেমন দু’জন নারী-পুরুষ একসঙ্গে থাকলে আর কী বিপদ হবে, বলো তো, রন?’

দীর্ঘ কয়েকটা পদক্ষেপে দরজার কাছে চলে গেল রন, মিশেলের দু’পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে দরজায় থাবা রাখল। এগুনোর উপায় থাকল না মিশেলের। নড়ল না মিশেল, ঠোট ফাঁক করল একটু, নামিয়ে নিল চোখ।

খুব কাছাকাছি দু’জনের মুখ।

‘কেমন লাগছে আমাকে দেখতে, রন?’ বড় করে শ্বাস নিল মিশেল। বুকটা ফুলে উঠল ওর।

মিশেলের পুরুট্ট ঠোটের উপর চোখ আটকে গেল রনের, বুঝতে চেষ্টা করল ওর না-বলা কথা। জবাবটার জন্য অপেক্ষা করল। এল না কোনও জবাব। যখন এল, সেটা মুখের ভাষায় নয়।

দরজা থেকে হাত সরিয়ে দু’হাতে পাঁজাকোলা করে মিশেলকে তুলে নিল রন, ওর মনে হলো একহাতে যেন মিশেলের ক্ষীণ কটি পেঁচিয়ে ধরতে পারবে। মুখ নামাল রন। ওর গায়ে সেন্টে গেল মিশেল, ঠোট দুটো ব্যস্ত হয়ে উঠল কঠোর দুটো ঠোট ঝুঁজতে।

কীসের যেন একটা বাধা সাড়া দিতে দিল না রনকে, আস্তে করে মিশেলকে নামিয়ে দিল। শিথিল হয়ে গেল মিশেল, এলিয়ে পড়ল ওর গায়ে। অপেক্ষা করছে। রন তাকে বুকে পিষছে না কেন দেখতে ধীরে ধীরে মদির চোখ মেলে চাইল।

আস্তে করে পিছু হটল রন, হাত সরিয়ে নিল মিশেলের কাঁধ থেকে। সরে এল। সরে এসে কিছুই অনুভব করল না, এমন কী একটু আগের সেই উষ্ণতাটুকুও নয়। অস্বাভাবিক এই শীতল অনুভূতিটা ভিতর ভিতর নড়িয়ে দিল ওঁকে— যেন কিছুই হারায়নি, হারানোর কিছু ছিলই না।

বড় বড় চোখে রনের চোখে চাইল মিশেল, দৃষ্টিতে বিস্ময়। আস্তে আস্তে মিশেলের ঠোটের কোনায় বাঁকা হাসি দেখা দিল, রনকে পাশ কাটিয়ে ওয়াশস্ট্যাণ্ডের কাছে চলে গেল। বেসিনে পানি ঢেলে বলল, ‘সেই ফাটা বেসিন। ...বসো, রন। দেরি করা যাবে না, বাবা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।’

তোয়ালে দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে রনের কাটা-ছেঁড়াগুলো পরিষ্কার করে দিল, তারপর তোয়ালেটা বেসিনে ফেলে ঘুরে দাঁড়াল। ‘আমি যাচ্ছি। শার্ট পরে শহরের বুড়োদের সঙ্গে আলাপটা সেরে ফেলো, রন।’ দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মিশেল, গ্রীবা কাত করে প্রেমিকের চোখের দিকে চাইল। ‘মিটিঙের পরে যদি আমাকে সময় দিতে পারো, তা হলে এসো, অপেক্ষায় থাকব আমি।’ একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, ‘এখানে কাজ করা সহজ হবে না, তা-ই না, রন?’

কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের বলা কথাগুলো মনে পড়ল রনের, সেটাই বলল, ‘যা কিছু মূল্যবান, সেসব বিনা কষ্টে সহজে আসে না, মিশেল।’

দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে গেল মিশেল। রনকে দরজায় দাঁড়াতে দেখে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ‘আমি কি খুব সহজেই কাছে এসেছিলাম, রন?’ জবাবের অপেক্ষা না করেই হাঁটতে শুরু করল মিশেল।

দরজায় একা দাঁড়িয়ে রইল রন, এত সহজে মিশেলকে ভুলে যেতে পারছে ভেবে বিব্রতই বোধ করল। জোর করে অন্য দিকে সরাল মনকে।

ক্লার্ক ফাওল ও লিউট ফেরিসের সঙ্গে আজকে সন্ধ্যায় যা হলো, সে চিন্তা স্থান পেল ওর মনে, সে সঙ্গে ভাবল বেপরোয়া ক্লিভ হেস্টিংসের শত্রুতার কথা।

পাঁচ

কারও সামনে রাগ সামলে রাখবার প্রয়োজন খুব কমই হয় ক্লিভ হেস্টিংসের। পিস্তল ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা অনেক আগেই বুঝে গেছে, তার বিরোধিতা করা চলবে না, তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। কর্নেল মার্শল্যাণ্ড, লিজা আর রন মার্লো খেপিয়ে দিয়েছে ক্লিভ হেস্টিংসকে। ধৈর্যের শেষসীমায় পৌঁছে গেছে সে।

কর্নেল মার্শল্যাণ্ড ও রন মার্লো চলে যাবার পর ক্লার্ক ফাওলের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকল ক্লিভ হেস্টিংস।

‘একটা ড্রিঙ্ক হলে ভাল হতো,’ নড়েচড়ে বসে অস্বস্তি ভরে বলল ক্লার্ক ফাওল।

‘জানি ভাল হতো তোমার,’ টিটকারির সুরে বলল লিউট ফেরিস। ‘আরও ভাল হতো মেয়েমানুষের কাছে যেতে পারলে।’

রেগে গেল ফাওল। ‘দেখো, ফেরিস...’

সামনের দিকে শরীরের ভর দিল হেস্টিংস, খট করে মেঝেতে পড়ল তাকে বহন করা চেয়ারের পায়া দুটো। ক্লার্ক ফাওলকে ধমক দিল সে, ‘আগে তুমি আমার কথা শোনো! ফাঁদে আটকা পড়েছ তুমি। এবার তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার না-ও করতে পারি আমি।’

রাগ আরও বাড়ল ক্লার্ক ফাওলের, ত্যাড়া গলায় বলল, ‘মার্লোকে হেনস্তা করার সুযোগ এনে দিয়েছি আমি তোমাকে। আর কী চাও?’

‘মার্লোকে শেষ করতে চাইলে খুব কাছ থেকে গোলাভরা কামান দাগতে চাইব আমি, মাত্র একটা বুলেট আছে এমন কোনও রিভলভার দিয়ে দূর থেকে গুলি করতে চাইব না,’ চোখ গরম করে ফাওলকে দেখল হেস্টিংস। ‘আমরা তোমার সঙ্গে ছিলাম, কারণ তখন আমাদের সামনে আর কোনও উপায় ছিল না। এবার জবাব দাও, কোন্ আক্কেলে লিজার সুটকেসে ওপিয়াম রাখতে গেছ?’

‘তোমরা জিজ্ঞেস করলেই পেটের সবকথা বলতে হবে নাকি আমাকে?’ জোর দিয়ে বলতে চাইলেও ক্লার্ক ফাওলের গলায় পরাজয়ের সুর চাপা থাকল না।

‘আমি জানতে চাইলে পেটের কথা তো বলবেই, যা বলতে বলব, তা-ই বলবে,’ গুড়গুড় করে উঠল ক্লিভ হেস্টিংসের কণ্ঠ। ‘তবে এখনই তার দরকার নেই। বইয়ের পাতার মত তোমাকে পড়ে ফেলতে পারি আমি, ক্লার্ক। তোমার উদ্দেশ্য ছিল লিজাকে বিপদে ফেলা। আর কাকতালীয় ভাবে তখন ওখানে হাজির ছিল রন মার্লো।’

জাজ ফেরিসের দিকে চাইল ফাওল। ‘ড্রিঙ্ক কি এখানে দেবে, ফেরিস, নাকি রানিং আয়ার্ন সেলুনে যেতে হবে আমাকে?’

রাগ সামলে শান্ত গলায় বলল ক্লিভ হেস্টিংস, ‘বোতল কোথায় আছে তুমি জানো, ফাওল। নিয়ে এসো।’

বিড়বিড় করে গাল দিতে দিতে ফেরিসের চেয়ারের পিছনে পর্দা দেয়া দরজা হয়ে ভিতরে চলে গেল ফাওল। ঠোঁটের কোণ নীচের দিকে নামিয়ে ভুরু উঁচু করে হেস্টিংসের দিকে চাইল ফেরিস।

জবাবে ভারী কাঁধ দুটো ঝাঁকাল হেস্টিংস।

চট্জলদি ফিরে আসায় মার্শালের শ্রাগ করাটা দেখতে পেল ক্লার্ক ফাওল। খঁকিয়ে উঠল সে, ‘কাঁধ ঝাঁকালে কেন?’

লিউট ফেরিস বলল, ‘বড্ড বেশি মাথা গরম তোমার, ক্লার্ক।’

‘মাথা গরম?’ হুইস্কির বোতল ও তিনটে গ্লাস এনেছে ফাওল, ওগুলো টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল। আবার কিছু বলতে হাঁ করেছিল, কিন্তু ক্লিভ হেস্টিংস থামিয়ে দিল তাকে।

‘বৈঠার হাতল ভেঙে ফেলো না, ফাওল, গভীর পানিতে অনেক দূর নৌকা বাইতে হবে আমাদের।’

একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালল ক্লার্ক ফাওল। ‘কাব্য করে কথা বোলো না, আমার মাথায় ঢোকে না।’

‘মনে হয় খুলে বললেও মাথায় ঢুকবে না তোমার,’ ঠাণ্ডা গলায় বলল হেস্টিংস। ‘এবার বোলো, লিজা যখন ওর বাবাকে বলবে কীভাবে ওকে ফাঁদে ফেলেছ তুমি, আর সে আসবে তোমাকে ধরতে, তখন কী করবে ভাবছ?’

চোখ পিটপিট করল ফাওল। ‘আমার মনে হয় বলবে না লিজা। যদি বলে— আমরা তো সবাই একসঙ্গে আছি, তা-ই না?’ দুঃসাহসী বিল ট্রেইসি অস্ত্রহাতে তাকে খুঁজতে আসতে পারে ভেবে অস্বস্তির ভিতর পড়ে গেছে ফাওল। লিউট ফেরিসের ধূসর মাথার দিকে চাইল সে। কেউ কোনও কথা না বলায় অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হলো ঘরে। ভুরুর ঘাম মুছল ক্লার্ক ফাওল।

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার ধারে আরেকটা চেয়ারে গিয়ে বসল ক্লিভ হেস্টিংস। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে প্রতিবাদ জানাল পুরনো চেয়ার। লিউট ফেরিসের দিকে চাইল হেস্টিংস। ‘আমরা সবাই একসঙ্গে আছি, লিউট?’

জবাব দিল না ফেরিস। হেস্টিংস ধীর গলায় বলল, ‘আমার মনে হয় আমাদের পরিকল্পনা খুলে বলার সময় হয়েছে, লিউট। সাবধান না হলে আমাদের স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন থেকে যাবে, অবস্থার কোনও উন্নতি হবে না শেষপর্যন্ত।’ ফাওলের দিকে চাইল সে। ‘আমাদের স্বপ্ন... পরিকল্পনা শুরু হয়েছে এখানে, শেষও হবে এই পিস্তল ফ্ল্যাটেই।’ যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে, এমন গলায় বলে গেল: ‘নানা রকম ঝামেলার মধ্য দিয়েও ইউনাইটেড ফেডারাল মাইনিং কোম্পানি চালিয়ে গেছে আমার বাবা ডিয়ান হেস্টিংস, মারা যাওয়ার আগে এই খনি আমাকে লিখে দিয়ে গেছে।’

ভুরু কুঁচকে কথা শুনেছে ক্লার্ক ফাওল। হেস্টিংস কী বলতে চাইছে মাথায় ঢুকছে না।

মৃদু হেসে লিউট ফেরিস বলল, ‘ডিয়ান হেস্টিংসের ছেলে হয়েও খুব ভাল কিছু করতে পারোনি তুমি।’

‘যা করেছি তা করেছি,’ তিক্ত গলায় বলল ক্লিভ হেস্টিংস। ‘আগে যদি জানতাম ওই খনিতে এখনও তামা আছে, ওটাকে ঘাড় থেকে না নামিয়ে ধরে রাখতাম।’ চিন্তার ছাপ পড়ল হেস্টিংসের চেহারায়। ‘হয়তো জানো, এখনও খনিতে কিছুটা অংশ আছে আমার। কিছু টাকা এখনও পাই আমি, ক্রেতার শোধ করেনি।’

‘বিক্রি হয়ে গেছে, টাকাও পেয়ে যাবে, কাজেই খনিতে আসলে কোনও অধিকার নেই তোমার,’ সিদ্ধান্তের সুরে বলল লিউট ফেরিস।

‘তারপরও আমার ধারণা অধিকার বজায় রাখতে ওটুকু অংশই যথেষ্ট, যে- কারণে তোমাকে বলেছিলাম, চুক্তি বাতিল করে খনির ওই অংশ তুমি ফিরিয়ে আনো,’ ঘড়ঘড় করে উঠল ক্লিভ হেস্টিংস। ‘চেষ্টা করতে গিয়ে কী দেখলে তুমি, ফেরিস?’

দু’সঙ্গীর দিকে পালা করে দেখল ক্লার্ক ফাওল, অভিযোগের সুরে বলল, ‘আমরা তো পার্টনার। আমি তা হলে এসব জানি না কেন?’

হেস্টিংসকে সামান্য মাথা দোলাতে দেখে লিউট ফেরিস বলল, ‘তোমার

বোঝার সুবিধের জন্যে শুরু থেকে বলছি। এল পাসোতে গিয়েছিলাম আমি হোবার্ট অ্যাণ্ড স্টাফ-এর অফিসে। ইউনাইটেড ফেডারালের ভূ-সম্পত্তি তারাই দেখাশোনা করে। ওখানে প্রথমেই আমার দেখা হয় ডেভ বেল-এর সঙ্গে। সে-ও একটা প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল ওখানে। আমি একাই খনির ব্যাপারে আগ্রহী লোক ছিলাম না।’

‘না, আমিও আগ্রহী ছিলাম,’ তিক্ত গলায় বলল ক্লিভ হেস্টিংস।

‘কিন্তু খনিটা তুমি বিক্রি করে দিয়েছিলে,’ নরম সুরে মনে করিয়ে দিল ফেরিস। ‘যা-ই হোক, দেরি হয়ে যায় আমাদের। আরেকদল ব্যবসায়ী আগেই কিনে নেয় খনি। ডেভ বেল যখন হোবার্ট অ্যাণ্ড স্টাফ-এর অফিসে জিজ্ঞেস করল: কারা কিনেছে খনিটা, ওখান থেকে জানানো হলো, মার্লো অ্যাণ্ড মার্শল্যাণ্ড ফার্ম কিনেছে খনি।’

‘ইশ!’ আফসোস করল ক্লার্ক ফাওল।

‘এই হচ্ছে অবস্থা,’ বলল ফেরিস। ‘মনে হয় তুমি ছাড়া অন্য সবাই জানত খনিটাতে “ওর” আছে। তুমি জানলে না কেন, ক্লার্ক, মেইমি-র মেয়েরা খুব বেশি ব্যস্ত রেখেছিল তোমাকে?’

হাঁ করা মুখটা ঝপ করে বন্ধ করল ক্লার্ক ফাওল।

টেবিলের উপর কাগজের ছোটখাটো স্তুপ জড় করল লিউট ফেরিস। ‘সুখের দিন শেষ। নতুন করে গড়ে উঠবে পিস্তল ফ্ল্যাট, কিন্তু শহরটা তখন আমরা চালাব না।’

‘আমি অতটা নিশ্চিত নই,’ গা-ছাড়া ভাবে বলল হেস্টিংস। ‘রানিং আয়ার্নে নতুন আসা মজুররা বলাবলি করছিল আগামী এক শ’ বছর খনিতে কাজ করতে পারবে তারা। এক শ’ বছরে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। আসলে কয়েক দিনই যথেষ্ট। শুধু খানিক সময় দরকার আমাদের।’

ক্লার্ক ফাওল ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘এখন যদি রন মার্লোকে জেলে ভরা যায়, ক্লিভ? তা হলেই তো...’

‘আমরাও তা-ই ভেবেছি,’ বলল হেস্টিংস। ‘নইলে ভাবছ এমনি এমনি তোমাকে সহযোগিতা করেছি?’

শিরা-ওঠা হাত দুটো টেবিলের উপর রাখল লিউট ফেরিস, মাথাটা বুকের কাছে ঝুকিয়ে উঁচু করল কাঁধ দুটো। স্বল্প আলোয় তাকে দেখে মনে হলো কোনও গারগয়েল। কাঁপা হাতে গ্লাসে হুইকি ঢালল, মদ্য চুমুক দিয়ে বলল, ‘হেস্টিংসদের খনি আবার চালু হবে, এটা শহরের সবার স্বপ্ন। ডেভ বেল, নিক হাওয়ার্ড, ম্যাক পিলার, তুমি, আমি, ক্লার্ক, ফ্র্যাঙ্কন— পুরনো দিনগুলো যাদের মনে আছে, তারা সবাই চায় চালু হোক ওই খনি।’ ফাওলের দিকে চেয়ে বাঁকা হাসল লিউট ফেরিস। ‘বুড়ো জিং ওয়াং-এর স্বন্ধেররা বোধহয় অপেক্ষায় আছে লিজার

সুটকেসে রাখা ওপিয়াম নিয়ে কখন ভূমি ওখানে পৌছাবে।' পিঠ সোজা করে আঙুলগুলো ধীরে ধীরে ছড়াল সে টেবিলের উপর, ঠোট দুটো বাঁকিয়ে আঙুলের দিকে চাইল, মনে হলো একটা একটা করে গুনে দেখছে সবক'টা আছে কি না। আত্মগত ভাবে বলল, 'অনেক বেশি দেরি করে ফেলেছি আমরা। ইউনাইটেড ফেডারাল-এর জমি বিক্রি হয়ে যাওয়ার আগেই...'

'এ-ই ভাল হয়েছে,' তাকে থামিয়ে দিল ক্লিভ হেস্টিংস। 'হোবার্ট অ্যাণ্ড স্টাফ বড় ওকালতি ফার্ম, ওদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারতাম না। কিন্তু মার্লোর ওপর পারব।'

মাথা উঁচু করল লিউট ফেরিস, জুলজুল করে উঠল তার চোখ দুটো। আস্তে করে মাথা দুলিয়ে ক্লার্ক ফাওলের দিকে চাইল। 'আমাদের পদ্ধতি এমন হতে হবে, যাতে কেউ কিছু টের না পায়।'

'যেমন?' রাগ প্রকাশ পেল ফাওলের কণ্ঠে।

বড় করে শ্বাস ফেলল ক্লিভ হেস্টিংস, তারপর ধীর স্বরে বলল, 'ওপিয়ামের কৌটাগুলো পৌছে দিয়ে জলদি করে আমাদের অংশের টাকা নিয়ে এসো। ফেরার পথে কাপড়গুলো লিজাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।'

'কেন?' প্রতিবাদের সুরে জিজ্ঞেস করল ফাওল। 'কোর্টে কেস উঠলে তখন প্রমাণ হিসেবে দরকার হবে ওগুলো।'

বিড়বিড় করে ফাওলকে গালি দিল হেস্টিংস, কিন্তু লিউট ফেরিস শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ক্লিভ যা বলছে তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। কোনও রকমের কোনও কেস উঠবে না কোর্টে।'

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে গেল ক্লিভ হেস্টিংস, ওখান থেকে বলল, 'আমরা এখানে বসে বকবক করছি, আর ওদিকে কাজ শুরু করে দিয়েছে রন মার্লো।' লিউট ফেরিসের দিকে চাইল সে। 'আইনের বই ঘেঁটে দেখো মার্লোকে ঠেকাবার কোনও পথ আছে কি না। অন্তত দেরি করিয়ে দেয়া দরকার ওকে।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ক্লিভ হেস্টিংস। ঝড়ের আওয়াজ ঢুকল ঘরে।

রন মার্লোর সঙ্গে শহরের আদি নাগরিকদের মিটিংটা হলো কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের ঘরে। শহর ছেড়ে চলে যাওয়া এক শ' দুটো পরিবারের পক্ষে কথা বলল এলাকার অন্যতম ধনী মানুষ, জেনারেল স্টোরের মালিক ডেভ বেল, হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিক ম্যাক পিলার ও হাওয়ার্ড হোটেলের মালিক নিক হাওয়ার্ড। বাবার রেখে যাওয়া হোটেলটা ছাড়াও শহরের আশপাশে বেশ জমি আছে নিক হাওয়ার্ডের।

মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করল কর্নেল মার্শল্যাণ্ড। কর্নেল ও রনের সামনের টেবিলের উপর থাকল বেশ কিছু কাগজ। তার ভিতর আছে ইঞ্জিনিয়ার ও ধাতু

বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট, ইউনাইটেড ফেডারাল মাইনিং কোম্পানির কর্মকাণ্ডের খতিয়ান।

নতুন করে পরিচিতির পালা চুকতেই সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় চলে এল কর্নেল মার্শল্যাণ্ড।

‘জেন্টলমেন, পিস্তল ফ্ল্যাটে এই সেদিনও আমার ব্যবসাই ছিল সব। অ্যারিয়োনায় আমার খনি-ব্যবসা ছিল সমস্ত ব্যবসার রাজা। তারপর মারা গেল সেই রাজা। কিন্তু ওয়াল স্ট্রিটের প্রতি দিনের রিপোর্ট বলছে, দিন পাচ্ছে, আবারও দারুণ বাজার পাবে তামা।’ বেচপ আঙুলের মোটা মোটা গাঁট গুনে একটা একটা করে বলে যেতে শুরু করল কর্নেল, ‘আমরা বিদ্যুতের যুগে প্রবেশ করেছি। বিদ্যুৎ পরিবহন করতে আমার জুড়ি নেই। টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের তার, বৈদ্যুতিক তার তৈরিতে আমার বিকল্প নেই বললেই চলে। তামা দিয়ে তৈরি হচ্ছে বয়লার, স্টিলস, রান্নার সরঞ্জাম, নানা রকমের অসংখ্য পাইপ, পেরেক, তার, নাম-ফলকের প্লেট, বজ্রবিদ্যুৎ থেকে রক্ষা পাওয়ার খুঁটি— আরও যেসব জিনিস তৈরি করতে তামা দরকার, সেগুলোর নাম সারা রাত বলে যেতে পারব আমি।’

ডেভ বেল-এর শীর্ণ হাত টেবিলের উপর শিথিলভাবে পড়ে আছে। কর্নেল ধামতাই শুকনো গলায় সে বলে উঠল: ‘বলার কোনও দরকার নেই। তামা দিয়ে কত কী তৈরি হয় তা আমরা জানি। এটাও আমাদের অজানা নেই যে, ক্লিভ হেস্টিংস ইউনাইটেড-এর মালিকানা বিক্রি করতে পেরে জানে বেঁচেছে। সহজে পাওয়া যাওয়ার মত সমস্ত তামা তোলা হয়ে গেছে ওই খনি থেকে।’ ঝুঁকে বসল ডেভ বেল, গর্তে ঢোকা কাছাকাছি বসানো উজ্জ্বল চোখদুটো রাখল কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের চোখে। ‘আমাদের ঠিক কী গেলাতে চাইছেন, কর্নেল?’

‘বলছি,’ একটুও দমে গেল না মার্শল্যাণ্ড। ‘একদম সাদা কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।’ মুঠো করা হাত দুটো কাঁধের উপর দিয়ে শহরের পিছনের টিলাগুলোর দিকে তাক করল কর্নেল। ‘ওই মিউল হিলে পঞ্চাশ মিলিয়ন টন তামা ছিল। এখনও মিলিয়ন মিলিয়ন টন নিচু গ্রেডের তামা আছে। কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বলে উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি।’ সামনে রাখা কাগজগুলোর উপর থাকা রাখল কর্নেল। ‘আমার তালুর নীচে যে-কাগজগুলো আছে, সেগুলোতে লেখা আছে কীভাবে ওই তামা লাভজনক ভাবে উত্তোলন করা সম্ভব। আমার পরিকল্পনা মত কাজ করা হলে আমি শুধু নামকরা মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার থাকব না, হয়ে যাব ধাতুবিজ্ঞানের জগতে বিশাল এক যুগান্তকারী আবিষ্কারক।’ জুলজুলে চোখে ডেভ বেলের দিকে চাইল মার্শল্যাণ্ড। ‘সেজন্যে আপনাদের কাউকে তেমন কোনও অবদান রাখতে হবে, তা নয়। আমার ধাতু-সংগ্রহ-প্রক্রিয়া রন মার্লে আর আমাকে রাজাদের চেয়েও বেশি ধনী করে তুলবে। সেই সঙ্গে ধনী হয়ে

উঠবেন আপনারাও— যদি সাহায্যের হাত বাড়াতে ভুল না করেন।’

কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের কথার ফাঁকে সবার উপর চোখ বোলাল রন। চেহারায় দেখে মনে হলো নিক হাওয়ার্ড ও ম্যাক পিলার অবিশ্বাস নিয়ে শুনছে কথাগুলো।

ডেভ বেলের নিস্পৃহ চেহারা থেকে কিছুই বুঝবার উপায় নেই। কর্নেল থেমে যাওয়ায় সে বলল, ‘একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক আমি, কর্নেল। আপনার কথা আমাকে হতাশ করেছে। ভেবেছিলাম এখানে পড়ে থাকা যন্ত্রপাতি ন্যায্য-মূল্যে আপনাদের কাছে বিক্রি করব, তাতে আমার লাভ হবে। আগে থেকে অনুরোধ না করলে ওসব যন্ত্র অন্য অনেক উৎপাদকের কাছে আরও বেশি লাভে বিক্রি করতে পারতাম।’ কথাগুলো বুঝবার জন্য সময় দিল ডেভ বেল, তারপর আবার শুরু করল, ‘কর্নেল, আপনি যে পরিকল্পনা করেছেন, তাতে এখন দেখা যাচ্ছে যে-কাজে হাত দিতে চাইছেন, সে-তুলনায় প্রাথমিক ভাবে খুব কম টাকার মেশিনই আপনি কিনবেন। অথচ এটা পরিষ্কার যে, কাজ শুরু করতে হলে প্রচুর মূলধন দরকার হবে আপনাদের। অত টাকা আমাদের প্রাক্তন খবরের-কাগজওয়ালা হকারের আছে কি না, তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কর্নেল, আপনি কী করে জোগাড় করবেন মূলধন?’

ডেভ বেলের সরু দু’ঠোটে হাসির রেখা ফুটে উঠল, চেয়ারে হেলান দিল সে, বিজয়ীর দৃষ্টিতে চাইল সবার দিকে। রন মার্শলার উপরে স্থির হলো তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

হাত দিয়ে কাগজ সরিয়ে টেবিলের উপর দু’হাত রাখল রন, দু’হাতের আঙুলগুলো পেঁচিয়ে টান দিয়ে খুলল, তারপর শান্ত গলায় বলল, ‘খুঁটিতে টান দিয়ে টাকা জোগাড় করব আমরা। মিউল হিলের ভেতরটা মৌচাকের মত ফোঁপড়া। ওই অজস্র সুড়ঙ্গের ছাত যাতে ধসে না পড়ে, সেজন্যে হাজার হাজার কলাম রেখে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে আরও ভেতরের দিকে যেতে হয়েছে মজুরদের। তামার পরিমাণ যেখানে খুব বেশি, কলামগুলো সবই কিন্তু সেখানে। আমাদের জরিপে দেখা গেছে, ওখানে যে-পরিমাণ উন্নতমানের তামা আছে, সেগুলো বিক্রি করে মেশিন কেনার টাকা জোগাড় করা বা সমস্ত প্রাথমিক খরচ সহজেই মেটানো সম্ভব। আমাদের এখন দরকার উন্নতমানের কনসেক্রেটার, মেরামত করা একটা স্মেলটার, তামা পরিশোধনের জন্যে বড় একটা টাঙ্ক, আর কর্নেলের পদ্ধতিতে খনিজ উত্তোলন করতে বিদ্যুৎ তৈরির শক্তিশালী একটা জেনারেটর।’ দম নিভে থামল রন, দেখল ডেভ বেলের আত্মপ্রত্যয়ী ভাবটা বিদায় নিয়েছে, চেহারায় খেলা করছে সতর্ক আগ্রহ।

‘কলামগুলো থেকে টাকা আসার আগে তো ওগুলোকে খসিয়ে ফেলে তামা বের করতে হবে,’ বলল ডেভ বেল। ম্যাক পিলারের দিকে চট করে চেয়েই চোখ সরিয়ে নিল সে। ‘যারা হাল নুা ছেড়ে নিজের দায়িত্বে খনিতে তামা

খুঁজেছে, তারা তো এত দিন বসে নেই— তা ছাড়া, যা ভাবা হচ্ছে, কলামগুলো থেকে সে-পরিমাণ টাকার তামা না-ও বেরুতে পারে।’

‘ওটা নিয়ে কোনও চিন্তা নেই,’ ডেভ বেলের কথা উড়িয়ে দিল রন, ‘আমরা ভাবছি মজুরদের বেতনের কথা। কালকে থেকে কাজ শুরু করবে তারা, করতে থাকবে যত দিন না আরও লোক আসে— এরপর পুরোদমে কাজ চালু করতে পারি আমরা।’

‘খাকার জায়গা পাবে কোথায় অত লোক?’ নিক হাওয়ার্ডের গলা অস্ফুট শোনাল।

উত্তেজনার ছাপ পড়ল ম্যাক পিলারের চোখে। ‘মানুষ জিনিসপত্র কিনবেই। পিস্তল ফ্ল্যাটের জনসংখ্যা যদি ওভাবে বাড়তে থাকে, তা হলে সপ্তাহ ফুরোবার আগেই দোকানের সমস্ত তাক খালি হয়ে যাবে আমার।’

অন্য দু’জনের তুলনায় ডেভ বেল অনেকটাই সংযত, সে বলল, ‘মিস্টার মার্লের প্রস্তাবটা নিঃসন্দেহে বিবেচনাযোগ্য।’

ডেভ বেলের দিকে চাইল রন, শান্ত গলায় বলল, ‘আগামী সপ্তাহের শেষে মজুরি দিতে হবে। দিতে আমরা পারব কি না তার ওপর নির্ভর করে তোমার ব্যবসা বাড়বে কি না, মিস্টার বেল।’ থামল রন, অপেক্ষা করল, তারপর ওর বক্তব্য অন্যরা বুঝবার পর বলল, ‘আমরা চাইছি চলতি মূলধন তোমরাই জোগান দাও। ঋণ হিসেবে টাকাগুলো দেবে তোমরা।’

‘এখন যে-হারে ঋণ দেয়া হয়, সে-হারে?’ জিজ্ঞেস করল ডেভ বেল।

‘অবশ্যই।’

হাসল ডেভ বেল। নেতিবাচক ভঙ্গিতে আশ্তে করে মাথা নাড়ল। ‘ব্যক্তিগত ভাবে বেশ কিছু টাকার ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলাম আমি, কিন্তু সেটা ঋণ হিসেবে নয়। খনির অর্ধেক মালিকানার বদলে টাকা ঢালতে রাজি আছি আমি।’

হতবাক হয়ে ডেভ বেলের দিকে চাইল রন। কর্নেল মার্শল্যাণ্ড নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল। হাওয়ার্ডের দিকে চাইল রন। ‘নিক? তুমি কী বলো?’

কাঁধ ঝাঁকাল নিক হাওয়ার্ড। ‘ভেবে দেখতে হবে আমাকে।’

‘পিলার?’

‘আমি বেলের সঙ্গে আছি,’ জবাব দিল হার্ডওয়ার্ডের স্টোরের মালিক।

ডেভ বেলের দিকে ফিরে চাইল রন, মেকি হাসিটা ঠিক একইভাবে ফিরিয়ে দিল, তারপর দুঃখপ্রকাশের সুরে বলল, ‘লোভ খুব খারাপ জিনিস, মিস্টার বেল। তোমরা ভাবছ বেকায়দা অবস্থায় পেয়েছ আমাদের, তাই...’

‘আমি এখনও মনস্তির করিনি, ব্যস,’ বলল হাওয়ার্ড।

‘তা হলে আরও পরিষ্কার করে বলি,’ কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের দিকে চেয়ে চোখ

টিপল রন, হাসিটা বিন্দুমাত্র স্থান হলো না ওর, ‘ডেভ বেল মনে করছে অর্থনৈতিক ভাবে ফাঁদে পড়েছি আমরা। ভাবছে, ফাঁকি দিতে পারিনি আমরা তাকে।’

দৃষ্টির উজ্জ্বলতা হ্রাস পেল ডেভ বেলের, একটু আহত বোধ করে সে বলল, ‘ফাঁকি দিচ্ছ তা ভাবিনি আমি, মার্লো, পুরো ব্যাপারটাই আসলে ব্যবসা।’

‘হ্যাঁ, ব্যবসা, খুব ভাল ব্যবসা, মিস্টার বেল,’ শুকনো গলায় বলল রন। ‘তুমি যা লাভ করছিলে, তার চেয়ে বেশি লাভ হবে এরকম একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমরা, কিন্তু আরও অনেক বেশি চাইছ তুমি। ঠিক আছে, খনিতে যে-পরিমাণ তামা আছে তার হিসেব দেখলে এল পাসোর ব্যাঙ্ক ঠিকই ঋণ দেবে আমাদের। তাদেরকে অংশীদারও করতে হবে না। তোমাদের শুধু এটাই পরামর্শ দেবার আছে, বেশি করে মালামাল আনাও, পিস্তল ফ্ল্যাট নতুন করে জমে উঠবে। ...আমার আর কিছু বলার নেই। এখানে কষ্ট করে আসার জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ।’

এভাবে হঠাৎ প্রত্যাখ্যাত হয়ে নড়ে গেল ডেভ বেল, একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল সে, ‘কত টাকা দরকার তোমাদের, মার্লো?’

কাঁধ ঝাঁকাল রন। ‘আগামীকাল রাতে টাকা জোগাড় করতে রওনা হবে কর্নেল। যদি তোমরা কেউ ঋণ দিতে আগ্রহ বোধ করো, তা হলে ট্রেইনের সময় হওয়ার আগে যোগাযোগ করতে পারো।’

শেষ হয়ে গেল মিটিং।

নিক হাওয়ার্ডের পাশে করিডর ধরে হাঁটতে গিয়ে রন খেয়াল করল, মিশেলের ঘরের দরজার তলা দিয়ে কোনও আলোর রেখা আসছে না। আন্দাজ করল, ঘুমিয়ে পড়েছে মিশেল।

খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে হোটেল ছেড়ে ঝড়ের ভিতর= অন্ধকারাচ্ছন্ন রেল-রাস্তায় বেরিয়ে গেল ম্যাক পিলার ও ডেভ বেল।

লবির একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়েছে হলুদ রেইনকোট গায়ে এক লোক, পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিক হাওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে এল। কার্পেটে কালো দাগ ফেলল তার কাদামাখা বুটজুতো। জোর গলায় কথা বলে সে, কিন্তু কেন যেন শুনতে খারাপ লাগে না।

‘নিক, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম,’ বলল সে। রন আন্দাজ করল, এই লোক সব সময় নির্দেশ দিতে অভ্যস্ত। তবে এখন তার কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে দাবী ও অনুরোধের সুর ফুটে উঠেছে। ‘কিছু টাকা ধার হিসেবে দরকার আমার।’

‘যা লাগে নেবে, জর্জ,’ আন্তরিক স্বরে বলল নিক হাওয়ার্ড, ‘তবে তার আগে পরিচয় করিয়ে দিই রন মার্লোর সঙ্গে।’ রনের বাহুতে হাত রাখল সে।

জর্জ ব্রাউন এই এলাকার সবচেয়ে বেশি জমির মালিক, রন। যদি মিউল হিলের ওপর থেকে চারপাশে চাও, জর্জের জমি ছাড়িয়ে দৃষ্টি যাবে না তোমার।’

নৌকার বৈঠার মত চওড়া, কড়া পড়া শক্ত হাতটা বাড়িয়ে দিল জর্জ ব্রাউন, করমর্দন শেষে বলল, ‘জমি থাকলেও পকেটে পয়সা নেই বলেই আসতে হলো।’ পকেট থেকে ভাঁজ করা খবরের কাগজের একটা টুকরো বের করল সে, ওটা ধরিয়ে দিল নিক হাওয়ার্ডের হাতে।

পাশ থেকে কাগজের লেখাগুলো চোখে পড়ল রনের। ডেনভার পোস্ট-এর একটা বিজ্ঞাপন। লিখেছে, ক্যানসাস সিটির একটা ঘোড়া নিলামের ফার্ম মেয়ার কিনছে। মেয়ারগুলোর দাম ষাট ডলার করে দিচ্ছে তারা।

জ্বলজ্বল করে উঠল জর্জ ব্রাউনের চোখ। ‘অ্যাপাচিদের কম্বলে যত উকুন থাকে, তার চেয়েও বেশি বুনো ঘোড়া আছে মিউল মাউন্টেনে। কারও সম্পত্তি না ওগুলো। মেয়ারগুলো ধরে ধরে ক্যানসাস সিটিতে পাঠাব আমি। লোকের কোনও সমস্যা নেই, দিনে এক ডলার বেতনে সারা দিন বাস্কেটবলের ধারে অলস ঘোরাঘুরি করছে আমার কাউবয়রা। নয় শ’ ডলার পেলে যে-পরিমাণ ঘোড়া আমি ক্যানসাস সিটিতে পাঠাতে পারব, তাতে চল্লিশ হাজার ডলার উঠে আসতে দেরি হবে না।’

‘অবিশ্বাস্য,’ বিড়বিড় করল রন।

‘বিরিট একটা সুযোগ,’ অর্ধেক কণ্ঠে বলল জর্জ ব্রাউন। ‘কী বুঝলে, নিক?’

নিক হাওয়ার্ড দ্বিধায় ভুগে রনের দিকে চাইল। ‘ব্যাংক ব্যবসায় ভাল করেছ তুমি, রন। তুমিই ভাল বলতে পারবে।’

রন জিজ্ঞেস করল, ‘খবরের কাগজটা কতদিন আগের, ব্রাউন?’

‘কতদিন আগের তাতে কী যায় আসে? হবে হয়তো কয়েক সপ্তাহ।’

‘প্রথম দফা ঘোড়া জোগাড় করতে কত দিন লাগতে পারে?’

‘এখানে দাঁড়িয়ে বকবক না করলে কয়েক দিনের ভিতর ট্রেনে ভরে ঘোড়া পাঠাতে পারব।’ হাসি-খুশি চেহারা চিন্তার ছাপ পড়ল ব্রাউনের। ‘কী ভাবছ? আমি তো বলছি এটা বিরিট সুযোগ।’

মাথা নাড়ল রন। ‘তুমি যখন ঘোড়া নিয়ে ক্যানসাস সিটিতে পৌছতে পারবে, তত দিনে এই খবর হয়ে যাবে অন্তত এক মাসের পুরনো। তুমি এটাও জানো না আরও কতগুলো রাজ্যে এই বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। রকি মাউন্টেনের আশপাশের সব ঘোড়া এত দিনে করালে ঢোকানো হয়েছে, সব আছে এখন ক্যানসাস সিটির পথে। ঘোড়ার দাম ওখানে এত পড়ে যাবে যে ঘোড়া বিক্রি করে তোমার যাতায়াত খরচা বা ঘোড়ার খাবারের দামও উঠবে না।’

‘কিন্তু ঝুঁকিটা নেব আমি,’ একরোখা গলায় বলল জর্জ ব্রাউন। ‘নিক জানে, ও চাইলে যা টাকা নেব তার বদলে ওই দামের গরু দিয়ে দেব ওকে।’

কাঁধ ঝাঁকাল রন। ‘আমি হলে এক পয়সাও খরচ করতাম না।’

‘কেন?’

‘গরু দিয়ে যখন তোমাকে ঋণ শোধ করতে হবে, তখন টাকা ধার দিয়েছিলাম বলে হাজারটা গালি দেবে তুমি আমাকে। মানুষ এমনই হয়।’

নিক হাওয়ার্ড সন্দেহের সুরে বলল, ‘অমন ভাবে টাকা চাই না আমি, জর্জ। বেহুদা বদনামের ভাগী হব কেন!’

রনের দিকে কড়া চোখে চাইল জর্জ ব্রাউন, তারপর হলুদ রেইনকোটের নীচে কাঁধ দুটো জোরে ঝাঁকি দিল। চেহারা দেখে মনে হলো সমস্ত রসবোধ হারিয়েছে। হ্যাঁচকা টানে খবরের কাগজের টুকরোটা নিক হাওয়ার্ডের হাত থেকে নিয়ে আবার ভাঁজ করে পকেটে রেখে বলল, ‘টাকা দেবার মত লোক আরও আছে, নিক। তাদের শহুরে কোনও উপদেষ্টা নেই। এমন উপদেষ্টা নেই যারা ঘোড়ার ব্যাপারে কিছুই জানে না।’

‘ব্যাপারটা তুমি এভাবে নিচ্ছ বলে আমি সত্যি দুঃশ্চিন্ত।’

‘এভাবেই নিচ্ছি,’ কড়া গলায় নিক হাওয়ার্ডকে থামিয়ে দিল জর্জ ব্রাউন, ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, ‘ভুলে যাও কেন এসেছিলাম।’

গটগট করে হেঁটে দরজা খুলে লবি থেকে বেরিয়ে গেল জর্জ ব্রাউন। দরজা খোলায় ঝড়ের জোরাল আওয়াজ ঢুকেছিল লবিতে, দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই আবার আবছা হয়ে গেল শব্দ।

খানিক পর নিক হাওয়ার্ড বলল, ‘তোমার ধারণা সত্যি হলে হয়, নইলে বলব একজন ভাল বন্ধু হারিয়েছি আমি।’

রন বলল, ‘আর আমি বানিয়েছি আরেকজন শত্রু।’

ছয়

পরদিন ভোর এল স্নান আলো নিয়ে। আগের মতই জোরাল বাতাস। ফুলে ওঠা মেঘরাশি এলিফ্যান্ট-হেড বাটকে লুকিয়ে রেখেছে। মিউল হিলের চূড়ো ঘিরে রেখেছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির অযুত-নিযুত কণা। ঘুম থেকে জেগে ওঠা পিস্তল ফ্ল্যাটকে স্বাগত জানাতেই যেন ডিপোতে ঢুকল একটা হালকা রেলগাড়ি।

হাওয়ার্ড’স হোটেলের বারান্দায় এসে দাঁড়াল রন, তারপর রাস্তায় নেমে রেল-রাস্তা ধরে পশ্চিমে চলল। বোর্ডওয়াকে খটখট আওয়াজ তুলছে ওর

বুটজুতো, তারপর শব্দটা তলিয়ে যাচ্ছে বনিলাস সেতুর নীচ দিয়ে দ্রুত বহতা স্রোতের কলধ্বনিতে।

সেতুর মাঝে থেমে নীচের ক্রীকের দিকে চাইল রন, লালচে রঙের তীব্র স্রোতে ভেসে যেতে দেখল পাড় থেকে উপড়ে যাওয়া একটা ঝোপ, ক্যানিয়নের উপর দিকে যেসব চাইনিজ থাকে তাদের কারও মুরগির ঘর; আরও আছে টিনের ক্যান, কাগজ, হাবিজাবি নানান জিনিস।

একটা চিন্তা এল রনের মাথায়।

এই ছুটে চলা স্রোত শহর ছাড়িয়ে আরও সিকি মাইল নামবে, তারপর ছড়িয়ে পড়বে নীচের মেসায়, ওখানে সমস্ত পানি শুষে নেবে শুষ্ক জমি, পানির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না— কিন্তু শহরের আবর্জনা ঠিকই পড়ে থাকবে মেসায়।

মানুষের জীবনের সঙ্গে এই স্রোতের অদ্ভুত মিল। তারুণ্য থেকে স্বপ্ন ও উচ্চাশা মানুষকে তাড়িয়ে ফেরে, কিন্তু এই স্রোত যতটুকু চিহ্ন রেখে যাচ্ছে, ততটুকু চিহ্ন জীবনের শেষে পৌঁছে ক'জন রাখতে পারে পৃথিবীর বুকে? অথচ মৃত মানুষটার খারাপ কাজ, ব্যর্থতাগুলো জীবিতদের মনে রয়ে যায় আবর্জনার মত।

সকালের নাস্তার জন্য আগুন জ্বালা হয়েছে, পুড়ছে মেসকিটের ডাল। সকালের এলোমেলো বাতাসে ভেসে আসছে তার সুবাস। বাড়ি-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে যে-যার মত দিনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে মানুষ। দূরে কে যেন কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল, কুলকুচির আওয়াজ শোনা গেল অস্পষ্টভাবে।

মেইমি জেন্টস থেকে বেরিয়ে এল ক্লার্ক ফাওল। মাথা নিচু করে হাঁটছে একবারও কোনওদিকে না চেয়ে ঢুকে গেল জিং ওয়াঙের রেস্টুরেন্টে।

খনিজ বহনের উঁচু দেয়াল-ঘেরা ওয়্যাগন চালিয়ে নীচের রেল-রাস্তার কালভার্ট পেরুল দু'জন লোক। তাদের চেহারা দেখতে পেল না রন, কিন্তু মাথায় মাইনারদের ক্যাপ দেখে বুঝল লোকগুলোর পেশা কী। তাদের পায়েব কাছে কোদাল-শাবলও চোখে পড়ল ওর। ক্যানিয়নের পূর্ব দিকে গিয়ে স্মেলটার ও তারও পিছনের মিউল হিলের রাস্তায় পড়ে এগিয়ে গেল ওয়্যাগন।

সেতু থেকে নেমে রেল-রাস্তা ধরে রানিং আয়ার্ন সেলুন পাশ কাটাল রন। ঠিক তখনই সজোরে খুলে গেল সুইং ডোর, এদিক-ওদিক না চেয়ে বাহ্যিক হাতে বেরিয়ে এল এক ঝাড়ুদার, বালতির নোংরা পানি ছুঁড়ে দিল রেল-রাস্তার ধীর লালচে স্রোতে। চট করে তাকিয়ে এক পলকের জন্য ঝাড়ুদারের চেহারা দেখল রন। সরু মুখটা ওর পরিচিত। প্যাট্রিক। লোকটা লিজার স্বামী প্যাট্রিক টমসন।

উঁচু হিলের বুটজুতো পরে দু'হাত্রে দুটো কারবাইড লণ্ঠন নিয়ে ডিপো থেকে বেরুল ফ্লিণ্টস্টোন ফেনটন, রেল-রাস্তা পেরিয়ে জিং ওয়াঙের রেস্টুরেন্টের

সামনে রনের অপেক্ষায় দাঁড়াল সে; রন কাছাকাছি হতেই ওর পিছনের দিকে ইঙ্গিত করল। ‘বেকার কোনও মাইনারকে জানাও গর্ত খোঁড়া হয়েছে, সে দুনিয়া পার হয়ে সবার আগে ছুটে আসবে।’

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রন। রেল-রাস্তার শেষমাথায় ক্ষণিকের জন্য উঠে গেছে বৃষ্টির পর্দা, ওখানে এক পাশে রাখা ছাউনি-ঢাকা একটা ওয়্যাগন দেখতে পেল। ক্যাম্পের আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে, আগুনটা ঘিরে বসে আছে বেশ কয়েকজন।

রেস্টুরেন্টে ঢুকবার আগে রন বলল, ‘ওদের জন্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।’

জিং ওয়াগের রেস্টুরেন্ট লম্বা একটা ঘর। একসময় মাইনারদের উপস্থিতিতে সব সময় গমগম করত জায়গাটা। এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেশ কিছু টেবিল। বেশিরভাগই খালি। বাতাসে ভাসছে কফি ও ভাজা মাংসের সুবাস।

‘চিনা লোকটার সঙ্গে খাবারের ব্যাপারে চুক্তি করেছি,’ বলল ফেনটন। ‘আমার লোক নাস্তা করে নিয়েছে। কাজও শুরু করে দিয়েছে সবাই। মাল টানা গাড়ি, ট্রাক— সব ঠিক করতে হবে, তার আগে খনি থেকে তামা বের করা যাবে না।’

পার্টিশনের ওধার থেকে মেয়েলি গলায় ঝগড়ার আওয়াজ এল। ক্যানিয়ন থেকে বোধহয় বেশ কয়েকজন চায়নিজ মেয়েকে কাজে নিয়েছে জিং ওয়াং। পার্টিশনের দরজায় দেখা দিল হলদে একটা মুখ, তারপর এক তরুণী ঢুকল খাবার-ঘরে।

দূরের এক টেবিলে দরজার দিকে মুখ করে বসেছে ক্লার্ক ফাওল, টেবিলের তলা দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে পা দুটো। সর্বক্ষণ তামাক চিবানোয় চোয়াল নড়ছে তার। রন ঢুকতেই কড়া চোখে ওকে দেখল ফাওল, আস্তে করে পা টেনে নিল, মনে হলো যেন কুণ্ডলী পাকাল কোনও বিষাক্ত সাপ।

সোজা তার দিকে হাঁটা দিল রন।

হাত থেকে কাঁটাচামচ ফেলে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ক্লার্ক ফাওল। লম্বা হাত দুটো দেহের পাশে ঝুলছে, মুঠোগুলো টেবিলক্লথের উপর রাখা। টেবিলে উরু ঠেকিয়ে থামল রন, একদৃষ্টিতে চাইল ফাওলের শেয়ালের মত চোখা মুখে। ওর নাকটা ফাওলের নাক থেকে বড়জোর আঠারো ইঞ্চি দূরে থাকল।

ডেপুটি শেরিফকে বিব্রত করে তুলেছে-রন, দেখল কীভাবে আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ দূর হয়ে যাচ্ছে তার চেহারা থেকে। মনে মনে বলল, ভয় পাচ্ছ তুমি, ক্লার্ক ফাওল। তারপর ওর স্মৃতি পড়ল, পিছনে ক্লিভ হেস্টিংস না থাকলে কখনোই মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না ফাওল।

‘গতকাল খুব মজা করেছ তুমি,’ ধীর গলায় বলল রন। ‘আর কোনও মজা

পাবে না তুমি আমার কাছ থেকে। শীঘ্রি পিস্তল ফ্ল্যাটের সবচেয়ে বড় মাথা হতে যাচ্ছি আমি। তোমার মত লোকের পিস্তল ফ্ল্যাটে জায়গা হবে না।' ফাওল কিছু বলতে পারে ভেবে অপেক্ষা করল রন, লোকটা কিছু বলছে না দেখে যোগ করল, 'ওই টিনের তারা তোমার কোনও কাজে আসবে না। যা বললাম সেটা ভেবে দেখো। ভেবে দেখে কী করবে সিদ্ধান্ত নিয়ে।'।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার পাশের টেবিলে ফেনটনের সঙ্গে বসল রন।

'মিস্টার মার্লো, দিলে তো বেচারার খিদে নষ্ট করে,' স্বভাবসুলভ জোর কণ্ঠে মন্তব্য করল ফ্লিণ্টস্টোন ফেনটন।

চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ক্লার্ক ফাওল, রনের উপর থেকে একবারের জন্যও চোখ না সরিয়ে চলে গেল দরজার কাছে, বেরিয়ে গেল রেস্টুরেন্ট ছেড়ে।

ফেনটন বলল, 'আগে কোনও তোমাকে দেখিনি সকালের নাস্তা শেষ না করেই কারও বারোটা বাজাতে, মিস্টার মার্লো। আজকে তোমার মেজাজ খারাপ। আজ পারতপক্ষে তোমার ধারেকাছে থাকতে চাই না।'।

সেদ্ধ ডিম, স্টেক, কড়া কফি দিয়ে নীরবে নাস্তা সেরে নিল ওরা, তারপর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল রেস্টুরেন্ট থেকে। রাস্তায় দাঁড়াতেই সামনে এসে দাঁড়াল বিরাট আকৃতির এক লোক। ফেনটনের চেয়েও অন্তত তিন ইঞ্চি লম্বা হবে সে। হাতের মুঠোগুলো মরচের মত লাল। 'মিস্টার মার্লো?' ফেনটনের দিকে চাইল সে।

রনের দিকে মাথা কাত করে দেখাল ফেনটন। 'এই যে বস্'।

রাস্তার শেষমাথা দেখাল দানব। 'কাজ করতে এসেছি। পরিবারে সাতজন আছে আমার, ওয়্যাগনে ভিজতে হচ্ছে, নড়াচড়ার জায়গা নেই। একজন বলল তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'।

রনের দিকে চাইল ফেনটন। 'বলেছিলাম না দুনিয়ার আরেক প্রান্ত থেকেও হাজির হয়ে যাবে?'

'দুপুরের আগেই তোমার পরিবারের থাকার জায়গা হবে,' দানবকে আশ্বাস দিল রন। 'আর কাজের ব্যাপারে কথা বলতে হলে মিস্টার ফেনটনের সঙ্গে বলো। যত বিনয় করুক, এখন থেকে খনির কাজে সব লোক ও-ই ভাড়া করবে।' ফেনটনের দিকে চেয়ে হাসল রন, মাইনারের ধন্যবাদে জবাবে মৃদু নড করে ধীর পায়ে রওনা হয়ে গেল। একটু পর ওকে ধরে ফেলল ফেনটন।

ক্যানিয়ন থেকে লিজাকে বৃষ্টিতে ভিজ়ে আসতে দেখল রন। মেয়েটির হাতে একটা শপিং বাস্কেট। গায়ে পুরুষদের কোট, কালো হয়ে গেছে ভিজ়ে। রনকে দেখে হাসল লিজা।

'বাবা জানতে চায় তার পছন্দের হকার বড় হয়ে কেমন হয়েছে। আমি

বলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাবা বলল আমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি দশ ফুট লম্বা হয়ে গেছ।’

‘হতাশ হতে হবে মিস্টার ট্রেইসিকে,’ মৃদু হাসল রন। ওর মনে হলো লিজার উষ্ণ হাসি যেন দিনের সমস্ত কর্মব্যস্ততা থামিয়ে দিয়েছে। হুঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল ওর, রন বলল, ‘একটা চাকরি পেলে কেমন হয় তোমার, লিজা? মার্শল্যাণ্ড অ্যাণ্ড মার্লোর ইউনাইটেড ফেডারালের রিয়াল এস্টেট এজেন্ট হতে পারো তুমি।’

হাসিটা ম্লান হলো লিজার। ‘এমনিতেই অনেক ঝামেলায় আছ তুমি, রন। আমি আর ঝামেলা বাড়াতে চাই না।’

কথাটা উড়িয়ে দিল রন। ‘বাজি ধরে বলতে পারি তুমি আমাদের সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। রেল-রাস্তার পূর্ব পাশে যে বাড়িগুলো আছে, ওগুলো আমাদের— এক লোক তার পরিবার নিয়ে চলে এসেছে, ওখানে, ওই বাড়িগুলোর একটায় তাকে থাকার ব্যবস্থা করে দাও। এটাই তোমার প্রথম কাজ। ওকে বোলো, বেতন পাওয়ার পর ভাড়া কত হবে সেটা ঠিক করব আমরা। আরও অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে আসবে, তাদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে তোমাকে। সবগুলো বাড়ি ভাড়া হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আপাতত এই কাজই করতে থাকো। যারা একা আসবে, তারা নিজেদের থাকার জায়গা নিজেরাই ঠিক করবে।’

রন ঠাট্টা করছে না বুঝে হাসির রেখা মুখে গেল লিজার ঠোঁট থেকে। আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, রন। কিন্তু সবক’টা বাড়ি ভাড়া হয়ে যাবার পর?’

‘ওয়্যারহাউস আর খালি দালান আছে অনেক— ওগুলোর বেশিরভাগই কিনে নিয়েছি আমরা। আমি একটা লিস্ট তৈরি করে দেব তোমাকে। সেই অনুযায়ী ভাড়া দেবে তুমি।’

ক্যানিয়নের মুখে এসে থামল বাদামী তারপুলিনে ঢাকা এক ফ্রেইট ওয়্যাগন, ওটার সিটে বসা লোকটা জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার খনিটা কোন্‌দিকে?’ জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, ‘মালপত্র রাখব কোথায়? পরিবার নিয়ে এসেছি। সঙ্গে গৃহস্থালী জিনিসপত্রও আছে।’

তার পাশে সিটে বসে আছে কাঁধে ভেজা কম্বল জড়ানো এক মহিলা। শীতে কাঁপছে সে। মহিলার পিছন থেকে তারপুলিন সরিয়ে উঁকি দিল আট-নয় বছরের একটা ছেলে।

ঠাট্টা করে রনকে স্যালিউট করল লিজা, পা বাড়িয়ে বলল, ‘বেতন হাল্কা করতে চললাম!’ লোকটার সামনে থেমে দাঁড়াল ও। ‘ওয়্যাগন ঘুরিয়ে আমার পেছনে এসো।’ কথা শেষ করে একবারও পিছনে না তাকিয়ে সোজা হাঁটা ধরল

রেল-রাস্তার পুব পাশের বাড়িগুলোর দিকে ।

ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ফ্লিস্টস্টোন ফেনটন বলল, ‘মিস্টার মার্লো, এই প্রথম একটা মেয়েকে দেখলাম, যাকে অর্ধেক রাত ধরে বোঝাতে হলো না কেন কীভাবে কী করতে হবে ।’

বিল ট্রেইসির নীরব বাড়ির পিছনের ক্যানিয়নে অ্যাডোবির তৈরি ব্যারাকের মত ঘরগুলোয় থাকে চায়নিজরা । শহরটা আবার কখনও নতুন করে জীবন ফিরে পাবে সে-আশায় এখনও রয়ে গেছে তারা । তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ওয়্যাগন চলাচলের দাগ দেখতে পেল রন । কিছুক্ষণ আগেই ও-পথে ওয়্যাগন গেছে ।

শহরের শেষ বাড়ি পেরুনোর আধমাইল পর পানি পার হয়ে খনিতে যাওয়া সুড়ঙ্গে ঢুকতে হবে লোকগুলোকে । ওখানে ক্যানিয়নের নিচু অংশ থেকে গুরু হয়েছে সুড়ঙ্গ । ভোরে যে ‘ওর’ ওয়্যাগন দেখেছিল রন, সেটা সুড়ঙ্গ-মুখের একটু ভিতরে, বৃষ্টির আওতার বাইরে থেমেছে ।

ওটার পাশ দিয়ে টিলার পেটের ভিতর চলে গেছে জং পড়া রেললাইন ।

‘এই স্তরে তো কাউকে আমি কাজে লাগাইনি!’ বিস্মিত কণ্ঠে জানাল ফ্লিস্টস্টোন ফেনটন । ওয়্যাগন পেরিয়ে জল-হাওয়ার আড়াল পেয়ে লণ্ঠন জ্বালল সে । সাদা আলোয় দেখা গেল, রেললাইনের ধারে পড়ে আছে ভাঙা কোদালের কয়েকটা পুরনো হাতল ।

উবু হয়ে ওগুলোর একটা তুলে নিয়ে চিন্তিত চোখে দেখল রন । আরেকটা তুলে নিল ফেনটন । কোনও কথা বলল না কেউ ।

টিলার এক শ’ গজ ভিতরে তামার বিশাল এক স্তর পাওয়া গিয়েছিল, ওখান থেকে খুঁড়ে নেয়া হয়েছে প্রায় সমস্ত তামা, এখন শূন্য জায়গাটা একটা মেঝে-ঢালু অন্তহীন হল-ঘরের মত দেখাচ্ছে । হল-ঘরের ছাত ধরে রেখেছে বহু কলাম বা পিলার । ওই পিলারগুলোতে রয়েছে প্রচুর তামা । খনি বন্ধ করে দেয়ার সময় প্রকাণ্ড খোঁড়লের ছাত ধসে পড়বে ভেবে পিলারগুলো ভেঙে তামা সংগ্রহ করা হয়নি ।

টিলার গহ্বরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না লণ্ঠনের আলো । ফাঁকা জায়গাটা যেন শুষ্ক নিচ্ছে সমস্ত শব্দ । এমন কী ফেনটন যখন জোর গলায়, ‘কলামগুলো খুঁড়ে ফোঁপড়া বানিয়ে দিয়েছে কেউ,’ বলল, তখনও মৃদু শোনালা শব্দটা ।

তবে ওই মৃদু কথাই অনুরণন তুলল রনের বুকে । কর্নেল মার্শল্যাও এবং ও প্রাথমিক কাজের টাকা জোগাড় করবার জন্য পুরোপুরি নির্ভর করছে এই কলামগুলোর উপর । শুধু তা-ই নয়, রনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কলামের তামা বিক্রি থেকেই আসবে প্রয়োজনীয় অফিস বিল্ডিং তৈরির টাকা । কেউ যদি এত

দিনে খনির পিলার ফোঁপড়া বানিয়ে দিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে দেরি না করে খরচ কমাবার জন্য নতুন ভাবে হিসাব কষতে হবে ওকে, সেইসঙ্গে বাইরে থেকে আরও অনেক বেশি টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে হবে।

‘চলো, দেখা যাক কতটা কী ক্ষতি করেছে ওরা,’ বলল রন।

‘তাড়াতে হবে শালাদের,’ লষ্ঠনের আলোয় রেললাইনের বাঁক ধরে এগুতে শুরু করল ফেনটন। ইউনাইটেড ফেডারালের চাকরি করেছে সে বেশ অনেক দিন, একটু পর বিড়বিড় করে জানাল, রেললাইন সরানো হয়েছে আগের জায়গা থেকে।

ধীর পায়ে বিদঘুটে চেহারার ক্ষতবিক্ষত, ভুতুড়ে পিলারগুলোর মাঝ দিয়ে সামনে বাড়ল দু’জন। ওদের জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে গেল লক্ষ লক্ষ টন পাথর আর স্তব্ধ বাতাসে।

‘অ্যারোয়ার তলা থেকে সুড়ঙ্গ শুরু করতে চেয়েছিলাম আমি,’ জানাল ফেনটন। ‘বড় কোনও বন্যা হলে পুরোপুরি তলিয়ে যাবে খনি। আমার কথা শুনে শেষে বনিলাস ক্যানিয়নে বাঁধ তৈরি করে ইউনাইটেড ফেডারাল।’

সামনে আলো দেখল ওরা, সাবধানে এগিয়ে একটু পর দু’জন লোককে দেখতে পেল। একটা পিলারের গায়ে শাবল চালাচ্ছে তারা, কেরোসিনের দুর্বল বাতির আলোয় কাজ করছে, পিলার থেকে খসিয়ে ওহার মেঝেতে জড় করছে তামা, সেখান থেকে জং ধরা রেললাইনের উপর দাঁড়ানো একটা কার্ট-এ তুলছে।

ফেনটন ও রনকে কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে কাজ থামিয়ে দিল তারা। একজন ভর দিল তার কোদালের হাতলে, অন্য জন বেপরোয়া ভঙ্গিতে দু’হাতে তুলে ধরল শাবল।

সকালে ক্লার্ক ফাওলের সঙ্গে এক দফা হয়ে যাওয়ায় এমনিতেই মেজাজ ভাল নেই রনের, তার উপর এই লোকগুলো ওর পকেট থেকে টাকা সরাচ্ছে দেখে রেগে গেল আরও। বাতাসে ঘুরে যাওয়া দ্রুতগতি চাবুকের মত হিসহিস করে উঠল ওর কণ্ঠ: ‘এখানে কাজ করার অনুমতি কে দিয়েছে তোমাদের?’

মাইনার দু’জন ছ’ফুটের কম হবে না লম্বায়। চওড়া শরীর। হয়তো খুব চালাক নয় তারা, কিন্তু বোকাও নয়। পেশার কারণেই কাউকে তোয়াক্কা করে চলবার মানসিকতা নেই দু’জনের একজনেরও। কিন্তু রনের কড়া গলা থমকে দিল তাদের, অস্বস্তিতে ফেলে দিল প্রশ্নটা। পরস্পরের দিকে চাইল তারা, ধীরে ধীরে দু’জনের চেহারায় ফুটে উঠল অপমানের ছাপ।

‘কে প্রশ্ন করছে?’ একটু থমকে জিজ্ঞেস করল শাবলওয়ালা, তারপর একহাতে শাবলটা বাগিয়ে ধরে সামনে বাড়ল। শাবলের এক প্রান্ত বাড়ি খেল রেললাইনের সঙ্গে, গাঁথে গেল পিলার থেকে খসানো তামার স্তূপের ভিতর। ওটা

টান দিয়ে তুলে আবার দু'হাতে শাবলটা ধরল সে, রনের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেরি না করে শাবল চালাতে পারবে।

অন্যজন বলে উঠল: 'শহুরে মানুষ, শিফ! সাবধান!' কোদাল তুলে ফেনটনের দিকে এল সে।

খুশি মনে হাতে ধরা কোদালের হাতলটা ড্রামবাদকের মত ঘোরাল রন, প্রচণ্ড জোরে বাড়ি বসিয়ে দিল শেফ-এর শাবল ধরা হাতে। কজির পেশিতে বাধা পেয়ে লাফ দিয়ে উঠল কোদালের মোটা হাতল। ব্যথায় কাঁপতে শুরু করল লোকটা, বিকৃত চেহারা যন্ত্রণায় ঝাঁকাতে শুরু করল হাত, পড়ে গেল তার শাবল।

নড়ল না তার সঙ্গী।

রনের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের হাতল চালান ফেনটন। ওটা লাগল কম্পিত মাইনারের পাজরে।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল রন, দুই মাইনারের হাত দুটো ভাঙতে যে বিন্দুমাত্র বাধবে না, সেটা স্পষ্ট বলে দিল ওর কঠোর চেহারা। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রন, 'কে তোমাদের অনুমতি দিয়েছে এখানে কাজ করার?'

'তামা যা পাই তার থেকে একটা অংশ আমরা ক্লিভ হেস্টিংসকে দিই,' যন্ত্রণাকাতর গলায় বলল মাইনার শিফ।

'কী কারণে তোমাদের ধারণা হলো এ খনিতে ওর কোনও অধিকার আছে?'

শিফ-এর সঙ্গী ত্যাড়া সুরে বলল, 'খনিটা তো ওর, নাকি?'

'এখন আর নয়। খনি কিনে নিয়েছি আমি। যন্ত্রপাতি নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাও! হেস্টিংসকে জানিয়ে দিয়ো, যে-পরিমাণ তামা তোমরা সরিয়েছ, যদি আইনে তার দামটা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উপায় থাকে, ওর এবং-তোমাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেব আমি।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও কীসে নিজের ভাল বুঝে মুখ হাঁ বন্ধ করে ফেলল শিফ, তারপর বলল, 'আমরা একা কাজ করছি না এখানে। মোট দশজন আমরা লাভ দিচ্ছি ক্লিভ হেস্টিংসকে। তোমার মাতবরী এত সহজে মেনে নেবে না ওরা।' আস্তে করে শাবলের দিকে হাত বাড়াল সে, ওটা তুলে রনের দিকে চাইল।

ওটা দিয়ে আঘাত করবার চিন্তা মাথায় থেকেও থাকে, রনের অগ্নিদৃষ্টি তার সে-ইচ্ছা দমিয়ে দিল। রনকে পাশ কাটিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে খনি থেকে বেরিয়ে যাবার রেললাইনের দিকে। লঠন ও পানির ক্যান্টিন তুলে নিয়ে তাকে অনুসরণ করল তার সঙ্গী। একটু পরেই চোখের আড়ালে চলে গেল দু'জন।

চিন্তিত চেহারা রন বলল, 'ওরা যদি সত্যি ভেবে থাকে খনি হেস্টিংসের, সেক্ষেত্রে ওদের চাকরি দিতে আপত্তি থাকবে না আমার।'

‘মিস্টার মার্লো, তুমি বলেছ চাকরি আমি দেব,’ আপত্তির সুরে বলল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন। ‘এরা জাত হাই-গ্রেডার, পকেটে পয়সা আসবে টের পেলে যে-কোনও খনির বারোটা বাজিয়ে দেবে শয়তানগুলো। ওদের কিছুতেই কাজে নেব না আমি।’

খনির প্রথম স্তরের আরও ভিতরের দিকে চলল রন ও ফেনটন। যেতে যেতে কীভাবে কাজ শুরু করবে তা ব্যাখ্যা করল ফেনটন। দুপুরের আগে রন নিশ্চিত হয়ে গেল, ওর মাইন সুপারইন্টেন্ডেন্ট ভাল বোঝে নিজ কাজ। বিদায় নিয়ে উপরে উঠবার জন্য রওনা হয়ে গেল রন।

দুপুরে পর্দা-ঢাকা ক্লজিটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ব্রেকম্যান্স হোটেলের মক্ষীরানী মেইমি, গতকাল বিকেলে যে কোট ঝুলিয়ে রেখেছিল, ওটা নামাল ক্লজিট হ্যান্ডার থেকে।

ক্লার্ক ফাওল নিজ ব্যাগ থেকে যে সুটকেসে ওপিয়াম ভরেছিল, সেটা থেকেই এসেছে ওই কোট।

আবার ঘরের মাঝে ফিরে এল মেইমি, কাউচের পাশে দাঁড়াল। কাউচে শুয়ে ছাতের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ক্লার্ক ফাওল। মেয়েটা পাশে এসে দাঁড়ানোর রক্তলাল চোখে তার দিকে চাইল ফাওল, তবে বলল না কিছুই।

গায়ের সঙ্গে কোট ধরে ওটা নিভাঁজ করতে শুরু করল মেইমি; চর্চিত, সুরেলা গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘কার কোট এটা, ক্লার্ক?’

‘তাতে তোমার কী! আরেকটা ড্রিস্ক দাও আমাকে।’

‘বিল ট্রেইসি যদি টের পায় এই কোট আমার ঘরে, বিপদ ঘটবে আমার,’ বলল মেইমি। ‘অথবা রন মার্লো যদি জানে...’

মেজাজ খারাপ করে উঠে বসল ক্লার্ক ফাওল, টলতে শুরু করল দু’পাশে। রাগে চেহারা থেকে সরে গেল রক্ত, সারামুখের গোল গোল ফ্যাকাসে দাগগুলো অদৃশ্য ও স্পষ্ট হলো। কর্কশ স্বরে বলল, ‘শরীর ভাল হওয়ার পর ওটা এখন থেকে সরিয়ে ফেলব।’

একটু চুপ করে থেকে মেইমি বলল, ‘লিজা টমসন কিন্তু সত্যি ভাল মেয়ে। ওকে তুমি কোনও বিপদে ফেলতে চাইলে তাতে নিজেকে জড়াব না। ...আর রন মার্লোও কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি আমার সঙ্গে।’

গাল দিয়ে উঠল ক্লার্ক ফাওল, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই হাত ঘুরিয়ে চড় মারল। সরে যেতে চাইল মেইমি, কিন্তু সময় মত সরতে পারল না। চোয়ালে জোরাল চড় খেয়ে ভারসাম্য হারাল সে, দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল পিঠ দিয়ে।

দাঁত খিঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ক্লার্ক ফাওল, ‘ভাল মেয়ের কী জানো তুমি?’

বুনো রাগ আরও বেড়ে গেল তার, আবার মেইমিকে ধরতে সামনে বাড়ল সে।

ফাওলের বাড়ানো দু'হাতের আওতা থেকে সরে যেতে চাইল মেইমি, কিন্তু এবারও দেরি করে ফেলল। ভয়ে চিৎকার করতে হাঁ করল মেয়েটা, কিন্তু গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরুল না। ফাওলের ঘুসিতে খেঁতলে গেল ঠোট দুটো, উপরের ঠোট ফেটে বেরুল একঝলক রক্ত। রক্তের সঙ্গে খসে পড়ল সামনের একটা দাঁত। ধূপ করে পড়ে গেল মেইমি।

মেয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে মাথাটা হঠাৎ করেই শীতল হয়ে উঠল ক্লার্ক ফাওলের, নিচু গলায় বলল, 'সময় এলে শোধ নেব আমি রন মার্লোর ওপর। ভুলেও আর কখনও ওর কথা বলতে এসো না আমাকে।'

যে-কোটের কারণে এই বিশ্রী কাণ্ড হলো, সেটা মেইমির হাত থেকে টেবিলের উপর পড়ে গিয়েছিল, সেখানেই পড়ে আছে। ওটা তুলে নিল ফাওল, গোল করে পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল মেইমির দিকে। এবার হ্যাট নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, পিছনে দড়াম করে বন্ধ করে দিল ঘরের দরজা।

ক্লার্ক ফাওল বেরিয়ে যাওয়ার পর ধীরে, খুব ধীরে, সাবধানে উঠে বসল মেইমি, চোখ সরল না তার লিজার কোটের উপর থেকে।

বাড়িগুলোতে নতুন আগতদের তুলে দিতে সারা দিনই প্রায় ব্যস্ত থাকল লিজা। ঝড়ো আবহাওয়া সত্ত্বেও এল অনেক মাইনার। দুপুরের আগেই বিশটা পরিবার আশ্রয় নিল তাদের জন্য বরাদ্দ করা বাড়িতে। একাকী পুরুষদের থাকবার জন্য কোনও ব্যবস্থা রাখতে বলেনি রন, তবে তাদের জন্যও একটা চিন্তা এল লিজার মাথায়।

দুপুরের খাবার সময় হল জুয়া খেলবার ঘরগুলোর পিছনে বাবার ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল লিজা, চুলোর আঙুন উসকে চড়িয়ে দিল পানি। একসময় যে-ঘরে থাকত সে ঘরে চলে এল, পরে নিল শুকনো পোশাক। কিচেনে ফিরে আসবার আগে আবারও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিন্তা করে দেখল মনের কোণে উঁকি দেয়া ভাবনাটা। চুলোর আঙুনে চুল শুকাতে শুকাতে আগের এক চিন্তার কারণে আপাতত সিদ্ধান্ত পাল্টাল।

নিজের আইনী ঝামেলার কথা বাবাকে বলেনি।

বিল ট্রেইসি সহজেই সবার সঙ্গে মিশে যাওয়ার মত মানুষ। বয়স হওয়ায় আচরণে আরও ভদ্র হয়েছে। এখন আর নিজের ছোট আস্তানা থেকে বেরুতে চায় না, পারত পক্ষে জড়াতে চায় না কোনও ঝামেলায়।

কিন্তু লিজা ওর বাবার মনের অনন্ত গহীন, রহস্যময় গভীরতার কথা জানে। কখনও কখনও সেজন্য বাবাকে ভয় লেগে ওঠে ওর।

এমন সময়ও এসেছে, যখন বিল ট্রেইসিকে মনে হয়েছে বিস্ফোরণোন্মুখ

আগ্নেয়গিরি। অবশ্য সবসময় লিজার সঙ্গে নরম আচরণ করেছে মানুষটা।

পুরুষশাসিত সমাজে চলতে গিয়ে কম পুরুষ তো দেখেনি লিজা, ফলে আন্দাজ করতে পারে, ওর বাবার ভিতর ইম্পাতির মত দৃঢ় একটা স্নায়ু আছে। খেয়াল করে দেখেছে লিজা, বাবার সামনে কখনও অসাবধান হয় না কোনও পুরুষ, ভুলেও অভদ্রতা বা বাড়াবাড়ি করে না। লিজা আঁচ করতে পারে, আপাত ভদ্র আচরণের আড়ালে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক একটা মানুষ বাস করে ওর বাবার ভিতর।

মনে মনে বলল লিজা, হয়তো সে-কারণেই সভ্যতা থেকে এত দূরে এভাবে একাকী জীবন কাটাতে চেয়েছে বাবা।

বিল ট্রেইসির সিঙ্কগানের বাঁটে অনেকগুলো আঁচড়ের দাগ আছে। প্রতিটা দাগ একজন করে মৃত মানুষের জন্য।

দাগগুলো দেখেছে লিজা, কিন্তু কখনও বাবাকে এ-ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করেনি।

বাবার আসবার শব্দ পেয়ে মগে ভরে ধোঁয়া-ওঠা গরম কফি টেবিলে রাখল লিজা।

ঘরে ঢুকে মেয়েকে দেখে হাসল বিল ট্রেইসি, চেয়ারে বসতে বসতে ঠাট্টা করে বলল, ‘ধারেকাছে সুন্দরী মহিলা থাকলে মনটা ভাল লাগে বেশ।’

নিজের জন্য একটা কাপে কফি ঢেলে চুমুক দিল লিজা, বাবার ধূসর মাথাটার দিকে চেয়ে বলল, ‘একটা কথা ভাবছিলাম, বাবা।’

ভারী ভুরুর নীচ দিয়ে স্নেহের চোখে মেয়েকে দেখল জুয়াড়ী। জানালা দিয়ে তার চুলে পড়ল বিকেলের আলো। চকচক করে উঠল মাথার দু’পাশের রূপালী চুল।

‘বেশিরভাগ মেয়েমানুষ কিছুই ভাবে না,’ মৃদু হাসল সে। ‘কী ধরনের ভাবনা এসেছে তোমার মনে?’

‘শহরে’ অনেক মাইনার আসছে। তাদের জন্যে একটা বোর্ডিং হাউস দরকার।’

‘এরকম শহরে বোর্ডিং হাউস চালানো কোনও মেয়ের জন্যে খুব কঠিন, লিজা। বিশেষ করে কমবয়সী, সুন্দরী কোনও মেয়ের জন্যে।’

‘নিজের দিকে খেয়াল রাখতে জানি আমি, বাবা।’

‘তা ঠিক,’ ক্লান্ত শোনাৎ বিল ট্রেইসির কণ্ঠ। ‘সবসময় নিজের দিকে খেয়াল রেখেছ। অবশ্য কখনও কখনও নাক না গলিয়ে পারিনি। আসলে এটা ভাবতেই কষ্ট হতো যে তোমার জীবনটা শুধুই তোমার। সবসময় তোমাকে সেই ছোট্ট মেয়েটা মনে হয়েছে। এখনও হয়। যেন বড় হওনি তুমি। সবসময় মনে হয়েছে, এখানে, এই জঘন্য পরিবেশে তোমাকে বেড়ে উঠতে দেয়া উচিত হয়নি আমার।’

এরকম পরিবেশে কোনও মেয়ের বাস করা উচিত নয়।’

কাপ নামিয়ে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াল লিজা, কাঁধে দু’হাত রেখে চাপ দিল। বাবার শরীর থেকে সাবান ও সিগারের মিশ্র গন্ধ এল। গন্ধটা ওকে মনে পড়িয়ে দিল অনেক দিন আগের অস্পষ্ট স্মৃতি। সময় যেন পিছিয়ে গেল ওর জন্য। তখন তিনজন ছিল ওরা... ঠিক মনে পড়ে না সেটা কবের কথা... কিন্তু সুখের একটা স্বপ্ন ছিল যেন সে-সময়টা।

‘আমি অন্য কোথাও বড় হতে চাইতাম না, বাবা,’ মৃদু গলায় বলল লিজা।

আস্তে করে ওর হাতে চাপড় দিল জুয়াড়ী। ‘এই বোর্ডিং হাউস— কোনও না কোনও ব্যবসায়ী মহিলা খুলবেই। ...প্যাট্রিকের ব্যাপারে কী ভাবছ তুমি, লিজা?’

‘জানি না, বাবা। সত্যিই জানি না।’

‘আসলে...’ দ্বিধায় ভুগল কঠোর মানুষটা, ‘আমি জিজ্ঞেস করতে চাইনি... রন মার্লোকে পছন্দ করো তুমি? আমার মন বলে রনকেই তোমার পছন্দ। যদি তা-ই হয়, প্যাট্রিকের সঙ্গে আর কোনওরকমের কোনও সম্পর্ক রাখা ভুল হবে। প্যাট্রিক যদি তোমাকে বিরক্ত করে, আমি হয়তো এবার একটু নাক গলাতে পারি।’ সোজা হয়ে বসল বিল ট্রেইসি। লিজা কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নেয়ার ভেস্ট-এর পকেট হাতড়ে সিগার বের করে ধরাল।

লিজা খেয়াল করল, জবাব দেবার জন্য ওকে চাপাচাপি করল না বাবা। নরম গলায় ও বলল, ‘একটা বাড়ি, কয়েকজন কাজের মেয়ে আর কিচেনে রান্নার কাজে সাহায্য করার জন্য দু’জন রাঁধুনি দরকার হবে আমার।’ দুপুরের খাবার তৈরি করবার জন্য ঘুরে রওনা হলো ও কিচেনের দিকে।

‘হাওয়ার্ড হোটেলের পেছনে বিনের পুরনো বাড়িটা হলে কেমন হয়?’ জিজ্ঞেস করল বিল ট্রেইসি। ‘জায়গাটা খনি আর স্মেলটারের কাছে। আমিও কাছাকাছিই থাকছি তা হলে। অনেক চায়নিজ মেয়ে আছে, যাদের চাকরি দরকার। খুশিমনে তোমার কাজ নেবে ওরা।’

খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল লিজার মুখ। ‘ভাবছি বাড়িটা কার— রন মার্লো, না নিক হাওয়ার্ডের।’

‘ইউনাইটেড ফেডারালের হোল্ডিং ছিল।’

‘তা হলে ওটার মালিক এখন রন।’ দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল লিজা। ‘আমি এখনই যাচ্ছি ওকে...’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও!’ হেসে ফেলল বিল ট্রেইসি। ‘দুপুরের খাবারের কী হবে?’ হেসে ফেলল লিজাও। ‘একটু পরেও খেতে পারব আমরা, বাবা!’

শান্ত চোখে মেয়েকে ঘরে গিয়ে ঢুকতে দেখল জুয়াড়ী। দেখল তারই একটা পুরনো কোট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এল লিজা। ‘ওই পুরনো ন্যাকড়া পরবে

কেন,’ হুঁশিয়ার করল ট্রেইসি, ‘শেষে ঠাণ্ডায় মারা পড়বে। ...গরম কোট নেই তোমার?’

থমকে দাঁড়াল লিজা। ‘নেই।’ বাবাকে কথা বলবার সুযোগ দিল না, দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি ছেড়ে।

বৃষ্টি কমে গেছে, ঝিরঝির করে পড়ছে। অনেক কমে গেছে বাতাসের জোর। বাবার বাড়ি আর বিন-এর দালানের মাঝের ফাঁকা জায়গাটা দ্রুত হেঁটে পেরুল লিজা, বিনের দালান পেরিয়ে বাঁক ঘুরে চলে এল হাওয়ার্ড’স হোটেলের সামনে; লবিতে ঢুকল রনের খোঁজে।

রেল-রাস্তার দিকে মুখ করা বাড়িগুলোর পিছন দিয়ে ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে মেইমিকে হেঁটে যেতে দেখল না।

লিজা বাড়ি থেকে বেরুবার পাঁচ মিনিট পর বিল ট্রেইসির পিছনের দরজায় টোকা দিল মেইমি। ‘কাম ইন!’ ভিতর থেকে বলল জুয়াদী। কেউ সাড়া না দেয়ায় বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলল।

দরজায় বিল তাকে দেখতে পেয়েই ঝট করে লিজার কোট ধরা হাত সামনে নিয়ে এল মেইমি। কোট নিয়ে মেয়েটার কাটাছেঁড়া চেহারার দিকে চাইল হতভম্ব বিল ট্রেইসি। ‘মেইমি, কী এটা?’

‘লিজার কোট।’

‘কিন্তু...’

‘লিজার সুটকেসে যখন ওপিয়াম ভরে, তার পরে এটা আমার কাছে রেখে গিয়েছিল ক্লার্ক ফাওল।’

‘কী বললে! ক্লার্ক ফাওল!’

‘আমাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারবে না কিছু। ক্লার্ককে জিজ্ঞেস কৈরো।’ •

ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল মেইমি, পিছনের উঠানে জমা কাদা-পানির পুকুরে ছপছপ পা ফেলে তড়িঘড়ি করে চলে গেল বাড়ির কোনা ঘুরে।

পিছন থেকে মেয়েটার দিকে চেয়ে রইল বিল ট্রেইসি।

রন মাল্লোর লোকজন স্মেলটার মেরামতের কাজ শুরু করেছে, ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষে ঢং-ঢং আওয়াজ হচ্ছে। কিন্তু সচেতন ভাবে শব্দটা শুনতে পেল না মেইমি। তার চোখে ভাসছে হঠাৎ পাথরের মত কঠোর হয়ে যাওয়া বিল ট্রেইসির নির্ভর, পুরুষালী চেহারা। কানে শুনতে পেল মেইমি তার ইস্পাতের মত কঠর: ‘কী বললে! ক্লার্ক ফাওল!’

মনে মনে বলল মেইমি, ‘ক্লার্ক ফাওল, আর কখনও আমাকে মারতে পারবে না তুমি।’ স্কাট উঁচু করে নর্দমায় নেমে কাদা-পানি পেরুল সে, বাড়িগুলোর

পিছন উঠান ধরে কয়েক মিনিট পর পৌছে গেল ব্রেকম্যাস হোটেলে, নিজ পার্সোনে।

সাত

ফেনটনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেললাইনের বাঁকের কাছে, সমতলে চলে আসতে মই বেয়ে এক শ' ফুট উঠতে হলো রন মার্লোকে। খেয়াল করল, রেললাইনের স্প্রিংগুলো এখানে নতুন, ধূসর রং করা। সুড়ঙ্গের মুখে গাছের গুঁড়ির ফ্রেমের ভিতর দিয়ে দিনের আলো চোখে পড়ছে। বাতাস এসে আলতো করে ছুঁয়ে দিল ওকে।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে হয়েস্টহাউস-এর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রন। ভেজা বাতাস টান দিল ওর কোটে। খনির অফিস বিল্ডিংগুলো সব ওর নীচে টিলার কোলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে পুরনো কনসেনট্রেটরের দীর্ঘ ঢাল, গ্যালভানাইজ করা লোহার ছাউনি দেয়া কামারের আস্তানা। বর্জ্য ফেলবার গহ্বররের কিনারায় চলে গেছে জং-ধরা দুটো রেললাইন। আরও নীচে থেকে যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে স্মেলটার থেকে পরিত্যক্ত জিনিসের স্তুপ। স্মেলটারের পিছনে ওই যে পানিতে ভেজা কালো রঙের পিছলা পাথরের বিরাট টিলা— আজকের ধূসর মেঘলা আকাশের আলোয় চিকচিক করছে।

টিলার এই উচ্চতা থেকে ক্যানিয়নের দিকে চাইলে স্পষ্ট দেখা যায় গোটা শহর। কাদা-পানির ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল করল ও, এক সময় কত বড় হয়ে উঠেছিল পিস্তল ফ্ল্যাট।

রেল-রাস্তার দিকে মুখ করে আছে প্রধান ব্যবসায়িক দালানগুলো, দূর থেকে ওগুলোর গায়ে গা ঘঁষা সমতল ছাত দেখে মনে হচ্ছে প্রাচীন কোনও ধ্বংসাবশেষের অংশ।

রাস্তার পাশে উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে গেছে রেললাইন। রেল-রাস্তার আরেক ধারে ছড়ানো ছিটানো কিছু একাকী বাড়ি-ঘর— যেন পাল থেকে সরে যাওয়া কয়েকটা হারানো ভেড়া। ডেভ বেলের বিরাট মার্কেটাইল কোম্পানি, ছোট চার্চ, বুড়ো ফেরিসের বাড়ি। ওই বাড়িতে এখন আইনের অফিস খুলেছে লিউট ফেরিস। দালানগুলোর মাঝে পড়ে আছে কাদায় ভরা অনেক ফাঁকা জায়গা।

শহরের পুব প্রান্তে উঁচু জমিতে প্রাসাদোপম হেস্টিংস ম্যানসন, প্রকাণ্ড সব সিকামোর ও কটনউড গাছের ঘন সবুজ পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রায়। সিকামোরের সাদা কাণ্ডগুলো রূপালী দেখাচ্ছে হালকা বৃষ্টিতে। পশ্চিমে ওই যে ব্রেকম্যানের হোটেল, চ্যাপ্টা ধরনের অ্যাডোবি দালান।

দু' জগতের দালান দুটোর মাঝে ফাঁকা বাড়িগুলো যেন একটা ত্রিভুজ তৈরি করেছে। ত্রিভুজের রেখাগুলো থেকে ক্রমে শুরু হয়ে গেছে বাড়িগুলোর সারি, চোঙের মত হয়ে ঢুকেছে ক্যানিয়নের ভিতর। টিলার উপর পুরনো খনিটা যেন একটা টুপি, ওটা থেকে নীচের দিকে পিস্তল ফ্ল্যাট শহরটা কোনও মানুষের ভাঙাচোরা দেহ।

স্মেলটারের বিশাল আকৃতিকে পাশ কাটাতে শুরু করে ওটার ভিতর লোকের কাজ করবার আওয়াজ শুনতে পেল রন। খোলা জায়গা দিয়ে চাইল, ছাউনির পাশের ভেন্টিলেটার দিয়ে প্রবেশ করা আলোয় দেখল মানুষের আবছা মূর্তি।

চলবার গতি বাড়িয়ে মূল ক্যানিয়নে ফিরে একটু এগুতেই চায়নিজদের প্রথম বাড়িটা পড়ল। ওখানে রনকে দেখে লাফানোর ফাঁকে ঘেউ-ঘেউ শুরু করল হাভিডসার এক বাদামী কুকুর, দাঁত খিঁচিয়ে তেঁড়ে এল কয়েক ফুট, তারপর অস্বস্তি নিয়ে কাদার ভিতর বসে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পিছনের পা দিয়ে গা চুলকাতে।

আমার মনের অবস্থাও ওই কুকুরের মত, মনে মনে বলল রন। কোথাও গিয়ে চুপচাপ বসে অস্বস্তি ভুলে থাকবার চেষ্টা করতে পারলে ভাল হতো।

পিলারগুলোর হাই-গ্রেড তামা হারানো বড় একটা আঘাত। কর্নেল মার্শল্যাণ্ডকে কথাটা জানাতে হবে ভেবে বিব্রত হয়ে উঠল রন। তিনটা বাড়ি পর বিল ট্রেইসির বাড়ির পিছন থেকে ক্যানিয়ন ধরে দ্রুত চলে যেতে দেখল এক মেয়েকে। বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে মাথা নিচু করে রেখেছে মেয়েটা, নর্দমায় নেমে পার হলো, বাড়িগুলোর পিছনের উঠান পেরিয়ে বাঁক নিয়ে চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

মেইমি, আপন মনে বলল রন। ও মেইমি না হয়েই যায় না। ওভাবে দীর্ঘ পদক্ষেপে কখনও হাঁটতে দেখেনি আর কোনও মেয়েকে। বিল ট্রেইসির বাড়িতে কী করছিল মেইমি? একটা সময় ছিল যখন বিল ট্রেইসি শহরের বাজে দিকগুলোর বিষয়ে বিলাসী ছিল। ওই বিলাসী ভাব অর্থলোভীদের টেনে আনত তার জুয়ার টেবিলগুলোয়।

কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে কথা হওয়া দরকার, আপাতত মাথা থেকে মেইমিকে দূর করে দিল রন, দ্রুত হেঁটে পেরুল বিল ট্রেইসির বাড়িটা। এক সময় ওটা ওর আশ্রয় ছিল। পরে সময় করে বিল ট্রেইসির সঙ্গে

দেখা করবে, ঠিক করেছে ও।

হোটেলের লবিতে ঢুকতেই ওকে দেখে নিক হাওয়ার্ড বলল, ‘কয়েক মিনিট আগেও লিঁজা এখানে ছিল, তোমাকে খুঁজছিল। ওকে জানিয়েছি তুমি খনিতে গিয়ে থাকতে পারো, বা ডিপোতে যন্ত্রপাতি বুঝে নিচ্ছ হয়তো।’

মুদু গলায় হোটেল-মালিককে ধন্যবাদ দিল রন।

‘মিস মার্শল্যাওও তোমাকে খুঁজছে,’ জানাল হাওয়ার্ড। ‘যখনই ফেরো, জানাতে বলে দিয়েছে, তাকে তার ঘরে পাবে।’

‘আর কর্নেল?’

‘এই একটু আগে বুড়ো টমসনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল, বোধহয় ডিপোতেই গেছে দু’জন। ভেজা আবহাওয়া থেকে ভারী কিছু যন্ত্র সরানো দরকার, চিন্তিত হয়ে পড়েছিল বুড়ো টমসন।’

ঘুরে দাঁড়িয়ে লবি থেকে আবার বেরিয়ে এল রন। বনিলাস সেতু পেরুনোর সময় লক্ষ করল, ডেভ বেলের দোকানের সামনের বারান্দায় দু’জন পুরুষ ও একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সবার মনোযোগ গিয়ে পড়েছে হোগান্স অ্যালির দিকে।

গলিটার কাছাকাছি পৌঁছে রেল-রাস্তার মোড়ে কাদার ভিতর প্যাট্রিক টমসনকে পড়ে থাকতে দেখল রন। রানিং আয়ার্ন থেকে বাড়ির দিকে ও পর্যন্তই আসতে পেরেছে প্যাট্রিক টমসন। তার বুড়ো বাবা অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ছেলের পাশে। রনকে কাছিয়ে আসতে দেখে বুড়ো টমসনের ঠোঁটের দু’কোণে তিক্ততার কয়েকটা গভীর রেখা পড়ল।

‘যেতে পারো, সাহায্যের কোনও দরকার নেই আমার,’ বলল সে। ‘কর্নেল ডিপোতে গেছে।’

জিমি টমসনের কথার কোনও জবাব দিল না রন, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ডেভ বেলের দোকানের দিকে। বারান্দায় অন্য দর্শকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ব্যবসায়ী।

‘সাহায্যের কোনও দরকার নেই আমার,’ আবারও বলল জিমি টমসন।

এবারও জবাব দিল না রন, দু’কাঁধ ধরে প্যাট্রিক টমসনকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। পড়ে যেত পাঁড় মাতাল যুবক, রন ধরে থাকায় পড়ল না। চোখ মেলে ভুরু কুঁচকে কে তাকে তুলেছে দেখতে চাইল সে, না পেরে জড়ানো গলায় দুর্বোধ্য কী যেন বলল।

একটা কথাও না বলে রনের পাশে চলে এল জিমি টমসন, ছেলেকে বয়ে নিতে হাত লাগাল। দু’জন মিলে কিছু দূর বয়ে, খানিক টেনে টমসনের বাড়িতে নিয়ে গেল ওরা প্যাট্রিককে।

শোবার ঘরে মাতাল ছেলের ভেজা কাপড় বদলাতে বুড়োকে সাহায্য করল

রন, তারপর তাকে শুইয়ে দিল বিছানায়, কমলের নীচে ।

চুপ করে পড়ে থাকল প্যাট্রিক, বালিশের পটভূমিতে কুচকুচে কালো দেখাল তার ভেজা চুলগুলো । ঘন ঘন শ্বাস নিতে চাইছে সে, চেষ্টা করতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে ।

‘ঘুমালে ঠিক হয়ে যাবে,’ বলে রনকে নিয়ে সামনের ঘরে চলে এল জিমি টমসন । মেঝেতে পাতা পুরনো, ছেঁড়া কার্পেটের দিকে ভুরু কুঁচকে চাইল সে, আন মনে দু’হাত কচলাতে শুরু করেছে । ‘কোনওভাবে যদি মদের কাছ থেকে দূরে রাখতে পারতাম ওকে...’

‘যারা বিক্রি করে তাদের বলে দেখেছ, যাতে ওর কাছে বিক্রি না করে?’

মুখ তুলে চাইল টমসন, চেহারা দেখে মনে হলো ভুলেই গিয়েছিল রনের উপস্থিতি ।

‘ব্লেক হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল আমার কথা । রানিং আয়ার্ন তো ও-ই সলায় । ব্লেক বলেছিল, যদি দেখি ডেভ বেল প্যাট্রিকের কাছে সিল করা বোতলের মদ বিক্রি করছে না, বিল ট্রেইসির ওখানে গিয়ে গিলে আসছে না, বা মেইমি ওকে মদ দিচ্ছে না, তো সে নিজেও প্যাট্রিকের কাছে মদ বিক্রি করা বন্ধ করবে ।’

‘তারপর?’

‘ডেভ বেল আমার কথা শুনবে । আর আমি অনুরোধ করার পর থেকে একফোঁটা মদ প্যাট্রিকের কাছে বিক্রি করেনি বিল ট্রেইসি । আমি জানি ।’

‘আর মেইমি?’

রাগের ছাপ পড়ল বুড়োর চেহায়ায় । ‘কী বলতে চাইছ, রন! আমি তো আর ওই মেয়েলোকটার হাতে-পায়ে ধরতে পারি না, নাকি?’

‘তুমি যদি চাও তা হলে আমি ওকে বলে দেখতে পারি,’ দরজার কাছে চলে গেল রন, ‘মেইমি হয়তো আমার অনুরোধ রাখবে ।’

বুড়ো টমসন আবারও দুঃখিত চেহায়ায় ছেঁড়া কার্পেট দেখতে শুরু করেছে । আঙুঠে করে দরজা লাগিয়ে ঝাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল রন । রেল-রাস্তার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল ওর । মিনিট দুয়েক পর সজোরে সুইং ডোর খুলে রানিং আয়ার্নে ঢুকল ও, সোজা গিয়ে দাঁড়াল ফাঁকা বার-কাউন্টারের সামনে । মোটা এক লোক কাউন্টারের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘ব্লেক কোথায়?’

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল মোটা লোকটা । ভেজা, নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে শুরু করল কাউন্টার, নিজের ঘুরন্ত হাতের দিকে চেয়ে বলল, ‘আমিই ব্লেক । কীসের দরকার আমাকে? কার দরকার?’

‘আমি রন মার্লে,’ শান্ত গলায় বলল রন । ‘তোমার সেলুনটা বন্ধ করে দেব

আমি ।’

ধীরে ধীরে হাত ঘুরিয়ে মুছবার গতি কমাল ব্লেক, তারপর হাতটা স্থির করে চোখ তুলে চাইল রনের দিকে । নিচু গলায় বলল, ‘ও, তুমিই সেই লোক, যে খনি চালু করেছে ।’ আবার মুছতে শুরু করল সে কাউন্টার, কিন্তু চর্বির পিছনে তার চোখ দুটো সরল না রনের উপর থেকে । ‘তুমি হয়তো ক্লার্ক ফাওলের মত ফালতু লোকের সঙ্গে টক্কর দিয়ে জিততে পারো, কিন্তু আমার সঙ্গে কোনও বাড়াবাড়ি চলবে না ।’

‘চলবে । এই বিল্ডিংটা আমার ।’

কথাটা ভেবে দেখল ব্লেক, তারপর ন্যাকড়া থেকে মোটা হাতটা উঠিয়ে পিছনের বার হাতড়ে এক বোতল হুইস্কি ও দুটো গ্লাস নিয়ে কাউন্টারের উপর রাখল । ‘আরে ভাই, এসো একটু ড্রিন্ক করি আমরা । সে সঙ্গে আলাপও করা যাবে ।’

অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল রন । আড়ষ্ট গলায় বলল, ‘অন্য কোনও সময় । কোম্পানির কাছ থেকে রাড়িটা কেনার সময় তাদের এজেন্টের কাছে জেনেছি, আঠারো মাস ভাড়া দাও না তুমি ।’

চোখদুটো একটু বড় হলো ব্লেকের । ‘কেউ তোমাকে মিথ্যে বলেছে, মিস্টার মার্লো । নিয়মিত ভাড়া দিই আমি ।’

‘কাকে ভাড়া দাও?’

‘ক্লিভ হেস্টিংসকে— আর কাকে?’ রনের দিকে চোখ পিটপিট করে চাইল ব্লেক । ‘ইউনাইটেড যদি আঠারো মাস ধরে ভাড়া না পেয়ে থাকে, তো দায়ী হবে কে?’

‘সেটা তুমিই ভেবে দেখো ।’

মলিনতার ছাপ পড়ল ব্লেকের চেহারায় । নিচু গলায় বলল, ‘ভাড়া পেতে যাবে তুমি ।’

‘মনে হয় না তোমার টাকা আমি নিতে চাইব ।’

ভুরু উঁচু করল ব্লেক । ‘মানে?’

‘মদ গিলে নিজেকে সামলাতে পারে না এমন লোকের কাছে যে মদ বিক্রি করে, তার ব্যাপারে কোনও সহানুভূতি নেই আমার ।’

উপলব্ধির ছাপ পড়ল ব্লেকের হোঁৎকা চেহারায় । ‘তুমি একটু আগে স্কট টমসনের সঙ্গে কথা বলছিলে ।’ একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘ব্যস্ত করতে নেমেছি আমি... তারপরও, ঠিক আছে, একজন কাস্টমার কমলে মন্দ না আমি । কথা দিচ্ছি, প্যাট্রিকের কাছে আর মদ বিক্রি করব না ।’ গোল মাথট নাড়ল সে । ‘তবে অনেক দেরি হয়ে গেছে । অ্যালকোহলিক হয়ে গেছে । এক ভাবে না এক ভাবে ঠিকই মদ জোগাড় করবে প্যাট্রিক ।’ ন্যাকড়াটা তুলে নিয়ে

রনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘মেইমির ব্যাপারটা কী হবে?’

‘প্যাট্রিকের কাছে কিছুই বিক্রি করবে না ও।’

‘খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বললে, মিস্টার মার্লো।’

‘কারণ আছে তার,’ বলে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল রন। কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি জানানো খুব জরুরি, আরও অনেক টাকা জোগাড় করতে হবে, কিন্তু লিজার কথা মনে করে দ্রুত পায়ে ডিপোর উল্টোদিকে ব্রেকম্যানের হোটেলে গিয়ে ঢুকল ও। খবরের কাগজ নিয়ে যখন এখানে আসত, তখনকার স্মৃতি মনে পড়ল।

কাউন্টারের পিছনে বসা লোকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল, ওকে হনহন করে হাঁটতে দেখে নরম সাদা হাতদুটো নেড়ে আপত্তি জানাতে শুরু করল, সে সঙ্গে ঘুমজড়ানো মেয়েলি গলায় থামতে বলল বারবার।

ভুরুক্ষেপ না করে সোজা মেইমির দরজার সামনে গিয়ে থামল রন, জোরে জোরে টাকা দিল দরজায়। প্যানেলের ওপাশে পায়ের মৃদু শব্দ এগিয়ে আসতে শুনল, তারপর কয়েক ইঞ্চি খুলে গেল দরজা, উঁকি দিল মেইমি।

মেইমিকে স্পষ্ট মনে আছে রনের। অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলা। শহর-নিয়ন্ত্রকদের পাড়ায় বড় বড় বাড়িতে ডিয়ান হেস্টিংসের মত যেসব বড়লোকরা থাকত, তাদের তুলনায় পিস্তল ফ্ল্যাটের সমাজে ওর নিজ অবস্থান ছিল মেইমির কাছাকাছি। কিন্তু আজকে, এত দিন পর দেখে সে দিনের মেইমির সঙ্গে আজকের মেইমির বিস্তর পার্থক্য খুঁজে পেল ও।

গড়িয়ে যাওয়া বছরগুলো অনেকটাই ধসিয়ে দিয়েছে মেইমিকে। মেয়েটির চোখের নীচে ও চিবুকের তলায় চামড়া ঝুলতে দেখল রন। ফুলে আছে উপরের ঠোঁট, নীচের ঠোঁটের চেয়ে অস্বাভাবিক ভাবে সামনে বেড়ে আছে।

‘ক্লার্ক এখানে নেই,’ ভোঁতা গলায় বলল মেইমি।

‘ওকে যত কম দেখি ততই ভাল বোধ করব,’ গম্ভীর শোনাগল রনের গলা, মেয়েটার কথা থেকে অনেক কিছুই আন্দাজ করছে। মেইমির চেহারায় পরিবর্তন আসতে দেখল। মেয়েটা কী না কী ভেবে বসবে চিন্তা করে দ্রুত বলল, ‘প্যাট্রিক টমসনের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম।’

চুপ করে থাকল মেইমি, মাথাটা একটু সামনে ঝোঁকাল। উঁচু হয়ে উঠল পেন্সিল দিয়ে আঁকা নকল ভুরু দুটো। রনের বক্তব্য শুনবার জন্য অপেক্ষা করছে। একটু যেন হতাশও হয়েছে। কেন? ধাঁধায় পড়ে গেল রন, তবে শান্ত গলায় বলল, ‘রেক, ডেভ বেল, বিল ট্রেইসি— কেউ আর হুইস্কি বিক্রি করবে না প্যাট্রিকের কাছে। আমি চাই তুমিও ওকে ফিরিয়ে দাও এখান থেকে।’

চুপ করেই থাকল মেইমি। এবার যেন রনের অপেক্ষার পালা। রনকে অস্বস্তিতে ভুগতে দেখে শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল মেইমি, ‘বিপদের সময় বেশ কিছু

দিন খরচাপাতি দিয়ে আমাদের চালিয়ে নিয়েছে প্যাট্রিক টমসন। পুরনো একজন বন্ধুকে এখন ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।’

নরম গলায় বলল রন, ‘মেইমি, ইউনাইটেড ফেডারালের সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে এই বাড়িটাও আমি কিনেছি।’

চুপ করে দাঁড়িয়ে রনের দিকে চেয়ে রইল মেইমি, তারপর বলল, ‘আমার পুরনো খবরের কাগজওয়ালা সত্যিই উন্নতি করেছে।’ কণ্ঠস্বর ভীক্ষা হয়ে উঠল মেয়েটার, ‘কিন্তু এই বাড়ির মালিক ক্লিভ হেস্টিংস। আমাকে না জানিয়ে বাড়িটা বিক্রি করবে না কিছুতেই। করলে আমি জানতাম। অনেক দিন ধরে আমার ব্যবসার লাভ থেকে একটা অংশ নেয় সে।’

ধৈর্যের সঙ্গে মাথা নাড়ল রন। ‘ইউনাইটেড ফেডারালের অ্যাটর্নিরা জানে না বাড়িটা এখনও খালি হয়নি।’

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত রনের দিকে অপলক চেয়ে রইল মেইমি, চোখের ভাষায় অব্যক্ত বেদনা। নিজেকে যেন গুটিয়ে নিল, তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘ও। ...কী করতে বলো তুমি আমাকে?’

‘প্যাট্রিককে আর ঢুকতে দিয়ো না এখানে।’

‘ওকে ঠেকাব কী করে? ও... ও আমার একটা মেয়েকে পছন্দ করে। তা ছাড়া, ওকে ঢুকতে না দিলেও কোনও লাভ হবে না, ও যেভাবে মদের নেশায় ডুবেছে, মদ জোগাড় করার জন্যে মিথ্যে বলা, লোক ঠকানো, চুরি— এমনকী খুন করতেও বাধবে না ওর।’

এবার রনের গলায় সামান্য কাঠিন্য প্রকাশ পেল: ‘আমি যদি জানতে পারি প্যাট্রিক টমসন আবারও এখানে এসেছে, রেইলরোড অ্যাভিনিউতে তোমাকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হবো আমি, মেইমি। এ-বাড়ির দরজায় তখন বড়সড় একটা তালা ঝুলবে।’

‘সত্যি তুমি ক্লিভ হেস্টিংসের সঙ্গে বিরোধে যাবে?’

‘যাব।’

‘ঠিক আছে,’ সামান্য দ্বিধা করে বলল মেইমি, ‘টমসনকে ঢুকতে দেব না আমি। তবে ঝামেলা করবে ও। কোথাও না কোথাও কোনও অঘটন বাধাবে।’ পাশ ফিরে আবার সোজা হলো মেইমি। ‘রন, জানি না তুমি কী করেছ ক্লার্ক ফাওলের সঙ্গে, কিন্তু তোমার ওপর ভীষণ খেপে আছে। সাবধান থেকে। ওর পক্ষে দুনিয়ার সমস্ত খারাপ কাজ করা সম্ভব।’ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর পা বাড়াল মেইমি।

‘ধন্যবাদ, মেইমি,’ মেয়েটার পিছনে বলল রন, তারপর হাত বাড়িয়ে আস্তে করে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

রেল-রাস্তায় বেরিয়ে ঝড়ো বাতাসের পুরো তাণ্ডব মোকাবিলা করতে হলো

ওকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগার বের করল, হাত দিয়ে বাতাস আড়াল করে সিগার ধরাল। ম্যাচের কাঠিটা ফেলে দিয়ে বারান্দা থেকে নামতেই শুনতে পেল লিজার গলা, ওকেই ডাকছে।

দু'জন মুখোমুখি হওয়ার পর ঘন ঘন শ্বাসের ফাঁকে লিজা বলল, 'সবখানে খুঁজেছি তোমাকে।' চোখদুটো হঠাৎ বড় হয়ে উঠল ওর, রনের কাঁধের উপর দিয়ে ব্রেকম্যানের জীর্ণ লবির দিকে চাইল। 'ভাবিনি কখনও এখান থেকে তোমাকে বেরুতে দেখব।'

মুখ থেকে সিগারটা নামাল রন, মৃদু হাসল। 'ব্যবসার কাজে মানুষকে কখনও কখনও অদ্ভুত সব জায়গায় যেতে হয়, লিজা।'

কথা বাড়াল না লিজা। মাথা জুড়ে আছে ওর অন্য চিন্তা। বলল, 'রন, বাবাকেও কোথাও পাচ্ছি না। কয়েক মিনিট আগে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম, ওখানে নেই বাবা।'

'না থাকাটা কি অস্বাভাবিক?'

'এক্ষেত্রে, হ্যাঁ। ক্লার্ক ফাওলের সঙ্গে তোমার বা আমার যা ঘটেছে, তার কিছুই বাবাকে জানাইনি। যতদূর জানি ব্যাপারটা অন্য কারও কাছ থেকেও শোনেনি বাবা। কিন্তু ব্রামবৌ জিমের কাছে শুনলাম, তাস বাটার ফাঁকে একবার বেরিয়ে মেইমিকে দেখেছে ও। আমাদের বাড়ির পেছনের উঠানে ঢুকে বাবাকে আমার কোটটা দিয়েছে মেইমি...' থেমে বড় করে দম নিল লিজা, তারপর বলল, 'ক্লার্ক যখন আমার সুটকেসে ওপিয়াম ভরে, তখন সুটকেস থেকে কিছু না কিছু বের করতে হয়েছিল তাকে। আমার কোট সরিয়ে ফেলে ক্লার্ক। বোধহয় ওটা মেইমিকে দিয়েছিল। জানি না বাবাকে ওটা কেন ফিরিয়ে দিয়েছে মেইমি, কিন্তু ব্রামবৌর কাছে শুনলাম, বহুদিন পর বাবাকে অস্বাভাবিক একটা কাজ করতে দেখেছে সে— ঘরে ঢুকে বারের পেছন থেকে গানবেল্ট-হোলস্টার নিয়ে পরেছে বাবা, তারপর একটা কথাও না বলে বেরিয়ে চলে গেছে। ভয় লাগছে, বাবা বোধহয় ক্লার্ক ফাওলকে খুঁজতে বেরিয়েছে।'

কথাগুলো চিন্তা করে দেখে বলল রন, 'তুমি বোধহয় অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছ, লিজা। তুমিই তো বলেছ, ক্লার্ক ফাওলের শয়তানি সম্বন্ধে কিছুই জানে না তোমার বাবা। কোথাও খুঁজতে যাওয়ার আগে চলো মেইমির কাছ থেকে জেনে নিই কী বলেছে মিস্টার ট্রেইসিকে।' কথাগুলো বলে ওর মনে পড়ল মেইমির সতর্কবাণী। রনের মন বলল, মেইমি শুধু শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে কথাগুলো বলেনি ওকে, বলেছে সম্ভবত নিজের গর্বে আঘাত লাগায়— ক্লার্ক ফাওলের উপর প্রচণ্ড রেগে আছে মেইমি।

লিজার বাহুতে হাত রেখে ব্রেকম্যানের লবিতে ঢুকবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও ডিপোর প্ল্যাটফর্মে একটা-নড়াচড়া দেখতে পেয়ে থামল ও।

ডিপোর দিকে খেয়াল করেনি লিজা; ও বলল, ‘বাবাকে আমি বলিনি মানেই এই নয় যে বাবা জানে না। চুপচাপ মানুষ, হয়তো জেনেও আমার কাছে প্রকাশ করেনি।’

ডিপোর শেষমাথা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ডকের উপর উঠেছে ক্লিভ হেস্টিংস, ধীর পায়ে চলেছে হলুদ বাল্টিংটার দিকে। রনের মনে হলো, কোনও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ওদিকে যাচ্ছে লোকটা। লিজাকে ও বলল, ‘একা যেতে যদি ভয় না পাও, মেইমিকে জিজ্ঞেস কোরো মিস্টার ট্রেইসিকে কী বলেছে, জরুরি একটা কাজে এক্ষুনি ডিপোতে যেতে হচ্ছে আমাকে। একটু পর চলে আসব।’

আহত ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল লিজার হতাশ চোখদুটো থেকে, আড়ষ্ট গলায় লিজা বলল, ‘বাবাকে সাহায্য করার তুলনায় তুমি যদি অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকো, তো ভয় পাব কেন! ছোটবেলা থেকে মেইমিকে চিনি আমি।’ থুতনি উঁচু করে দ্রুত পায়ে ব্রেকম্যানের লবিতে ঢুকে গেল লিজা।

ওর পিছনে জোরে বন্ধ হলো দরজাটা।

রেল-রাস্তার দিকে ফিরে চাইল রন। হাতটা আপনাআপনি চাপড় মারল উরুতে। মনে মনে বলল, সিন্ধুগান নিয়ে বেরুনো উচিত ছিল। এটা নিউ ইয়র্ক নয়!

রেল-রাস্তার কাদায় নেমে ক্লার্ক ফাওলকে দেখতে পেল রন, হোগানের গলি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে ডিপোর দিকে। কাঁধের উপর দিয়ে একবার পিছনে চাইল লোকটা।

ক্লিভ হেস্টিংসকে দেখা গেল না কোথাও।

লোডিং প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ওয়েইটিং রুম পাশ কাটিয়ে ক্লার্ক ফাওলকে দালানের কোনা ঘুরতে দেখল রন। ওকে খেয়াল করেনি ফাওল।

কী ঘটছে ভেবে দেখল রন। ওর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ঠিক এভাবেই সৈন্যদের খেলিয়ে কানাগলিতে নিয়ে যায় অ্যাপাচি যোদ্ধারা। রেল-সড়ক পেরুনের পর হাঁটবার গতি কমাল রন, ওর সন্দেহ সত্যি কি না দেখতে অপেক্ষায় থাকল।

এক মিনিট পর হোগানের গলি থেকে দৃঢ়পায়ে বেরিয়ে এল বিল ট্রেইসি। রাস্তার এমাথা-ওমাথায় চোখ বোলাল, রনকে এক পলক দেখে আবার এগোল, আড়াআড়ি ভাবে ডিপোর দিকেই যাচ্ছে।

দ্রুত চলে দু’জনের মাঝের দূরত্ব কমিয়ে ফেলল রন, পানি ঝরানো কটনউড গাছগুলোর তলা দিয়ে এমন এক পথ তৈরি করে হাঁটছে, ডিপোর ওয়েইটিং রুমের কাছাকাছি গিয়ে জুয়াড়ীর সামান্য আগে পৌঁছবে ও।

দিনটা আরও ধূসর হয়ে গেছে। শীতও বেড়েছে বেশ। বাতাসে এটা-ওটা

নড়ে নানা শব্দ হচ্ছে, কোনটা কীসের, বোঝা শক্ত। আওয়াজগুলো কী সেই পুরনো পিস্তল ফ্ল্যাট শহরের, যেখানে প্রতি দিন বন্দুকযুদ্ধে মরত অন্তত একজন মানুষ?

ওয়েইটিং রুমের দরজার কাছে পৌছে গেল রন, পিছনে স্পষ্ট শুনতে পেল কাদার ভিতর বিল ট্রেইসির নিশ্চিত পা ফেলবার শব্দ।

কাঁধের উপর দিয়ে নিচু গলায় রন বলল, 'ঘুরপথে যাও, মিস্টার ট্রেইসি।' মনে মনে আশা করল, ওঁৎ পেতে কেউ বসে থাকলে বিপরীত দিক থেকে বয়ে আসা বাতাসে ওর কণ্ঠ শুনতে পাবে না সে।

এবার দরজা খুলে অঙ্ককারাচ্ছন্ন ওয়েইটিং রুমের ভিতরে উঁকি দিল ও। প্র্যাটফর্মে যাওয়ার খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে ক্লিভ হেস্টিংসকে কী যেন বোঝাচ্ছে জ্যাক ওয়েড। তার কথার শেষ অংশ শুনতে পেল রন।

'...অনেকদিন পর এখানে স্পেশাল ট্রেইন এল... জংশনে গাড়ি বোঝাই জর্জ ব্রাউনের ঘোড়া নিয়ে যাব আমরা, বদলে ওখান থেকে নিয়ে আসব খনির যন্ত্রপাতি, মজুর বা... হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাওয়ার পথ নাকি খুঁজে পেয়েছে জর্জ ব্রাউন... তারপর স্পেশাল ট্রেইন আবারও আসবে, শিডিউল বলে আর কিছু থাকছে না... স্মেলটার, খনি আর মিল-এর যন্ত্রপাতি এত বেশি আসছে যে সরিয়ে কূল পাচ্ছি না আমরা...'

হঠাৎ কথা থামিয়ে হেস্টিংসের উদ্দেশ্যে মাথা দোলাল ওয়েড, কৌতূহলী চোখে রনকে দেখে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। তার পিছনে দরজাটা বন্ধ হওয়ার আগে ভেসে এল প্র্যাটফর্মে দাঁড়ানো রেল ইঞ্জিনের হাঁপানোর শব্দ, একপাশ খোলা বগিতে ওঠানো গরুগুলোর প্রতিবাদ।

ঘরে ঢুকে ক্লিভ হেস্টিংসের মুখোমুখি হলো রন। দু'জন দাঁড়িয়ে আছে দুই দরজার দিকে পিঠ দিয়ে। হেস্টিংসের সঙ্গে রনের দূরত্ব ঠিক তেইশ ফুট। ব্যবধানটা ভরে আছে সারাজীবনের অপছন্দের মনোভাবে।

হেস্টিংসের চেহারা থেকে বিস্ময়ের ছাপ ফুটেই মিলিয়ে গেল। ধীর পায়ে রনকে আসতে দেখছে সে, তারপর দু'পা ফাঁক করে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়াল। ট্রাউজার্সের ওয়েইস্টব্যাণ্ডের ভিতর দু'হাতের বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে বিরাট বপুর নীচে টেনে নামাল ট্রাউজার্স। বেশ নীচে কাত হয়ে ঝুলছে তার গানবেল্ট, হোলস্টারে ভরা সিঙ্কগানটা উরুর পাশে, আরও নীচে।

প্র্যাটফর্মের দরজা দিয়ে এক মিনিট আগে বেরিয়ে গেছে জ্যাক ওয়েড, হঠাৎ ওই দরজা খুলে ছিটকে ভিতরে ঢুকল ক্লার্ক ফাওল। রিভলভারটা হোলস্টারে আলগা ভাবে পোরা ছিল, রনকে দেখে তালুর ধাক্কায় অন্তটা হোলস্টারের ভিতর ভালমত গুঁজল।

ক্লিভ হেস্টিংসের ভারী চেহারায়া রাগ-ক্ষোভের মিশ্র ছাপ পড়ল। গলার

গভীর থেকে উঠে এল ঘড়ঘড় একটা চাপা শব্দ।

এক পাশে সরে ক্লার্ক ফাওল এবং নিজের মধ্যে হেস্টিংসকে রাখল রন। স্বাভাবিক গলায় বলল, ‘তুমি খনি থেকে তামা চুরি করেছে, হেস্টিংস। ইউনাইটেড ফেডারালের প্রাপ্য ভাড়াও মেরে দিয়েছ। কিন্তু কখনও ভাবতে পারিনি বিল ট্রেইসিকে ফাঁদে ফেলে খুন করতে চাইবে।’

ধরা পড়া অপরাধীর অন্যায় রাগ প্রকাশ পেল হেস্টিংসের চেহারায়ে। লাল হয়ে উঠল সে।

এক পাশ ফিরে ডানহাত ঘুরিয়ে হেস্টিংসের চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি মারল রন। প্রকাণ্ডদেহী বলেই হয়তো হেস্টিংস ধীর, সরতে পারল না, চোয়ালের হাড়ের উপর প্রচণ্ড ঘুসিটা হজম করতে হলো তাকে।

মুঠির হাড় থেকে কাঁধ পর্যন্ত ব্যথায় বনবন করে উঠল রনের।

মাথা ঝাড়া দিয়ে উন্মত্তের মত পাল্টা হাত চালাল হেস্টিংস। নিচু হয়ে সরে গেল রন, তারপরও ওর মাথার তালুতে ঘষা খেল হেস্টিংসের মুঠো। ব্যথাটা এমনই, রনের মনে হলো দেবে যাওয়া খুলি গাঁথে গেছে মগজে, সে সঙ্গে ভেঙে গেছে ঘাড়। নিজেকে কংক্রিটের মেঝেতে ছয় ইঞ্চি গাঁথে যাওয়া মানুষ বলে মনে হলো ওর। তাড়াহুড়ো করে পিছু হটল রন, ওর শোল্ডার ব্রেড ধাক্কা খেল দেয়ালে। তবে ঝট করে সরে গেল ওখান থেকে, নইলে ওর পেট ফাটিয়ে দিত ক্লিভ হেস্টিংসের সবুট লাথি।

পড়ো বার্নের দেয়াল যেভাবে ধসে পড়ে, সেভাবে হুড়মুড় করে সামনে বাড়ল ক্লিভ হেস্টিংস। একবার অপ্রস্তুত রন মার্লোকে নাগালের ভিতর পেলে ঘুসিয়ে ভর্তা বানাতে দেরি হবে না তার।

দ্রুত বামপাশে সরল রন, কাঁধের জোরে পর পর দু’বার ঘুসি মারল হেস্টিংসের পেটে। রনের বামহাতের মুঠো ঘষা খেল মার্শালের গানবেল্টের ধাতব বাকলে। ডানহাতি ঘুসিটা লাগল আরও উপরে—কজি পর্যন্ত ডেবে গেল রনের। হুউউশ করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল হেস্টিংসের পেট থেকে, দু’ভাঁজ হয়ে গেল সে ব্যথায়।

দানবটাকে মোকাবিলা করা সম্ভব। সম্ভব ওটাকে হারিয়ে দেয়া।

চোখের কোণে প্ল্যাটফর্মের দরজা খুলে যেতে দেখল রন। ক্লার্ক ফাওল গিয়ে ওর উপর আক্রমণ শানাতে চেষ্টা করছিল, এক লাফে তার পিছনে চলে গেল বিল ট্রেইসি। পরেরবার রন যখন ওদিকে চাইল, দেখল খুঁটির মত সোজা হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে ডেপুটি শেরিফ, হোলস্টার থেকে উদ্ধাও হয়েছে তার রিভলভার।

ডানহাত পিছনে নিয়ে গায়ের জোরে ঘুসি মারল হেস্টিংস। ওটা এড়াতে সরে গেল রন, আর ঠিক তখনই হেস্টিংসের বাঁ হাতি ঘুসি পড়ল ওর পাজরের

উপর। পিছলে গিয়ে বেসামান্ন হয়ে ঘর ছেড়ে হল-এ বেরিয়ে গেল রন।

তাড়া করে এল হেস্টিংস। তাকে দু'ফুটের ভিতর আসতে দিল রন— সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যে, দ্রুত সরে গেল একপাশে, দু'হাত এক করে মুণ্ডরের মত ঘুরিয়ে মেরে বসল লোকটার কানের পিছনের হাড়িডতে।

থামবার সুযোগ পেল না ক্লিভ হেস্টিংস, তার নিজের গতির সঙ্গে যোগ দিল রনের আঘাত, ধূপ করে দেয়ালে বাড়ি খেল তার মাথা। ঘরের ভিতর তার মাথার সঙ্গে দেয়ালের সংঘর্ষের আওয়াজটা শোনাৎল পাকা তরমুজে লাঠির বাড়ির শব্দের মত। দেয়ালের রক্ষ প্লাস্টারে লেগে ছড়ে গেল লোকটার চিবুক।

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল হেস্টিংস। সামলে নেয়ার কোনও সুযোগ দিল না রন, এগিয়েই মুঠি করে ধরল হেস্টিংসের তেলতেলে চুল, বিন্দুমাত্র দয়া না করে মাথাটা বারকয়েক জোরে জোরে ঠুকে দিল দেয়ালের সঙ্গে।

বিবশ হয়ে গিয়েও আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদ আছে, ঘুরে বসে ধাক্কা দিয়ে রনকে সরিয়ে দিতে চাইল ক্লিভ হেস্টিংস। সরল না রন, সামনে ঝুঁকে একের পর এক ঘুসি মারতে শুরু করল আধবসা হেস্টিংসের মুখে। এক মিনিট পেরুনের আগেই প্রকাণ্ড মুখটা রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল দানবের।

একটু পিছিয়ে হেস্টিংসের লম্বা হাতদুটোর আওতার বাইরে থাকল রন, দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করল এবার। যেন অসাড় হয়ে গেছে ওর দু'হাত। শত্রু মোকাবিলা করতে হলে ওগুলোতে সাড়া ফিরে পাওয়া উচিত।

হঠাৎ সামনে ঝুঁকল ক্লিভ হেস্টিংস, তারপর মুখ খুবড়ে মেঝেতে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে অজ্ঞান লোকটার দিকে চাইল রন। কান ভোঁ-ভোঁ করছে ওর, সেই ওজনের মাঝ দিয়ে বিল ট্রেইসির গলা শুনতে পেল। 'এবার হয়তো তোমার বলার সময় হয়েছে লিজার কোট মেইমির কাছে কীভাবে গেল, ক্লার্ক।'।

বাইরে প্ল্যাটফর্মে রেল-ইঞ্জিনের পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে রেললাইন দেখাল জ্যাক ওয়েড। জবাবে হুইসল বাজাল ড্রাইভার, কুউ-কুউ শব্দ তুলল। একটু পরেই রওনা হবে রেলগাড়িটা।

ইঞ্জিনের ফোঁস-ফোঁস আওয়াজের উপর দিয়ে আড়ষ্ট, কাঁপা গলায় বলল জুয়াড়ী, 'শুয়ারের বাচ্চা... কী ভেবেছিলি?' সিক্সগানটা সজোরে ক্লার্ক ফাওলের মাথার পাশে নামিয়ে আনল সে।

টলমল করতে করতে দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেল ফাওল। খুলে গেল দরজা, প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে ধূপ করে পড়ে গেল সে। পড়েই থাকল, উঠবার কোনও চেষ্টা করল না। চোখে ভয় নিয়ে দেখল বিল ট্রেইসির নির্মূর হাসি।

'একটা সুযোগ দিচ্ছি তোকে, কুকুরের বাচ্চা ক্লার্ক। ট্রেইনটা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।' সিক্সগান তুলে নলটা ক্লার্ক ফাওলের বুকে তাক করল বিল

ট্রেইসি।

মেরুদণ্ডের হাড়গুলো বরফ দিয়ে তৈরি বলে মনে হলো ফাওলের, কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল সে, তারপর কুঁজো হয়ে দৌড় দিল পিছন বগিটার দিকে। হেলেদুলে রওনা হয়ে গেল রেলগাড়ি।

বগির দরজায় জ্যাক ওয়েডকে দেখা গেল, হাঁ করে চেয়ে আছে সে বিল ট্রেইসির দিকে।

সিন্ধুগানটা তুলল ট্রেইসি, তাক না করেই গুলি করল। ছুটন্ত ফাওলের এক ফুট সামনে কাঠের কুচি ছিটিয়ে প্ল্যাটফর্মে গাঁথল বুলেট।

বৃষ্টিতে ভেজা বড় বড় কিছু যন্ত্রের সামনে দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছিল কর্নেল মার্শল্যাণ্ড, গুলির আওয়াজে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর দু' সেকেন্ড পেরুনোর আগেই আলাপ ভুলে বিরাট বিরাট লাফে যন্ত্রপাতির আড়াল নিল তিনজন।

কিন্তু ফাওলের লাফটাই সবচেয়ে বিরাট, ছুটন্ত রেলগাড়ির শেষ বগির পাশ থেকে লাফ দিয়ে দক্ষ বাঁদরের মত রেলিং ধরে ফেলল সে, তারপর রেলিং টপকে হুড়মুড় করে পড়ে গেল পিছন প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে। পড়েই উঠে দাঁড়াল আবার। সঙ্গে সঙ্গে বগির পিছন-দেয়ালে গুলি করল বিল ট্রেইসি। বসে পড়ে তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে বগির দরজার দিকে চলল ফাওল। ততক্ষণে বুদ্ধিমানের মত দরজা থেকে অদৃশ্য হয়েছে জ্যাক ওয়েড।

রেলগাড়িটা দূরে চলে যেতেই নীরবতা যেন চেপে বসল ডিপোতে, তারপর রেল-রাস্তায় শোনা গেল মানুষের উত্তেজিত কথার আওয়াজ। ওয়েইটিং রুমের ভিতর কয়েক পা এগোল ট্রেইসি, রনকে বলল, 'রন, মনে হয় না কখনও আর ফিরবে ক্লার্ক।'

রেইলরোড অ্যাভিনিউর দিকে ওয়েইটিং রুমের যে দরজাটা আছে, সেটা খুলে গেল, ছুটে ভিতরে ঢুকল লিজা। চেহারা একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে বলতে ঠিক একই সময় প্ল্যাটফর্মের দিকের দরজা দিয়ে ঢুকল কর্নেল মার্শল্যাণ্ড।

রনকে দেখেই থমকে দাঁড়াল লিজা, রাগী স্বরে বলল, 'তুমি আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে... তুমি! তুমি!' রাগের কারণে আর কিছু বলতে পারল না, একবার মাত্র অনড় ক্লিভ হেস্টিংসের দিকে চেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল বাবার সামনে।

মাত্র জ্ঞান ফিরতে শুরু করেছে দানবের। অল্প অল্প গোঙাচ্ছে সে, নড়ছে।

মেয়ের কাঁধে হাত রেখে রাছে টানল বিল ট্রেইসি, নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'যাচ্ছ কোথাও?'

'আসছিলাম বেঁচে আছো না মরে গেছ তা দেখতে।' লিজার বলবার হালকা

ভঙ্গি এমনই, মনে হয় রাতের খাবারের পর কৌতুককর কিছু বলল। কিন্তু রন ঠিকই বুঝল, কী পরিমাণ দুশ্চিন্তা লুকিয়ে আছে ওই নির্লিপ্ত ভাবের আড়ালে।

‘সশরীরে এখনও বিদ্যমান,’ হাসল বিল ট্রেইসি। রনকে দেখাল। ‘হেস্টিংসকে ব্যস্ত রেখেছিল রন, সে সঙ্গে আগ্রহী করে তুলেছিল ফাওলকে, আর আমি সে সুযোগে ফাওলের পেছনে চলে আসি। ওর অস্ত্র ওর পিঠে ধরেছিলাম।’

ধীরে ধীরে উঠে বসল ক্লিভ হেস্টিংস, এদিক-ওদিক চাইল। চোখে ফাঁকা দৃষ্টি।

রনের দিকে চাইল লিজা, নিচু গলায় বলল, ‘আমার মত তুমিও ক্লিভকে চেনো, রন। আজ যা হলো সেটার প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে সে।’

আট

পরদিন ভোর এল পুবাকাশে রক্তলাল ছোপ নিয়ে। ঘুম থেকে জেগে ঘরের ভিতর উজ্জ্বল সূর্যালোক দেখল রন। কিন্তু একটু পরে ঘন মেঘের আড়ালে আবার মুখ লুকাল সূর্য, নতুন করে গুরু হয়ে গেল বৃষ্টি।

ব্যায়ামপুষ্টি পেটা শরীরে শার্ট চাপানোর সময় জানালা দিয়ে বাইরে চাইল রন। রাস্তাটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। রেল-রাস্তাকে যেখানে আড়াআড়ি ভাবে কেটেছে গভীর নালা, সে-জায়গাটা পার করে ধূসর রঙের ল্যাংড়া এক ঘোড়া টেনে আসছে হালকা এক ক্যারিঅল। ক্যারিঅলের উঁচু চাকার স্পোকগুলোর মাঝ দিয়ে ফেনা তুলে ছুটে যাচ্ছে কাদাটে পানি।

এলাকার প্রত্যন্ত কোথাও থেকে একযোগে এসে হাজির হলো রেইনকোট পরা বারোজন অশ্বারোহী। জর্জ ব্রাউনের হয়ে যারা ফাঁদ পেতে ঘোড়া ধরবে, এরাই তারা, আঁচ করল রন।

বিল ট্রেইসির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল লিজা, হেঁটে চলে গেল বিন-এর পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে, তারপর ভিতরে ঢুকল।

বসে থাকার মেয়ে নয়, আপনমনে বলল রন। ভবিষ্যৎ দেখে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করার বুদ্ধিও রাখে লিজা। আমি কি রাখি?

চিন্তাটা মাথায় আসতেই ব্যাগ খুলে .৪৪ কোল্ট ভরা হোলস্টার বের করল রন, ওটার লুপের ভিতর দিয়ে বোল্ট ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে নিল। অস্ত্রটার পরিচিত

ওজন মনে স্বস্তির একটা ভাব এনে দিল।

ঘর ছেড়ে লবিতে এসে নিক হাওয়ার্ড ও কর্নেল মার্শল্যাণ্ডকে দেখতে পেল, কথা বলছে দু'জন। রনের কোন্ট লক্ষ করল কর্নেল, তবে এ-ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করল না, মাথা কাত করে হাওয়ার্ডকে দেখাল। 'মিস্টার হাওয়ার্ডের কাছে জিজ্ঞেস করছিলাম এদিকে এরকম বৃষ্টি সবসময় লেগেই থাকে কি না।'

'মাঝে মাঝেই একটানা এক সপ্তাহও বৃষ্টি হয়,' বলল রন। 'খরার পর বৃষ্টি এখন সবাই চাইছে। বিশেষ করে গরু-ব্যবসায়ীরা।'

'রেকের রানিং আয়ার্ন বৃষ্টির পুরো সময়টা ভাল ব্যবসা করবে,' বলল নিক হাওয়ার্ড। 'যাদের একটা গরুও আছে, তারাও খুশিমনে ড্রিঙ্ক করবে এ-বছরের বাছুরগুলোর স্বাস্থ্য কামনা করে।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সাই দিল রন, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'নিক, ডেভ বেল কি ঋণ দেবে এমন কোনও আভাস দিয়েছে?'

'আমাকে অন্তত দেয়নি,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল নিক হাওয়ার্ড। 'তোমাদের হতাশ করতে চাই না, কিন্তু না বলে পারছি না, যদি অন্য কোথাও থেকে টাকা জোগাড় করতে পারো, সেটাই তোমাদের জন্যে ভাল। ডেভ বেল ঘাড়-ত্যাড়া লোক।'

'আর তুমি কী করবে ভাবছ?'

খানিক অনিশ্চয়তায় ভুগল হাওয়ার্ড। 'ডেভ বেল চালাক মানুষও, রন। এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি আমি।'

অর্ধেক ভাবে নাক দিয়ে শব্দ করল মার্শল্যাণ্ড। 'মানুষের কী কী দরকার? ডেভ বেল বা তুমি বুঝ না এ-শহরের উন্নতির সম্ভাবনা পুরোপুরি জড়িয়ে আছে ওই খনির সঙ্গে? সেই সঙ্গে তোমাদের ভাগ্যও।'

'খনির একটা অংশ চাইছে ডেভ বেল,' কর্নেলকে মনে করিয়ে দিল রন।

'রক্ত!' রেগে দিয়ে বলল মার্শল্যাণ্ড, 'আমাদের রক্ত চাইছে ও!'

'ড্যাভি!' ঘুরে চেয়ে ওরা দেখল, আসছে মিশেল মার্শল্যাণ্ড। 'টাকা জোগাড় করা তো রনের কাজ, তা-ই না?'

তরুণীর দিকে হেঁটে গেল রন। শীঘ্রি এই দেবীসুলভ সোনালী সৌন্দর্য একান্ত ওর নিজের হবে। ঋণিকের জন্য আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগতে হলো ওকে। চোখের সামনে যেন দেখতে পেল লিজা ট্রেইসিকে: যখন শহরের বেশির ভাগ মানুষই ঘুমিয়ে কাদা, সম্ভবত অঘোরে ঘুমাচ্ছে মিশেলও, তখন বৃষ্টিতে ভিজে বিন-এর বিল্ডিংয়ের দিকে চলেছে লিজা।

রনের বাড়ানো দু'হাতে ধরা দিল মিশেল, সামান্য হেলান দিল গায়ে, তারপর সরে গেল। রনের অন্তরটার দিকে মনোযোগ চলে গেল তার। মিশেলের মন অন্য দিকে ফেরাতে হালকা গলায় রন জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কথায়

বিশেষ কোনও ইঙ্গিত আছে, মিশেল?’

‘টাকা জোগাড় করার ব্যাপারে?’ ভুরু উঁচু করল মিশেল। ‘কথাটা ঠিক না? টাকা জোগাড়... মার্শালদের পেটানো... তোমার কাজ নয়?’ বাবার দিকে একবার চেয়েই চোখ সরিয়ে নিল মিশেল। ‘গুজব খুব দ্রুত ছড়ায়, রন। আমি অবশ্য তোমার কাছ থেকে কিছু শুনি নি। মনে হয় ব্যবসার কাজে তুমি এত ব্যস্ত যে, আমাকে দেবার মত সামান্য সময়টুকুও নেই তোমার। গতকাল আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি তুমি।’ জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মিশেল। ‘এটাও বুঝছি না আজকে আমাকে নিয়ে নাস্তা করতে যেতে তোমাকে আমি অনুমতি দেব কি না।’

‘মিশেল,’ ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে চাইল রন। ‘হেনরি, ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন, পরের ট্রেন ধরতে হলে আপনার সঙ্গে জরুরি আলাপ প্রয়োজন আমার।’

ঝটকা খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মিশেল। ‘তার মানে তুমি বলতে চাইছ এখনও আমাকে দেয়ার মত সময় নেই তোমার?’

‘ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর...’

যেরকম হঠাৎ করে রাগ প্রকাশ করেছিল, তেমনি দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ হয়ে গেল মিশেল। কিন্তু চেহারা থেকে রাগের ছাপ দূর হলো না। ‘ঠিক আছে,’ ধীর গলায় বলল মিশেল, ‘কোনও সমস্যা নেই। আশা করি তুমি দয়া করে জিং ওয়াংকে বলবে, আমার নাস্তা যেন ঘরে দিয়ে যায়?’

‘এই তো আমার মেয়ের মত কথা,’ খুশি হয়ে বলল কর্নেল মার্শল্যাও। ‘আমরা কাজের মানুষ, আমাদের মত কাজের মানুষদের ব্যাপারে একটু ধৈর্য ধরতেই হয়, নাকি, মিশেল!’

চলে যাওয়ার সময় রনকে পাশ কাটাল মিশেল, ঠোঁটে আড়ষ্ট হাসি। অন্যরা হয়তো ওর বিড়বিড় করে বলা কথাগুলোর কোনও অর্থ বুঝল না, কিন্তু রন স্পষ্ট শুনল: ‘আমাকে সময় দিতে না পারলেও মিসেস টমসনকে ঠিকই সময় দিতে পারছ তুমি। শুনলাম কালকে তোমার মারামারির সময় উপস্থিত ছিল সে।’ রাজকীয় ভঙ্গিতে গ্রীবা সোজা করে করিডর ধরে হেঁটে চলে গেল মিশেল।

পিছন থেকে চেয়ে রইল রন, ওর চোয়ালের একটা পেশি তিরতির করে কাঁপল বারকয়েক।

‘বাদ দাও, রন,’ বলল মার্শল্যাও। ‘আজ সকাল থেকেই মেজাজ খারাপ ওর। ঠিক হয়ে যাবে নিজেই। চলো, খেতে যাওয়া যাক।’

ক্যান্টিনিজ ভাষায় নতুন দু’জন ওয়েইটসকে দ্রুত নির্দেশ দিচ্ছে জিং ওয়াং, কিন্তু রন ও কর্নেলের অর্ডার নিজে এসে নিল সে। কাগজে অর্ডার লিখে নিতে নিতে বলল, ‘হঠাৎই ব্যবসা বেড়ে গেছে। সত্যি তুমি খনি চালু করবে, মিস্টার

মার্লো?’

‘হ্যাঁ।’

‘তা হলে আরও অনেক মেয়েকে চাকরি দিতে হবে আমার,’ বলে কিঁচেনে ফিরে গেল জিং ওয়াং। ভিতর থেকে তার উঁচু গলার চিৎকার শোনা গেল, রাঁধুনিকে ধমকাচ্ছে।

এল পাসো যাওয়া নিয়ে আলাপে ডুবে গেল মার্শল্যাণ্ড ও রন। একটু পর রেস্টুরেন্টে ঢুকল ক্লিভ হেস্টিংস। চামড়া-মাংস ছেঁচে যাওয়া চেহারা থেকে স্বাভাবিক রং বিদায় নিয়েছে, ফোলা চোখ দুটোর চারপাশে ঘন কালো ছোপ। রনকে দেখে ওদের টেবিলের দিকে হনহন করে এল সে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রন, ওর ডানহাত থাকল টেবিলের কিনারায়, সিক্সগানের বাঁট থেকে তিন ইঞ্চি দূরে।

মাথা নাড়ল হেস্টিংস। ‘রানিং আয়ার্ন সেলুনে অনেকক্ষণ ছিলাম,’ বলে ঘরের শেষ প্রান্তের আরেকটা টেবিলে গিয়ে বসল।

ভুরু কুঁচকে গেল মার্শল্যাণ্ডের। ‘কী বলতে চাইল লোকটা? কালকের অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করল নাকি?’

‘না।’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল রন, ‘বলতে চাইল, পরেরবার যখন আমরা মুখোমুখি হবো, তখন মদের নেশা থাকবে না ওর।’

নাস্তা শেষ করে কর্নেলের কাছ থেকে বিদায় নিল রন। তার আগে বলল, ‘যত নীচে পানি থাকবে ভেবেছিল ফেনটন, তার চেয়ে বেশ ওপরের স্তরেই পানি আছে। যদি দরকার হয়, খনিতেই পাবেন আমাকে।’

পথে লিজার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। বিনের বিল্ডিং থেকে মাত্র বেরিয়েছে লিজা। রনকে দেখে মৃদু হাসল, বলল, ‘এরকম পুরনো একটা বাড়ি মেরামত করে ভাড়াটে বসাতে হলে কী কী দরকার হবে তার লিস্ট করা সহজ কাজ নয়।’

‘লিস্ট করে কী হবে?’

‘একটা বোর্ডিং হাউস খুলব আমি ওখানে, যদি তোমার কোনও আপত্তি না থাকে।’

‘নেই আপত্তি।’

হালকা বাতাসে বৃষ্টির মিহি কণা উড়ছে চারপাশে। ভেজা ভেজা হয়ে গেল লিজার দু’গাল। রাস্তার ধারের ক্যানিয়ন গাল্চ থেকে ছুটন্ত কাদা-পানির খলখল-ছলছল আওয়াজ আসছে। কথা বলতে গিয়ে গলা উঁচু করতে হলো ওদের দু’জনকে।

রাস্তায় নতুন ব্যস্ততা নজর কাড়ল রনের। লিজার কাছে জিজ্ঞেস করল, ‘জানো, কী ব্যাপার— লিজা?’

বিল ট্রেইসির বাড়ি আর বিনের বিল্ডিংয়ের মাঝের বিরাট এক চাতাল আছে কংক্রিটের। এক সময় ওখানে একটা ওয়্যারহাউস ছিল। ওটা আগুনে পুড়ে যাওয়ায় মেঝেটাই শুধু রয়েছে এখনও। ওই কংক্রিটের চাতালের দিকে উঁর হয়ে হাতুড়ি দিয়ে গজাল, গাঁথছে লাল দাড়িওয়ালা এক শক্তপোক্ত লোক। তার পাশে পড়ে আছে ক্যানভাসের স্তূপ। মনে হলো তাঁরু খাড়া করতেই গজাল ঠুকছে সে কংক্রিটে।

লোকটাকে সাহায্য করছে খড়-রঙা চুলওয়ালা একটা ছেলেটা, বয়স দশের বেশি হবে না।

চাতালে তোলা হয়েছে একটা ওয়্যাগন। ওটার সিটে দুধের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসে আছে এক মহিলা।

‘ডেভ বেলের সম্পত্তি ওটা,’ লিজাকে বলল রন। ওরা দু’জন আরও কাছে যাওয়ার পর গলা উঁচু করল, ‘মিস্টার, শহরে খালি বাড়ি থাকতে বৃষ্টির ভিতর ক্যাম্প করছ কেন?’

হাঁ হয়ে গেল লোকটা, স্নেজ হাতুড়ি নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ‘দোকানের ওই লোকটা...’ ডেভ বেলের স্টোর দেখাল সে, ‘আমাকে বলল এই চাতালগুলোতে কম ভাড়া থাকতে দেবে। আমাকে ধারণা দিয়েছে শহরের আর কোনও জায়গা খালি নেই।’

রন নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘ভাড়া কত নিয়েছে তোমার কাছ থেকে?’

লাল হয়ে গেল লোকটার চেহারা। ‘কম না। এই টাকায় অন্য কোথাও আস্ত একটা বাড়ি ভাড়া নিতে পারতাম আমরা।’

লিজার দিকে চাইল রন। ‘ভাড়া দেবার মত খালি বাড়ি আছে, লিজা?’

ওয়্যাগনে বসা মহিলার দিকে চেয়ে হাসল লিজা। ‘তাঁবুটা তুলে রেখে দাও। রেল-রাস্তা ধরে এক ব্লক গিয়ে ডানদিকে মোড় নেবে। বাঁ পাশের দ্বিতীয় বাড়ি খালি আছে। ওটার মালিক রন মার্লো। অনেক দিন কেউ থাকে না, কাজেই বাড়ির ভেতরটা পরিষ্কার করে নিতে হবে তোমাদের।’

‘রন মার্লো? আমি ওই ভদ্রলোকের কাজ করতেই এসেছি।’ হতাশ ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। ‘এক মাসের জন্যে এই চাতাল ভাড়া নিতে গিয়ে প্রায় সব টাকা শেষ হয়ে গেছে আমাদের।’

রন বলল, ‘তোমার জায়গায় আমি হলে দোকানের লোকটাকে বলতাম, আরও ভাল একটা জায়গা পেয়ে গিয়েছি, আমার টাকা যেন সে ফেরত দেয়।’

‘সহজ লোক মনে হয়নি লোকটাকে আমার। টাকা যদি ফেরত দিতে রাজি না হয়?’

কোমরে হাত রেখে মাইনারের ফ্যাকাসে নীল চোখদুটোর দিকে চাইল লিজা। ‘দেখে তো মনে হয় শরীরে যথেষ্ট শক্তি আছে তোমার, না দিলে কেড়ে

নেবে।' ঘুরে ওয়্যাগনে বসা মহিলার দিকে ফিরল লিজা। জবাবে অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠল মহিলার ঠোঁটে। লিজা তাগাদা দিল, 'বাচ্চাদের সরিয়ে নাও বৃষ্টি থেকে। তোমার স্বামী মিস্টার রন মার্লে'র হয়ে কাজ শুরু করার পর বাড়ি ভাড়া কত হবে সেটা ঠিক করব।'

রনের দিকে চেয়ে চোখ টিপে ক্যানিয়ন ছেড়ে রেল-রাস্তার দিকে রওনা হয়ে গেল লিজা। মনে মনে বলল, টাকা-পয়সার ব্যাপারে লোভের শেষ নেই ডেভ বেলের। মার্কেটাইল দোকানের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল ও। ভাবছে, এই সকালবেলা কোথায় যাচ্ছে রন।

এত সকালেও দোকানের ভিতর কয়েকজন কাস্টমার দেখল লিজা। সবাই তারা অপরিচিত।

ওকে দেখে মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো মালপত্রের ভিতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে এল ডেভ বেল। লোকটা কাছে আসা পর্যন্ত বিব ওভারঅলের একটা বড় স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল লিজা। ওভারঅলগুলোর নতুন-নতুন গন্ধ ভাল লাগল ওর।

'অনেকদিন পর দেখলাম তোমাকে, লিজা,' বলল ডেভ বেল। রিব্রত মনে হলো তাকে। এবার সরাসরি কাজের কথায় এল সে, 'যেভাবে শহরে লোক আসছে, তাতে সাহায্যের হাত দরকার আমার। ভাল বেতন দেব। তুমি আগ্রহী?'

রাগী লোক ডেভ বেল, একরোখা মানুষ। শহরের বাচ্চারা সবসময় ভয় পেত ডেভ বেলকে। তার সামনে দাঁড়িয়ে অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করল লিজা, কিন্তু ওর অস্বস্তি দূর হয়ে গেল বৃষ্টির ভিতর সেই মহিলা ও তার দুই বাচ্চার দুরবস্থার কথা চিন্তা করে।

লিজা বলল, 'চাকরি হয়ে গেছে আমার, মিস্টার বেল। রন মার্লে'র সিস্টাল এস্টেট-এ কাজ করছি। মার্শল্যাণ্ড অ্যাণ্ড মার্লে ফার্মের খালি বাড়িগুলো আমিই ভাড়া দিই।' সরাসরি কথা না বললে কোনও ফল পাবে না বুঝে এবার বলল, 'একটু আগে তোমার কাছ থেকে তোমার এক ভাড়াটেকে নিয়ে নিয়েছি আমি—লাল চুল লোকটার। শীঘ্রি অগ্রিম দিয়ে যাওয়া টাকা ফেরত চাইতে আসবে সে তোমার...'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল ডেভ বেলের। 'কাজটা কি ন্যায় সঙ্গত হলো, লিজা?'

ডেভ বেলের চোখের দিকে নিম্পলক চাইল লিজা। 'দুধের শিশুর দেখাশোনা করছে এমন এক মহিলাকে বৃষ্টির ভিতর সিমেন্টের মেঝে ভাড়া দেয়া কি ন্যায় সঙ্গত?'

ক্ষণিকের জন্য গাল থেকে রক্ত সরে গেল ডেভ বেলের। একটু থমকে গিয়ে

সে বলল, 'লোকটা যখন আসে, তখন খুব ব্যস্ত ছিলাম আমি। পরিবারের কথা যদি আমাকে সে বলেও থাকে, শুনিনি। ওর অগ্রিম আমি ফিরিয়ে দেব। ওরকম কাজ করে টাকা কামানোর কোনও দরকার পড়ে না আমার।'

'শীঘ্রি মালামাল না কিনলে টাকা কামাতেও পারবে না তুমি,' মৃদু হাসল লিজা। 'এখনই তোমার অনেকগুলো তাক খালি হয়ে গেছে।'

মাথা দোলাল ডেভ বেল। 'সেজন্যেই তো বিশ্বস্ত সাহায্যকারী দরকার, লিজা। অর্ডার লিখে পাঠানোর জন্যে খানিক সময় তো অবশ্যই পেতে হবে আমাকে!'

একটা তাকের দিকে পাশ ফিরল লিজা, কাঁধের উপর দিয়ে বলল, 'প্রচুর গ্রোসারির অর্ডার দাও, মিস্টার বেল। শীঘ্রি বোর্ডিং হাউস খুলছি আমি জিনিসপত্র তোমার কাছ থেকেই কিনতে চাই।' একটু থেমে বলল, 'তবে আগে মূল্য তালিকা দেখব। তুমি যে-দাম ধরবে, তার চেয়ে এল পাসোতে যদি কমে পাই, ওখান থেকে কিনতে বাধ্য হবো।'

আহত চেহারায় কাঁধ দোলাল ডেভ বেল। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বিষণ্ণ স্বরে বলল, 'তুমি কি আমাকে একটা ডলারও মুনাফা করতে দেবে না, লিজা?'

ব্যবসায়ীর কপট হতাশ ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল লিজা। 'একেই বলে ব্যবসা, মিস্টার বেল।'

হেসে ফেলেও গম্ভীর হয়ে গেল ডেভ বেল, বলল, 'বুঝতে পারছি খুব চালাক কাস্টমারের সঙ্গে ব্যবসা করতে হবে আমাকে। ঠিক আছে, কী আর করা, ন্যায্য দামই ধরব না হয়!'

বিরাত আকৃতির এক লোক এক পাশের গাল ফুলিয়ে তামাক চিরাচ্ছে, অর্ধেক ভাবে ডেভ বেলকে ডাকল সে।

'আসছি, শিফ,' বলে লিজার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে এগিয়ে গেল ডেভ বেল।

মনে মনে হিসাব কষতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লিজা। খানিকক্ষণ পর এক বোল্ট কাপড়ের গুণগত মান, রং, ডিযাইন ও পরিমাণ পছন্দ হওয়ায় কিনবে ঠিক করল। বুঝতে ওর দেরি হলো না, নতুন এই ব্যস্ত পিস্তল ফ্ল্যাটে এক সপ্তাহের আগেই শেষ হয়ে যাবে ডেভ বেলের দোকানের সমস্ত মালামাল।

'জয়ন্য ডিযাইন, তা-ই না?'

ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে মিশেল মার্শল্যান্ডকে দেখতে পেল লিজা তর্জনী তুলে ওর হাতে ধরা কাপড়ের বোল্ট-এর কোনো দেখাচ্ছে মেয়েটা।

'আমার কাছে ভাল লেগেছে,' রাগ হলেও শাস্ত গলায় বলল লিজা

'আমি বলতে চাইছি, কাপড়টা আসলে একদম পুরুষালী।'

'পুরুষরা থাকবে এরকম ঘরের জন্যেই নিচ্ছি এই কাপড়।'

‘ও।’

‘হাওয়ার্ড হোটেলের পেছনে একটা বোর্ডিং হাউস খুলব আমি। অবিবাহিত পুরুষদের জন্যে বোর্ডিং হাউস।’

‘জানি ওদের তুমি সামলাতে পারবে, মিসেস টমসন।’

কাপড়টা আঙুল দিয়ে ঘষে দেখল লিজা। মনে মনে বলল, এই মিশেল মেয়েটা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছে। শান্ত গলায় ও বলল, ‘পুরুষদের সামলানো সহজ, মিস মার্শল্যাণ্ড। ওরা সরল-সোজা হয়, মেয়েমানুষের চেয়ে পঁচাচ অনেক কম থাকে ওদের মনে।’

খানিক উপরে উঠল মিশেল মার্শল্যাণ্ডের ভুরু। গলায় এবার কাঠিন্য প্রকাশ পেল: ‘তুমি যদি পুরুষদের অতই চেনো, তা হলে কালকে তোমার বাবাকে সামলাতে পারলে না কেন?’

‘কী বলতে চাইছ তুমি, মিস মার্শল্যাণ্ড?’

‘তুমি যদি সরাসরি ক্লার্ক ফাওলের সঙ্গে ট্রেইনে যা ঘটেছে, বা ওপিয়ামের ব্যাপার তাকে খুলে বলতে, গতকাল ডিপোতে ওরকম জঘন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না।’

লিজার হাসিতে গর্ব ঝরল। ‘বাবা খুঁজে বের করে ক্লার্ক ফাওলকে শহর-ছাড়া করেছে, এটাই তো তুমি বলতে চাইছ? না, ওটা এড়ানোর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু বলতেই হয়, দ্রুত ঘটেছে যা ঘটার।’ হাসিটা আরেকটু চওড়া হলো লিজার। ‘যা-ই হোক, আমি তো আগেই বলেছি, পুরুষরা সরল-সোজা হয়, মেয়েমানুষের চেয়ে পঁচাচ অনেক কম থাকে ওদের মনে।’

‘হ্যাঁ, সেটা তুমি বলেছ।’ রাগের স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠল মিশেলের সুন্দর চেহারায়। গলাটা ভারী শোনাল আগের চেয়ে: ‘তবে মেয়েরাও সোজা-সাপ্টা হতে পারে। তুমি যখন সরল-সোজা কথা পছন্দ করো, তো আমিও তোমাকে সরল-সোজা কথাই বলব। তুমি নিশ্চয়ই চিন্তা করে দেখোনি কোনও জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে ওই পরিস্থিতির কারণে? একবারও ভেবেছ, মার্শাল হেস্টিংস অস্ত্র ঝোলানোর মত সুস্থ হলেই রনকে খুঁজতে বেরুরে?’

‘নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রনের আছে।’

‘তুমি এমন ভাবে কথা বলছ, যেন গোলাগুলি কোনও ব্যাপারই নয়।’

‘এর চেয়েও অনেক খারাপ বহু কিছু ঘটে। এখানে আমরা বুনো একটা এলাকায় বাস করি, মিস মার্শল্যাণ্ড।’

‘রন আর আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে,’ বলল মিশেল। ‘ক’দিন পরেই আমাদের বিয়ে। না বলে পারছি না, এখন আমার মনে হচ্ছে তুমি যেখানে থাকো, সেখানেই গোলমাল হয়, আর তাতে কোনও না কোনও ভাবে জড়িয়ে যায় রন।’

মিশেল মার্শল্যাও মাত্র গর্জন করতে শুরু করেছে, ভাবল লিজা। কখন নখ বের করে আক্রমণ হানবে সে-অপেক্ষায় থাকল ও।

আবার মুখ খুলল মিশেল, ‘কী ঘটছে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ তুমি, মিসেস টমসন। রাতারাতি বিরাট একটা শহরে পরিণত হবে পিস্তল ফ্ল্যাট। সত্যিকার অর্থে বাবা আর রনই হবে পিস্তল ফ্ল্যাটের মালিক। তারাই চালাবে পুরো শহর।’ বড় করে শ্বাস টানল মিশেল। ‘এই শহরে কোনও মহিলা-চালিত বোর্ডিং হাউস, বা জুয়াড়ীর জুয়াখানার জায়গা হবে না।’

মিশেল মার্শল্যাওকে আপাদমস্তক দেখল লিজা, তারপর বলল, ‘পিস্তল ফ্ল্যাট চালাতে হলে তোমার বাবা আর রনকে এখনও বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। ...একটা কথা জেনে রাখো, রন মার্লোর দিকে কখনও হাত বাড়াইনি আমি। ওকে পাওয়ার জন্যে আমার সঙ্গে লড়াই করে জিততে হবে না তোমাকে।’ এবার কথা বলবার ভঙ্গিতে নিজের স্পষ্ট বিরক্তি ফুটিয়ে তুলল লিজা: ‘পুরুষদের ধরে রাখতে হলে মেয়েদের যে যোগ্যতা লাগে, তার কিছুই তোমার মধ্যে দেখিনি আমি। রন আর তোমার ভিতর সত্যিকারের কোনও গভীর সম্পর্ক আছে বলেও মনে হয়নি আমার। আর সে-কারণেই প্রেমের প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে পারো ভেবে দৃষ্টিস্তা করো তুমি। আর সেই দৃষ্টিস্তা থেকেই কর্নেল মার্শল্যাওর মেয়ে আর রনের হবু বউ বলে নিজেকে জাহির করো, চেষ্টা করো নিজের গুরুত্ব বাড়াতে।’ দম নিতে থামল লিজা, তারপর দম ফিরে পেয়েই প্রতিবাদ করতে চাওয়া মিশেল মার্শল্যাওকে থামিয়ে দিয়ে দেরি না করে বলে চলল, ‘তো কে কাকে শহর থেকে তাড়াচ্ছে? কীভাবে তাড়ানো হবে সেটা কোনও ব্যাপার নয়— কে তাড়াবে সেটাই ব্যাপার, তা-ই না?’ একটু ঝুঁকে মিশেলের মুখের কাছাকাছি মুখ নিয়ে গেল লিজা। ‘পিস্তল ফ্ল্যাট থেকে লিজা ট্রেইসিকে কেউ তাড়াতে পারবে না, মিশেল মার্শল্যাও। কথাটা কখনও ভুলে যেয়ো না।’

মাঝ রাত্রে মিছিল শেষে মানুষ যেমন দ্রুত যার যার পথে চলে যায়, তেমনি করে চেহারা থেকে সমস্ত ভদ্রতা বিদায় নিল মিশেলের; হাতে ধরা ভারী ব্যাগটা দিয়ে পাশ থেকে লিজার মুখ লক্ষ্য করে বাড়ি মারতে চেষ্টা করল সে।

না পিছিয়ে সামনে বাড়ল লিজা, বামহাত বাড়িয়ে ঠেকিয়ে দিল ব্যাগ, সেই সঙ্গে ডানহাতের তালুর কিনারা দিয়ে মেরে বসল মিশেলের থুতনিতে।

টালমাটাল হয়ে পিছাল অপ্রস্তুত মিশেল, মেঝেতে রাখা একগাদা ঘোড়ার নালে পা পড়তেই ভারসাম্য হারাতে শুরু করল। কাত হয়ে পড়ল কভারঅলর র্যাকের উপর, র্যাক নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। ওকে ঢেকে দিল কভারঅলগুলো।

‘হ্যাঁ, মেয়েরাও সহজ-সরল হতে পারে,’ মন্তব্য করল লিজা। দেরি না করে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ও।

জর্জ ব্রাউন যখন ডেভ বেলের দোকানে ঢুকছে, ঠিক তখনই বেরিয়ে এল মিশেল। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে তার, ফ্যাকাসে চেহারা তীব্র রাগের ছাপ।

হ্যাট ছুঁয়ে মিশেলকে সম্মান জানাল জর্জ ব্রাউন, তারপর দোকানে ঢুকতে গিয়ে বুঝতে পারল মেয়েটার অবস্থা বেসামাল। ঘুরে চাইল, রেল-রাস্তা ধরে হনহন করে হেঁটে চলেছে মিশেল মার্শল্যাণ্ড, রেলরোডের বাঁধে উঠতে গিয়ে পিছলাল সে, তারপর বাঁধের ওপাশে চলে যাওয়ায় আর দেখা গেল না তাকে।

চোখ ফিরিয়ে পাশে ডেভ বেলকে দেখতে পেল জর্জ ব্রাউন। জিজ্ঞেস করল, ‘দোকানে খুব বেশি ভিড়?’

মাথা নুড়ল ডেভ বেল। ‘না। দুই মহিলার লড়াই। মনে হলো লিজা ট্রেইসিহি জিতল।’

ঠোঁট গোল করে শিস বাজাল জর্জ ব্রাউন। ‘লড়াইটা দেখতে পেলে খুশি হতাম। ...কী নিয়ে লাগল ওদের?’

‘জানি না। দোকানের আরেক দিকে ছিলাম। তবে খেপে গিয়েছিল দু’জনই।’ ব্রাউনের দিকে মুখ তুলে চাইল বেল। ‘কী দরকার তোমার, জর্জ?’

‘টাকা।’ ডেভ বেলের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে যেতে দেখে আন্তরিক হাসল জর্জ ব্রাউন। ‘বেশি না।’

দোকানের পিছনে এক কোনায় নিজের অফিসে ব্রাউনকে নিয়ে এল ডেভ বেল, বসল এলোমেলো ভাবে কাগজ ছড়ানো এক ডেস্কের পিছনে কাঠের খটখটে চেয়ারে। তার সামনে লোহার টুলে বসল জর্জ ব্রাউন, দেরি না করে বলল, ‘বুঝলে, সেন্ট লুইয়ের বাজারে একেকটা ঘোড়া ষাট ডলার করে বিক্রি হচ্ছে। তো এখন...’

দোকান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় ক্লিভ হেস্টিংসের সঙ্গে দেখা হলো জর্জ ব্রাউনের। মার্শালের চেহারা দেখে তার মনে হলো, হেস্টিংসের মুখটা যেন জোর করে ঠেলে দিইয় কাঁচের জানালা ভেঙেছে কেউ। কেটেছড়ে ফুলে গেছে পুরো মুখ, লালচে হয়ে আছে।

‘ডেভ বেলকে আগ্রহী করতে পারলে তোমার ঘোড়ার ব্যবসায়?’ জিজ্ঞেস করল হেস্টিংস।

জবাবে পকেটে চাপড় দিল ব্রাউন। ‘এরই মধ্যে ঘোড়া ধরতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। বেলের কাছ থেকে ধার নিতেও অসুবিধে হয়নি তেমন। তবে সুদ দিতে হবে অনেক।’

‘তাতে কী, এক মাসের ভিতর যা নিয়েছ তার এক শ’ গুণ টাকা রোজগার করে ফেলবে, তা-ই না?’

‘তা ঠিক।’ খুশিমনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল জর্জ ব্রাউন।

দোকানে ঢুকে আবছা আলোয় চোখ সহিয়ে নিল ক্লিভ হেস্টিংস। ভেজা রেইনকোট খুলে স্বস্তি বোধ করল। ডেস্কেই পেল ডেভ বেলকে। দোকান-মালিক খতিয়ানের খাতা নিয়ে লেখালেখির কাজে ব্যস্ত। মুখ তুলে পায়ের শব্দে চাইল বেল, নির্বিকার চেহারায় দেখল হেস্টিংসের বিধ্বস্ত চেহারা।

‘ব্রাউনকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম,’ বলল হেস্টিংস।

সাবধানে খতিয়ানের খাতা বন্ধ করে উপরের এক তাকে রেখে দিল ডেভ বেল। ‘তুমি নিজে ধার দিলে না কেন?’

‘অত টাকা আপাতত নেই আমার। থাকলে দিতে দেরি করতাম না।’

‘কেন?’

‘সময় মত ক্যানসাস সিটিতে পৌঁছতে পারবে না ব্রাউন, ঘোড়ার দামও যা ভাবছে তার দশ ভাগের এক ভাগও পাবে না।’

সরু দু’ঠোঁট চেপে কথাটা চিন্তা করে দেখল ডেভ বেল। পকেট থেকে বের করে একটা সিগার দাঁতে কামড়ে ধরে চিবাতে শুরু করল ক্লিভ হেস্টিংস। ফোলা চোখ দুটোতে তার মরা মাছের দৃষ্টি।

‘আর কিছু বলবে?’ জিজ্ঞেস করল ডেভ বেল।

মুখ থেকে সিগার নামিয়ে ওটা দেখতে শুরু করল ক্লিভ হেস্টিংস। ‘পিস্তল ফ্ল্যাট... রন মার্লো... টাকা।’

‘তা হলে তো তোমার ভাবার মত বহু কিছু আছে দেখছি।’

‘আছেই তো। হাওয়ার্ড আর তোমার কাছ থেকে রন মার্লো টাকা ধার নিতে চেয়েছে?’

‘ম্যাক পিলারের কাছ থেকেও। গোটা ব্যাপারটায় কোনও গোপনীয়তা নেই।’

‘এটা ভেবে দেখেছ, যদি তুমি টাকা না দাও, বা দিতে দেরি করো, অন্য কোনওখান থেকে সহজে টাকা জোগাড় করতে পারবে না রন? তা-ই যদি হয়, খনিটা হয়তো আবারও বিক্রির জন্যে উঠবে। দামও পড়ে যাবে তখন অনেক। তোমার কি মনে হয়?’

সামনে ঝুঁকে টেবিলের উপর থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিল ডেভ বেল, তারপর বলল, ‘এমনটা হবেই তা বলা যায় না।’ হেস্টিংস পরবর্তীতে কী বলবে আন্দাজ করে নিয়ে আগেই জিজ্ঞেস করল সে, ‘খনিটা কিনতে পারলে লাভ কী আমাদের?’

‘মার্শল্যাণ্ড যে পদ্ধতিতে তামা বের করতে চাইছে, সেটা আমাদের জানানো না সে। কিন্তু দেশে তো সে একাই ধাতু বিশেষজ্ঞ না। লাভজনক ভাবে নিচু গ্রেডের খনিজ উত্তোলনের পদ্ধতি নিয়ে নিশ্চয়ই কাজ করছে আরও অনেকে।’

ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্কে দু'হাতের ভর দিয়ে দাঁড়াল ডেভ বেল, হাসিতে ঝরে পড়ল শেয়ালের চতুরতা। 'আমরাই হয়তো খনির মালিক হয়ে যাব, কি বলো? মার্শল্যাণ্ডের পদ্ধতি যদি প্রকাশ না পায়, পুরনো যন্ত্রপাতি ভাল লাভে বিক্রি করতে পারব আমি।' আবারও ভবিষ্যতের চিন্তা এল ডেভ বেলের মাথায়। চিন্তায় ডুবে ভুলে গেল ক্লিভ হেস্টিংসের উপস্থিতি। যেন নিজেকেই বলল ডেভ বেল, 'কিন্তু এল পাসোতে গিয়ে টাকা জোগাড় করা থেকে কর্নেল মার্শল্যাণ্ডকে ঠেকাবে কে? বা তার ওয়াল স্ট্রিটে যাওয়া থেকে?'

দাঁতে কামড়ে ধরে ম্যাচের কাঠি জেলে সিগার ধরাল ক্লিভ হেস্টিংস, আঙনের ভিতর দিয়ে দেখল ডেভ বেলকে। চাপা স্বরে বলল, 'কিছু হয়তো কর্নেলের অন্য কোথাও যাওয়া ঠেকিয়ে দেবে। ভাবার মত একটা বিষয়, কি বলো?' ঘুরে দাঁড়িয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল সে। সন্তুষ্ট। উর্বর জমিতে বীজ বোনা হয়ে গেছে তার।

সারাদিন খনি ও স্মেলটারের কাজে ব্যস্ত থাকল রন। কখনও কখনও একইসঙ্গে দু'জায়গায় দরকার পড়ল ওর। সন্ধ্যা পর্যন্ত ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের সঙ্গে তদারকী করতে হলো ওকে। শেষে যখন ফেনটন তার লোকদের নিয়ে লণ্ডনের আলোয় কাজ শুরু করল, তখন বিদায় নিল রন।

হোটেলে ফিরে শেভ-গোসল সেরে নিয়ে কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের সঙ্গে জিং ওয়াণ্ডের রেস্টুরেন্টে ডিনার করল ও। মেয়েকে নিয়ে চিন্তায় আছে কর্নেল, রনকে জানাল, আজ সারাদিন ঘর থেকে প্রায় বের হয়নি মিশেল, খুব নাকি মাথা ধরেছে তার।

ডিনার শেষে ডিপোতে চলে এল দু'জন। আগেই ব্যাগ পাঠিয়ে দিয়েছে কর্নেল মার্শল্যাণ্ড। ওরা পৌছে দেখল, প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড়িয়ে ফোঁস-ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে বুলেট ট্রেন।

বিশেষ ট্রেনটার চলে যাওয়া দেখতে ছোটখাটো একটা ভিড় জমেছে প্ল্যাটফর্মে। ম্যাক পিলার হাজির তার চিঠিপত্রের বাঙিল নিয়ে। কোনও কোনওটাতে লেখা: *জরুরি দ্রুত পাঠান*। নিজের চিঠি নিয়ে হাজির হয়েছে ডেভ বেলও।

ম্যাক পিলার এত উত্তেজিত হয়ে আছে যে, আর কারও দিকে কোনও খেয়াল নেই তার। তবে রন ও কর্নেলকে দেখতে পেল ডেভ বেল, পাশ কাটানোর সম্ময় আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে জ্যাক ওয়েডের খোঁজে চলে গেল সে।

ভিড়ের উপর দিয়ে ক্লিভ হেস্টিংসের মাথা দেখা গেল। ধীর পায়ে হেঁটে লিউট ফেরিসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে।

রাত নামতেই থেমে গেছে বৃষ্টি। লণ্ডনের অনুজ্জ্বল হলদে আলোয় ডিপোর

ভিতর কেমন যেন ভুতুড়ে আলো। আলো-ছায়া পড়ছে বগিতে উঠতে শুরু করা মানুষগুলোর মুখে। এক হাতে লণ্ঠন ও অন্য হাতে রঙনা হওয়ার নির্দেশ নিয়ে রেল-ইঞ্জিনের দিকে চলল জ্যাক ওয়েড।

‘মিশেলের দিকে খেয়াল রেখো,’ রনকে বলল কর্নেল মার্শল্যাণ্ড, ‘আমি নেই এটা ও বুঝে ওঠার আগেই ফিরব ঠিক।’ ট্রেনে উঠতে গিয়েও ফিরে চাইল সেনের দিকে। ‘টাকা জোগাড় করতে দেরি হবে না, পরের ট্রেনেই আসতে পারব আশা করি।’

‘অপেক্ষা করব আমরা,’ বলল রন। ‘গুড লাক, হেনরি।’

ধাপ বেয়ে বগিতে উঠে পড়ল কর্নেল মার্শল্যাণ্ড। রেলগাড়ির সামনে থেকে লণ্ঠন নেড়ে ঘোষণা দিল জ্যাক ওয়েড: ‘সবাই উঠেছে!’

ঝাঁকি খেয়ে সামনে বাড়ল খাটো ট্রেন, ঝিকঝিক শব্দ তুলে ধীর গতিতে ঢাল বেয়ে নেমে যেতে লাগল।

লিউট ফেরিসের হাতে একটা ব্যাগ, চিন্তায় ডুবে গেল সে কানের কাছে হেস্টিংসের কথাগুলো শুনে। তারপরই দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল পাশ দিয়ে যাওয়া শেষ বগির পিছন প্র্যাটফর্মে।

আস্তে আস্তে পাতলা হতে লাগল ভিড়।

রেল-রাস্তা ধরে হাওয়ার্ড হোটলে ফিরল রন। দ্বিধা করে মিশেলের ঘরের দরজায় টোকা দিল ও।

‘কে?’

‘রন।’

বিছানার স্প্রিংয়ের কাঁচাকাঁচ আওয়াজ শুনতে পেল রন, তারপর মেঝেতে পায়ের হালকা শব্দ। দরজা খুলল মিশেল। করিডরের লণ্ঠনের আলোয় দেখতে ওকে ফ্যাকাসে লাগল।

‘ভাবলাম বাতাসে একটু হেঁটে এলে ভাল লাগবে তোমার।’

‘ওই কাদায় হাঁটব?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রন। অসহায় বোধ করল মিশেলের রহস্যময়, রুঢ় আচরণে। অবশ্য শান্ত কণ্ঠে বলল, ‘কর্নেল এল পাসোতে গেছে, মিশেল। আমি যদি কোনও দরকারে...’

‘কোনও দরকার পড়বে না,’ দরজার নব থেকে হাত সরাল না মিশেল। ‘আমি এখন একা থাকতে চাই।’ কথাটা শেষ করেই বেশ জোরে দরজা বন্ধ করে দিল সে। শিকল আটকানোর ধাতব আওয়াজ শুনতে পেল রন।

লবিতে ফিরে এল ও, ভাবতে শুরু করল কী হয়েছে মিশেলের।

লবিতে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল নিক হাওয়ার্ড। ওকে দেখেই বলল, ‘কর্নেল আর তুমি সারাদিন বাইরে ছিলে, রন। তুমি হয়তো লিজার সঙ্গে মিস

মার্শল্যাণ্ডের ঝগড়ার খবর শোনোনি।’

অবাক হয়ে নিক হাওয়ার্ডের দিকে চাইল রন। ‘কী বললে?’

‘যা শুনেছি, তাতে বুঝলাম, ডেভ বেলের দোকানে মিস মার্শল্যাণ্ডকে চড় মেয়ে মেঝেতে ফেলে চলে গেছে লিজা। আজ সকালের ঘটনা। বিনের বাড়িতে লিজা টমসনের বোর্ডিং হাউস করা নিয়েই নাকি ঝগড়ার সূত্রপাত।’

অবিশ্বাস নিয়ে নিক হাওয়ার্ডের দিকে চাইল রন, কিছু বলল না।

কাঁধ ঝাঁকাল নিক হাওয়ার্ড। ‘আমি অবশ্য মানুষের মুখে শুনেছি, রন।’

ঘুরে দাঁড়িয়ে লবি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল রন। আসলে কী ঘটেছে জানতে হবে ওকে। সেজন্য লিজার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

হোটেলের কোনায় পৌঁছে সতর্কতাবোধ জন্ম নিল ওর মনে। মেয়েদের ঝগড়ায় নিজেকে কখনও জড়ায় না বুদ্ধিমান পুরুষ। হাঁটবার গতি ধীর হলো, তারপর থেমে দাঁড়াল রন। ঝগড়ার পুরো ব্যাপারটা আস্তে আস্তে জানবে। অপেক্ষা করাই ভাল। কিন্তু এখনই যদি জানা যেত কী নিয়ে ঝগড়া, তা হলে ভাল হতো।

নয়

ভাবতে অবাক লাগে, কত দ্রুত ফাঁকা হয়ে যায় পিস্তল ফ্ল্যাটের রাস্তা। বনিলাস সেতুর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রেল-রাস্তায় মাত্র একজন লোক দেখল রন। রানিং আয়ার্ন সেলুন থেকে বেরুল লোকটা, পিছনের আলোয় দেখা গেল, ব্যাট উইণ্ডে হোঁচট খেয়ে বেসামাল পা ফেলল সে কয়েক কদম, তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় অদ্ভুত একটা সুরে গান গাইতে শুরু করল।

মৃদু বাতাসে ভেসে এল করুণ সুর।

তারপর সেলুনের দেয়াল ঘেঁষে দেখা দিল আরেকটা ছায়ামূর্তি।

ব্যাট উইং পার হয়ে গুঞ্জন আসছে বাইরে, যোগ দিচ্ছে ক্রীকের কলকল-হুলহুল ধ্বনির সঙ্গে। বাতাস হঠাৎ দিক পাল্টানোয় ক্ষণিকের জন্য নীরব মনে হলো চারপাশ। সেই নীরবতায় সামনের বোর্ডওয়াক থেকে তীক্ষ্ণ এক চিৎকার শুনতে পেল রন। ওখানে দুটো ছায়ামূর্তি মুখোমুখি থেমেছে। তারপর ছুটন্ত পায়ের ধূপধাপ আওয়াজ শোনা গেল। বাতাস আগের মত বয়ে যেতেই আবার কানে এল সেলুনের গুঞ্জন, ক্রীকে ছুটন্ত পানির কলধ্বনি।

এগোল রন। যা দেখেছে বা শুনেছে, তা ওর পছন্দ হয়নি। সেতু পেরিয়ে বোর্ডওয়াক ধরে প্রায় ছুটে চলল ও।

রেল-রাস্তার আরও সামনে ডিনারের পর সিগার ধরাল ক্লিভ হেস্টিংস, দুই ছায়ামূর্তিকে কাছাকাছি যেতে দেখল, শুনতে পেল আতঁচিকারটাও। পুরনো অভিজ্ঞতার কারণে বুঝতে তার দেরি হলো না কী ঘটেছে। অপেক্ষা করল সে, তারপর দ্রুত সামনে বেড়ে অন্ধকারে ছুঁত লোকটাকে জাপ্টে ধরল।

লোকটা প্যাট্রিক টমসন।

নিজেকে ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল টমসন। মুখ থেকে বাসি, পচা গন্ধ বেরুচ্ছে তার। হড়বড় করে বলে উঠল, ‘যেতে দাও, ক্লিভ। তাড়া আছে আমার।’

যেটার কারণে ক্লিভ হেস্টিংস ছাড়ল প্যাট্রিক টমসনকে, লবির অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল সেটা, বোর্ডওয়াকে পড়ে আছে। জিনিসটা তুলে নিল হেস্টিংস।

চামড়ার একটা মানিবাগ। খালি।

গাল দিয়ে উঠে টমসনের পিছু নিতে ঘুরে দাঁড়াল হেস্টিংস, ঘুরতেই রানিং আয়ার্ন সেলুনের আলোয় বোর্ডওয়াকে এক লোককে দেখতে পেল। শক্ত হয়ে গেল হেস্টিংসের দেহের সমস্ত পেশি। দ্রুত চিন্তা করতে লাগল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রেল-রাস্তায় রন মার্লো যেকিকে আছে, সেদিক লক্ষ করে হাঁটতে শুরু করল।

ভারী পায়ের শব্দ কাঁপিয়ে দিল সেলুনের বোর্ডের তৈরি মেঝে। জোরাল একটা কর্কশ কণ্ঠ জানতে চাইল, কোন্ জাহান্নামে গেছে ম্যাক।

বোর্ডওয়াক ধরে ছুটে চলল ক্লিভ হেস্টিংস।

অন্ধকারে তাকিয়ে লণ্ঠনের আলোর আওতায় তাকে চলে আসতে দেখল রন। তাগাদার সুরে বলল ও, ‘ক্লিভ, এখানে আহত হয়ে পড়ে আছে একজন।’

জবাবে কিছু বলল না ক্লিভ হেস্টিংস।

রনের পিছনে সেলুন থেকে চিৎকার করতে করতে বেরুল সেই কর্কশ কণ্ঠের মালিক। ‘ম্যাক, খোদার ষাঁড়, কোন্ জাহান্নামে গেলে তুমি! কই তুমি! তোমাকে না বললাম...’

ক্লিভ হেস্টিংস আর রনকে দেখে কাছে এসে দাঁড়াল সে, ঝগড়াটে সুরে জিজ্ঞেস করল, ‘একটা মাতালকে যেতে দেখেছ?’ জর্জ ব্রাউনকে চিনতে পারল রন। হাঁটের মত লাল হয়ে আছে মাতাল লোকটার চেহারা।

ক্লিভ হেস্টিংস বলল, ‘মার্লোকে জিজ্ঞেস করো, ব্রাউন।’

দ্রুত ঘুরে রনের মুখোমুখি হলো রানশার। আরেকটু হলেই পড়ে যেত, এলোমেলো পা ফেলে ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইল। তার বুটের ডগা লাগল

পড়ে থাকা লোকটার গায়ে। চমকে উঠে উবু হয়ে বসল জর্জ ব্রাউন, লোকটা কে দেখে শ্বাস আটকাল সশব্দে।

‘ম্যাক!’

উঠে দাঁড়াল রানশার, এখন দেহের দু’পাশে হাত দুটো ঝুলছে। আঙুলগুলো ছড়ানো। ব্রাউনের নীরবতার মাঝে বিপদের গন্ধ পেল রন।

‘কী ঘটেছে?’ আবেগ তড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ব্রাউন।

‘মার্লোকে জিজ্ঞেস করো,’ আবারও বলল হেস্টিংস।

রনের হঠাৎ মনে হলো, পাহাড়ের কিনারার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে, একটু পরেই পড়তে হবে হাজার হাজার ফুট নীচে, অথচ থামবার কোনও উপায় নেই। ক্লিভ হেস্টিংসের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ একদম পরিষ্কার।

‘এই লোক সেলুন থেকে বেরিয়ে আসে,’ আড়ষ্ট গলায় বলল রন। ‘এর পেছনে আসে আরেকজন। দু’জনের মধ্যে হাতাহাতি হয়। কী ঘটছে দেখতে এগিয়ে এসে একে পড়ে থাকতে দেখি আমি।’

‘আর অন্য লোকটা?’

‘হাওয়ার্ডস হোটেলের দিকে ছুটে চলে যায়

হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে গেল জর্জ ব্রাউনের। থমকে থমকে বলল, ‘যা ঘটেছে সেটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। তোমাকে পছন্দ করি না আমি, রন মার্লো। ম্যাক আমার সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। ওর কোনও শত্রুও নেই। মাছিও মারে না কখনও।’

ক্লিভ হেস্টিংস ভারী গলায় বলল, ‘হাওয়ার্ডস হোটেলের দিকে কেউ যায়নি। এইমাত্র ওদিক থেকে এসেছি আমি।’

আগে করে ঘাড় ফিরিয়ে রনের দিকে চাইল জর্জ ব্রাউন। প্রচণ্ড রাগে জ্বলছে তার চোখ দুটো।

‘ক্লিভ...’ বলতে শুরু কবেও থেমে গেল রন।

নড়ে উঠল হেস্টিংস। রাগিং আয়ার্নের লণ্ঠনের আলোয় সোনালী ঝিলিক দিয়ে উঠল তার বুকে আঁটা নক্ষত্র। চুপ করে আছে হেস্টিংস, কিন্তু তার এই নীরবতা ভাষার চেয়ে অনেক জোরাল।

বোধহয় নেই এই মুহূর্তে যুক্তির কোনও স্থান আধমাতাল রানশারের মনে।

আরেকবার চেষ্টা করে দেখল রন। ‘ক্লিভ...’

এবার ওকে থামিয়ে দিল হেস্টিংস। তার কথা শুনে মনে হলো ধারাল ছুরি দিয়ে শক্ত কিছু চিরছে সে।

‘চিনতে পারছ এটা, ব্রাউন?’ হাত সামনে বাড়িয়ে মানিব্যাগ দেখাল হেস্টিংস।

গাল বকে উঠল জর্জ ব্রাউন। ‘ম্যাকের ওয়ালেট!’ হেস্টিংসের হাত থেকে

প্রায় ছিনিয়ে নিল ওটা। ‘শহরে যখন এল, তখন সরকারের কাছে গরু বিক্রি করার বারো হাজার ডলার ছিল ওর কাছে। গ্যালাপে বিক্রি করেছিল গরুগুলো। তার মানেই...’

আস্তে আস্তে ঘুরে রনের মুখোমুখি হলো জর্জ ব্রাউন, পাকা বস্ত্রারের মত ঘুসি মারল প্রতিপক্ষের চোয়াল লক্ষ্য করে।

মাথা সরিয়ে নিল রন, পরমুহূর্তে সামনে বাড়ল পাণ্টা ঘুসি মারতে। কিন্তু ওকে ফাঁকি দিয়েছে রানশার, তার আসল ঘুসিটা এল ওর পেট লক্ষ্য করে।

রানশারের কজি পর্যন্ত ডুবে গেল রনের পেটের ভিতর।

আঘাতের প্রচণ্ডতায় দু’ভাঁজ হয়ে গেল রন। ওর চোয়াল ছুঁয়ে গেল রানশারের তৃতীয় ঘুসি। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ব্রাউনের বাড়ানো দু’হাতের ভিতর ঢুকে পড়ে পাণ্টা আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করল রন।

দৃঢ় ভাবে দাঁড়ানো রানশারের পায়ে পা বেধে হোঁচট খেতে হলো ওকে, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল রন। সঙ্গে সঙ্গে ওর পাঁজরে এসে লাগল ব্রাউনের সবুট লাথি। এক পাক গড়িয়ে গেল রনের শরীর, বুকের ব্যথায় মনে হলো জ্ঞান হারাবে এখনই।

থমকে দাঁড়াল জর্জ ব্রাউন, চিৎকার করে বলল, ‘ওহ্! ওহ্ শালা!’

পিছলা বোর্ডওয়াকের ভেজা তক্তায় দু’হাতের তালু ঠেকিয়ে উঠে বসল রন, তারপর দাঁড়াতে শুরু করল। টের পেল, ভিড় জমে গেছে চারপাশে। লড়াই দেখতে চলে এসেছে সবাই রানিং আয়ার্ন খালি করে। ব্যাপসা চোখে অপরিচিত মুখগুলোর মাঝে সাদা অ্যাগ্রন পরা ব্লেক-এর চেহারা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল।

থমথমে নীরবতায় আঙুল তাক করে জর্জ ব্রাউনের হাতে ধরা খালি ওয়ালেট দেখাল ক্রিভ হেস্টিংস, চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, ‘রন মার্লো, তা’ হলে এভাবেই খনি চালু করার টাকা জোগাড় করছ তুমি?’

কষ্ট হলেও উঠে দাঁড়াল রন। আধমাতাল লোকগুলো নিরেট একটা দেয়ালের মত এগিয়ে এল ওর দিকে। ক্রিভ হেস্টিংসের কথা আর জর্জ ব্রাউনের শত্রুতামূলক মনোভাব প্রভাবিত করছে তাদের, ফলে একযোগে রনকে লক্ষ্য করে ঘুসি-লাথি মারতে শুরু করল তারা।

সেলুনের দেয়ালে পিঠ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রন, হাতের ধাক্কায় সামনে থেকে উন্মত্ত জনতাকে সরিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চাইল। ধূপধাপ লাথি-ঘুসি পড়ছে ওর উরু, তলপেট ও পাঁজরে। কোনও কোনও আঘাত ব্যথায় বিবশ করে দিল ওকে। তারপরও দাঁড়িয়ে থাকল রন অবিশ্বাস্য মনোবলে, প্রতিরোধের চেষ্টা করল। কিন্তু চারজন মিলে হেঁচড়ে রাস্তায় নামাল ওকে। মাথায় কয়েকটা ঘুসি খেয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল রন, তখনও হাত-পা ছুঁড়ে লড়তে চাইছে। ওর

আক্রমণকারীরা দম ফিরে পাওয়ার জন্য থামল। কিছুক্ষণ পর, ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে সবাই, চোখে মদের নেশা।

মোটাকৈ লোকের ভুঁড়ি উপচে পড়েছে বেণ্টের উপর দিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করল সে, ‘আমাকে জায়গা দাও!’

খানিকটা জায়গা করে নিল সে ঠেলে, কয়েক পা সামনে বাড়ল, তারপর লাফ দিয়ে উঠে সবুট দু’পা দিয়ে নামল রনের নিখর দেহের উপর। ভারসাম্য রাখতে পারল না মোটকু, পিছলে এবার নিজেই পড়ে গেল কাদার ভিতর।

হোঁৎকার হাস্যকর দুরবস্থা দেখে কে যেন হেসে উঠল তীক্ষ্ণ গলায়। একবার নড়ে উঠল রনের ডান পা, তারপর স্থির হয়ে গেল আবার।

জর্জ ব্রাউন কর্কশ গলায় বলল, ‘যথেষ্ট হয়েছে।’ ক্লিভ হেস্টিংসের দিকে ফিরে চাইল সে, চোখ সরু হয়ে গেল হিসাব কষতে গিয়ে। কড়া গলায় বলল, ‘তুমি যদি মার্শালের “ম”-ও হতে, তোমার শহরে এরকম ঘটনা ঘটতে পারত না।’ চ্যালেঞ্জ করবার ভঙ্গিতে কোমরের কাছ থেকে সামনে ঝুঁকল সে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে নির্দেশ দিল, ‘ব্যাক্সারকে তল্লাসী করে দেখো।’ একবারের জন্যও চোখ সরল না তার ক্লিভ হেস্টিংসের উপর থেকে।

আধমিনিট পর কে যেন বিড়বিড় করে বলল, ‘জর্জ, কিছুই নেই ওর কাছে!’

থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকল ক্লিভ হেস্টিংস। যদি রেগেও গিয়ে থাকে, রাগের কোনও প্রকাশ ঘটল না চেহারায়ে। বুঝতে তার দেহি হয়নি, এখন বাড়াবাড়ি করবার সময় নয়। অস্ত্রের কাছ থেকে হাতটা সাবধানে সরিয়ে রাখল সে। ভাবতে শুরু করেছে বিপদ কী ভাবে এড়ানো যায়।

‘মার্শালকে তল্লাসী করো,’ নির্দেশ দিল ব্রাউন।

রক্ষতার সঙ্গে দ্রুত পালন করা হলো রানশারের নির্দেশ। বারোজন লোক ঘিরে রাখল ক্লিভ হেস্টিংসকে। তিনজন তার পকেট হাতড়ে দেখল।

‘ম্যাকের ওয়ালেট কোথায় পেয়েছ?’ বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল জর্জ ব্রাউন।

বোর্ডওয়াকের দিকে আঙুল তাক করে দেখাল হেস্টিংস।

‘এমন কি হতে পারে টাকা ছিল না ম্যাকের কাছে?’ নিচু গলায় নিজেই যেন জিজ্ঞেস করল ব্রাউন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, হাঁটতে শুরু করল। অন্যদের নেশা কমে গেছে উত্তেজনা প্রশমনের কারণে, মাথা নিচু করে রানশারের পিছু নিল তারা। লজ্জার কারণেই বোধহয়, বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারল না কেউ।

অচেতন রানশার ম্যাককে তুলে ডাক্তার ব্রায়ারের নাপিতের দোকানের দিকে নিয়ে চলল ব্রাউনের দু’জন কাউবয়। রন মার্শালের নির্যাত্তিত দেহের পাশে একা দাঁড়িয়ে থাকল ক্লিভ হেস্টিংস। আস্তে আস্তে মাথা পরিষ্কার হচ্ছে তার, বিপদ কেটে গেছে বুঝে চিন্তা করতে শুরু করেছে।

জর্জ ব্রাউনের চাঁছাছোলা কথাগুলোয় যে রাগ তার হয়েছিল, সেটা ফিরে এল আবার। হাত মুঠো হয়ে গেল হেস্টিংসের। নিচু গলায় গালি দিল সে এক টানা। তবে রেল-রাস্তা জনশূন্য হয়ে যাওয়ার আগে রাগের কোনও বহিঃপ্রকাশ থাকল না তার ভিতর।

দু'মিনিট পুরো হওয়ার আগেই ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। কেউ গেল সেতুর দিকে, কেউ বা নীরব রানিং আয়ার্ন সেলুনে ঢুকল। শেষপর্যন্ত রন মার্লের পাশে থাকল শুধু হেস্টিংস। এবার এক পা পিছাল সে, গায়ের জোরে সবুট লাথি মারল রনের মুখে, তারপর বোর্ডওয়াকে রানশার ম্যাকের ওয়ালেট ফেলে দিয়ে সরে গেল হাঁটতে হাঁটতে।

পিস্তল ফ্ল্যাট শহরের উপর দিয়ে দ্রুত উড়ে চলা মেঘের চাদরে ঢেকে রয়েছে চাঁদটা। মেসকিটের মাঝ দিয়ে শৌ-শৌ করে বইল পাগলা হাওয়া; শক্ত গাছগুলোকেও দুলিয়ে দিল বারবার। কটনউড গাছগুলো প্রতিবাদে পিছনে হেলল, তারপর নতুন উদ্যমে দমকা, বুনো বাতাস শুরু হতেই হার মেনে দুলতে লাগল এদিক-ওদিক। ভেজা পিস্তল ফ্ল্যাট ও আশপাশের টিলা জুড়ে শুরু হয়ে গেল তুমুল বৃষ্টি।

এই কিছু দিন আগেও পানি পড়লে স্পঞ্জের মত শুষে নিত শুকনো মাটি, কিন্তু এখন অতি বৃষ্টিতে সমস্ত শোষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। টিলার ঢাল বেয়ে হড়হড় করে নেমে এল জলস্রোত, বনিলাস ক্রীকে পড়ে রেল-বাঁধের কালভার্টের তলা দিয়ে ছুটে চলল নীচের মেসায়।

বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল রনের কাপড়। বরফ-শীতল পানির স্পর্শে চামড়ায় যেন আগুন ধরে গেল ওর। চকিতে এক ঝলক বিদ্যুৎশিখার মত মনে পড়ল কিছু স্মৃতি। সব এলোমেলো। তারপর চেতনা যেন স্বাভাবিক হলো। মনে পড়ল ক্রিভ হেস্টিংসের ফোলা, হাসি-হাসি চেহারা ওকে কাদায় পড়ে যেতে দেখে এক পাশে দাঁড়িয়ে পৈশাচিক আনন্দে হাসছিল লোকটা।

প্রচণ্ড ষ্ণায় ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল রনের। বাহুর জোরে প্রথমে শরীরটা সামান্য তুলতে পারল, তারপর চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে বসল। উঠে দাঁড়াতে পারল একটু পর। মনে মনে বলল, এখনও আমি বেঁচে আছি, ক্রিভ হেস্টিংস। তোমার ওই হাসি আমি মুখের এক পাশ থেকে আরেক পাশে পাঠিয়ে দেব লাথি মেরে। দেবই।

পঞ্চাশ গজ দূরের সেতু পর্যন্ত পৌঁছুতে রুক্ষ অ্যাডোবির দেয়ালে হাত রেখে রেখে হাঁটল রন। মনে হলো যেন হাজারো মাইল দূস্তর, কষ্টসাধ্য পথ পাড়ি দিতে হলো ওকে। সেতুর কাছে গিয়ে বসে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেতুটা পার হলো রন। হাওয়ার্ডস হোটেলের লবিতেও ঢুকল ওভাবেই। ওর শরীর থেকে লবির কার্পেটে ঝরে ঝরে পড়ল কাদা-পানি ও রক্ত। বলতে পারবে না কখন

ডেকের পিছন থেকে এসে ধরে ধরে ওকে ঘরে পৌছে দিল নিক হাওয়ার্ড। এটাও বুঝতে পারল না রন, কখন ডাকা হয়েছে ডাক্তার ব্রায়ারকে। এক সময় দেখল, ওর হৃৎস্পন্দন মাপছে ডাক্তার, তারপর মুখের ক্ষতগুলো পরিষ্কার করে কী একটা মলম মাখিয়ে দিল।

অনেক পরে, রনের মনে হলো, ওর বিছানার পাশে বসে আছে লিজা। কখনও বা মিশেল।

আরও পরে কোনও এক সময় নিজেকে ও বলতে শুনল: ‘মিশেল?’ অথচ ওর মন বলল, লিজাকে ডাকা উচিত ছিল।

কখন যেন মিশেলের বদলে লিজাকেও ডাকল ও। সময় যেন অন্তহীন হয়ে গেল ওর জন্য। শুধু কালো আর কালোর ছোপ চার দিকে। বিচলিত মন কাকে খুঁজছে বুঝতে পারল না। আর ব্যথা! শরীরটা যেন ভেঙেচুরে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে!

ক্ষিপ্ত জনতার হাতে রন বেধড়ক মার খেয়েছে, এটা বিল ট্রেইসির এক কাস্টমারের কাছে শুনল লিজা। খবরটা শুনে কোট নেয়ার জিন্স ঘরে গেল না; বৃষ্টির মধ্যে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে পড়ল দেরি না করে। হাওয়ার্ডস হোটেলে পৌছতে তিন মিনিটের বেশি লাগল না ওর। রন কোন ঘরে উঠেছে সেটা নিক হাওয়ার্ডের কাছে জেনে নিয়ে সোজা রনের ঘরে চলে এল ও।

রনের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মিশেল। লিজাকে দেখে চোখ পরম করে চাইল সে। তবে পান্ডা দিল না লিজা, থমকে দাঁড়িয়ে দেখল রনের ফোলা, ক্ষতবিক্ষত, বিকৃত মুখ ও আহত দেহ। কোমরের উপর কোনও কাপড় নেই রনের শরীরে। সারাশরীরে ছোপ-ছোপ বেগুনী দাগ পড়ে গেছে ওর। সম্বিত ফিরে পেয়ে ডাক্তারের দিকে চাইল লিজা। ‘কে মেরেছে ওকে, ডক?’

ডাক্তার ব্রায়ারের বয়স একষট্টি, এক মাথা সাদা চুল, পাড় মদ্যপ, সেই সঙ্গে দর্শন-শাস্ত্রের পোকা। পেশায় আসলে সে নাপিত ছিল, ফোঁড়া কাটতে কাটতে নাম হয়ে গেছে ‘ডাক্তার’। সীমান্তের এই দুর্গম এলাকায় ভালই চলে তার ব্যবসা।

‘জেনে লাভ কী তোমার?’ হতাশ ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ব্রায়ার। ‘কী করতে পারবে তুমি, লিজা? শুধু এটুকু জানি, খেপে গিয়ে অনেক মানুষ মিলে বেদম পিটিয়েছে ওকে।’

‘আইনের লোক নিশ্চয়ই.... মিস্টার হেস্টিংস...’ মিইয়ে গেল মিশেলের কণ্ঠ।

রাগে গা জ্বলে গেল লিজার, ঘুরে দাঁড়াল ও। বলল, ‘একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, মিস মার্শল্যাণ্ড, যারা ওকে পিটিয়েছে, তাদের ভিতর

ক্লিভ হেস্টিংস ছিল। খুব ব্যস্ত, আনন্দিত সময় কাটিয়েছে সে ওখানে।’
পোশাকের হাতা গোটাল লিজা। ‘ডক, আমার হাতে দাও তো বেসিনটা।’

রাতের কোনও এক সময় পা টিপে টিপে রনের ঘরে এসে হাজির হলো ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন, চেয়ারে চোখ বুজে পড়ে থাকা ডাক্তার ব্রায়ারকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ‘কী অবস্থা ওর?’

‘ঘুমাচ্ছে,’ জবাব দিল ব্রায়ার। ‘মারাত্মক কিছু না। অবাক ব্যাপারই বলতে হবে। এমন কিছু ভাঙেনি যেটা জোড়া লাগবে না।’

বিরাট মাথাটা লিজার দিকে ফেরাল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন, তারপর নিচু স্বরে বলল, ‘খনির কাছে যারা আছে, তাদের কাছে ভাল লাগছে না ব্যাপারটা। মিস্টার মার্লো বেতন দিতে না পারলে না খেয়ে থাকতে হবে আমাদের সবাইকে। মিস্টার মার্লো একবার বললেই গোটা শহর তছনছ করে দায়ী সবাইকে টাইট দিয়ে দেব আমরা।’

লিজা বলল, ‘যদি কিছু করা দরকার মনে করে, যা করার ও একাই করবে মনে হয়।’

ব্রায়ার বলল, ‘কিছু না করলেই ভাল করবে। ওষুধের অভাব তো আছেই, আমার হাতও মাত্র দুটো।’

ঘরে ঢুকল মিশেল। তার উদ্দেশ্যে মাথা একটু দুলিয়ে বেরিয়ে চলে গেল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন।

লিজার উপর থেকে ঘুরে ডাক্তার ব্রায়ারের উপর স্থির হলো মিশেলের হালকা রঙা চোখ। বলল, ‘আমি ওর সঙ্গে বসতে পারব। আপনার থাকার কোনও দরকার নেই, ডাক্তার।’

‘তা হলে আমি লবিত্তে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিই,’ উঠে দাঁড়াল ব্রায়ার।

‘রন যখন জাগবে, তখন ও থাকলে বোধহয় ভাল,’ সায় দিয়ে বলল লিজা। ‘রনের কোনও দরকার পড়তে পারে।’

ব্রায়ারের পিছু নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লিজাও।

রনের চেতনা যখন ফিরল, ঘরের দেয়ালে লাল রঙের ছোপ ফেলেছে সূর্যের রশ্মি। প্রথমেই শরীর জুড়ে ব্যথার অবিশ্রান্ত ঢেউ অনুভব করল রন। আস্তে করে মাথা কাত করল, ফোলা চোখের পাতার ভিতর দিয়ে আবছা দেখাল সব কিছু। বিছানার পাশে একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আছে মিশেল, ঘুমে বেহুঁশ।

শরীরের পেশি শক্ত করে উঠে বসল রন। ঘুরে উঠল যেন ঘরের ভিতরটা, সে সঙ্গে লাফাতে শুরু করল। খানিকক্ষণ বসে থাকবার পর স্থির হলো চারপাশ। যা থেকে কন্ডল ফেলে দিয়ে পা ঘুরিয়ে বিছানা থেকে নামল রন।

চমকে জেগে উঠল মিশেল। ‘রন! বিছানা থেকে নামা তোমার মোটেই উচিত...’

ফাটা ঠোঁট প্রসারিত করে হাসবার চেষ্টা করল রন, কিছুক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে টলল, তারপর পা-পা করে হেঁটে গেল ঘরের ড্রেসার লাগোয়া আয়নাটার দিকে। নিজের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে নিয়ে বলল, ‘অনেক কাজ পড়ে আছে, মিশেল। সামান্য এই বাধা তো একটা বাচ্চা ছেলেকেও ঠেকিয়ে পারবে না, সমর্থ পুরুষের কথা বাদই দিলাম।’

‘রন!’ আপত্তির সুরে বলল মিশেল। ‘আমি বলছি তুমি...’

মিশেল আরও কিছু বলবার আগেই রন বলল, ‘মিশেল, আগেও বহুবার এর চেয়ে অনেক বেশি আহত হয়েছি।’

কাঁধে সোয়েটার রেখে ঘরে ঢুকল ডাক্তার ব্রায়ার, জোর গলায় বলল, ‘তোমাদেরকে কথা বলতে শুনে দেখতে এলাম।’ চোখে কম দেখে বলে খুব কাছে এসে রনকে দেখল সে। বলল, ‘চশমা না পরলে দেখতে তত খারাপ লাগছে না তোমাকে। শোও, শুয়ে পড়ো, আমি একটু পরীক্ষা করে দেখি তোমাকে। কালকে তুমি মোটেই গোঙাওনি, তাই বুঝতে পারিনি আসলে কী অবস্থা তোমার।’

‘কিছু হয়নি আমার, ডক,’ শান্ত স্বরে বলল রন।

‘তাতে কী, শুয়ে পড়ো দেখি ওখানে।’ রনকে ঠেলে বিছানার দিকে নিয়ে চলল ব্রায়ার, জোর করে বসিয়ে দিয়ে বলল, ‘উপড় হয়ে শোও দেখি। মিস মিশেল, আমি লবিত্তে যে-চেয়ারে বসেছিলাম, ওটার পাশে মেঝেতে হুইকির বোতলটা পাবে। ওটা আমার দরকার।’

চলে গেল মিশেল। রনের দেহে হাত বুলিয়ে, খোঁচা দিয়ে, নানা ভাবে পরখ করে দেখতে শুরু করল ব্রায়ার। একটু পর বলল, ‘বলতে পারছি না বিরাট কোনও ক্ষতি হয়েছে। বেঁচে আছ, আর সেটা থেকেই বুঝতে পারছি তুমি মরবে না।’

হুইকি নিয়ে ফিরল মিশেল। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বোতলটা নিল ব্রায়ার, কর্ক খুলে গলায় ঢালল হুইকি, তারপর বোতলটা রনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘তোমার এমন কিছু হয়নি, যেটা এই জিনিস খালিক গিললে সারবে না। এক ঢোক গিলে নাও, তারপর শরীরে আচ্ছামত হুইকি ডলে দেব। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, ভাল লাগবে।’

একটু পর কথামত শরীর ডলাডলির কাজ শুরু করল সে। বিরক্ত হয়ে মিশেল বলল, ঘরের ভিতর গন্ধ একেবারে ডিসটিলারির মত হয়ে গেছে।

‘তাড়াতাড়ি কাজ সারো, ডক,’ তাগাদা দিল রন। ‘বাইরে বেরতে হবে আমাদের।’

‘অস্বস্ত বাবা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো,’ অনুরোধ করল মিশেল। ‘বিশ্রাম দরকার তোমার।’

আপত্তি করল রন। ‘আমি যদি বিছানায় পড়ে থাকি, ফিরে এসে কর্নেল কী বলবে? নিজে সে সারা এল পাসো ছুটোছুটি করে টাকা জোগাড় করছে, আর আমি করছি বিলাস।’ ফেটে যাওয়া চামড়ায় নির্জলা হুইস্কি লাগতেই জ্বলুনিতে চোখ কুঁচকে গেল ওর।

‘বাইরে বেরুলে আবারও ওই লোকগুলো আক্রমণ করতে পারে তোমাকে,’ জোর দিয়ে বলল মিশেল। ‘আমার কথা রাখো। বেরিয়ে না। এবার হয়তো জানেই মেরে ফেলবে।’

‘অথবা দুশ্চিন্তা করছ, মিশেল,’ নরম গলায় বলল রন। ‘যারা আমাকে মেরেছিল, তারা এখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত। ...তুমি কি বলো, ডক?’

রনের কাঁধে চাপড় মারল ব্রায়ার, তারপর বলল, ‘ঘুরে শোও, তোমার বুকে ডলব। যা বলছিলাম, রাতে ওরা তোমাকে শেষ করে দেয়ার বিরাট সুযোগ হারিয়েছে।’

চিন্তার ভাঁজ পড়ল মিশেলের কপালে। ‘রন, বুঝতে পারছি না এত হালকা ভাবে ব্যাপারটা নিচ্ছ কী করে! টাকা রোজগারের তো সহজ পথও আছে, নাকি? তোমাকে কি... খনিটা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ?’

ধৈর্যের সঙ্গে জবাব দিল রন, ‘কতটা, সেটা তুমি তো জানো, মিশেল। সারা জীবনের সময় বিনিয়োগ করেছি ওই খনিতে। ঋণও করতে হয়েছে আমাকে। এখন যদি হেরে যাই, আমার সঙ্গে অনেকে হেরে যাবে।’

পুরো একমিনিট চুপ করে রইল মিশেল, চিন্তায় ডুবে নীচের ঠোট কামড়াল দাঁত দিয়ে, তারপর ধীরে ধীরে বলল, ‘মনে হয় না আমি জীবন থেকে এতকিছু আশা করি যে, তোমাকে এরকম বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে, রন। আমি চাই না আমার স্বামী পরিত্যক্ত একটা খনির জন্যে জীবন দিক।’

গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ি আওয়াজ বেরুল ডক ব্রায়ারের, তারপর খুকখুক করে কাশল সে। ‘ঠিক আছে, রন, এবার প্যান্ট নীচে নামাও, তোমার তলপেট দেখতে চাই।’

দরজার দিকে সরে গেল মিশেল, দরজায় দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে বলল, ‘এসব আমি আর সহ্য করতে পারছি না, রন। অবুঝের মত করছ তুমি। গোঁয়ার লোক সহ্য হয় না আমার।’ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

হতাশ হয়ে চোখ বন্ধ করল রন। ব্রায়ার বলল, ‘শরীরের এই অবস্থায় এরকম আচরণ হজম করা যে-কারণও পক্ষে কঠিন।’ ডলাডলি শেষে রনের সমতল পেটে চাপড় দিল সে। উঠে দাঁড়ানোর আগে বলল, ‘আমার পেট এমন মেদহীন, সুন্দর হলে ভাল হতো।’ হুইস্কির বোতলে কতটুকু তরল আছে দেখল সে চিন্তিত হয়ে, ঝাঁকাল বোতলটা, তারপর উপুড় করে লম্বা চুমুক দিল। নাক

দিয়ে বিদঘুটে শব্দ বেরল তার, খানিক কেশে ফুঁ দিল। ‘ঠিক ডাক্তার যা গিলতে বলে। ...দুঃখিত, তোমার জন্যে আর নেই।’ চেয়ার থেকে কোট তুলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজে কে ওটার ভিতরে ভরল সে কস্টেস্টে, জড়ানো গলায় বলল, ‘একটা কাজই আমার করার আছে তোমার জন্যে। চাইলে তোমার চুল কেটে দিতে পারি। সেরে উঠে এসো আমার দোকানে।’

বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

উঠে দাঁড়িয়ে বেসিনের সামনে গিয়ে মুখে পানি ছিটাল রন। ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল নিক হাওয়ার্ড। রনকে দাঁড়ানো দেখে বলল, ‘কালকে রাতে যখন তোমাকে ঘরে নিয়ে এলাম ধরে, তখন ভুলেও ভাবিনি আজ সকালে নিজ পায়ের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখব তোমাকে।’

‘ভাল রকম মাড়িয়েছে ওরা আমাকে,’ তিক্ত শোনালা রনের কণ্ঠ। ‘রাতে কষ্ট করে ঘরে পৌঁছে দিয়েছি বলে অনেক ধন্যবাদ।’

‘কিন্তু...’ ইতস্তত করল হাওয়ার্ড। ‘খুব খারাপ খারাপ কথা বলছে লোকে। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, বড়লোক মাতালদের কাছ থেকে সর্বস্ব হিনতাই করে খনি চালু করার টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করছে তুমি।’

‘আর করতে গিয়ে ধরা পড়ছি।’

‘মানুষের তা-ই ধারণা। ধরে নাও, ম্যাক পিলার ও ডেভ বেলকে হারিয়েছি আমরা।’

ভুরু উঁচু করল রন। ‘তুমি “আমরা” বললে। তার মানে তুমি বিশ্বাস করোনি যে আমি এ-কাজ করতে পারি?’

‘না, বিশ্বাস করিনি।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল হাওয়ার্ড। ‘ডেভ বেল বেশ কিছু টাকা অন্য জায়গায় খাটিয়েছে। আমি তো জর্জ ব্রাউনকে ধার দিইনি, কিন্তু সে দিয়েছে। মনে হচ্ছে এরপর আর জর্জের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবে না আমার।’

প্যাণ্টের ভিতর শার্ট গুঁজল রন, মনে মনে বলল, টাকা ধার নিয়েছে বলে পরে আফসোস করবে জর্জ ব্রাউন। কিন্তু সে-কারণে লোকটার জন্যে কোনও দুঃখ হলো না ওর। চেয়ারে ঝুলন্ত বেল্ট ও অন্ত্র তুলে নিল ও, বাইরে বেরুতে তৈরি হয়ে গেল আধ মিনিটের ভিতর। সিঙ্গানোর বাঁটে চাপড় মেরে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ‘গতরাতে এটা কোনও কাজে আসেনি। তবে এখন থেকে আসবে।’

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রনের দিকে চেয়ে হাসল বিল ট্রেইসি, কথাটি শুনতে পেয়েছে। খোশমেজাজে বলল, ‘দেখে খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে না তোমাকে। যখন গুনলাম মাতালদের মেরে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করছে, ভাবলাম তোমাকে জানাব, জরুরি দরকারের জন্যে কিছু টাকা সব সময় রাখি আমি নিজের কাছে। ...তো, এখন কি তোমার জরুরি দরকার?’

কৃতজ্ঞ বোধ করল রন, আন্তরিক স্বরে বলল, ‘জেনে ভাল লাগছে যে পিস্তল

ফ্ল্যাটে আমার বন্ধুও আছে, মিস্টার ট্রেইসি।’

‘মার্লো মাইন বা মার্লো ব্যান্ড, যেটাই বলো, লাভের বড় একটা অংশ তাদেরই থাকবে। টাকা বিনিয়োগ করে অংশীদার হতে চাইছি আমি, রন। তুমি কি শেয়ার বিক্রি করবে আমার কাছে?’

‘সম্ভব নয়, মিস্টার ট্রেইসি। আসলে...’

‘ঠিক আছে,’ অখুশি মনে হলো না বিল ট্রেইসিকে। ‘আমিও ভেবেছিলাম অংশীদার তুমি নিতে চাইবে না। ডেভ বেলকে যদি অংশীদার করতে না চাও, তো কোনও জুয়াড়ীকেই বা অংশীদার করবে কেন! বাদ দাও। কিন্তু টাকা থাকল, দরকার লাগলে কম সুদে ধার নিতে পারবে।’

নিক হাওয়ার্ড বলল, ‘রনের এখন তোমার মত মানুষকেই পাশে দরকার, বিল।’

হোটেল-মালিকের দিকে চেয়ে ভুরু নাচাল বিল ট্রেইসি। ‘ডেভ বেল আর ম্যাক পিলার তো রনকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ...তুমি?’

‘আমি আছি ওর সঙ্গে,’ জোর দিয়ে বলল হাওয়ার্ড। ‘রন যদি টাকা চায়, অবশ্যই ধার পাবে আমার কাছ থেকে।’

পকেট থেকে একটা সিগার বের করে দাঁতে কামড়ে ধরল বিল ট্রেইসি, পোকার খেলবার সময় তার চেহারা যেরকম নির্বিকার থাকে, সেরকম নিস্পৃহ চেহারায় বলল, ‘ভাল সঙ্গীই পেয়েছ তুমি, নিক। দেরি না করে তাস তুলে নাও। খেলা শুরু হয়ে যাক।’

দশ

হাওয়ার্ডস হোটেল থেকে বেরিয়ে আরেকটু হলেই প্যাট্রিক টমসনের সঙ্গে ধাক্কা খেত রন। রেল-রাস্তার পাশের বোর্ডওয়াক ধরে টলতে টলতে চলেছে লোকটা। রনকে দেখে স্ফণিকের জন্য তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠল চোখে। দৃষ্টিটা খেয়াল করল রন, তবে ভদ্রতা করে বলল, ‘শুভ সকাল, প্যাট্রিক।’

রনকে পাশ কাটিয়ে গেল লোকটা, শুভকামনার জবাবে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল কথাগুলো।

লিজাকে হাওয়ার্ডস হোটেলের কোনা ঘুরে দ্রুত আসতে দেখল রন।

প্যাট্রিক টমসনকে দেখেই ঠোটে চেপে বসল লিজার ঠোট। ওর তিক্ত গলা শুনতে পেল রন: 'খুব খুশি হলাম ওকে দেখে!' রনের চেহারায় স্থির হলো মেয়েটার চোখ। বলল, 'যাক, তুমি অন্তত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছ।'।

'দাঁড়িয়ে থাকতে চাই, কাজেই থাকতে পারবও,' লিজার বাহুতে হাত রেখে হোটেলের কোনো ঘুরল রন, বাতাসের সরাসরি আক্রমণ থেকে আড়ালে চলে এল। থেমে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বিনের বিন্ডিঙে কী কাজ করেছ আমাকে দেখানোর সময় হবে তোমার?'

মাথা দোলাল লিজা। 'নিশ্চয়ই! কিন্তু এক দিনে বেশি কিছু করে উঠতে পারিনি।'

মৃদু হাসল রন। 'তোমাকে যতটুকু চিনি, মনে হয় কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছ।'

ক্যানিয়নের ওদিকে, রানিং আয়ার্ন সেলুনের ওপারে রেল-রাস্তায় ধীর পায়ে টহল দিচ্ছে ক্লিভ হেস্টিংস, এদিকেই আসছে। ভুরু কুঁচকে গেল রনের। হেস্টিংসের সঙ্গে টক্কর দেয়ার মত শারীরিক অবস্থায় নেই এখন। আড়ষ্ট আঙুলগুলো ফুলে আছে, বাকানো যাচ্ছে না, সিন্ধুগানের ট্রিগার গার্ডের ভিতর ঢুকবে না তর্জনী।

ভেজা এক ঝলক দমকা হাওয়া হঠাৎ করেই রনের মাথা থেকে উড়িয়ে নিল হ্যাট। চট করে স্কাট ধরে ফেলল লিজা, ওর কালো চুলের বেণী উড়তে শুরু করল, আলগা কয়েকটা চুল পড়ল কমনীয় মুখের উপর। যেমন হঠাৎ এসেছিল হাওয়া, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল। কাদা ভরা ক্রীকের ভিতর গিয়ে পড়ল রনের হ্যাট। স্রোতে ভেসে দ্রুত চলে গেল বনিলাস সেতুর তলা দিয়ে।

তিক্ত হাসল রন। হাসতেই ক্ষত-বিক্ষত মুখে টান লাগল। নিচু গলায় বলল রন, 'নিউ ইয়র্ক থেকে কিনেছিলাম ওই হ্যাট। আসল বোরস্যালিনো।'

নিউ ইয়র্কের ছক বাঁধা জীবনটা অনেক দূরের মনে হলো রনের, সেই সঙ্গে দুর্বল একটা মুহূর্ত মন চাইল ওখানে ফিরে যেতে। চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল, ক্লিভ হেস্টিংসের দিকে একবারও না চেয়ে লিজাকে নিয়ে ক্যানিয়ন ধরে হাঁটতে শুরু করল। মনে মনে বলল, আমাকে তুমি পিস্তল ফ্ল্যাট থেকে তাড়াতে পারবে না, ক্লিভ হেস্টিংস।

স্পষ্ট বুঝল, ওদের দু'জনকে এক সময় না এক সময় মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে। রক্ত ঝরবে ওই লড়াইয়ে, তারপরও লড়াইটা দ্রুত আসুক, তা-ই চাইল রন।

হাওয়ার্ডস হোটেলের পিছনে বনিলাস ক্রীকের তীরে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে বিনের পুরনো বিন্ডিং। হাওয়ার্ডস হোটেলের ইঁট এসেছে ওয়্যাগনে করে, সেই এল পাসো থেকে; হোটেলের লাল রং করা ঝকঝকে পিছনটার তুলনায়

বিনের দালানের জীর্ণ ইঁট বের হওয়া অ্যাডোবির দেয়াল বেশি দৃষ্টিকটু লাগল।

দালানটা এখনও যথেষ্ট মজবুত, তবে অনেক দিন ধরে রাস্তার এক পাশ খেয়ে ফেলেছে পাড়-ভাঙা বনিলাস ক্রীকের স্রোত। বাড়িটার এক কোনার ভিত্তি একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দোতলা বাড়ির এক তলায় কাঠের শক্ত গরাদ দেয়া ছোট ছোট অনেকগুলো জানালা আছে। রন দেখল; এক লোক ওগুলোর একটার সামনে দাঁড়িয়ে নতুন কাঁচ লাগাতে ব্যস্ত।

সদর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রন, দরজা ফাঁক করে ধরল লিজার জন্য। খেয়াল করল, কজাগুলোতে তেল সদ্য দেয়া হয়েছে। প্রথমেই ছোট একটা রিসেপশন ঘর পড়ল। ওটা থেকে দেখা গেল কয়েকটা দরজা। একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

লিজার পিছু নিয়ে বাম দিকের একটা ঘরে ঢুকল রন, অজান্তেই খেয়াল করল লিজার ভরাট দেহের ছন্দবদ্ধ দোলা, সুডৌল উরু, বুক।

ঘুরে ওর দিকে চাইল লিজা।

হঠাৎ বিচলিত বোধ করল রন, মনে হলো কী যেন চায় ও লিজার কাছে। বোধহয় এমন কিছু, যেটা মুখ ফুটে চাওয়া যায় না।

ব্যাপারটা খেয়াল করল লিজা, দ্রুত এগিয়ে ঘরের মাঝের টেবিলের ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কাটাতে তাড়াতাড়ি করে বলল, 'পর্দাগুলো পছন্দ হয়েছে তোমার, রন?'

জিং ওয়াগের রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে সিগার ধরাল ক্লিভ হেস্টিংস। ধোঁয়ার স্বাদটা মিষ্টি লাগল তার কাছে। পেট ভরে সুস্বাদু নাস্তা খেয়েছে। শরীর-মন ঝরঝরে লাগছে। ফুসফুস ভরে শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ল সে, তারপর রেইলরোড অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটতে শুরু করল। দ্রুত চিন্তা করে চলেছে। প্যাট্রিক টমসনকে দেখতে পেল, রন মার্লোকে পাশ কাটাল প্যাট্রিক। তারপর এক রুক দূরে হাওয়ার্ডস হোটেলের কোনা ঘুরে চোখের আড়ালে রন মার্লো ও লিজাকে চলে যেতে দেখল সে।

আগে কখনও এতটা আত্মভৃষ্টি অনুভব করেনি ক্লিভ হেস্টিংস। রন মার্লো হামলা করে টাকা কেড়ে নিয়েছে সে-অভিযোগ মার্লোর বিরুদ্ধে আনতে রাজি হয়নি রানশার ম্যাক, কিন্তু লিউট ফেরিস যখন ফিরে আসবে, তার মাধ্যমে ডেভ বেল আর অন্য বেশ কয়েকজনকে প্রভাবিত করা যাবে। রন মার্লোকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘোষণা করবে তখন। সে রকম ব্যবস্থা হয়ে গেলেই বড়লোক ব্যাঙ্কারকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় সীমা বেঁধে দেবে সে। হয় শহর ছেড়ে যাও, নইলে জেলে পচে মরো।

রন মার্লোর প্রতিক্রিয়া কী হবে আন্দাজ করতে চাইল হেস্টিংস। সম্ভবত

খেপে উঠবে লোকটা। তবে সে তো আর জানে না, হারা খেলা খেলছে! আগেই হেরে বসে আছে রন মার্লো!

বজ্রপাতের গুড়গুড় আওয়াজ ভেসে এল এলিফ্যান্ট হেড বাট-এর পিছন থেকে। রাস্তায় গোড়ালি সমান উঁচু প্যাচপ্যাচে কাদা। ভারী বাতাসে বৃষ্টির সোদা গন্ধ। শক্ত জমিতে চলে অভ্যস্ত পশ্চিমের যে-কেউ কয়েক দিনেই ক্লান্ত হয়ে যাবে একটানা বৃষ্টিতে। সেই চিন্তাটা মাথায় আসতেই হাঁটবার গতি বেড়ে গেল ক্লিভ হেস্টিংসের। হঠাৎ করেই চমৎকার ধারণাটা জন্ম নিয়েছে তার মনে। নিজের প্রশংসা করল।

সেতু পেরুবার সময় রনকে দেখতে পেল সে, লিজার সঙ্গে বিন-বিল্ডিঙে ঢুকছে বোকাটা। কেন, সেটা জানতে পারলে ভাল লাগত, কিন্তু জানতে হলে সময় ব্যয় করতে হবে। হাতে সময় নেই তার।

মার্শালের অফিসের সামনে প্যাট্রিক টমসনকে ধরে ফেলল সে, পাশে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, ‘এত তাড়া কীসের তোমার?’

থামল প্যাট্রিক টমসন, যাতে ভারসাম্য হারাতো না হয়, সেজন্য সাবধানে ঘুরল। রক্তলাল চোখে হেস্টিংসের দিকে চেয়ে জড়ানো গলায় বলল, ‘নিজের কাজে যাচ্ছি। তোমার কী?’

‘আরেকটু ড্রিঙ্ক হলে কেমন হয়, বলো তো?’ খুশি-খুশি গলায় জিজ্ঞেস করল ক্লিভ হেস্টিংস। ‘চলো, লিউট ফেরিসের ওখানে একটু বসি। বিয়ার যা লাগে না হয় আমিই কিনব। কথা আছে তোমার সঙ্গে— ব্যক্তিগত গোপন কথা।’

সন্দেহে সরু হয়ে গেল প্যাট্রিক টমসনের লাল চোখদুটো। ‘ফেরিস শহরের বাইরে গেছে। তুমি তা জানোও। মনে যা-ই থাক, সেটা নিজের কাছেই রাখো।’ ঘুরে টলমল করতে করতে পা বাড়াল সে।

তার বাহু ধরে ফেলল ক্লিভ হেস্টিংস, এক টানে ঘুরিয়ে দিল নিজের দিকে, তারপর দাড়ি-না-কামানো মুখটা নিয়ে গেল প্যাট্রিক টমসনের নাকের কাছে। ঠোঁট বেকে গেল রাগে, চাপা গলায় বলল সে, ‘আমি কথা বললে না শুনে আর কক্ষনো চলে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না।’

ভয় পাওয়ায় চোখ থেকে বেপরোয়া ভাবটা বিদায় নিল টমসনের।

লোকটা ভয় পেয়েছে দেখে আত্মতৃপ্তি বোধ করল হেস্টিংস, রাগ কমল তার। অপদার্থটার বাহু ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ‘কথা আছে তোমার সঙ্গে— মাতালদের কাছ থেকে টাকা ছিনতাইয়ের ব্যাপারে।’

‘মানে?’ কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল প্যাট্রিক টমসন।

কাঁধ ঝাঁকাল হেস্টিংস, টমসনের চোখের দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি বোধহয় ভুলে গেছ প্রয়োজনে কতটা কঠোর হতে পারে রন মার্লো। কেউ যদি মার্লোকে

বলে দেয় তোমার প্রাপ্য পিটি ওর ওপর গিয়ে পড়েছে, বোধহয় খুশি হও তুমি? তুমি চাইলে আমিই ওকে জ্ঞানাতে পারি।’

কথাটা চিন্তা করে দেখল প্যাট্রিক টমসন, নিজের কাদা মাথা জুতো জোড়ার ডগা থেকে চোখ সরাল না। আবার যখন চোখ তুলে চাইল, ততক্ষণে মনের জোর বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই তার। কাঁধ দুটো সামনে ঝুঁকে এল টমসনের, কুঁজো হয়ে গেল খানিক। শুকনো গলায় বলল, ‘ড্রিঙ্ক নিতে আপত্তি নেই আমার।’

নিষ্ঠুর হাসল ক্লিভ হেস্টিংস।

রেল-রাস্তা পার করে রেল-বাঁধে উঠে ট্র্যাকের কাছে টমসনকে নিয়ে এল সে, ঢুকল লিউট ফেরিসের অফিসে।

বাড়ির পিছনে কোথাও একটা ঘন্টি বেজে উঠল। ক্লিভ হেস্টিংস ও প্যাট্রিক টমসনের পিছনে রাস্তার কাদা ছলকে চার্চের দিকে হেঁটে চলল একটা বাচ্চা ছেলে, এক ঝলক দমকা বাতাস মিউল হিল থেকে ভাসিয়ে আনল যন্ত্রপাতির আবছা শব্দ।

সরাসরি লিউট ফেরিসের থাকবার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ল হেস্টিংস, একটা তাক থেকে তুলে নিল বাদামি বোতলটা। নোংরা একটা জেলি-গ্লাস ঝাঁকিয়ে ভিতরে আটকা পড়া তেলাপোকাকার বাচ্চাটাকে ফেলে দিল সে, বোতল থেকে তরল ঢেলে গ্লাসটা পূর্ণ করে টমসনের হাতে তুলে দিল। নিজে বোতল থেকে চুমুক দেয়ার আগে বলল, ‘সাফল্যের জন্যে।’ টেবিলের পিছনের চেয়ারটায় এবার বসল সে।

আরেকটা চেয়ারে ধপ করে বসল প্যাট্রিক টমসন, বেসুরো কণ্ঠে বলল, ‘এই জঘন্য বৃষ্টি...’ কথার রেশ মিলিয়ে গেল তার। গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে দুর্গন্ধিত চেহারায় হাইস্কিটুকু দেখল।

সিগারের আগুনটা যেরকম উজ্জ্বল, ঠিক তেমনি ভাবেই যেন জ্বলছে ক্লিভ হেস্টিংসের চোখদুটো। চাপা গলায় সে বলল, ‘প্যাট্রিক, লিউট আর আমি রন মার্লোর বারোটা বাজানোর ব্যবস্থা নিচ্ছি। ...চিরতরে।’ নড়েচড়ে বসে টমসনের উপর নিষ্পলক চোখ রাখল সে। ‘প্যাট্রিক, ওই রন মার্লো তোমার বউয়ের সমস্ত মন-প্রাণ দখল করে রেখেছে।’

ধীরে ধীরে মাথাটা উঁচু করল প্যাট্রিক টমসন, চেহারায় প্রকাশ পেল তীব্র রাগ, হিংসা, ক্ষোভ। কোনও কথা বলল না। অপেক্ষা করছে হেস্টিংস কী বলে শুনবার জন্য।

ক্লিভ চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কখনোই লিজার জন্যে যথেষ্ট ছিলে না, তা-ই না, প্যাট্রিক? রন মার্লো বোধহয় যথেষ্ট। ...কি বলো?’

টেবিলের উপর রাখা টমসনের হাতদুটো আস্তে আস্তে মুঠো পাকিয়ে গেল।

রুদ্ধস্বরে বলল সে, 'এসব বলার কারণ কী তোমার, ক্লিভ?'

ঠোট প্রসারিত করে হাসল ক্লিভ হেস্টিংস, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'লিউট আর আমি রন মার্লোর লেজে টিনের কৌটা বাঁধব। তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না প্যাট্রিক টমসন, দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'ধরে নাও আমি আছি।'

হাতটা বাড়িয়ে দিল হেস্টিংস, গম্ভীর স্বরে বলল, 'সেজন্যে খরচা করতে হবে তোমাকে। ম্যাকের কাছ থেকে পাওয়া টাকাগুলো ফেরত দাও আমাকে।'

সেদিনই দুপুরের পর শহরে রেলগাড়ি ঢুকবার আওয়াজ পেয়ে নিজ অফিস থেকে লিউট ফেরিসের অফিসে চলে এল ক্লিভ হেস্টিংস, ফেরিসের আইনের বইয়ের র্যাকে আরাম করে কাদামাথা বুটসহ পা তুলে দিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

বাড়ি ফিরে তাকে নিজের টেবিলের পিছনে আর্দ্র করে বসে থাকতে দেখল লিউট ফেরিস। দরজায় থমকে দাঁড়াল সে। আকাশ মুখ কালো করে আছে বলে তার আকৃতি দেখতে আবছা লাগল। দাঁত খিলাল করবার ফাঁকে হেস্টিংসকে কিছুক্ষণ দেখল সে, তারপর ঘরে ঢুকে মেঝেতে নামিয়ে রাখল তার ব্যাগ।

'কী হলো?' গলার গভীর থেকে উঠে এল ক্লিভ হেস্টিংসের প্রশ্নটা।

'অপেক্ষা তোমাকে বিরক্ত করে তোলে, নাকি, ক্লিভ?' টেবিলের কোনায় বসল ফেরিস।

ঘোঁৎ করে উঠল হেস্টিংস। 'শুধুই বসে থেকে সময় নষ্ট করিনি আমি। আরও কিছু কাজ করেছি।'

মাথা কাত করে জিজ্ঞাসা নিয়ে চাইল লিউট ফেরিস।

'লেজ কেটে দিয়েছি রন মার্লোর,' বলল হেস্টিংস।

দাঁত বের করে হাসল লিউট ফেরিস, প্রবল আগ্রহের ছাপ পড়ল তার চেহারায়।

রসিয়ে রসিয়ে রনের মার খাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করল ক্লিভ হেস্টিংস। তার কথা শেষ হওয়ার পর লিউট ফেরিস বলল, 'এমন হতেই পারে, রন মার্লো ভাবতে শুরু করবে দরকারের চেয়ে বেশি দিন ধরে পিস্তল ফ্ল্যাটে রয়ে গেছে ও।'

হেস্টিংস বলল, 'যা ওর প্রাপ্য তা-ই পাচ্ছে মার্লো। অন্য কেউ হলে এক সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থেকে সুস্থ হয়ে উঠে শহর ছেড়ে ভাগত, কিন্তু মার্লোকে দেখলাম ভোরে হোটেল থেকে বেরিয়ে লিজা টমসনের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর সারা দিন মিউল হিলে গিয়ে মাইনারদের কাজও দেখাশোনা করেছে।'

মনের একান্ত জিজ্ঞাসাটা এবার করল সে, ‘তোমার কাজের কত দূর?’

টেবিল থেকে উঠে টেবিলের এপাশের চেয়ারটাতে বসল ফেরিস, একহাতে আরেক হাতের আঙুল টানতে টানতে বলল, ‘প্রথম কথা হলো, তুমি যখন জর্জ ব্রাউন আর তার লোকদের সামনে খালি মানিব্যাগ দুলিয়ে তাদের উত্তেজিত করে তুললে, আর তারপর আরামে দাঁড়িয়ে রন মার্লোকে মার খেতে দেখলে, আমি তখন বসে নেই। এল পাসোতে কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের পিছু নিয়ে সারা শহর ঘুরতে হয়েছে আমাকে। কাজটা সহজ হয়নি, চডুই পাখির মত ফুডুৎ-ফুডুৎ করে এখানে ওখানে গেছে কর্নেল।’

খাটো একটা বেঁটে সিগার দাঁতে কামড়ে ধরল ক্লিভ হেস্টিংস। চোখ দুটো মার্বেলের মত শীতল কঠিন হয়ে উঠল তার।

আবার শুরু করল লিউট ফেরিস: ‘সংক্ষেপে বলতে গেলে, মার্শল্যাণ্ড কথা সেরে বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই নয় জন ব্যাঙ্কারের সঙ্গে দেখা করেছে। সবার কানে তুলে দিয়েছি জেমার বলা কথাগুলো— টাকার জন্যে মার্লো ও মার্শল্যাণ্ড যে-পিলারগুলোর ওপর ভরসা করছে, তাদেরকে জামানত হিসেবে ওগুলো দিতে চাইছে কর্নেল; কিন্তু আসলে সেখানে আমার কোনও অস্তিত্বই নেই।’

হেলান দিয়ে বসে ক্লিভ হেস্টিংসের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকল ফেরিস।

‘কাজ হলো তাতে?’ জিজ্ঞেস করল হেস্টিংস। সিগারটা ধরাল।

‘তোমার আগামী মাসের বেতনের টাকার বদলে আমার পরবর্তী প্রাপ্য ফী বাজি রাখতে পারি। যারা কর্নেলকে ধার দেবে বলে কথা দিয়েছে, তারা দেবে না ধার। খুব কম টাকাই জোগাড় করতে পারবে মার্শল্যাণ্ড।’ জিভ দিয়ে ঠোট ভিজিয়ে হেস্টিংসের চোখে চাইল ফেরিস। ‘আজকে রাতের ট্রেনে ফিরছে সে।’

‘এলে খালি হাতে আসবে না, কর্নেল,’ বলল হেস্টিংস। ‘আর এদিকে মার্লোকে এখানে বেশি দিন থাকতে দেয়াও ঠিক হবে না।’ চিন্তায় ডুবে গেল সে, তারপর বলল, ‘মজুরি না পেলে কাজ করবে না খনি-মজুররা। খনি থেকে তামাও উত্তোলন করা যাবে না তা হলে। টিকে থাকার জন্য রন মার্লোকে খনি চালু রাখতেই হবে।’

‘আর বিক্রি যদি করে দেয় খনিটা,’ যোগ করল লিউট ফেরিস, ‘আমরা কিনতে পারব সে-সম্ভাবনাই বেশি। ...তুমি আর আমি।’

তার দিকে চেয়ে প্রায় দয়ার হাসি হাসল ক্লিভ হেস্টিংস। ‘আর সম্ভবত ডেভ বেল। ডেভ বেল পক্ষে থাকলে আমাদের অনেক সুবিধে।’ টেবিলে কনুই রেখে এবার জিজ্ঞেস করল সে, ‘আর তোমার অন্য কাজগুলো?’

কোটের ভিতরের পকেট থেকে দুটো আইনী কাগজ বের করল লিউট ফেরিস, হেস্টিংসের হাতে ধরিয়ে দিল।

চোখ বোলাল হেস্টিংস, পড়তে শুরু করায় ঠোট নড়তে শুরু করল তার।

আস্তে আস্তে কাঠিন্য বিদায় নিল চেহারা থেকে, হাসি ফুটে উঠল মুখে। চোখ তুলে লিউট ফেরিসের দিকে চাইল হেস্টিংস।

‘বাজি মেরে দিয়েছ তুমি,’ বলল ফেরিস।

‘কীভাবে?’

‘আসার পথে কাউন্টি সিট হয়ে এসেছি। আমাকে মনে আছে শেরিফের। তোমাকেও। পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে ক্লার্ক ফাওলকে চলে যেতে হওয়ায় ভীষণ রেগে গেছে শেরিফ। আমি তাকে জানিয়েছি, জরুরি ভিত্তিতে এখানে একজন ডেপুটি শেরিফ দরকার। সে যতক্ষণ কাউকে দিতে পারছে না, ততক্ষণ আমিই ডেপুটি শেরিফের দায়িত্ব পালন করব।’ মাথা কাত করে কাগজগুলোর একটা দেখাল লিউট ফেরিস। ‘বাজি হয়েছে সে। ওই রিবন আঁটা সিলমারা কাগজ আমার নিয়োগ-পত্র।’

‘পড়তে জানি আমি,’ দাঙ্কি সুরে বলল ক্লিভ হেস্টিংস। ‘অন্য কাগজটার ব্যাপারেই আমার আগ্রহ বেশি।’

ওটা একটা ফর্ম, ফাঁকা জায়গাগুলো সুন্দর হাতের লেখায় পূরণ করা হয়েছে।

‘এটা পকেটে রেখে দাও, হারায় না যেন,’ সতর্ক করল ক্লিভ হেস্টিংস। ‘কালকে সকালে খনিতে গিয়ে দুটো কাগজ মিস্টার মার্লোকে দেখাব আমরা।’

পরদিন সকাল নটা। আবার থেমে গেছে বৃষ্টি, তবে কালো মেঘগুলো ঝুলছে মাথার কাছে, মনে হয় যেন হাত বাড়ালেই ওগুলোকে ছুঁয়ে দেয়া যাবে।

ফ্লিস্টস্টোন ফেনটনের সঙ্গে হয়েস্ট ইঞ্জিনিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রন। পরীক্ষামূলক ভাবে খনিজ তুলবার ঢাকনিহীন খালি ধাতব বাক্স নামাতে শুরু করল ইঞ্জিনিয়ার।

হঠাৎ একটু দূরে প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল একটা সেফটি ভালভ। বয়লার থেকে তীক্ষ্ণ শব্দে ছিটকে বেরুল সাদা বাষ্প।

পুলি পার হয়ে মোটা মোটা কেবলগুলোর চলে যাওয়ার শব্দ, বা অলস ইঞ্জিনের একটানা গুঞ্জন যেন খনির সঙ্গে জড়িত সবার কানে মধু ঝরাচ্ছে।

এক শ’ ফুট গভীরতা ছাড়িয়ে নেমে গেল বাক্স। ওখানেই হাই-গ্রেডারদের মোকাবিলা করেছিল রন ও ফ্লিস্টস্টোন ফেনটন। ছাড়িয়ে গেল বাক্স দু’ শ’ ফুট গভীরতাও। তারপর তিন শ’ ফুট। সরসর করে নামছে কেবলগুলো, সেই সঙ্গে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাক্স।

হয়েস্ট ইঞ্জিনিয়ার চিৎকার করে বলল, ‘পুরো নেমে গেছে, ফেনটন!’

হাত তুলল ফ্লিস্টস্টোন ফেনটন। ‘তাড়াতাড়ি ওঠাও! কেবল টাইট দাও দেখি!’

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিনিয়ার। কর্কশ হয়ে উঠল ইঞ্জিনের আওয়াজ। বয়লারে আরও শুকনো জুনিপার কাঠ দিল ফায়ারম্যান।

টুল-শ্যাকের কাছে দাঁড়ানো কয়েকজন কাজ বন্ধ করে কী ঘটছে দেখতে ঘুরে চাইল। উঠে আসছে বায়ুটা। উইণ্ডে ক্রমেই জমছে আরও কেবল, মসৃণ ভাবে পের্চিয়ে বসে যাচ্ছে জায়গামত।

তারপর মাটির উপর উঠে এল বায়ু। চওড়া হাসি নিয়ে রনের দিকে চাইল ইঞ্জিনিয়ার, তেলমাথা হাত দিয়ে পিছনে ঠেলল হ্যাট। সাদা কপালে কালো একটা দাগ পড়ল তার। ‘সব ঠিক,’ মাথা দুলিয়ে বলল।

কথা বলতে ফ্লিটস্টোন ফেনটনের দিকে ফিরল রন, ওর চোখ চলে গেল তাকে ছাড়িয়ে। হড়হড় করে নীচের ক্যানিয়নে বনিলাস ক্রীকে গিয়ে পড়ছে বৃষ্টির পানির স্রোত, চলে যাচ্ছে শহরের দিকে।

ওদিক থেকে খনির দিকে আসছে ছ’সাতজন লোক।

‘ঝামেলা,’ বলল ফেনটন। ‘ওই যে লিউট ফেরিস আর ক্লিভ হেস্টিংস। অন্যদের আগে আগে আসছে।’

টুলশেডের দিকে হাতের ইশারা করল রন, ফায়ারম্যানকে বলল, ‘ওখানে চলে যাও। ছেলেরাও বোলো চোখের আড়ালে থাকতে। কিন্তু দরকার পড়লে যেন দেরি না করে চলে আসে।’

জমে থাকা পানিতে ছপছপ আওয়াজ তুলে চলে গেল ফায়ারম্যান। এবার রন বলল, ‘যদি কোনও ঝামেলা হয়, আমি সামলাব, ফেনটন। তোমরা জড়াতে যেয়ো না।’

‘ব্যাপারটা যদি খনি বিষয়ে হয়, দূরে থাকতে পারব না আমি,’ প্রতিবাদের সুরে বলল ফেনটন। ‘ছেলেরাও কেউ তখন ছাড়বে না ওদের। ওই যে, মার্শালের সঙ্গে যারা আসছে, তাদের ভিতর আমাদের তাড়ানো ওই হাই-গ্রেডারগুলোকেও দেখছি। কেউ আমরা অনেক দিন ধরে নিয়মিত খেতে পাই না, খনি চালু হলে যদি আমাদের ছেলে-মেয়েদের পেট ভরাতে পারি, আমাদের পেটে খাবার পড়ে, তো নিজ স্বার্থ রক্ষা করতে লড়ব আমরা, মিস্টার মার্শো।’

প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে রনের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অন্যদের নিয়ে রনের আরেক পাশে এসে দাঁড়াল ইঞ্জিনিয়ার।

‘লড়বে কী দিয়ে?’ হালকা সুরে জিজ্ঞাসা করল রন। ‘ওদের সবার কাছে অস্ত্র আছে।’

‘তোমার কাছেও আছে।’

‘কিন্তু তোমাদের কাছে নেই।’

জড় হওয়া লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করল ফেনটন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। রন ছাড়া সবাই অনুসরণ করল তাকে।

তিন ফুট লম্বা আধ ইঞ্চি ব্যাসের একটা কালো পাইপ তুলে নিয়ে তত্ত্ব বয়লারের পাশে বসল ফেনটন, পাইপটা দেহের আড়ালে রেখে ওটা দিয়ে গুঁড়ির একটা পাশ খোঁচাতে শুরু করল। পাইপের যেটুকু দেখা গেল, সেটা দেখে মনে হতে পারে তার হাতে ওটা একটা শটগান, নলের খানিক দেখা যাচ্ছে শুধু।

আন্তে আন্তে হাসি ফুটে উঠল রনের চেহারা। মুখের কাটা-ছেঁড়ায় টান পড়ায় ব্যথা পেল।

‘উত্তেজিত মানুষ সহজে বুঝবে না পাইপ আর টুয়েলভ গেজ শটগানের তফাৎ,’ বলল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন। ‘ওদের উত্তেজিত করে তোলা তোমার দায়িত্ব, মিস্টার মার্লো।’

ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যরাও ফেনটনের মত একই ভাবে বসে পড়ল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একা হয়ে গেল রন, কিন্তু মোটেই একা বোধ করল না। ক্লিভ হেস্টিংস তিরিশ গজ দূরে থাকতে হঠাৎ সিঁকান বের করে ফেলল ও, অন্ততটা হেস্টিংসের বুকে তাক করে উঁচু গলায় বলল, ‘আর এগোবে না। বিনা অনুমতিতে অনধিকার প্রবেশ করেছে তোমরা।’

হেস্টিংসের পাশে থমকে দাঁড়াল লিউট ফেরিস। অন্যরা জড় হলো তাদের পিছনে। হাই-গ্রেডার শিফ ও তার সঙ্গীকে চিনতে পারল রন। কাজের পোশাক পরে আছে অন্য দু’জনও। এদেরও হেস্টিংসের মাইনার বলে মনে হলো ওর।

‘যা বলছ তার উল্টো, মার্লো!’ চিৎকার করে জানাল লিউট ফেরিস। ‘অনধিকার প্রবেশ করেছে আসলে তুমি নিজে।’ ফেনটন, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যদের দিকে চট করে চাইল সে। জীতি সামলে নিয়ে বলল এবার, ‘এখানে আমরা লড়তে আসিনি, মার্লো।’

‘তা হলে জীবনে এই প্রথম শয়তানি বুদ্ধি ছাড়া আমার কাছে আসতে চাইছ তুমি,’ নির্বিকার ভাবে মন্তব্য করল রন, ‘যদি কথা বলতে চাও, তো ফেরত পাঠাও তোমার পেছনের ওদের।’

ফিসফিস করে হেস্টিংসকে কী যেন বলল লিউট ফেরিস। রাগে টকটকে লাল হয়ে গেল হেস্টিংসের চেহারা, জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

সিকানানের হ্যামারটা বুড়ো আঙুলে তুলে রন বলল, ‘যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে তোমাদের।’ অলস ইঞ্জিনের মৃদু আওয়াজের উপর দিয়ে শোনা গেল হ্যামার কক করবার ধাতব ক্লিক শব্দ।

পরবর্তী কয়েকটা সেকেণ্ড কাটল শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনায়। তারপর বয়লারে জমে যাওয়া বাড়তি বাষ্প বিকট শব্দে বের করে দিল সেফটি ভালভ। আকাশে উঠে গেল সাদা বাষ্পের একটা পিলার। সেফটি ভালভের আওয়াজটা চমকে দিল হেস্টিংস ও তার সঙ্গীদের। সবচেয়ে পিছনের লোকটা হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল শহরের দিকে। অন্য তিন হাই-গ্রেডারও সামান্য

ইতস্তত করে পিছু নিল তার। লিউট ফেরিসের পাশে অনড় দাঁড়িয়ে রইল ক্লিভ হেস্টিংস।

‘কথা বলতে চাই, মার্লো,’ জানাল ফেরিস।

‘তা হলে কাছে এসো। ...হেস্টিংস, যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়াবে।’

একা এগিয়ে এল লিউট ফেরিস, রনের পাঁচ ফুট দূরে ঢালের খানিক নীচে দাঁড়িয়ে আস্তে করে হাত ঢোকাল কোটের পকেটে।

সঙ্গে সঙ্গে ফেরিসের বুকে অস্ত্র তাক করল রন।

বরফের মত জমে গেল লিউট ফেরিস। তার পিছন থেকে নিচু গলায় বলল হেস্টিংস, ‘ভুল বুঝছ তুমি, মার্লো। ও শুধু কয়েকটা কাগজ দেখাতে চাইছে তোমাকে।’

‘ফেনটন।’ মাথা কাত করে ইশারা করল রন।

বয়লারের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল ফ্লিন্টস্টোন। ভীত চোখে তার দিকে চাইল লিউট ফেরিস। রন বলল, ‘কোটের ভেতরে হাত ভরে দেখো কী আছে ওর কাছে।’

বিরাট হাতটা রুম্ফতার সঙ্গে ফেরিসের কোটের ভিতর ভরে দিল ফেনটন, একটু হাতড়ে নিয়ে বলল, ‘অস্ত্র আছে ওর কাছে, তবে অন্য দিকের পকেটে।’ অনেক উপর থেকে রাগের সঙ্গে ফেরিসকে দেখে নিল সে, তারপর কোটের ভিতরের পকেটগুলো আরও ভাল ভাবে হাতড়াতে শুরু করল। জিজ্ঞেস করল এবার, ‘এই কাগজগুলোই তো, বাটকু উকিল?’

রেগে গেলেও মাথা ঝাঁকাল লিউট ফেরিস। কাগজগুলো বের করে নিয়ে রনের হাতে দিল ফেনটন, তারপর পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের মত।

ফেরিস বলল, ‘ওপরের কাগজটা ডেপুটি শেরিফ হিসেবে আমার নিয়োগ-পত্র।’

‘আগের পদের চেয়ে ডেপুটি শেরিফের পদটার গুরুত্ব বেশি, তা জানতাম না,’ শুকনো গলায় বলল রন।

এ-কথার কোনও জবাব দিল না ফেরিস, বলল, ‘ডেপুটি শেরিফ হিসাবে অন্য কাগজটা তোমাকে দেখানো আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

কী লেখা আছে পড়ল রন, তারপর আড়ষ্ট চেহারায় তুলে দিল কাগজটা ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের হাতে। নির্দেশনামাটা পড়ে রাগে ফেটে পড়ল ফেনটন, চিৎকার করে উঠল, ‘আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়েছে!’

রন বলল, ‘আদালতের নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব ততটাই, যতটা জোরাল নিষেধাজ্ঞা দেয়ার কারণটা।’ ফেরিসের দিকে চাইল। ‘আদালতে তুমি বলতে চাও এই খনিতে কাজ করার কোনও অধিকার নেই আমাদের, তা-ই না?’

‘হ্যাঁ,’ জবাব দিল ফেরিস।

‘আমার ধারণা ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছ তুমি,’ শুকনো ঠেকল রনের গলার ভিতরটা।

বোমার মত ফেটে পড়ল ফেনটন, ‘এক শ’ পঞ্চাশ মাইল দূরের কোনও জাজ কী করে জানবে এখানে কী ঘটছে!’ চোখ গরম করে লিউট ফেরিসকে ভস্ম করে দেবে যেন সে, হাতদুটো মুঠো করে লিউট ফেরিসের নাকের নীচে নিয়ে দোলাল, তারপর বাজ পড়া কণ্ঠে বলল, ‘খুদে বাঁদর, তুমি যা করতে চাইছ সেটা হয়তো আইনসম্মত হবে, কিন্তু আমি তোমাকে যা করব, সেটা মোটেই আইনসম্মত হবে না।’

হতচকিত লিউট ফেরিস এত দ্রুত পিছিয়ে গেল যে, আরেকটু হলেই পিছলে পড়ে আছাড় খেত।

অসহায় বোধ করল রন, মনে হলো অতল জলে ডুবে যাচ্ছে। আক্রোশ চাপতে কষ্ট হলো ওর। বাড়িয়ে ধরল কাগজগুলো। সাহস করে ওগুলো নিতে কাছিয়ে এল লিউট ফেরিস।

চাপা স্বরে রন বলল, ‘ফেনটন, সামলে রাখো নিজেকে। আদালতের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে যেতে পারব না আমরা।’

গলা বুজে এল ফ্লিণ্টস্টোন ফেনটনের, রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ‘কুকুরের বাচ্চা ভাল করেই জানে আমাদের বউ-বাচ্চার মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিচ্ছে ও।’

‘তুমিই জিতলে, ফেরিস... আপাতত,’ বলল রন। ‘কিন্তু নিজের ভাল বুঝলে তাড়াতাড়ি এখান থেকে ভাগো, ছেলেদের হয়তো শেষ পর্যন্ত ঠেকাতে পারব না আমি। ...ঠেকাতে চাইব, তা না-ও হতে পারে।’

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে লিউট ফেরিসকে দ্রুতপায়ে ক্লিভ হেস্টিংসের কাছে চলে যেতে দেখল রন। কী যেন আলাপ করল দু’জন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঢাল বেয়ে শহরের দিকে নেমে চলল।

ইঞ্জিনের কাছে দাঁড়ানো লোকগুলোকে হাতের ইশারা করল রন। ‘ইঞ্জিন বন্ধ করে দাও। আজকের মত খনিতে আমাদের কাজ শেষ।’

এগারো

আজকের মত খনিতে কাজ শেষ, মনে মনে বলল রন মার্লো। হয়তো চিরদিনের জন্যই শেষ।

হোটেলে নিজ ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে রন। মিশেল বসে আছে ঘরে, একটা চেয়ারে।

দরজা থেকে রনের দিকে চাইল নিক হাওয়ার্ড। বলল, ‘মনে হচ্ছে ভাল বিপদেই ফেলতে পেরেছে ওরা তোমাকে, রন।’

কাঁধ ঝাঁকাল রন। ‘আগেও এরকম অনেক বিপদে পড়েছি। ...বিপদ থেকে বেরিয়েও এসেছি।’

মিশেল বলে উঠল, ‘রন, জানি খনিটা তোমার কতখানি, কিন্তু ভবিষ্যৎ কি দেখতে পাচ্ছ না তুমি? যা ঘটেছে সেটা ভালর জন্যেই ঘটেছে। হবার কথা ছিল বলেই এরকম হয়েছে। এবার বাবা ফিরে এলেই নিউ ইয়র্কে ফিরে যাব আমরা। ...করার তো আর কিছু নেই, তা-ই না, রন?’

বৃষ্টিস্নাত দিনের স্নান আলায়ে বনিলাস ক্রীকে বয়ে যাওয়া বাদামী রঙের কাদাটে পানির দিকে চাইল রন। দুরন্ত পানির কলধ্বনি ভেসে এল ওর কানে। মিশেলকে কী বলবে ভাবতে শুরু করল, কিন্তু ও কিছু বলবার আগেই মুখ খুলল নিক হাওয়ার্ড: ‘সারাজীবন ধরেই আমার বুকে একটা বিদ্রোহী বাস করে, রন।’

ঘুরে হোটেল-মালিকের দিকে চাইল রন, বুঝতে চেষ্টা করল কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ, তারপর বলল, ‘বিদ্রোহীদের জীবনটা সহজ নয়, নিক, অনেক কষ্ট সহিতে হয় তাদের। এখন যদি পিছিয়ে যাও তুমি, সেটাকে কাপুরুষতা মনে করব না আমি।’

‘আমিও সে-ব্যাপারেই কথা বলছি,’ বলল হাওয়ার্ড। ‘পিছিয়ে যেতে রাজি নই আমি। ক্লিভ হেস্টিংস, লিউট ফেরিসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি; সম্ভবত ডেভ বেল আর ম্যাক পিলারের সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক থাকবে না আমার।’ কাঁধ জোড়া শক্ত করল নিক হাওয়ার্ড, শিথিল বুক টানটান করল। মাঝবয়সী এক লোক সে, ইচ্ছা করে রুখে দাঁড়াতে চাইছে, অথচ লড়তে অভ্যস্ত নয়। হাস্যকর লাগল তাকে দেখতে। আবার বলল সে, ‘তবে এসব বলতে

এখানে আসিনি আমি, রন।' চট করে মিশেলকে একবার দেখে নিল হাওয়ার্ড। 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে বোধহয় পেছন-দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে মেইমি।'

আঁতকে উঠল বিস্মিত মিশেল। মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

রন বলল, 'ঠিক আছে, ওকে বলো আমি আসছি।'

'রন!' তীক্ষ্ণ স্বরে আপত্তি তুলল মিশেল, 'তুমি কিছুতেই ওই... ওই... মেয়েমানুষটার সঙ্গে দেখা করবে না!'

হঠাৎ কৌতূহলী দৃষ্টিতে মিশেলের দিকে চাইল নিক হাওয়ার্ড, তারপর বলল, 'ওকে এ-ঘরে আসতে বললে কেমন হয়?'

'হোটেলটা তোমার,' বলল রন। 'ওকে ঢুকতে দেবে কি না সে-সিদ্ধান্তও তোমাকেই নিতে হবে।'

'রন!' প্রায় চিৎকার করে উঠল মিশেল, কিন্তু নিক হাওয়ার্ড চলে যাওয়ার পরেও চেয়ার ছেড়ে উঠল না।

মৃদু গলায় ওকে বলল রন, 'এ-ঘরে থাকতে হয়তো ভাল লাগবে না তোমার।'

'না, থাকব,' আড়ষ্ট শোনালা মিশেলের কণ্ঠ। রনের দিকে চাইল, চোখ যেন হিসেব কষছে কীসের। মেইমি যখন দরজায় এসে দাঁড়াল, তখনও ওভাবেই রনের দিকে চেয়ে আছে ও।

'এসো, মেইমি।' জানালা থেকে সরে দাঁড়াল রন।

আগেরবার যখন কথা হলো, তখনকার সেই আত্মবিশ্বাসী মেইমি যেন সে আর নেই, পার্লারের অতি পরিচিত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে অস্বস্তিতে ভুগছে সে। তার উপর মিশেলের উপস্থিতি আরও বিচলিত করে দিল তাকে। দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল মেইমি, বলল, 'যা বলার এখানে দাঁড়িয়ে বলে চলে যাব আমি। শুনলাম অনেক টাকা দরকার তোমার। আমার কাছে জমানো আছে বেশ কিছু টাকা। সত্যি যদি খনি চালু হয়, আর সবাই যেমন বলছে তেমনি করে শহর জমে ওঠে, সবার রোজগার বেড়ে যায়, তো খনি চালু করার জন্যে টাকা ধার দিতে কোনও আপত্তি নেই আমার।'

রন কিছু বলবার আগেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল মিশেল: 'তা হলে শেষ খবর জানো না তুমি। খনিটা আবার নিয়ে নিয়েছে মিস্টার হেস্টিংস।'

চট করে ঘুরে মিশেলের দিকে চাইল মেইমি, তার দ্বিধাস্থিত দৃষ্টি বারকয়েক ঘুরল রন ও মিশেলের উপর, তারপর মেইমি বুঝতে পারল, যা বলেছে, তার পরেও আরও না বলা কথা আছে মিশেলের।

একটু থমকে গিয়ে বলল মেইমি, 'কথাটা শুনেছি। কিন্তু জানি আমাকে ভোবাবে না রন মার্লো। একটা কাগজের ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নয় ও।

আমার মন বলছে হাল ছেড়ে দেবে না রন।' রনের দিকে চাইল সে। 'ক্লিভ হেস্টিংস জানে বিল ট্রেইসিকে ক্লার্ক ফাওলের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছি আমি। ফাওলও জেনে গেছে। ও যদি আবার ফিরে আসে, খুন করে ফেলবে আমাকে। ওই তিনজন... ফাওল, হেস্টিংস আর ফেরিস মিলে অনেক দিন ধরে নিয়মিত চাঁদা নিচ্ছে আমার কাছ থেকে। ব্লেকের মত আরও অনেকের রক্তই বছরের পর বছর চুষছে শয়তানগুলো। ওদেরকে চির দিনের মত ঘাড়ের ওপর থেকে নামাতে যা করা দরকার, করতে রাজি আছি আমি। টাকা যদি কাজে আসে, টাকা নিতে পারো তুমি, রন।'

রন ধীরে ধীরে বলল, 'আসলে... ধন্যবাদ, মেইমি; তবে আপাতত দরকার নেই টাকা।'

'লাগলে বলতে দ্বিধা কোরো না,' যান্ত্রিক কণ্ঠে আবারও বলল মেইমি, 'ক্লার্ক ফাওল যদি খুন করেই ফেলে আমাকে, তার আগে তোমার উপকারে আসতে চাই।' ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল সে করিডর ধরে।

মেইমির পায়ের আওয়াজ দূরে চলে যেতে শুনল রন, দুঃখ বোধ করল মহিলার জন্য। দিনগুলো কঠিন হয়ে উঠছে মেইমির। হয়তো শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু হবে না ওর।

হঠাৎ প্রশ্ন করল মিশেল, 'ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?'

মৃদু হাসল রন। 'চাইনি তাকাতে। আসলে তুমি এত সুন্দর; আর এত বিব্রত, আহত বোধ করছিলে মেইমির কথায়, যে...'

'আমি হয়তো ভুল ভাবছি, রন,' নিচু গলায় বলল মিশেল। 'হয়তো এদের সবার জন্যে থেকে যাওয়াই উচিত তোমার, লড়া উচিত এদের হয়ে। আমি... আমি... জানি না কোন্টা ঠিক। ...বাবা ফিরে এলে...' হাতের নড়াচড়ায় দ্বিধা প্রকাশ পেল মিশেলের। 'যদি আমরা থেকেই যাই, আর ওই মেয়েমানুষের টাকা নিই...'

'বিল ট্রেইসিও ধার দিতে চেয়েছে।'

'বিল ট্রেইসি।' ভুরু কুঁচকে উঠল মিশেলের। 'কিন্তু এদের টাকা নিলে সেটা কি নৈতিক কাজ হবে? অন্তরের সাহায্য নিয়ে শুভকে পরাজিত করা হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা?'

'শুভটা কোথায় দেখলে?' হঠাৎ খুব ক্লান্তি বোধ করল রন।

'মিস্টার হেস্টিংস, মিস্টার ফেরিস, মিস্টার বেল...'

কাঁধ ঝাঁকাল রন। 'ডেভ বেলের কথা হয়তো আলাদা। পিলারও হয়তো খারাপ লোকের কথায় ভুল পথে আছে, কিন্তু হেস্টিংস আর ফেরিস...'

রনকে থামিয়ে দিল মিশেল। 'আইন আর নিয়মের প্রতিনিধিত্ব করে তারা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রন। 'শুধু তাদের নিজ পক্ষে যাবে এমন আইনের

প্রতিনিধিত্ব করে তারা, মিশেল। ওই আইন আমাদের জন্যে নয়, অন্য কারও জন্যেও নয়— আর কারও স্বার্থ দেখবে না তাদের তৈরি আইন। নিজেদের উন্নতি হলে শহরের সবার উন্নতির পথে বিনা দ্বিধায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে হেস্টিংস বা ফেরিস।’

সেদিন দুপুরের বেশ পরে, দেহিতে রওনা হলো বুলেট ট্রেন— দুটো বক্স কার ও জর্জ ব্রাউনের ঘোড়াগুলোর জন্য বেশ কয়েকটা স্টক কার নিয়ে। জংশনে টেলিগ্রাফারের হলুদ কুটিরটা বুলেট ট্রেনের দেহির কারণ। টেলিগ্রাফার খবর দিল, এল পাসো থেকে রওনা দেয়া নাম্বার নাইন লেট করেছে। কিন্তু দেহির মূল কারণ নাম্বার নাইন এসে পৌছানোর পর বুলেট ট্রেনে যাত্রীদের মালামাল তোলা নিয়ে হাঙ্গামা।

সন্ধ্যার আবছায়া যেন দ্রুতই ঘনাল আজ। নাম্বার নাইন যখন জংশনে এসে থামল, তার আগেই বগির ভিতর বাতি জ্বালানো হয়ে গেছে। সাবধানে রেললাইন পার হলো কর্নেল মার্শল্যাণ্ড, ঝিরঝিরে বৃষ্টির ভিতর চলে এল বুলেট ট্রেনের কাছে।

কর্নেলের ফুলে ওঠা ব্রিফকেসের দিকে চাইল বুড়ো জ্যাক ওয়েড, তারপর বলল, ‘যাঁর কারণে রওনা দিতে দেহি করতে হলো, তাঁকে আস্ত একটা সিট না দেয়ার কোনও কারণ দেখি না। বসে বসে কাজ করতে পারবেন আপনি।’ চারপাশে একবার তাকিয়ে নিল ওয়েড। ‘ছাব্বিশ বছর ধরে এই কোম্পানির রেলরোডে আছি, কিন্তু যেখানে এখনও কিছুই নেই, সেখানে যাওয়ার জন্যে কখনও মানুষকে এতো তাড়াহুড়ো করতে দেখিনি।’

মৃদু হাসল কর্নেল। ‘শীঘ্রি ওখানে অনেক কিছু হবে। পুবে কাজ নেই, এখানে কাজ পাবে জেনে পাগল হয়ে ছুটে আসছে মানুষ। এরাই গড়ে তুলবে পিস্তল ফ্ল্যাট।’ হাসিটা চওড়া হলো তার। ‘বাজারে মজুরের সংখ্যা যত বেশি, মজুরির হার তত কম।’

জ্যাক ওয়েডের পিছু নিয়ে কোচের ধাপ বেয়ে উঠতে উঠতে কর্নেল ভাবল, মজুরি যত কম, লাভ তত বেশি। টাকা। হাতে অনেক নগদ টাকা থাকা দরকার এখন।

সেই এল পাসো থেকে টাকার চিন্তা করেছে কর্নেল। তার অনুরোধে যারা টাকা ধার দেবে বলে কথা দিয়েছিল, পরেরবার দেখা করে টাকা আনতে গেলে রহস্যজনক ভাবে তাদের তিনজন বাদে অন্যরা সবাই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

বগির শেষ মাথায় ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টের পাশে কর্নেলকে সিট দিল জ্যাক ওয়েড। ‘এখানে আপনাকে বিরক্ত করবে না কেউ, যাত্রীদের ওঠা-নামার সময়েও অসুবিধে হবে না আপনার। আজকে এত ব্যাগেজ না থাকলে আরও

সামনে সিট দিতে পারতাম।’

সিটের উপর ভারী ব্রিফকেসটা রাখল কর্নেল, ওয়েড চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর খুলল ওটা। ব্রিফকেসের ভিতরে একগাদা কাগজ, নগদ টাকার বাঙিল আর লম্বা ব্যারেলের একটা .৪৪ কোল্ট। এবার একটা প্যাডে হিসাব কর্ষতে শুরু করল মার্শল্যাণ্ড, বগিতে উঠতে শুরু করা যাত্রীদের হই-চৈয়ের দিকে কোনও খেয়াল নেই।

কিন্তু যতই মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন কর্নেল, মাথায় আশঙ্কা উঁকি দিতে লাগল তার। পিস্তল ফ্ল্যাটে কেমিস্ট্রির যে-ধরনের সমস্যা তাকে মোকাবিলা করতে হবে, সেগুলোর সমাধান সে করতে পারবে কি না, তা নিয়ে মনে আশঙ্কা জাগছে না তার মনে, আশঙ্কা জাগছে রনের প্রতি পিস্তল ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের শত্রুতামূলক মনোভাবের কথা চিন্তা করে।

অন্যমনস্ক ভাবে ভাবতে শুরু করল কর্নেল, সে তরুণ ব্যাঙ্কারের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভুলই করেছে কি না, কে জানে। পিছিয়ে যাওয়ার তুলনায় কি বেশি দেরি হয়ে গেছে তার? রনের প্রতি মিশেলের আচরণে ইঠাৎ পরিবর্তনের তাৎপর্য কী? মিশেল তার একমাত্র সন্তান, মনপ্রাণ দিয়ে মিশেলকে ভালবাসে সে, ফলে শুধু হালকা ভাবে খেয়াল করেনি, গভীর মনোযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে মিশেলের পরিবর্তনের কারণ।

একটু পর হাল ছেড়ে দিল মার্শল্যাণ্ড। মন থেকে এমন কী মুছে ফেলল মিশেলকেও; সেটা তার ভালবাসা মেয়ের প্রতি কম বলে নয়, স্মৃতি তাকে মনে পড়িয়ে দিল, মেয়েদের মন বোঝা যায় না, তারা কখন কেন কী করবে তা বুঝবার উপায় নেই কোনও। প্রায় কখনোই কোনও মেয়ে একজন পুরুষকে পুরো ভালবাসে না, তাকে পছন্দ করে না, বদলাতে চায় নিজের মত করে। তারপর যখন সফল হয়, বদলে যায় পুরুষটা, তখন বিরক্তি বোধ করে।

শেষ পর্যন্ত ট্রেইন যখন ডিপো ছেড়ে বেরুল, ততক্ষণে তলিয়ে গেল কর্নেল তামা পরিশোধনের জটিল রাসায়নিক সমস্যার গভীরে।

কর্নেলের পাশে এসে মাথাটা একটু ঝাঁকাল জ্যাক ওয়েড, শেষবারের মত দেখে নিল যাত্রীরা ঠিকমত বসেছে কি না। একটু পরেই পাহাড়ি এলাকায় ঢুকবে ট্রেইন। সব ঠিক আছে দেখে নিয়ে ব্যাগেজ-রুম খুলল ওয়েড। এক পলকের জন্য গাদা গাদা সুটকেস, বেডরোলের মাঝের সরু এক করিডর দেখতে পেল কর্নেল, তারপর ওয়েডের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ব্রিফকেস হাতড়ে আরেকটা পেন্সিল খুঁজতে শুরু করল কর্নেল। খুঁজতে গিয়ে অস্ত্রটা সরাল, বেরুল এল পাসো থেকে সংগ্রহ করা টাকার বাঙিল। আনমনে ভাবল, মাত্র দু’তিন সপ্তাহের বেতন দেয়া যাবে এই টাকায়। টাকা ফুরিয়ে গেলে... তারপর কী?

রন মার্লোর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে পাততাড়ি গুটিয়ে সরে যাওয়ার চেয়ে গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সমস্যাটা। পিস্তল ফ্ল্যাটে অনেক টাকা বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে। রন মার্লোর মতই বেশ কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি জামানত রেখে বড় অঙ্কের টাকা ধার করেছে সে। মিশেলের কথাও ভাবতে হবে তাকে।

রন মার্লোর ব্যাপারে মেয়ের বর্তমান মনোভাব কেমন ভাবতে শুরু করে ব্রিফকেসটা বন্ধ করে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল কর্নেল, সামনের দেয়ালে ওটা ঠেস দিয়ে হেলান দিল সিটে। বুঝতে পারছে, এখন আর তার সামনে পিছিয়ে যাওয়ার কোনও পথ খোলা নেই।

কোনও পথই নেই পিছানোর, ভাবল সে। একেবারে শেষপর্যন্ত রনের সঙ্গে থাকতে হবে, অপেক্ষা করে দেখতে হবে কী ঘটে শেষে।

ক্লাস্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে কর্নেল মার্শল্যাণ্ড। টাকা জোগাড় করতে যতটা পরিশ্রম হবে ভেবেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। তার উপর গতরাতে হোটেলে তার ব্যক্তিগত পার্টিতে প্রায় ভোর পর্যন্ত চলেছে মদ্যপান। ঘুম হয়নি বটে, তবে পার্টিটা জমেছিল। পুরু গৌফের নীচে হাসতেই একটু বেকে গেল কর্নেলের উপরের পুরু ঠোঁট।

তার যা বয়স, তাতে কয়েকটা মেয়েকে সম্ভষ্ট করতে পারলে গর্ব বোধ করাই স্বাভাবিক।

হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে বুলেট ট্রেন। নিয়মিত দুলুনিতে ঝিমুনি চলে এল কর্নেলের। একটু পরে ঝিমুনি পরিণত হলো গভীর ঘুমে। হাতদুটো ভাঁড়ির উপর রেখে মৃদু মৃদু দুলে ঘুমাতে লাগল সে।

সময়ের আগে ঘনাল অন্ধকার। বগির ভিতর লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ কমল, তারপর থেমে গেল একেবারে। ক্লাস্ত মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়ল একে একে। নিঃশব্দে ব্যাগেজ-রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল জ্যাক ওয়েড, আইল ধরে এগিয়ে লণ্ঠনগুলোর শিখা কমিয়ে দিল। রাতের ভেজা বাতাস যেন না আসে, সেজন্য প্ল্যাটফর্মের দরজা বন্ধ করল, তারপর ফিরে গেল ব্যাগেজ-রুমে।

অনেকক্ষণ পর অস্ফুট একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জেগে উঠল কর্নেল, পাশের জানালার চৌকো, কালো গহ্বর দিয়ে বাইরে চাইল।

রাতটা যেন কালো চাদর দিয়ে মুড়ে দিয়েছে সব। কিন্তু লণ্ঠনের আভায়ে দেখা গেল রেললাইনের ধারে খাড়া ঢাল। ধীর গতিতে একটা লো-কাট পার হচ্ছে ট্রেন। ঘুমের আবেশে চোখ বুজে এল কর্নেলের, কিন্তু মনের ভিতর কোথায় যেন খচখচ করতে শুরু করল। সোজা হয়ে বসল সে, পা দিয়ে স্পর্শ

করতে চাইল ব্রিফকেস ।

হঠাৎ করে ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্ট-এর দরজা খুলে গেল সজোরে ।

চাপাচাপি করে ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টের দরজা দিয়ে বগির ভিতর ঢুকল দু'জন লোক । লাল রুমাল বেঁধে মুখটা আড়াল করে রেখেছে তারা, কপালের উপর টেনে নিয়েছে হ্যাট । পরনে গলা পর্যন্ত বোতাম এঁটে দেয়া হলদে রঙের লম্বা স্ট্রিকার ।

সামনের জন বেশ লম্বা-চওড়া । সিঁক্কাগানের ট্রিগারে তর্জনীর চাপ বাড়াল সে । বগির মেঝেতে গাঁথল .৪৪ বুলেট ।

গুলির বিকট আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘুম থেকে চমকে জেগে ওঠা যাত্রীদের উদ্দেশে কণ্ঠ বিকৃত করে চৈচাল সে, 'নড়বে না কেউ! কেউ হাত বাড়াবে না অস্ত্রের দিকে! মাথার ওপর হাত তুলে বসে থাকলে কাউকে কিছু বলব না আমরা ।'

ঘুমের ঘোরে কথাগুলো শুনলেও মর্মার্থ বুঝল না আচ্ছন্ন কর্নেল, হাত বাড়িয়ে দিল ব্রিফকেস খুলে রিভলভার বের করতে ।

কী ঘটছে বুঝতে পেরেই কর্নেলকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল লম্বা ডাকাত ।

চর্বি ফুটো করে মার্শল্যাণ্ডের নরম মাংসে বিঁধল ভারী ক্যালিবারের বুলেট, পাঁজরের হাড়ে পিছলে হৃৎপিণ্ড ছেদ করে বেরিয়ে গেল পিঠ দিয়ে ।

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হলো কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের । চর্বিমোড়া শরীরটা হেলে পড়ল পাশের দেয়ালে । অর্ধেক শরীর থাকল সিটে, অর্ধেকটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে ।

সঙ্গীকে পাশ কাটিয়ে কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে উবু হলো অপেক্ষাকৃত বেঁটে ডাকাত, টান দিয়ে মৃতদেহের পা সরিয়ে তুলে নিল ব্রিফকেসটা, তাড়াহুড়ো করে ডালা খুলল । ভিতরে চেয়ে চাপা গলায় নির্দেশ ঝাড়ল: 'জলদি বস্তার ভিতর ঘড়ি, ওয়ালেট, আঙুটি দাও সবাই!'

কর্নেলের পরিণতি দেখবার পর কোনও প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না কামরার কেউ । আইল ধরে হেঁটে একের পর এক যাত্রীর কাছ থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে শুরু করল লম্বা ডাকাত ।

কামরায় শব্দ বলতে রইল শুধু এগিয়ে চলা রেলগাড়ির বিকবিক, অসমতল রেললাইনের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্লুনির কারণে বগির ক্যাচকোঁচ, ছাতে বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর টুপটাপ, আর হু-হু বাতাসের একটানা হাহাকার ।

পিছনের দরজার কাছে গিয়ে ওটা খুলে বেরিয়ে গেল খাটো ডাকাত, পিছনে বন্ধ করে দিল দরজাটা । তার সঙ্গী সামনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উদ্যত অস্ত্র হাতে আরও এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল বগি থেকে । দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে ।

দুই ডাকাত চলে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ বগির ভিতরে কথা বলল না

কেউ। হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই। ধীরে ধীরে বুদ্ধি আর সাহস ফিরল। একটু পরে সিট ছেড়ে সাবধানে চলে এল অনেকে কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের লাশের কাছে, লাশটা ঘিরে উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে শুরু করল।

ব্যাগেজ-রুমের দরজা খুলল জ্যাক ওয়েড, হতাশ স্বরে বলল, ‘পিস্তল ফ্ল্যাট আর মাত্র একমাইল! এখন আর এখানে থেমে কোনও লাভ নেই, এতক্ষণে হারামিগুলো সরে গেছে। শহরে গিয়ে খবর দিলেই পাসি তৈরি করে খুঁজতে বেরুবে মার্শাল।’ হঠাৎ চোখ বড় বড় হয়ে উঠল জ্যাক ওয়েডের। এতক্ষণে কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের শিথিল মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে। বগির দেয়াল বেয়ে নেমে আইলের দিকে গড়িয়ে পড়ছে তাজা লাল রক্তের স্রোত।

বুলেট ট্রেন আসবার নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগে মিশেলের দরজায় টোকা দিল রন।

‘এক মিনিট, রন,’ ভিতর থেকে বলল মিশেল। এক মিনিট পার হওয়ার আগেই করিডরে বেরিয়ে এল মিশেল, মৃদু হাসল রনের দিকে চেয়ে। মিষ্টি করে বলল, ‘আগের চেয়ে মনটা এখন ভাল লাগছে আমার।’

‘গুড,’ স্বস্তি বোধ করল রন, নরম স্বরে বলল, ‘ভাবলাম তুমি হয়তো ডিপোতে যেতে চাইবে। আজ রাতের ট্রেনেই আসবে কর্নেল। তাজা বাতাসে বেরুলে ভালও লাগবে তোমার।’

‘নিশ্চয়ই লাগবে,’ উপর-নীচে মাথা দোলাল মিশেল।

কালো মেঘের পাহাড়গুলো রেল-রাস্তার উপর ঝুঁকে আছে, তবে বৃষ্টি থেমেছে আপাতত। রাস্তা অবশ্য ভরে আছে কাদায়। এখানে ওখানে সৃষ্টি হয়েছে জমে থাকা পানির ছোট-ছোট ডোবা। বোর্ডওয়াকের ভেজা তক্তা মাড়িয়ে চলল রন ও মিশেল। মিশেলকে আগের তুলনায় অনেক বেশি হাসি-খুশি মনে হলো রনের।

একটু পর মিশেল বলল, ‘এখন তো মনে হচ্ছে এখান থেকে নিউ ইয়র্কে ফিরে গেলে খারাপই লাগবে। এ শহর সত্যি ভাল লাগতে শুরু করেছে আমার। তবে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে জায়গাটাকে। সেজন্যে দরকার ভদ্রমহিলা, বাচ্চা-কাচ্চা, গানবাজনা, নানান ধরনের বিনোদন, ঝলমলে বাতির জন্যে ইলেকট্রিসিটি। এখন তো এখানে আছে শুধু কর্কশ কথা বলতে অভ্যস্ত তিক্ত চেহারার অসভ্য কিছু পুরুষ।’

‘মহিলারা আসবে,’ বলল রন, ‘আপাতত পরিবার-পরিজন রেখে আসছে বেশিরভাগ পুরুষ। বোঝাই তো, সীমান্ত এলাকা এটা, মিশেল। মাঝে মাঝে আইনের শাসন বলতে কিছুই থাকে না। কিন্তু সীমান্তের শহরগুলো এরকমই হয়।’

‘জানি। তবুও... হয়তো নতুন জায়গায় বসত করার মত মানসিকতা নিয়ে মানুষ হইনি আমি। সীমান্ত এলাকা শান্ত হওয়ার পর এখানে বাস করতে এলে বেশি খুশি হতাম আমি।’

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাসল রন। ‘ছয় মাস সময় দাও পিস্তল ফ্ল্যাটকে ঠিক পথে চলতে, তারপর দেখবে স্কুল-কলেজ— সব তৈরি হয়ে গেছে। গানবাজনা, নাচের আসর নানা রকম বিনোদনের বন্দোবস্তও হয়ে যাবে, কথা দিতে পারি।’

কুঁচকে উঠল মিশেলের ভুরু। ‘তুমি... তুমি তা হলে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নাওনি? লড়াই করবে তুমি ওদের সঙ্গে?’

‘নিশ্চয়ই!’

বনিলাস সেতু পেরিয়ে রানিং আয়ার্ন সেলুনের সামনে দিয়ে ডিপোর দিকে চলল ওরা, মত বিরোধের কারণেই হয়তো নীরবতা নামল ওদের মাঝে। ইচ্ছা করেই সেলুন থেকে দূর দিয়ে যাওয়ার জন্য বোর্ডওয়াক ছেড়ে রাস্তায় নেমে হাঁটল রন, চাইল না সেলুনের ভিতরের রুক্ষ মানুষগুলোর কর্কশ কথা ব্যাট উইং পেরিয়ে এসে মিশেলের কানে যাক।

কৌতূহলের সঙ্গে সেলুনের দিকে চাইল মিশেল, বলল, ‘মানুষজন তো আসতে শুরু করেছে, রন, এখন এ ধরনের আড্ডাখানা পেছনের কোনও রাস্তায় সরিয়ে দেয়া উচিত না?’ ব্রেকম্যানের হোটেলে মেইমির পার্লারের দিকে চোখ চলে গেল ওর। ‘বা ওটা?’

ধীরে ধীরে বলল চিন্তিত রন, ‘বিল ট্রেইসি আর মেইমি, দু’জনই খনি চালু করার জন্যে টাকা ধার দিতে চাইছে। ...কেন? ঘোলা পানিতে মাছ ধরতে চাইছে তারা, না শহর জমে উঠলে লাভ অনেক বেশি হবে বলে তাদের এই ধার দিতে চাওয়া? নাকি দুটোই? তোমার কী ধারণা, মিশেল?’

‘ঘটনা যা-ই হোক,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল মিশেল, ‘ওদের মত মানুষদের বাড়তে দেয়া মোটেই উচিত হবে না।’

‘হয়তো সেজন্যেই ওদের টাকা নিতে বাধছে আমার,’ বলল দ্বিধাস্থিত রন। ‘টাকা ধার নিলে শেষ পর্যন্ত ওদের ব্যবসারই ক্ষতি করা হবে। ওদের মত মানুষদের সঙ্গে কোনও ধরনের মেলামেশা করে না মহিলা বা বাচ্চারা।’

‘নাও তা হলে ওদের টাকা,’ সঙ্গে সঙ্গে বলল মিশেল। ‘ভুলেও আপত্তি করো না নিতে। টাকা জোগান দিয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনুক ওরা।’

‘আমি...’ কথা শেষ করতে পারল না রন, তার আগেই সজোরে খুলে গেল রানিং আয়ার্ন সেলুনের ব্যাট উইং দরজা। টলতে টলতে রেল-রাস্তায় বেরিয়ে এল এক লোক। চমকে গিয়ে অস্ফুট শব্দে শ্বাস আটকাল মিশেল।

মাতাল লোকটাকে চিনতে পারল রন, সেই হাই-গ্রেডার। শিফ।

বোর্ডওয়াকের সামনে দাঁড়িয়ে নেশার ঘোর-লাগা চোখে রন ও মিশেলকে

দেখল শিফ, তারপর যে খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়েছিল, সেটা ছেড়ে রাস্তায় নামল টলমল পায়ে।

‘উফ!’ নিচু স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল মিশেল।

‘মনে হয়েছিল তোমাকেই দেখছি, রন মার্লো...’ শিফ-এর জড়ানো গলার বাকি কথাগুলো উড়িয়ে নিল হাওয়া।

মিশেলকে আরেক পাশে রেখে আবার এগোল রন।

এক পা সামনে বেড়ে ঠিক রনের চলবার পথে দাঁড়িয়ে গেল হাই-গ্রেডার।

রনকে পিছু টানল মিশেল, কিন্তু থামল না রন, মিশেলকেও বাধ্য করল পা বাড়াতে।

হাঁটতে সামান্যতম ইতস্তত করল না রন, একেবারে শেষ মুহূর্তে কাঁধ নিচু করে গায়ের জোরে ধাক্কা দিল মাতাল শিফের বুকে। চিত হয়ে শিফ পড়ে যাবার পরও থামল না ও, মাড়িয়ে এগোল তাকে।

‘রন!’ আঁৎকে উঠল মিশেল, হাত ছাড়িয়ে ঝট করে সরে গেল এক পাশে, ফোঁপানোর ফাঁকে বলল, ‘তোমার বর্বর আচরণ আমি সহ্য করতে পারছি না। মানুষের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাওয়া...’ ঘুরে দাঁড়িয়েই হাওয়ার্ড হোটেলের দিকে প্রায় দৌড়ে ফিরে চলল মেয়েটা।

পিছন থেকে চেয়ে রইল রন, মিশেলকে সেতু পেরিয়ে গিয়ে হাওয়ার্ডস হোটলে ঢুকতে দেখল, তারপর চোখ নামিয়ে চাইল শিফের দিকে। কাদার ভিতর অল্প পানিতে আটকা পড়া মাছের মত কিলবিলা করছে লোকটা। তারপর চার হাত-পায়ে বসতে পেরে আবার হাঁচড়পাঁচড় করে বোর্ডওয়াকে উঠল।

একবারও পিছন না চেয়ে ডিপোর দিকে পা বাড়াল রন।

নতুন করে গুরু হলো বৃষ্টি, এবার বড় বড় ফোঁটায়।

বুলেট ট্রেইনের যাত্রীদের দেখতে, পরিচিতদের নিয়ে যেতে ভিড় করেছে পিস্তল ফ্ল্যাটের বেশ কয়েকজন বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে দূরে, প্ল্যাটফর্মের কোনায় একা দাঁড়াল রন। প্ল্যাটফর্মের লণ্ঠনগুলো দুলছে ভেজা বাতাসে, পোড়া কেরোসিন তেলের গন্ধ ছড়াচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মে যারা অপেক্ষা করছে, তাদের ভিতর ডেভ বেল ও ম্যাক পিলারও রয়েছে। সঙ্গে ওয়্যাগন নিয়ে এসেছে দু’জনই। ওগুলো রেখেছে যেখানে বুলেট ট্রেইনের বন্ধ কারগুলো থামবে, সেখানে। ভিড়ের ভিতর হেঁটে ওয়্যাগনে মালামাল তুলবার জন্য লোক ভাড়া করেছে তারা।

কাজেই, লোকের অভাব না থাকায়, সহজেই নামানো গেল কর্নেল মার্শাল্যাণ্ডের মৃতদেহ। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ব্যবসায়িক কাজ আপাতত বন্ধ রেখে নিজের ওয়্যাগনে লাশ তুলতে রাজি হয়ে গেল ডেভ বেল।

যারা মৃতদেহটা ওয়্যাগনে তুলল, তাদের ভিতর ফ্যাকাসে চেহারার বৃষ্টিতে

চুপচুপে ভেজা প্যাট্রিক টমসনও থাকল।

কার্ডুরয় জ্যাকেট খুলে মৃতদেহের মুখ ও বুক ঢেকে দিল রন, তারপর দেরি না করে দ্রুতপায়ে ফিরে চলল হোটেলের দিকে। বাবার মৃত্যু-সংবাদ যাতে সামলাতে পারে, সেজন্য মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ করে দিতে হবে মিশেলকে।

খরাপ খবর বাতাসের আগে ছোটো। হাওয়ার্ডস হোটেলের কাছে গিয়ে ক্লিভ হেস্টিংসকে দেখতে পেল রন, হোটেল থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরুচ্ছে বৃষ্টিতে কাক-ভেজা লোকটা।

তার মানে নিক হাওয়ার্ড জেনেছে।

নিশ্চয়ই জানিয়েছে সে মিশেলকে।

লবিতে ঢুকতেই রনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিশেল। কান্নার ঢেউ বারবার দুলিয়ে দিল ওর শরীর।

কাঁদলে মিশেলকে দেখতে সুন্দর লাগে না। অন্য কোনও কারণে যদি না-ও হয়, দেখতে ভাল লাগছে না সে-কারণেই হয়তো নিজেকে সামলে নিল সে।

রনকে ছেড়ে পিছিয়ে দাঁড়াল মিশেল, বলল, ‘রন, ওদের বলো বাবাকে তার ঘরে নিয়ে যেতে।’ কথা শেষে টলমল পায়ে করিডর ধরে নিজ ঘরের দিকে হাঁটা দিল সে।

পিছন থেকে মিশেলের দিকে চেয়ে রইল নিক হাওয়ার্ড, তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘আর কাউকে না করে কর্নেলকে খুন করল কেন, রন?’

‘বলতে চাইছ আমার বদলে কর্নেলকে কেন,’ বলল গম্ভীর রন। ‘ব্যাপারটা তো সোজা, হেনরি মার্শল্যাণ্ড চেয়েছিল রন মার্লো তার নিজ শহরের উন্নতি করতে পারুক— এমন এক শহরের, যে-শহরের বেশিরভাগ লোক রন মার্লোর উপস্থিতি পছন্দ করছে না।’

একটু থেমে বলল ও, ‘হয়তো মিশেলের কথাই ঠিক... যা হওয়ার নয়, তা করতে চেষ্টা করে লাভ নেই কোনও।’

বারো

ব্লেট ট্রেন এসে ডিপোতে ঢুকবার এক ঘণ্টার মধ্যে জর্জ ব্রাউন, জর্জ ব্রাউনের সাত জন পাখার ও হেস্টিংসকে ডেপুটি করে দশজনের পাসি তৈরি করল

ডেপুটি শেরিফ লিউট ফেরিস। পাসির নেতৃত্ব দিল সে ক্লিভ হেস্টিংসকে।

ফ্লিণ্টস্টোন ফেনটন ও রনের আরও কয়েকজন মাইনার পাসির সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বেশি লোক গেলে পাসির গতি কমবে, এই অজুহাতে ফিরিয়ে দেয়া হলো তাদের।

একটু পরে রাস্তার কাদা ছিটিয়ে তীব্র গতিতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল পাসি। দলের আগে রয়েছে ক্লিভ হেস্টিংস ও জর্জ ব্রাউন। দেখতে না দেখতে রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। যেখানে ডাকাতি ও খুন হয়েছে, সেই লো কাটের দিকে চলেছে পাসি। শহরের মানুষ অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে শুরু করল।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে তাদের।

ট্রেন-ডাকাতির পরদিন কর্নেল মার্শল্যাণ্ডের লাশ নিয়ে এল পাসো শহরে গেল রন ও মিশেল। সেখানে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে মৃতের শেষকৃত্য হলো। ওরকম অনুষ্ঠান কোনও সীমান্ত-শহরে বিরল। অনুষ্ঠান শেষে রনের মনে হলো, বেঁচে থাকলে ওই জমজমাট অনুষ্ঠানটা পছন্দ করত কর্নেল।

সেদিনের বাকি সময়টা ডেল নর্টে মিশেলের সুইটে এল শোক প্রকাশ করতে আসা লোকদের আনাগোনা। মিশেল এবং শোক জ্ঞাপনকারীদের মাঝে যোগসূত্র হিসেবে সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করল রন। তারপরও একসময় মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ল মিশেল, বাধ্য হলো বিছানা নিতে। তার হয়ে সবার সঙ্গে কথা বলল রন।

বিকেলে একা হয়ে মিশেলের সিটিংরুমে একটু বসল ও, কিন্তু বিশ্রাম যেন আজ কপালে নেই ওর, একটু পরেই টোকার শব্দ হলো দরজায়। উঠে গিয়ে দরজা খুলল রন, ম্যাকগ্র হার্টসেলকে দেখতে পেল সামনে। লোকটা ছোটখাটো একটা মাইনিং কোম্পানির প্রধান। সকালে এসে একবার শোক প্রকাশ করে গেছে সে, ফলে তাকে আবারও দেখে বিস্মিত বোধ করল রন।

‘জরুরি ব্যবসায়িক কাজে আসতে হলো, মিস্টার মার্লে,’ স্বার্থসিদ্ধির হাসি চোঁটে নিয়ে বলল হার্টসেল। ‘ভেতরে আসতে পারি তো?’

‘নিশ্চয়ই,’ দরজা থেকে সরে দাঁড়াল রন।

হার্টসেলকে টেবিলের উপর হ্যাট ও গ্লাভস খুলে রাখতে দেখে কাবার্ড থেকে হুইস্কির বোতল বের করে দুটো গ্লাসে তরল ঢালল ও, নীরবে টোস্ট করল দু’জন দু’জনকে। গ্লাসটা হাতে নিয়ে সোফায় বসল হার্টসেল, রন দাঁড়িয়ে থাকল ম্যাশেটেলের পাশে। লোকটা ব্যবসা বিষয়ে কী বলে শুনবার জন্য অপেক্ষা করছে।

আকার-আকৃতিতে কর্নেলের ঠিক যেন উল্টো ম্যাকগ্র হার্টসেল। লম্বা, চিকন, চুলগুলো কালো; বাঁটার কাঠির মত খোঁচা-খোঁচা গোঁফটাতে মোম মেখে

ছুরির ফলার মত চোখা করে রেখেছে। শহুরে একটা টোকস ভঙ্গি আছে হার্টসেলের, বয়সে রনের চেয়ে খুব বেশি হবে না সে। তবে মৃত কর্নেলের মত করেই চলে তার চিন্তার গতি, আচরণে বিচ্ছুরিত আত্মবিশ্বাসটাও কর্নেলের মতই।

সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার মানুষ সে, এ ধরনের মানুষ বুদ্ধিমান, চতুর হয়; হার্টসেলকে বলা যায় অর্ধেক খনি-ব্যবসায়ী, অর্ধেক বিনিয়োগকারী— আর, শতকরা এক শ' ভাগ জুয়াড়ী।

দেরি না করে কাজের কথায় চলে এল সে, বলল, ‘অযথা তোমার সময় নষ্ট করব না, মিস্টার মার্লো, কাজেই কোনও ভণিতা না করে কেন এসেছি, সেটা বলছি। জানো বোধহয়, দক্ষিণ-পশ্চিমের খনি-ব্যবসায় ভাল একটা অবস্থানে আছি আমি। আর এই পর্যায়ে আসতে গিয়ে অলস বসে থাকিনি কখনও, চারপাশে নজর রেখেছি সর্বক্ষণ। কাজেই পিস্তল ফ্ল্যাটে তোমাদের বাধা-বিপত্তিগুলোও মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেছি। এখন কথা হলো, আমি ওই সম্পত্তির ব্যাপারে আগ্রহী।’

‘কথা হলো, আমিও আগ্রহী,’ শুকনো গলায় বলল রন।

‘আশা করি তোমার আগ্রহ লাভবান করবে তোমাকে,’ সোজা হয়ে বসল হার্টসেল। ‘কিন্তু মিস মার্শল্যাণ্ড? সে কী করবে?’

‘পরিস্থিতি এখন যেমন, তাতে ওর সঙ্গে এসব কথা বলার সময় আসেনি,’ বলল রন। ‘কিন্তু আমাদের বিয়ের পর ওর আর আমার স্বার্থ যে একই হবে, সে-বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।’

আন্তে করে মাথা দোলাল হার্টসেল। ‘কংথ্র্যাচুলেশস না জানিয়ে পারছি না। চমৎকার মেয়ে মিস মার্শল্যাণ্ড। তার অংশ কিনে নিতেই এখানে এসেছিলাম আমি। যথেষ্ট ভাল লাভ দিয়ে কিনতে চাই। ভেবেছিলাম তুমি আর আমি পার্টনার হিসেবে ব্যবসা করতে পারব।’ হাসতেই সরু হয়ে গেল হার্টসেলের ঠোঁট, গৌফের দু’প্রান্ত উঁচু হলো সামান্য। ‘গুজব যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে তুমি একইসঙ্গে আর্থিক এবং আইনী সমস্যায় আছ, মিস্টার মার্লো। আমার কোম্পানি যদিও দেশের সবচেয়ে বড় কোম্পানি নয়, তারপরও পিস্তল ফ্ল্যাটে যা লাগবে, সে-টাকা বিনিয়োগের ক্ষমতা রাখি আমরা। তা ছাড়া, অন্য সব মাইনিং কোম্পানির মত একদল উকিল আছে আমাদেরও। আইনী ঝামেলা হলে তারাই সামলায়।’

ক্লান্ত, ফ্যাকাসে চেহারায় হঠাৎ করেই ঘরে ঢুকল মিশেল। কথা থামিয়ে ওকে সম্মান দেখাতে উঠে দাঁড়াল ম্যাকথ হার্টসেল।

মিশেলের পাশে চলে গেল রন, মৃদু স্বরে বলল, ‘মিস্টার হার্টসেল, মিশেল।’

‘মনে আছে, রন,’ দুর্বল কণ্ঠে বলল মিশেল। ‘তবে ভদ্রতা ভোলেনি, হাতের ইশারা করল। ‘বসুন। তুমিও বসো, রন।’ নিজ টেবিলের পাশের একটা চেয়ারে বসল ও, হার্টসেল ও রন বসবার পর রনের দিকে চেয়ে বলল, ‘তোমাদের কথা শুনে ফেলেছি আমি। ...রন, কী করবে ভাবছ?’

একটু দ্বিধা করল রন। ‘শরীর-মনের এ অবস্থায় ব্যবসার কথা বলা কি ঠিক হবে তোমার সঙ্গে?’

মদু কাঁধ ঝাঁকাল মিশেল। ‘শুনতে কোনও আপত্তি নেই আমার।’

ধীর গলায় বলল রন, ‘তোমার বাবার মত আরেকজন মানুষ আর পাওয়া যাবে না, মিশেল। কিন্তু অতীত আঁকড়ে থাকলে তো জীবন চলে না। ভবিষ্যতের দিকে যেতে হবে আমাদের। মনে কোনও দ্বিধাকে ঠাই দিয়ো না।’

‘কিন্তু কোথায় এগিয়ে যাব আমরা, রন? পাসি যদি উদ্ধার করতে না পারে ওই ব্রিফকেসের... ব্রিফকেসে রাখা ফর্মুলা, তো মিউল হিলের খনি থেকে লাভজনক ভাবে তামা বের করা তো অসম্ভব।’

জ্ঞানীর মত মাথা দোলাল হার্টসেল। ‘ঠিক, মিস মার্শল্যাণ্ড।’ চট করে রনকে একবার দেখে নিল সে।

আপত্তি করল রন, ‘কর্নেল অত্যন্ত যোগ্য লোক ছিলেন, কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও অনেকেই তাঁর মত ওই একই লাইনে কাজ করছে। তারাও জানে লো-গ্রেড “ওর” থেকে কীভাবে বের করবে তামা। ব্যাপারটা যে সম্ভব, তা আমার চেয়ে কোনও অংশে কম জানে না মিস্টার হার্টসেল।’

রনের দিকে চেয়ে হার্টসেলের নীল রঙের ধূর্ত চোখ দুটোতে প্রশংসার ছাপ ফুটে উঠল। নিজের মাথায় তর্জনী ঝুঁকে কপট আন্তরিক স্বরে স্বে বলল, ‘তোমার বয়সী যুবক এমনি এমনি ব্যাকার হয় না, মিস্টার মার্লো... এখানে ঘিলু না থাকলে। প্রস্তাবটা আমি সোজাসুজিই দেব— তোমরা তিনজনের পার্টনার শিপে রাজি হবে কি না সেটা ভেবে দেখো।’

‘আমি রাজি না,’ সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না রন।

‘তা হলে...’ মিশেলের দিকে চেয়ে ভদ্রতাসূচক নড করল হার্টসেল, ‘মিস মার্শল্যাণ্ড, পিস্তল ফ্ল্যাটে যে-পরিমাণ টাকা আপনার বাবা বিনিয়োগ করেছে, তার চেয়ে যথেষ্ট বেশি পেলে মালিকানা ছাড়তে রাজি হবেন আপনি?’

দ্রুত জিজ্ঞেস করল মিশেল, ‘যথেষ্ট বেশিটা কত বেশি, মিস্টার হার্টসেল?’

‘এক লাখ ডলার।’

নড়ে উঠল মিশেল। ‘রন! রাজি হয়ে যাও! নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে পারব আমরা। তারপর...’

জেদ চেপে রেখে শান্ত স্বরে বলল রন, ‘না, মিশেল।’

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মিশেল। ‘কী করবে ভাবছ, রন?’

মিশেলের অসমর্থন বিব্রত করল রনকে, ভাবল, হয়তো বিচলিত বলেই ওর প্রতি অনাস্থা দেখাচ্ছে তা বুঝছে না মিশেল। নরম স্বরে বলল ও, ‘মিশেল, আমাদের বিয়ের পরে...’

ওকে থামিয়ে দিল মিশেল: ‘বিয়ের পর অবস্থায় কী পরিবর্তন আসবে, রন? ...আমি বলছি, রাজি হয়ে যাও তুমি মিস্টার হার্টসেলের প্রস্তাবে।’

একটু চুপ করে থেকে হার্টসেলের দিকে চাইল রন, তারপর আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, ‘মিস্টার হার্টসেল, নিশ্চয়ই বুঝছ এরকম একটা সিরিয়াস বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে? তোমার প্রস্তাবটা আকর্ষণীয়, কিন্তু এখন...’

‘বেশ,’ টুপি-গ্লাভস নিয়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স হার্টসেল, দরজার কাছে চলে গেল। তীক্ষ্ণ শোনাল তার কণ্ঠ: ‘তুমি যদি আগ্রহী অন্য কারও সঙ্গে যোগাযোগ করো, সেক্ষেত্রেও টাকার অঙ্ক আর বাড়াব না আমি, মিস্টার মার্লো। চব্বিশ ঘণ্টা পর ফিরিয়ে নেব আমার প্রস্তাবটা। চব্বিশ ঘণ্টা।’

দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অসহায় ভঙ্গিতে হাত ঝাপটাল মিশেল। ‘যা ভাল বোঝা করো, রন, কিন্তু খনি বিক্রি করে দাও।’

‘তাড়াহুড়ো করতে চাই না, মিশেল,’ চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেল রনের। ‘লড়াইতে এখনও হেরে যাইনি আমি। পিস্তল ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়ার অন্য কোনও কারণ না থাকলেও ওখানে গিয়ে কর্নেলের খুনিদের অন্তত খুঁজে বের করবার চেষ্টা করব আমি।’

তিক্ত স্বরে বলল মিশেল, ‘আর তারপর খুন হয়ে যাবে নিজে! নাকি শুধু প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছেয় ফিরতে চাইছ তুমি? আমার বাবা মারা গেছে, সেটাই কি যথেষ্ট নয়? খুনিদের ধরে শাস্তি দিতে আইন আছে, সেটা ভুলে যাচ্ছ? ভুলে যাচ্ছ আমার প্রতি তোমার দায়িত্বের কথা?’

মুখ ঘুরিয়ে নিল মিশেল, ফুঁপিয়ে উঠতেই দু'কাঁধ। পিছনে দাঁড়িয়ে আলতো করে মিশেলের কাঁধে হাত রাখল রন, টের পেল, আড়ষ্ট হয়ে গেছে মিশেলের শরীর, কাঁপছে থরথর করে।

‘মিশেল,’ বোঝানোর চেষ্টা করল রন, ‘তুমি তো দেখেছ পিস্তল ফ্ল্যাটে আইন বলতে কিছু...’

ওর হাত সরিয়ে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল মিশেল, চোখে বরফ-শীতল দৃষ্টি। ‘বাবা নেই এখন, বাবার সমর্থন পাবে না তুমি, কাজেই ওই আইন তোমাকে বের করে দেবে শহর থেকে। মিস্টার হেস্টিংসের ইনজাংকশনের ফলে খনিতে কাজ করার ন্যায়-সঙ্গত কোনও অধিকারও নেই তোমার।’

হাল ছাড়ল না রন, নরম স্বরে বলল, ‘পিস্তল ফ্ল্যাটে আমার কাজ শেষ হয়নি, মিশেল। পিছিয়ে যাওয়ার তুলনায় এখন অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে

আমার— তোমারও। ম্যাকগ্র হার্টসেল আসলে টাকা দিয়ে দেখছিল আমাদের। শেষ পর্যন্ত খনিটা কার হাতে পড়বে, তা না বুঝে টাকা খরচ করবে, সে-তুলনায় অনেক চালাক লোক ও। আর আমরা যদি না লড়ি, খনিটা হয়তো ক্রিভ হেস্টিংসের কোলের ওপরই পড়বে।’ প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গিতে দু’হাত তুলল রন। ‘আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে ফিরে আমাকে যেতেই হবে, মিশেল।’

ওর চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাইল মিশেল, তারপর ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, ‘তোমার যা করতে হবে তা তুমি করবে, রন। আমার যা করার তা আমি করব। ...আরেকটা কথা, আপাতত ওই কাদার গর্তে ফিরে যেতে রাজি নই আমি।’

‘মিশেল...’ অনুরোধের সুরে বলতে শুরু করেও থেমে গেল রন। বুঝল, মিশেলকে বোঝানোর চেষ্টা আর নিরেট পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে দেয়ালটা ভাঙবার চেষ্টা এখন একইরকম অনর্থক। ওর প্রতি ভয়ানক শীতল হয়ে উঠেছে মিশেল। একসময় যেখানে ওর জন্য উষ্ণ অনুভূতি ছিল, সেখানে এখন বরফের হিম-শীতলতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

হ্যাট তুলে নিয়ে রন বলল, ‘শুভরাত্রি, মিশেল।’ দরজার কাছে চলে গেল ও, দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ওখানে, মিশেলের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপল, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, ‘খোঁজ করলে আমাকে হাওয়ার্ডস হোটেলেই পাবে।’

রেললাইনটা গেছে কাউন্টি সিটির ভিতর দিয়ে। জায়গাটা ছোট একটা গরু-শহর। পরদিন বিকেলে ট্রেন যখন ওখানে থামল, প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল রন, সদর রাস্তা ধরে হেঁটে কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেল শহরের একমাত্র হোটেলে। ঘর নিয়ে সেখানে ব্যাগ রেখে রিসেপশনে জানতে চাইল, কোর্টহাউস কোন দিকে।

‘নিশ্চয়ই বিচারটা দেখতে চলেছ?’ রনের গম্ভ্য কোথায় বুঝতেই প্রশ্ন করল হোটেল-ক্লার্ক।

রন বলল, ‘জানতাম না বিচারের কাজ চলছে কোর্টে।’

‘চলছে,’ সোৎসাহে বলল ক্লার্ক। ‘আমাদের কাউন্টিতে এরকম কেস এই প্রথম। সত্যি সভ্য হয়ে উঠছে এলাকাটা। রোলিং আর-এর করালের কাছে বুড়ো টার্নারের সঙ্গে গোলাগুলি হয়েছিল পেকো অ্যাভিলার। বরাবরের মতই জিতেছিল টার্নার, কিন্তু কাউন্টির নতুন অ্যাটর্নি বলছে, ব্যাপারটা আসলে খুন। কাজেই ধরে এনে বিচার করা হচ্ছে বুড়ো টার্নারের।’

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে রন জিজ্ঞেস করল, ‘বিচারের রায় কি ওর পক্ষে যাবে, নাকি বিপক্ষে?’

‘বুড়ো টার্নার অনেক টাকা পায় জাজ রোথ-এর কাছে,’ রনের পিছন থেকে

বলল ক্লার্ক। ‘কাউন্টির আরও অনেকেই টার্নারের দেনাদার— জুরিদের অনেকেও। তবে বিচারের স্বার্থে তাদের কেউ এখন ভুলেও স্বীকার করবে না বুড়ো টার্নারকে আগে কখনও দেখেছে তারা। বাজি ধরতে পারো, টার্নার বুড়োকে কিছুতেই ফাঁসিতে ঝুলতে দেবে না তারা কেউ। বুড়ো টার্নার ফাঁসিতে ঝুললে তার উত্তরাধিকারীদের রোষানলে পড়ে পথের ফকির হবে অনেকে। ...বুঝতে পারছ, মিস্টার?’

‘নিশ্চয়ই!’ বলে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রন।

ক্লার্ক যেমন বলল, সভ্যতা সত্যি এসেছে এই এলাকায়, কিন্তু আছে এখনও কাগজে-কলমে।

কোর্টহাউসের সামনের চৌকো সমতল জায়গাটা ভরে আছে স্যাডল পরানো ঘোড়া ও ধুলো-মাখা বাগিতে। ঝিমাচ্ছে ঘোড়াগুলো। কিন্তু কোর্টের বাড়িটা মনে হলো যেন জনশূন্য। অন্তত এক তলাটা।

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে শেরিফের অফিস পাশ কাটাল রন, প্যাচানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দোতলায়। রেকর্ডারের অফিসেও কাউকে দেখতে পেল না। টু মারল ট্রেজারারের অফিসে, তারপর বিচারকের কামরায়। কেউ নেই কোথাও। শেষে সুপিরিয়র কোর্ট লেখা বন্ধ দরজাটার সামনে থামল ও।

দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে মানুষের গুঞ্জন। নিঃশব্দে দরজাটা খুলল রন।

ঘর ভর্তি হয়ে আছে অনেক মানুষে। চেক ট্রাউজার্স ও নীল শার্ট পরা লাল আপেলের মত চেহারার এক সাদা দাড়িওয়ালা গুঁটকি লোক সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়ছে তরুণ এক উকিল, বয়স্ক লোকটার নাকের নীচে ঘনঘন তর্জনী নিয়ে গিয়ে হুমকি মূলক ভাবে নাড়ছে সে।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মুখভরা কাটাকুটির দাগওয়ালা এক লোক, বুকে ঝুলছে ডেপুটির ব্যাজ। তার কানের কাছে ফিসফিস করল রন, ‘শেরিফ, রেকর্ডার কোথায়?’

‘আমি শেরিফ না,’ পাল্টা ফিসফিস করল লোকটা। ‘বুড়ো টার্নারের বিচার হচ্ছে শুনে এল পাসোতে ভেগে গেছে শেরিফ। রেকর্ডারও শহর ছেড়ে পালিয়েছে কোথায় যেন। তার কাজ করছে ওই মহিলা,’ হাতের ইশারায় মধ্য বয়সী এক স্বর্ণকেশীকে দেখাল সে।

দু’জনের ফিসফাস কানে যাওয়ায় এদিকে মুখ ফেরাল মহিলা।

ডেপুটি বলে উঠল, ‘এ তোমাকে খুঁজছে, নিনা।’

বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে কাছে এসে দাঁড়াল স্বর্ণকেশী, রন কোর্টরুম থেকে বেরুতেই অনুসরণ করে বেরিয়ে এল সে-ও, চোখে প্রশ্ন নিয়ে চাইল রনের দিকে।

‘পুরনো কিছু জায়গার ব্যাপারে রেকর্ড খুঁজছি আমি,’ বলল রন। ‘বিচারের মাঝ থেকে ডেকে আনায় সত্যিই দুঃখিত। ...কী অবস্থা বুড়ো টার্নারের?’

‘ছেড়ে দেবে শেষ পর্যন্ত, তবে বিচার করা হচ্ছে এরকম একটা ভঙ্গি নেবার পরে। নিজেদের সম্মান বাঁচাতে ন্যায়-বিচার করা হয়েছে এমনটা ওদের দেখাতেই হবে, উপায় নেই।’ রনকে পিছনে নিয়ে রেকর্ডারের ঘরে চলে এল মহিলা, এবার জিজ্ঞেস করল, ‘কবের রেকর্ড খুঁজছ তুমি?’

‘চুরানবুইয়ের এপ্রিলের।’

‘একটু দাঁড়াও,’ বলে পাশের স্বল্পালোকিত ঘরটাতে চলে গেল মহিলা।

খোলা দরজার ওপাশে তাকের পর তাক বোঝাই ধুলোপড়া নীল রঙের খতিয়ান বই দেখল রন। দু’হাতে ওরকম গোটা সাতেক বই নিয়ে আবার এ-ঘরে ঢুকল নিনা, বইগুলো একটা টেবিলের উপর রেখে বলল, ‘কী খুঁজছ খুঁজে নাও নিজে। আমি কোর্টরুমে গেলাম। যা খোঁজার খুঁজে খাতাগুলো টেবিলের ওপর রেখে গেলেই হবে।’

আস্তে করে মাথা দোলাল রন।

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসল মহিলা, তারপর তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল বিচার প্রক্রিয়া দেখতে।

প্রয়োজনীয় রেকর্ডস দ্বিতীয় খাতায় পেল রন। পরবর্তী আধঘণ্টা ব্যয় হলো ওর ওয়েস্ট পেপার বাক্সেট থেকে সংগ্রহ করা ছেঁড়া খামে রেকর্ডগুলো টুকে নিতে। আবার যখন হোটেলের দিকে ফিরতি পথ ধরল, তখনও চলছে বিচারের গুরুগম্ভীর কার্যক্রম।

হোটলে ফিরবার আগে ছোট একটা দোকানে থামল রন, ওখানে অন্যান্য নানা জিনিসের সঙ্গে আইনী ফর্মও বিক্রি হয়। সাপারের আগে পর্যন্ত হোটেল কামরায় বসে খামে টুকে আনা তথ্যগুলো দিয়ে কিনে আনা ফর্মগুলো পূরণ করতে ব্যস্ত থাকল ও।

রাতে সহজেই এল ওর ঘুম। সকালে নাস্তা সেরে হাজির হয়ে গেল রন কোর্টহাউসে। দরজা খুলতেই ওর চাঁদমুখ দেখতে পেল জ্যানিটর।

অ্যাসিস্ট্যান্ট রেকর্ডার নিনা এল আরও পনেরো মিনিট পর। রনকে দেখেই বলল, ‘ও, আবারও দেখছি তুমি। ...পেয়েছ, যেটা খুঁজছিলে?’

‘পেয়েছি।’ পূরণ করা ফর্মগুলো মহিলার দেখবার জন্য দিল রন, তারপর বলল, ‘এগুলো রেকর্ডে তোলাতে চাই। বুড়ো টার্নারের কী হলো?’

চট করে রনের দিকে চাইল মহিলা, রনকে ঠিক পছন্দ করে উঠতে পারল বলে মনে হলো না। সম্ভবত বুঝে ফেলেছে, আসলে বুড়ো টার্নারের ব্যাপারে সত্যিকারের আগ্রহ নেই রনের। ‘এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা চলে না,’ বলে চালু একটা টেবিলের পাশের টুলে উঠল সে, একটা খতিয়ান খাতা টেনে বের

করে নামাল। খাতায় টুকে নিল ফর্মের তথ্যগুলো, সেই সঙ্গে ফর্মের নম্বরগুলোও লিপিবদ্ধ করল। কাজের ফাঁকে বলল, 'নীচের সেলে গুয়ে-বসে কাউন্টির পয়সায় ভালই সাঁটাচ্ছে বুড়ো টার্নার। জুরিরাও সবাই রোজ হিসেবে টাকা পায়। তা ছাড়া, বিচারের রায় কী হবে সেটা সবাই জানে, কাজেই চিন্তিত নয় কেউ। রায় দিতে দেরি হলেও কারও কিছু যায় আসে না। কিন্তু আজকে সকালে বোধহয় আরেকবার হাজিরা দিতে হবে টার্নারকে।'

'একটা কথা বলো তো, নিনা,' বলল রন, 'সত্যিই কি বুড়ো টার্নার খুন করেছে?'

সন্দেহের দৃষ্টিতে রনকে দেখল মহিলা, ডেস্কের দিকে খানিক ঝুঁকে কড়া গলায় বলল, 'তুমি এখানে নতুন লোক। টার্নার খুন করেনি তো কী করেছে? কিন্তু তাতে কিছু হবে না, এদিকের প্রায় পুরো এলাকাই ওর।'

'আচ্ছা,' বুঝল রন। 'কিন্তু আইন...'

'আইন সবসময়, সবখানে শক্তিশালী পক্ষে,' ওকে থামিয়ে দিল মহিলা, একটা স্ট্যাম্প প্যাড টেনে নিয়ে কর্মগুলোয় সিল মারল অভ্যস্ত ভঙ্গিতে, কী যেন লিখল সিলের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায়, তারপর রনের দিকে ফর্মগুলো ঠেলে দিয়ে বলল, 'ছয় ডলার।'

টাকা পরিশোধ করে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল রন। পরবর্তী ট্রেইনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আপাতত করবার কিছু নেই ওর। হোটেল ফিরে কাপড় না ছেড়েই বিছানায় সটান হলো, স্বর্ণকেশী মহিলার কথাগুলো ভাবতে শুরু করল। মহিলা হয়তো পছন্দ করেনি ওকে, তবে মিথ্যেও বোধহয় বলেনি।

তা হলে আইন সবসময় শক্তিশালী পক্ষে?

আইনী লড়াইয়ে কে জিতবে তা নির্ভর করে কার ক্ষমতা কতটা তার উপর? পিস্তল ফ্ল্যাটে ক্ষমতা আছে কার?

একটু পর ঘুমিয়ে পড়ল রন, প্রশ্নগুলোর কোনও উত্তর তখনও জানা নেই ওর।

ঘুম ভাঙতে দেরি হলো, দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর জাগল রন। হোটেলের বিল মিটিয়ে স্টেশনে চলে এল ও। একটু পরেই জংশনে যাওয়ার বিকেলের ট্রেইন ছাড়বে। ওখান থেকে ওকে যেতে হবে পঞ্চাশ মাইল দূরের পিস্তল ফ্ল্যাটে।

দক্ষিণ থেকে বয়ে আসা মৃদু বাতাসে আবছা শোনাগল নাম্বার নাইনের ইঞ্জিনের আওয়াজ। দেখা গেল না রেলগাড়িটা, কিন্তু আওয়াজ বাড়তে শুরু করল দ্রুত। খবরের কাগজের বাঙিল নিয়ে এক কিশোর হকারকে দৌড়ে ডিপোতে ঢুকতে দেখল রন। ব্যস্ত হয়ে খবরের কাগজ বিক্রি করছে ছেলেটা, প্র্যাটিকর্ম ধরে সামনে বাড়ল।

একটা কাগজ কিনল রন, কিন্তু ট্রেন আসবার আগে পড়বার সুযোগ পেল না।

নির্দিষ্ট সিটে বসবার আগে সুটকেসটা উপরের র্যাকে রেখে দিল, তারপর আরাম করে বসল।

উত্তর-পশ্চিমে ছুটে চলেছে নাম্বার নাইন।

এবার খবরের কাগজটা মেলে ধরল রন। বড় বড় কালো অক্ষরগুলো যেন চিৎকার করল ওর মস্তিষ্কে।

রনের মনে হলো, মুচকি হাসে ও, বা অট হাসি হাসে। রেকর্ডারের অফিস থেকে নিয়ে আসা ফর্মগুলো মুচমুচ আওয়াজ করছে ওর বুক পকেটে। উপসংহারে পৌঁছল ও, আইন সবসময় শক্তিশালীর পক্ষ নেয় না।

যারা সঠিক পথে আছে, তাদের পক্ষ কখনও কখনও নেয় আইন। দরকার শুধু আইনকে সঠিক দিকে চলতে পথ নির্দেশনা দেয়া। দরকার একজন সাহসী, উদ্যোগী লোক।

তেরো

রন যেদিন কাউন্টি সিট থেকে পিস্তল ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠল, সেদিনও বুলেটের দায়িত্বে আছে কণ্ঠের জ্যাক ওয়েড। টেলিগ্রাফারের অফিসে রাখা বোতলটার সদ্যবহার করায় বকবক করবার নেশায় পেয়ে বসল যেন তাকে।

প্রধান রেললাইন থেকে সরে যেতে খানিক দেরি করতে হলো বুলেট ট্রেনকে, শেষ পর্যন্ত যখন রওনা হলো ওটা, রনের পাশে এসে বসল জ্যাক ওয়েড। কাজ নেই তার, বগি প্রায় খালি। উদাস গলায় বলল সে, 'ভাবতে অবাক লাগে, কীভাবে মাত্র একজন মানুষ এই লাইনটার ব্যবসায় এত বড় প্রভাব ফেলতে পারে। যেই খবর ছড়িয়ে পড়ল মার্শল্যাও মারা গেছে, অমনি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল পিস্তল ফ্ল্যাটে লোকজন আসা। মালামাল অবশ্য ঠিকই আসছে এখনও।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রন বলল, 'উন্নতি হয়তো খানিক বাধাগ্রস্ত হয়েছে, জ্যাক; কাজ শুরু হতেও হয়তো দেরি হবে একটু, তবে রাত শেষে সূর্য ওঠেই—

বাজি ধরতে পারো, দেখবে পিস্তল ফ্ল্যাট নতুন করে গড়ে উঠছে দ্রুত।’

‘ধরেছি বাজি,’ বলল জ্যাক ওয়েড। ‘পিস্তল ফ্ল্যাট আবার জীবন ফিরে পাবে ভেবে ডেভ বেলের কাছ থেকে জমি কিনে ফেলেছি। শহরটা যদি শেষ পর্যন্ত মরে যায়, তো আমার সারাজীবনের সমস্ত সঞ্চয় পানিতে যাবে। পথের ফকির হয়ে যাব আমি।’

‘ঠকতে হবে না তোমাকে।’

‘কিন্তু খনি চালু করতে যে আইনী সমস্যা হচ্ছে? ফেরিস যা বলল তাতে তো মনে হলো খনির মালিকানা চলে গেছে ক্লিভ হেস্টিংসের হাতে।’

‘থাকবে না কোনও ঝামেলা,’ বুক পকেটে রাখা ক্রেইমের ফর্মগুলোয় হালকা চাপড় মারল রন। ‘হেস্টিংসের ব্যবস্থা করতে কিছু আইনী দলিল নিয়ে ফিরছি আমি।’

‘তুমি এরকম কিছু করবে তা-ই ভেবেছিলাম,’ উৎসাহিত হয়ে উঠল জ্যাক ওয়েড। ‘সবাইকে বলেছি, এত টাকা ঢালার পর পিছাবে না তুমি। অনেকে বলাবলি করছিল, তুমি আর ফিরবেই না।’ অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল সে। ‘গোটা শহর পাগল হয়ে গেছে কর্নেলের খুনিদের ধরতে। এমন কী নিক হাওয়ার্ডের মত মানুষ হোটেলের ডেস্ক ছেড়ে ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ...আমাদের জরুরি মালামাল যেন ঠিক থাকে, সেজন্যে লোক পাঠিয়েছে ওয়েলস ফার্গো। তাদের কাছে গুনলাম, পিস্কারটনের লোকও শহরে চলে এসেছে তদন্ত করতে।’

‘হয়তো খুনিদের ধরতে পারবে তারা।’

‘এখনও পারেনি,’ তিক্ত শোনাৎ ওয়েডের কণ্ঠ।

‘হালও তো ছাড়েনি, তা-ই না?’

‘তা ছাড়েনি। তবে হেস্টিংস হাল ছেড়ে দিয়েছে। দিন দুয়েক পাসি নিয়ে ঘোরাঘুরি করে শহরে ফিরেছে ব্যর্থ হয়ে। তুমি যাওয়ার পর থেকেই একটানা বৃষ্টি পড়ছে। একটা ট্রাকও পায়নি তারা।’

আরও তথ্য আদায়ের জন্য বলল রন, ‘আমি ভেবেছিলাম খুনিদের যদি কেউ ধরতে পারে, তা হলে হেস্টিংসই পারবে। ও তো ব্লাডহাউণ্ডের মত একরোখা।’

‘হয়তো অন্য কোনও স্বার্থ আছে ওর... যেমন খনি।’ পাশ থেকে রনের দিকে চাইল জ্যাক ওয়েড। ‘জর্জ ব্রাউন পুরো এলাকা চষে ফেলছে ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে, এরই মধ্যে এক গাড়ি ঘোড়া পাঠিয়েও দিয়েছে। পাহাড়ে-টিলায় খুনি-ডাকাতদের কেউ যদি থাকত, ব্রাউনের লোকরা ঠিকই খোঁজ পেত তাদের। নিজেদের হাতের তালুর মত চেনে ওরা ওদিকের এলাকা।’

উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্ট-এ চলে গেল ওয়েড। অবশিষ্ট পথ নিজ

চিন্তায় ডুবে থাকল রন।

যেদিন রন প্রথমবারের মত ফিরেছিল পিস্তল ফ্ল্যাটে, সেদিনের মত আজও রেল ডিপোর প্ল্যাটফর্ম প্রায় খালি দেখল ও। দূরে, প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে একটা গগোলায় ‘ওর’ তুলছে কয়েকজন লোক— সেই প্রথম দিনেরই মত। তাদের ভিতর লম্বা লোকটাকে আগে চিনল রন। সেই হাই-গ্রেডার, শিফ। অন্যরা ইনজাংকশন দিতে হেস্টিংস ও ফেরিসের সঙ্গে আসা সেই তিন শকুন।

হোটেলে পৌঁছুতেই রনকে ঘরের চাবি দিল নিক হাওয়ার্ড। তার মুখেই শহরের সর্বশেষ খবর জানতে পেল ও। ঘোড়ায় চড়ে বাইরে বাইরে ঘুরে উপকার হয়েছে নিক হাওয়ার্ডের, ঝরঝরে লাগল তাকে দেখতে।

‘অনেকেই হেসেছে আমাকে ঘোড়ায় উঠতে দেখে,’ মৃদু হেসে বলল সে। ‘তবে অনেক দিন পর আমার মনে হলো ডেস্কের পেছনে বসে না থেকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোই আমাকে মানায় বেশি।’

অমনোযোগের সঙ্গে কথাটা শুনল রন, এক হাত থেকে আরেক হাতে নিল চাবির রিং, তারপর বলল, ‘ভাল মত কিছু বুঝে ওঠার আগেই হোটেল ব্যবসায় ঢুকে পড়েছিলে তুমি, নিক।’

কৌতূহল নিয়ে রনকে দেখল নিক হাওয়ার্ড। ‘অনেকে বলছিল আর ফিরবে না তুমি। তোমার মাইনার আর হেস্টিংসের হাই-গ্রেডারদের ভিতর কয়েক দফা হাতাহাতি হয়ে গেছে। র্নেকের সেলুনের ক্ষতিই হয়েছে তাতে বেশি। ওটাই ছিল যুদ্ধক্ষেত্র। লোকটা বুঝতে পারছে না কার কাছে ক্ষতিপূরণ চাইবে।’

মুচকি হাসল রন। ‘ক্লিভ হেস্টিংস, না আমার কাছে? নিশ্চয়ই চরম সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগছে লোকটা।’

‘ও একাই নয়, রন। আমিও চিন্তিত, দ্বিধায় ভুগছি। তোমার পক্ষ নিয়ে এ-পর্যন্ত বন্ধু পাইনি একজনও। বুঝতে পারছি না কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা।’

‘কোথায় দাঁড়িয়ে আছ সেটা জানার অধিকার আছে তোমার, নিক,’ সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল রন। ‘কালকে আবার আমার হয়ে যাচ্ছে খনিটা। দেবার মত যত টাকা তোমার আছে, সব তখন দরকার পড়বে আমার। বিল ট্রেইসি, মেইমি বা অন্য যারাই টাকা বিনিয়োগ করতে চাইবে, সবার কাছ থেকে নেব আমি।’

কৌতূহল বোধ করলেও কোনও প্রশ্ন করল না হোটেল-মালিক, শুধু বলল, ‘খুশি হয়েছি তুমি ফিরে আসায়। অস্বীকার করব না, হঠাৎ হঠাৎ নিজেকে এতিম শিশু মনে হচ্ছিল।’

‘কোনও কারণ নেই ওরকম মনে হওয়ার।’

নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল রন। ডেস্ক ছেড়ে ওর পিছু নিল নিক হাওয়ার্ড, নিটু গলায় বলল, ‘মেইমি তোমাকে বলতে বলেছে, আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় ও। জানাতে বলেছে, ও এমন কিছু জানে, যেটা জানা

দরকার তোমার। ...ওকে ডেকে আনতে পাঠাব কাউকে?’

বেসিনে পানি ঢেলে ধুলো-মাখা শার্টটা খুলে ফেলল রন, তারপর বলল, ‘না। আমিই গিয়ে দেখা করব ওর সঙ্গে।’

পরীক্ষার-পরীক্ষন হয়ে নতুন শার্ট গায়ে চাপাবার ফাঁকে চিন্তা করল ও, কী চায় ওর কাছে মেইমি? নিশ্চয়ই জরুরি কোনও ব্যাপার, নইলে নিক হাওয়ার্ডের কাছে খবর দিয়ে রাখত না মেইমি।

রাত নেমেছে, রেল-রাস্তার দু’ধারে ও মার্শালের অফিসে জ্বলছে কেরোসিনের লণ্ঠন। একটা লণ্ঠন হেলছে-দুলছে। ওটা হাতে চার্চ থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছে কেউ। রাস্তার আরেক দিকে রানিং আয়ার্ন সেলুন ও ব্রেকম্যানের হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তার কাদায় পড়ছে বাতির হলদে আভা।

ক্যানিয়ন ও রেলরোডের সঙ্গমে দামাল হাওয়ায় দাঁড়াল রন। রাতটা ভেজা, বাতাসে কাদার সোঁদা গন্ধ। মেইমির ওখানে যাওয়ার আগে আগে একবার লিজার সঙ্গে দেখা করতে যাবে কি না ভাবল রন। পকেট থেকে ম্যাচ বের করে জ্বালল, ছোট্ট শিখার আলোয় দেখে নিল ক’টা বাজে।

কয়েক ফুট দূরের অন্ধকার থেকে ফ্লিণ্টস্টোন ফেনটনের কণ্ঠ শুনতে পেল ও। সেতুর তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া স্রোতের জোর কলধ্বনিকে তলিয়ে দিল ফেনটনের দরাজ গলা।

‘সাহস আছে তোমার, মিস্টার মার্লো। শহরে মোটেই জনপ্রিয় নও তুমি, তারপরও নাকের সামনে মশাল ধরে নিজ চেহারাটা দেখতে দিচ্ছ সবাইকে।’

ফেনটনের উষ্ণ আচরণ ভাল লাগল রনের, একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ‘এই কুৎসিত চেহারা মানুষকে দেখাচ্ছি সেটা খেয়াল ছিল না আমার।’

কাছে এসে দাঁড়াল ফ্লিণ্টস্টোন ফেনটন। ‘খুব খুশি হয়েছি তুমি ফিরে আসায়। আমাদের লোক সবাই অস্থির হয়ে আছে।’

‘তা হলে ওদের আমরা ভাবার মত খোরাক দেব, ফেনটন,’ বলল রন। ‘আগামীকাল আবার খনিতে কাজ করতে যাব আমরা— আইনসম্মত ভাবে।’

খুশি হয়ে বিরাট হাতের তালু দুটো এক করল ফেনটন। ‘শুভ! আমাদের ছেলেরা একটা শেষ লড়াই লড়তে চাইছে।’ চুপ করে গেল সে, তারপর নিচু কণ্ঠে বলল, ‘কর্নেলের খুনের কেসে কোনও অগ্রগতি হয়নি, মিস্টার মার্লো। সবার ভাব দেখে মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে আর তেমন ঘাঁটাঘাঁটি হোক, তা চায় না কেউ। আমার তো মনে প্রশ্ন জাগছে...’ রেল-রাস্তায় কারও পায়ের আওয়াজ পেয়ে আবার থেমে গেল সে।

হাঁটবার গতি কমিয়ে দিল লোকটা হঠাৎ। অন্ধকারে রন ও ফেনটনকে পাশ কাটানোর সময় নাক দিয়ে তাচ্ছিল্যসূচক আওয়াজ করল, তারপর এগিয়ে গেল সেতুর দিকে। উচ্ছল পানির ছলছল আওয়াজ শুধে নিল তার হাঁটবার শব্দ।

রানিং আয়ার্ন সেলুন থেকে বেরুনো আলোয় দেখা গেল লোকটার চওড়া দু'কাঁধ।

‘হেস্টিংস,’ নিচু স্বরে বলল ফেনটন।

রন জিজ্ঞেস করল, ‘কী যেন বলছিলে তুমি, তোমার মনে প্রশ্ন জাগছে— তারপর?’

‘প্রশ্ন জাগছে বুলেট ট্রেইন যখন কর্নেলের লাশ নিয়ে স্টেশনে এল, তার আগে কোথায় ছিল মার্শাল। একেবারে ভিজে চূপচূপে হয়ে ছিল লোকটা, যেন অনেকক্ষণ বাইরে বৃষ্টিতে ভিজেছে। আরেকটা ব্যাপার, প্যাট্রিক টমসন যখন এল, তখন তাকে খেয়াল করেছ তুমি, মিস্টার মার্লো? ওর কাপড়চোপড়ও ভিজে জবজবে হয়ে ছিল। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল মদের নেশা কাটার পরের মাথা-ব্যথার চেয়ে বহুগুণ বেশি যন্ত্রণা হচ্ছে ওর মাথায়।’

রনের মনে পড়ল সে সন্ধ্যায় ডেভ বেলের ওয়্যাগনে কর্নেলের লাশ তুলবার সময় প্যাট্রিক টমসনকে কী রকম অসুস্থ দেখাচ্ছিল। ধীর কণ্ঠে বলল রন, ‘ওই লো কাট থেকে প্রায় ট্রেইনের সমান গতিতে শহরে পৌঁছুতে পারবে দ্রুতগামী কোনও ঘোড়া। ...তুমি কি এটাই বলতে চাইছ, ফেনটন?’

‘যদি সোজা কথায় বলতে বলো, তা হলে— হ্যাঁ।’

‘যা ভাবছ সেটার সপক্ষে প্রমাণ থাকতে হবে।’

‘জানি। প্রমাণ জোগাড় করতে চেষ্টা করেছি আমি।’

‘পেয়েছ কোনও প্রমাণ?’

‘এখনও না।’

‘যদি সত্যিই ওরকম কিছু ঘটে থাকে, তো প্রমাণ আমরা পাবই,’ বলল রন। কর্নেল মার্শল্যাণ্ড ও অসহায় মিশেলের কথা ভেবে চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেল ওর। মনে পড়ল কীভাবে ওদের পরিকল্পনা বানচাল করবার চেষ্টা করা হয়েছে, হেস্টিংসের প্ররোচনায় কতখানি শত্রুতা করেছে শহরের লোক। রন বলল, ‘ঘটনা যদি তুমি যা ভাবছ তা হয়, তো দুনিয়া থেকে ওদের নাম মুছে ফেলব আমরা।’

‘ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যাতে প্রমাণ পাই,’ গুড়গুড় করে উঠল ফেনটনের কণ্ঠ।

হাঁটতে শুরু করল রন। রানিং আয়ার্ন সেলুন পর্যন্ত ওর সঙ্গে এল ফ্লিস্টস্টোন ফেনটন, তারপর ব্যাট উইং দরজার উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে বলল, ‘আরে! ছেলেরা দেখছি আরেকটা মারামারির জন্যে তৈরি!’ তিক্ত হাসল ও, ‘যাই, ওদের সঙ্গে মিলে লড়ব।’

তাকে থামাল রন। ‘আজকে রাতের মত গোলমাল থেকে দূরে থাকতে বলো ওদের।’ ফেনটন আর ওর সঙ্গে যারা একই ট্রেইনে এসেছিল, একে একে

তাদের নাম বলল রন। ‘জিং ওয়াঙের রেস্টুরেন্টে সকাল-সকাল থাকতে বলবে ওদের। সকালে খনিতে যাব আমরা।’

ফ্লিণ্টস্টোনকে ওখানে রেখে ব্রেকম্যানের হোটেলে চলে এল রন, বুঝতে পারল, মেইমির পার্লার আজ রাতে ভাল ব্যবসা করছে। লবিতে জড় হয়ে খদ্দেরদের সঙ্গে গল্প করছে বেশ কয়েকটা মেয়ে। একজন গায়ক গুনগুন করে গান গাইছে, কী গাইছে বোঝা যাচ্ছে না মদের গ্লাস ও বোতলের ঠুং-ঠাং শব্দে, পুরুষদের চড়া গলার হাসির আওয়াজ চলছে। লবি থেকে স্বল্পালাকিত করিডর পর্যন্ত কে যেন অনুসরণ করল রনকে, তারপর মেইমির দরজার সামনে দাঁড়াতেই মুখোমুখি হলো সে ওর।

মেয়েটা স্বয়ং মেইমি। পরিচিত পরিবেশে আবার আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে সে, ফিরে এসেছে লড়াই, খোলামেলা ভাবটা। ‘ব্যবসা, নাকি আনন্দ দরকার, রন?’ জিজ্ঞেস করল মেইমি।

জবাবে কিছু বলল না রন, গম্ভীর চেহারায় চাইল মেইমির দিকে।

‘কথাটা বলা উচিত হয়নি আমার,’ মৃদু হাসল মেইমি। অসীম ক্লান্তি যেন ঝরে পড়ল তার হাসিতে। ‘তুমি সব সময়ই অন্যরকম। ...হাওয়ার্ড বলেছে যে আমি দেখা করতে চেয়েছি তোমার সঙ্গে?’

‘হ্যাঁ।’

‘বেশ। আমার সঙ্গে এসো।’

পিছনে অচেনা একটা সুবাস ছড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল মেইমি। সুবাসটা খারাপ লাগল না রনের। মেইমির পিছু নিয়ে করিডরের শেষে চলে এল ও। ওখানে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির খুঁটিতে হাত রাখল মেইমি। ‘ওপরে চলো, রন।’

রনের ওজনে কাঁচাকাঁচ আওয়াজ করল পুরনো সিঁড়ির ধাপ। দোতলার করিডরে জোরাল কোনও আওয়াজ নেই।

করিডরের মাঝে এক মেয়েকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। তারপর পাশের দরজাটা খুলে মেয়েটাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল সে ঘরে। দরজা বন্ধ করে দেয়ার আগে বিরক্ত স্বরে বলল, ‘কী মুশকিল! মানুষের কি একটু প্রাইভেসিও থাকবে না!’

সামনের একটা ঘরে রনকে নিয়ে এল মেইমি, দরজা বন্ধ করল না, চলে গেল রেল-রাস্তার দিকে মুখ করা এক জানালার কাছে, পর্দা সরিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় কাছে ডাকল রনকে।

‘এখানে এসো, রন।’

জানালার কাছে গিয়ে মেইমির কাঁধের উপর দিয়ে বাইরে চাইল রন। আঙুল তাক করে কী যেন দেখাতে চাইছে মেইমি।

নেইলপলিশ মাখা নখ যদিও তাক হয়েছে, সেদিকে চাইল রন। রানিং

আয়ার্ন থেকে বেরিয়ে আসা আলো পড়েছে রেল-রাস্তার উপর। কালো সরল রেখার মত দেখাচ্ছে বোর্ডওয়াকের তক্তাগুলোর অসংখ্য ফাঁক।

সেলুনের বেড়ে থাকা ছাউনির তলা থেকে বেরিয়ে বোর্ডওয়াকের পাশে থামল এক লোক, ম্যাচ জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে বিতৃষ্ণার সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিল জ্বলন্ত কাঠিটা। এবার কাদার ভিতর লাফিয়ে নেমে একটা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল সে, স্পারের স্পর্শে ছুটাল অনুগত প্রাণীটাকে। রেল-রাস্তা পেরুচ্ছে সে, আড়াআড়ি ভাবে চলেছে ডেভ বেলের দোকানের বারান্দায় ঝলমল জ্বলা লণ্ঠনটার দিকে।

‘চেনো লোকটাকে?’ জিজ্ঞেস করল মেইমি।

‘জর্জ ব্রাউন।’

‘চিনতে তো কোনও সমস্যা হয়নি তোমার?’

‘না। আলো পড়েছিল ওর মুখে।’

পর্দাটা আবার টেনে দিল মেইমি। ‘যে-রাতে তোমাকে মারল সবাই মিলে, সে-রাতে এই জানালায় দাঁড়িয়ে সবই দেখেছি আমি।’

বুকের গভীরে চাপা উত্তেজনা অনুভব করল রন, যেন কোনও বাচ্চা ছেলে ও, এখনই জন্মদিনে পাওয়া উপহারের প্যাকেট খুলবে— জানে না কী আছে প্যাকেটের ভিতর।

মেইমি কী বলে শুনবার জন্য অপেক্ষা করল ও।

খুকখুক করে কেশে নিয়ে মেইমি বলল, ‘ম্যাক যখন সেলুন থেকে বেরিয়ে এল, তখনও এই জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি।’

রন অনুভব করল, বুকের খাঁচায় লাফ দিয়েছে হৃৎপিণ্ড। ‘যে ওকে ছিনতাই করেছে, তাকে দেখেছ তুমি?’

উপর-নীচে মাথা দোলাল মেইমি। ‘পরিষ্কার। ঠিক যেমন তুমি দেখতে পেয়েছ জর্জ ব্রাউনকে।’

ঘরের মাঝে চলে গিয়ে খাটের পাশে দাঁড়াল মেইমি এবার।

‘সে কে, মেইমি?’ মেয়েটার দিকে দ্রুত গেল রন, খেয়াল করল না আগ্রহের আতিশয্যে প্রায় তাড়া করেছে মেইমিকে, ওর আচরণ আক্রমণাত্মক মনে হতে পারে।

‘সাহায্য করা যায় বা রক্ষা করা দরকার, তেমন কেউ না, ব্যাঙ্কার,’ কড়া, কর্কশ গলায় বলল মেইমি। ‘তার প্রতি তোমার বা আমার কোনও সহানুভূতি নেই। এমন কী তার বাবারও সহানুভূতি নেই তার জন্যে।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেইমি। ‘জেনে যদি কোনও উপকার হয় তোমার, তো বলতে আপত্তি নেই— লোকটা ছিল প্যাট্রিক টমসন।’

বুকের ভিতর প্রচণ্ড রাগ নিয়ে মেইমির ওখান থেকে বেরুল রন, ভাবছে,

এখনই খুঁজে বের করবে প্যাট্রিক টমসনকে, বদমাশটার কাছ থেকে যেভাবে হোক অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করবে। কাজটা করতে পারলে শহরের ঘাসিন্দাদের বুঝিয়ে দেয়া যাবে, হেলাফেলা করবার মত লোক নয় ও। কিন্তু রানিং আয়ার্নের উট্টোদিকে পৌঁছে আরেকটা চিন্তা মাথায় এল রনের— প্যাট্রিক টমসন ওরকম কোনও স্বীকারোক্তি দিলে লিজার মনের উপর তার প্রভাব কেমন পড়বে?

আগে জানতে হবে টমসনের ব্যাপারে কী ধরনের মনোভাব পোষণ করে লিজা।

প্যাট্রিক টমসনকে সাহায্য করতেই শহরে ফিরেছে লিজা, তাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে ফিরে এসেছে। এখন যদি ও লোকটার নাক কাদায় গুঁজে দেয়, তো লিজার কাজ আরও অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাবে। হাঁটবার গতি কমাল রন, পৌঁছে গেল হাওয়ার্ডস হোটেলের বাঁকে, তখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না কী করবে।

ডেভ বেলের দোকান থেকে বেরিয়ে রনকে হোটেলের বারান্দায় উঠবার সিঁড়িতে দেখতে পেল জর্জ ব্রাউন। রাশ টেনে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে রনের সামনে থামল রানশার, স্যাডলে কাত হয়ে কড়া চোখে প্রতিপক্ষকে দেখল।

‘যা হবার হয়েছে, ব্যাঙ্কার। ভুল করেছিলাম আমি। কিন্তু জানি না কী করে ভুল হয়ে গেল। জানতে হলে যদি পকেট খালি হয়, তা হলেও আমি রাজি।’ স্যাডলে সোজা হয়ে বসে ডেভ বেলের দোকানের দিকে চাইল সে। ‘আরেকটা ব্যাপার, ঠিকই বলেছিলে তুমি ঘোড়ার ব্যাপারে। একটু আগে বুড়ো টমসন আমাকে দুঃসংবাদ দিয়ে গেছে। রেইলরোডের লোকরা ক্যানসাস সিটিতে ট্রেইনের বগি থেকে নামাতেই পারেনি ঘোড়াগুলো। ওখানে সব করাল ভর্তি হয়ে গেছে আগেই। ওরা জানতে চায় কী করবে এখন।’

দুর্বল হতে হতে মিলিয়ে গেল জর্জ ব্রাউনের কণ্ঠ। লোকটার জন্য দুঃখ বোধ করল রন। শ্রদ্ধাও জাগল মনে। ভুল যা-ই করুক, স্বীকার করবার মত বুকের পাটা আছে লোকটার।

‘ঘোড়াগুলো ফেরত আনার সমস্ত খরচও এবার দিতে হবে আমাকে,’ বলল ব্রাউন। ‘জানালাম বেলকে। ও বলল, “বুঝলাম, জর্জ, কিন্তু আর একটা টাকাও ধার দিতে পারব না তোমাকে— অন্য জায়গায় খাটিয়েছি আমি সব টাকা।” কাজেই, গরুর বাজার যত খারাপই হোক, গরু বিক্রি করেই ওর কাছ থেকে নেয়া ঋণ শোধ করতে হবে, নইলে সুদের যে হার ও ধরেছে, তাতে শেষ পর্যন্ত রানশ খুইয়ে পথে বসতে হবে আমাকে। কাঁথা পুড়ি শালার ঈশ্বরের, আমাকে খুব খরুচে শিক্ষা দিয়েছে শালার ঈশ্বর।’

হঠাৎ রনের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল জর্জ ব্রাউন, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে

রেল-রাস্তার কাদা ছিটাতে ছিটাতে ছুটে চলে গেল।

যদিও ক্ষতির শিকার হয়েছে জর্জ ব্রাউন, তারপরও ভাল লাগল রনের। ভাল লাগাটা ব্রাউন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে নয়, মানুষটা অঘোষিত শত্রুতা ভুলে যাওয়ায়। একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে সিদ্ধান্তে এল ও, কালকে সকালে দেখা করবে লিজার সঙ্গে।

হোটেলে ঢুকল রন ধীর পায়ে। জর্জ ব্রাউনের ক্ষতির খবরটা দিতে হবে নিক হাওয়ার্ডকে।

পরদিন সকালে হোটেলে থেকে বেরোতেই হালকা-পাতলা এক তরুণ পথ আটকে দাঁড়াল রনের।

‘মিস্টার মার্লো? আমার নাম র্যান্ডল্ফ। খনিতে কাজ খুঁজছি। কে কতক্ষণ কাজ করল তার হিসেব রাখার জন্যে তোমার তো একজন লোক...’

তরুণকে এক পলক দেখল রন। ‘কয়েক দিন পর কাজ দিতে পারব, র্যান্ডল্ফ। আগামী বৃহস্পতিবার যোগাযোগ করো।’

পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল তরুণ, ‘তা হলে কি কথাটা সত্যি যে খনি চালু হবে আবার?’

‘নিশ্চয়ই,’ উৎফুল্ল স্বরে বলবার চেষ্টা করল রন। মনে মনে বলল, ‘যেরকম আত্মবিশ্বাস আছে এমন ভঙ্গিতে বললাম কথাটা, সেরকমটা মনের ভেতর অনুভব করলে ভাল হতো।’

জিং ওয়াগ্গের দোকানে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল ফ্রিস্টেস্টোন ফেনটন, রনকে দেখেই চোখে কৌতুক নিয়ে বলল, ‘ওই ছেলেগুলো, মিস্টার মার্লো, ওদের আমি আর আটকে রাখতে পারলাম না। আগেই খনিতে চলে গেল সবাই। বলল, খনির সম্পত্তিতে বাইরের কাউকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না ওরা। তাতে নাকি পরে কষ্ট করে ঘাড় ধরে বের করতে হবে না কাউকে।’

‘চলো, আমাদেরও থাকা উচিত ওদের সঙ্গে,’ তাড়াতাড়ি করে বলল রন। ‘ক্রিভ হেস্টিংসের জানতে দেরি হবে না যে খনিতে আবার কাজ শুরু করছি আমরা।’

ক্যানিয়নের মেঝে ধরে হাঁটতে হাঁটতে বিন বিন্ডিঙের দোতলায় লিজাকে দেখল রন, মেয়েটার কর্মব্যস্ত সকাল শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। মাথায় স্কার্ফ পেঁচিয়ে তোয়ালে দিয়ে জানালার কাঁচ মুচছে লিজা। হাত নাড়ল রন। পাশটা হাত নাড়ল লিজাও, কাজ থামিয়ে ওকে ফ্রিস্টেস্টোন ফেনটনের সঙ্গে খনির দিকে যেতে দেখল।

খনিতে ঢুকবার মুখে রন বুঝল, সেনাবাহিনীতে গেলে একজন দক্ষ সেনাপতি হতে পারত ফ্রিস্টেস্টোন ফেনটন।

সুড়ঙ্গের মুখের কাছে ভেজা সকালের স্নান আলো গায়ে মেখে .৩০ রাইফেল হাতে আরাম করে বসে আছে কঠোর চেহারার দুই মাইনার। তাদের হাতের নাগালের ভিতর দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা আরও দুটো .৩০ রাইফেল।

ওদের দু'জনের উদ্দেশ্যে মৃদু মাথা দোলাল রন। 'মনে হয় না রাইফেল ব্যবহার করতে হবে তোমাদের, তবে হেস্টিংসের কোনও লোক যেন ঢুকতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রেখো।'

'পারবে না ঢুকতে,' বলল গার্ডদের একজন। 'একটু আগে হেস্টিংসের দুই হাই-থ্রেডার এসেছিল, হুমকিও দিচ্ছিল, তারপর মেরে ফেলব বলে ভয় দেখাতেই লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে।'

ফ্লিন্টস্টোনের সঙ্গে পিছলা পথ পেরিয়ে হেডফ্রেমের দিকে রওনা হলো রন, ওখানে উঠতে উঠতে দেখল মিউল হিলের চূড়ায় মেঘের তলা দিয়ে রশ্মি ছড়াতে শুরু করেছে সূর্য।

হাঁপিয়ে যাওয়ায় মোটাসোটা ফেনটনকে একটু বিশ্রাম দিতে মাঝ পথে থামল ও।

ক্যানিয়নের আরও এক মাইল সামনে বাঁধের কারণে তৈরি লম্বাটে লেকের শান্ত পানিতে প্রতিফলিত হলো সূর্যের রশ্মি। ফেনটন বলল, 'দু'জন লোক রেখেছি ছ' ঘণ্টা পর পর বাঁধের অবস্থা জানাবার জন্যে। ওই বাঁধটাকে একফোঁটা বিশ্বাস করি না আমি, মিস্টার মার্লো।'

ফ্লিন্টস্টোনের চিন্তিত চেহারা খেয়াল করল রন, কিন্তু এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল না কিছু।

'যদি ভেঙে যায় বাঁধ, তো খনি আর শহর— দুটোই ভেসে সয়লাব হবে,' একটু পর বলল ফেনটন।

আরও খানিকক্ষণ চড়াই বেয়ে উঠবার পর হয়েস্ট হাউসে পৌঁছে গেল ওরা। ছ'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, দেখল রন। বয়লারে বাষ্প তৈরি হয়ে গেছে।

'বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না আমাদেরকে,' জানাল ফ্লিন্টস্টোন।

হয়েস্ট ইঞ্জিনিয়ারের দিকে চাইল রন, বলল, 'জলদি করুক ওরা। একটা লম্বা ডাক ছাড়ো দেখি।'

হাসিমুখে ল্যানিয়ার্ড ধরে টান দিল হয়েস্ট ইঞ্জিনিয়ার, নীরব পাহাড়ি সকালের নিস্তব্ধতা চিরে দিয়ে নীচের মেসা, পিছনের ক্যানিয়ন ভরে উঠল বাষ্পের শিস দেবার তীক্ষ্ণ, একটানা শব্দে।

'আওয়াজটা ওদের জাগিয়ে তুলবে নিশ্চয়ই,' বলল গম্ভীর রন।

চোন্দো

পাহাড়ে পাহাড়ে শিসের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার পনেরো মিনিট পর শহরের দিক থেকে এল ওরা। সবার আগে ক্লিভ হেস্টিংস, লিউট ফেরিস; তাদের পিছনে প্যাট্রিক টমসন ও চার হাই-গ্রেডার। দলের সঙ্গে যোগ দিতে হস্তদন্ত হয়ে ছুটছে ডেভ বেল ও ম্যাক পিলার।

‘হেস্টনেস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে একেবারে,’ বিড়বিড় করল ফ্লিণ্টস্টোন ফেনটন।

আস্তে করে মাথা দোলাল রন।

হয়েস্টের চারপাশ থেকে চোখের আড়ালে সরে যেতে শুরু করল মাইনাররা। রনকে একা রেখে জং-পড়া বাক্সগুলোর প্রথম সারির পিছনে চলে গেল ফেনটন।

ঢাল বেয়ে উঠে আসছে ক্লিভ হেস্টিংস। বিনা দ্বিধায় অনমনীয় একটা ভঙ্গিতে পার হলো সে ইউনাইটেড ফেডারালের তৈরি ছেঁড়াখোঁড়া বেড়ার বাধা। তার পিছনেই আছে অন্যরা।

মিলের লম্বা, নিচু আকৃতির আড়ালে চলে যাওয়ায় কিছুক্ষণ দেখা গেল না কাউকে, তারপর আবার যখন দেখা গেল, ততক্ষণে চলে এসেছে তারা হয়েস্ট হাউসের কোনায়।

ওখানেই থমকে দাঁড়াল হেস্টিংস, বিরাট মাথাটা দুলিয়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে ঝাঁড়ের মত এদিক ওদিক চাইল, কী যেন বলল লিউট ফেরিসকে। তার গলার আওয়াজটা আবছা ভাবে শুনতে পেলেও বক্তব্য বুঝতে পারল না রন। ফেরিসের ইশারায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে সরে গেল দুই হাই-গ্রেডার ও প্যাট্রিক টমসন। রনকে বড় একটা ঘেরাওয়ার ভিতর রেখে আবারও এগোল দলটা।

লিউট ফেরিস ও প্যাট্রিক টমসনের কাছে শটগান আছে, দেখল রন। অন্য সবার উরুতে সিন্ধুগান। রনের চোখ এড়াল না, দলে লোক কমে গেছে দু’জন। তাদের বোধহয় মিলের ছায়ায়, আড়ালে রেখে এসেছে হেস্টিংস।

সামান্য পরেই হয়েস্ট হাউসের কোনা ঘুরল ডেভ বেল ও ম্যাক পিলার, তাড়াহুড়ো করে এল হেস্টিংস ও ফেরিসের সঙ্গে যোগ দিতে। হাঁপানি রোগীর

মত করে ম্যাক পিলারের শ্বাস নেবার আওয়াজটা শোনা গেল স্পষ্ট।

‘যেখানে আছ, সেখানেই থামো,’ শান্ত স্বরে কর্তৃত্বের সঙ্গে নির্দেশ দিল রন।

বলবার সুরটা এমনই, বেপরোয়া ক্রিভ হেস্টিংসও থমকে দাঁড়িয়ে গেল।
ঝোপের মত ঘন জুরু জোড়া উঁচু হলো তার। একবার পিছনে দেখে নিল সে।

অপেক্ষা করছে তার লোকরা, নির্দেশ পেলেই তেড়ে গিয়ে ঘিরে ফেলবে রনকে।

কিন্তু দ্বিধা যেন পেয়ে বসল হেস্টিংসকে। উইঞ্চের পিছন থেকে, হয়েস্ট হাউসের ওপার থেকে, বয়লারের ওপাশ থেকে বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করল সে। রন মার্লো সবখানে লোক রেখেছে, মনে মনে বলল হেস্টিংস। চাইল ডেভ বেল ও ম্যাক পিলারের দিকে। ওই দু’জনের উপস্থিতি এক মুহূর্তের জন্য বিস্মিত করল তাকে। মনে মনে খুশিও হলো। ডেভ বেল ও পিলারকে দেখিয়ে দেয়া যাবে খনিটা চালু করবার জন্য তার সঙ্গে মূলধন বিনিয়োগ করতে রাজি হয়ে সামান্যতম ভুল করেনি তারা। সিদ্ধান্তে এল, এখন নিজ কর্তৃত্ব দেখানোরই সময়।

রনের দিকে ঘুরে দৃঢ়ভঙ্গিতে এক পা সামনে বাড়ল হেস্টিংস, ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, ‘রন মার্লো, তোমাকে আদালতের নিষেধাজ্ঞা দেখানো হয়েছে, যেন এই সম্পত্তিতে আর পা না রাখো। নির্দেশটা অমান্য করেছ তুমি।’ লিউট ফেরিসের দিকে ইশারা করল সে। ‘ডেপুটি শেরিফ আমাদের ডেকেছে, যাতে এখান থেকে তোমাকে বের করে দিই আমরা।’

লিউট ফেরিস বলে উঠল: ‘তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, রন মার্লো, যদি তুমি বা তোমার কোনও লোক কর্তব্য পালনে আমাদের বাধা দেয়, তো সেটা হবে আইনের অফিসারদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। আইনকে তার নিজস্ব পথে চলতে না দিলে তার শাস্তি কিন্তু গুরুতর।’

আবার রনের দিকে এগোল ক্রিভ হেস্টিংস।

‘যেখানে আছ, সেখানেই দাঁড়াও, ক্রিভ,’ কড়া গলায় নির্দেশ দিল রন। তারপর গলা নামিয়ে বলল, ‘ফেরিস, তুমি আমাকে আদালতের একটা নিষেধাজ্ঞা দেখিয়েছ, সেটা আমি মেনেও নিয়েছি। এবার আমিও তোমাকে কিছু আইনী কাগজ দেখাব।’

ফেরিসের বদলে এগিয়ে এল ক্রিভ হেস্টিংস। ভাব দেখে মনে হলো রনের নির্দেশটা কানে যায়নি তার।

ঠিক তখনই হঠাৎ গায়ে গা ঠেকানো দুটো বক্স কারের মাঝে নড়াচড়া দেখা গেল। বেরিয়ে এল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের চওড়া কাঁধ ও বিরাট মাথা। কারবাইনের সাইটের পিছনে ঝকঝক করল তার সাগর-নীল চোখ দুটো।

‘মিস্টার মার্লো তোমাকে থামতে বলেছে!’ মেঘ ডাকল যেন ফেনটনের গলায়।

ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে এক পা সামনে বাড়িয়েছিল ক্লিভ হেস্টিংস, ওভাবেই দৌড় দিতে তৈরি দৌড়বিদের মত বেকায়দা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ক্লিক করে কক হলো ফেনটনের কারবাইনটার হ্যামার।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়া হেস্টিংসের পিঠে গুতো খেল লিউট ফেরিস, কিন্তু ভুলেও সরল না ওখান থেকে, দাঁড়িয়ে থাকল মার্শালের বিরাট দেহের আড়ালে। তার ভাব, দেখে মনে হলো লুকিয়ে পড়েছে, কিন্তু আসলে পরিষ্কার দেখতে পেল তাকে ফেনটন।

সাবধানে ডানে-বামে চাইল ক্লিভ হেস্টিংস, বস্ত্র কার দুটোর মাঝে ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনকে দেখতে পেয়ে ঘুরে চাইল সে উপরে দাঁড়ানো রনের দিকে। লোকটার দৃষ্টিতে প্রবল ঘৃণা ও জেদ দেখতে পেল রন।

আবার চোখ সরে গেল হেস্টিংসের, শাফটের কালো গহ্বরের দিকে চাইল, দেখতে পেল রনের দুই গার্ডের মাথা ও কাঁধ। ট্র্যাকের উপর গুয়ে আছে তারা এখন, কাঁধের রাইফেলগুলোর লক্ষ্য সে নিজে।

ক্লিভ হেস্টিংসের বুঝতে দেরি হলো না, ফাঁদে পড়ে গেছে। হয় তাকে পিছিয়ে যেতে হবে, অথবা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নিষ্ক্রিয় হয়ে।

‘ভাল,’ যেন তার মন পড়েই বলল রন, ‘ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকো।’

হেস্টিংসের কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিল লিউট ফেরিস। ডেভ বেল কথা বলে উঠল মিলের কোনা থেকে। উত্তেজনা ভরা নীরবতায় খসখস আওয়াজ তুলল তার কণ্ঠ: ‘মার্লো, বোকামি কোরো না। জোর করে খনি দখলে রাখতে পারবে না, খনি থেকে তামা বের করার কথা বাদই দিলাম। আইন তোমার বিপক্ষে।’

কোনও জবাব দিল না রন।

রাগে শরীর মোচড়াল ডেভ বেল, কিন্তু যেখানে আছে, সেখান থেকে এগোল না, নিচু স্বরে কী যেন বলল ম্যাক পিলারকে।

ক্লিভ হেস্টিংসের কানে ফিসফিস করে দ্রুত কথা বলল লিউট ফেরিস

দরদর করে ঘামছে ক্লিভ হেস্টিংস। ফ্লিন্টস্টোন ফেনটনের চোখে সে এমন কিছু দেখেছে, যেটা চিন্তিত করে তুলেছে তাকে। মার্লোর গার্ড দু’জনও তৈরি, ভাবভঙ্গি বলে দিচ্ছে গুলি করতে দ্বিধা করবে না এক তিল। আর... গুলি ছুঁড়লে তারা খুন করবার জন্যই ছুঁড়বে।

পিছনে নিজ দলের লোকদের নড়তে গুনল হেস্টিংস। ‘না! দাঁড়াও!’ কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল। হ্যাট ব্যাণ্ডের তলা থেকে টুপ করে তার কপালে নামল ঘামের একটা বড়সড় ফোঁটা।

মিলের ভিতর থেকে ধাতুর সঙ্গে ধাতু ঘষা খাওয়ার আওয়াজ হলো। ‘কিছু করতে নিষেধ করেছি আমি!’ কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা চড়ে গেল হেস্টিংসের।

ক্ষিপ্ত মার্শালের দিক থেকে চোখ সরাল রন। ‘ফেরিস, এগিয়ে এসো।’

হোঁচট খেতে খেতে সামনে বাড়ল লিউট ফেরিস, চেহারা য শঙ্কা। তার দিকে চেয়ে হাসল রন, পকেট থেকে বের করল কাউন্টি সিট-এর কোর্টহাউস হতে সংগ্রহ করা লোকেশন নোটসগুলো। ওগুলো দিয়ে ফেরিসের মুখে বাতাস করল ও।

যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে একটা নোটস নিল লিউট ফেরিস, ওটাতে চোখ বুলিয়ে চাইল রনের চোখে। তার দৃষ্টিতে উপলব্ধির ছোঁয়া দেখল রন।

নরম গলায় বলল ও, ‘বুঝতেই পারছ, তোমরাই আমার সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করেছ, ফেরিস। পুরনো আমলে খুব কম কোম্পানিই প্রেসার ক্রেইম ছাড়া অন্য কোনও ধরনের ক্রেইম ফাইল করত। ইউনাইটেড ফেডারালও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ফেডারালের করা প্রেসার ক্রেইমগুলোর ওপর লোড ক্রেইম ফাইল করেছি আমি।’

চুপচাপ হাতে ধরা কাগজটা দেখল লিউট ফেরিস, তারপর নীরবে বাড়িয়ে দিল রনের দিকে। দপদপ করে লাফাতে শুরু করল তার কপালের এক পাশের শিরা।

আবারও বলল রন, ‘তোমার দেখানো ইনজাংকশন অনুযায়ী আমি বা আমার কোনও লোকের বিরুদ্ধে কিছু করার অধিকার আর নেই তোমার। এখানে তোমাকে চাইছি না আমি। বুঝতেই পারছ, তোমাকে চলে যেতে বলার সমস্ত আইনী অধিকারই আছে আমার।’ থামল রন, তারপর বিরতি নিয়ে আবার যখন বলল, ভারী শোনাৎ ওর কণ্ঠ: ‘এখান থেকে বেরোও!’

কর্তৃত্বের সমস্ত ছাপ মুহূর্তে বিদায় নিল ক্লিভ হেস্টিংসের চেহারা থেকে, এক পলকে যেন ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে সে। যদিও পরাজয় ঢেকে রাখতে কর্কশ গলায় বলল, ‘ঠিকমত দেখো কাগজগুলো, ফেরিস। ঠকাতে চেষ্টা করছে ও তোমাকে!’

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল লিউট ফেরিস, তারপর মাথা দোলাল। ‘ঠকানোই বলতে পারো। তবে আইনসম্মত ভাবে।’ ঠোট বাঁকা করে রনের দিকে চেয়ে হাসল সে। ‘খেলাটা আমিও জানি, মার্লো। এ-খেলায় আমাকে হারানো খুব কঠিন হবে তোমার পক্ষে।’ স্থলিত পায়ে হেস্টিংসের কাছে হেঁটে গেল ফেরিস, নিচু স্বরে বলল, ‘চলো, ক্লিভ, পরে অন্য কোনও সময় আবার আসব আমরা।’

দীর্ঘ এক মুহূর্ত দু’দিকে দুলল ক্লিভ হেস্টিংসের মন। রাগ ও হতাশায় গাল দুটো লাল হয়ে উঠল তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি হারিয়ে বেসামাল কিছু করল না, লিউট ফেরিস বাহুতে হাত রেখে টানতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, ফিরতি

পথ ধরল।

হেস্টিংস ও লিউট ফেরিস রওনা হতেই সরু পথটা থেকে সরে দাঁড়াল ডেভ বেল ও ম্যাক পিলার। উকিলের পিছু নিল হাই-গ্রেডাররা।

সবাই তারা মিল পেরিয়ে যাওয়ার পর ডেভ বেল বলল, ‘এখানে আমি কারও পক্ষ নিয়ে আসিনি, রন। বলতে দ্বিধা নেই, কোন্ পক্ষ জেতে সেটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছি। ব্যবসায়ী মানুষ আমি, কাজেই যারা জিতবে, তাদের কাছে বিনিয়োগ করব আমি আমার টাকা।’

‘তাড়াতাড়ি মনস্থির করলেই ভাল করবে,’ বলল রন। ‘শেষে লোভ করে বেশি দেরি করে ফেলতে পারো।’

রক্ত সরে গেল ডেভ বেলের মুখ থেকে, কোনও জবাব দিল না। সামান্য ইতস্তত করে ম্যাক পিলারকে ইশারা করে ফিরতি পথ ধরল সে-ও।

বক্স কারগুলোর আড়াল থেকে রনের পাশে এসে দাঁড়াল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন। নীচ থেকে চলে এল দুই গার্ড। হযেস্ট হাউসের আশপাশ থেকে অন্যান্যদের চলে আসতেও দেরি হলো না।

ফেনটন বলল, ‘এই একবার ওদের ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে দেখলাম। ভাল লাগল।’

শান্ত স্বরে বলল রন, ‘একবার ফিরিয়ে দিতে পেরেছি, এবার চেষ্টা করতে হবে, যাতে সব সময়ের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি ওদের।’

‘সেজন্যে কোনও পরিকল্পনা করেছে, মিস্টার মার্লো?’

‘বলতে পারো। তোমার কথা থেকেই একটা চিন্তা মাথায় এসেছে।’ সরু পথ ধরে নামতে শুরু করল রন বিস্তারিত কিছু ব্যাখ্যা না করেই।

পিছন থেকে ফেনটন বলল, ‘তুমি যদি শহরে যাও, তো ভুলেও কোনও অঙ্কার গলির দিকে পিঠ দিয়ে না, মিস্টার মার্লো। ওই হাই-গ্রেডারদের সামনে পোড়ো না যেন। নীচ ছোটলোক ওরা।’

‘সেটা আমি হাড়ে হাড়ে জেনেছি,’ বলল রন।

নেমে যাওয়ার গতি দ্রুত হলো ওর।

টিলা থেকে অর্ধেক নামতেই আবারও শুরু হলো বৃষ্টি। আকাশ দু’ফাঁক করে পানি ঢালছে যেন কেউ। খনির ঘর-বাড়ির টিনের চালে ঝমাঝম শব্দ তুলল বড় বড় ফোঁটা। মিলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দু’জন লোককে দ্রুত পায়ে চলে যেতে দেখল রন। আন্দাজ করল, ওরা ক্লিভ হেস্টিংসের দলের অবশিষ্ট দুই হাই-গ্রেডার। হেস্টিংস যখন বাড়াবাড়ি করতে চাইল, তখন লুকিয়ে ছিল এরা মিলের ভিতর।

মিলের মাঝ দিয়ে বয়ে আসা বাতাসে একটা গন্ধ পেল রন। তারপর ওর কানে এল পড়-পড় আওয়াজটা।

ওদিকে চাইল রন। এবার লোহার একটা ট্যাক্সের কালো পটভূমিতে আগুনের লাল আভা চোখে পড়ল ওর। দ্রুত পায়ে মিলের ভিতরে ঢুকল ও, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একগাদা ড্রিলে পা বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। শরীরটা গড়িয়ে গেল একটা টেবিলের তলায়। আগুনটা ওখানেই জ্বলছে। সলতের আগুন, ধীরে ধীরে চলেছে ডিনামাইটের বাগুলির দিকে।

সলতে ধরে টেনে খুলতে গিয়ে হাতে ফোস্কা পড়ে গেল রনের। ওটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, পায়ের তলায় ফেলে ব্যস্ত হয়ে নেভাতে চেষ্টা করল। কাজটা শেষ করে সাবধানে ডিনামাইটের বাগুলির ক্যাপ খুলে নিল।

প্রাচীন একটা ওক গাছে গুঁড়ির উপর পড়ে থাকা লোহার পাতে পৈঁচিয়ে রাখা হয়েছিল ডিনামাইট চার্জ। ক্লিভ হেস্টিংসের পরিকল্পনা কী ছিল বুঝতে বেগ পেতে হলো না ওকে। লোকটা এমন জায়গায় ডিনামাইট বসিয়েছে, ক্ষতি খুব সামান্যই হবে। হেস্টিংস আশা করেছে, বিস্ফোরণটা মাইনারদের সবার মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে দেবে, আর সেই সুযোগে রনকে অপ্রস্তুত অবস্থায় বাগে পাবে সে। বিস্ফোরণ ঘটলে লোহার পাতটা কামানের গোলার মত ছিটকে টিনের ছাত ভেদ করে বেরিয়ে যেত, আওয়াজ হতো প্রচণ্ড।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় হেস্টিংসই যে চার্জটা বসানোর নির্দেশ দিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই রনের। এ-ধরনের নোংরা প্রতিহিংসা মূলক কূটকৌশল হেস্টিংসের মত নীচ লোকের পক্ষে স্বাভাবিক।

খনিটার অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য এবার উঠে-পড়ে লাগবে ক্লিভ হেস্টিংস।

টিলা বেয়ে নীচে নামবার সময় রনের উরুতে চাপড় মারল সিক্সগানটা। হাত দিয়ে ওটা চেপে রাখল ও, মনে চিন্তা এল: হয়তো এটাই একমাত্র জিনিস, যেটা ঠেকিয়ে দেবে ক্লিভ হেস্টিংসকে।

বিপদের জন্য তৈরি হয়ে রেল-রাস্তায় চলে এল ও, কিন্তু কোথাও হেস্টিংস বা ফেরিসকে দেখতে পেল না। দোকানে পৌঁছে গেছে ডেভ বেল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে জর্জ ব্রাউনের সঙ্গে কথা বলছে। হাওয়ার্ডস হোটেল পেরিয়ে নিজের দোকানের দিকে চলেছে ম্যাক পিলার।

ডেভ বেলের স্টোর পাশ কাটানোর সময় বারান্দা থেকে নেমে এসে রনকে ডাকল জর্জ ব্রাউন। বুড়ো টমসনকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে সেতু পেরিয়ে আসতে দেখল রন, ব্রাউনের আগে তার সঙ্গেই কথা বলল ও।

‘প্যাট্রিককে খুঁজছি আমি, মিস্টার টমসন।’

‘আমিও খুঁজছি,’ জানাল টমসন, কৌতূহলের সঙ্গে রনকে দেখল। ‘কী জন্যে খুঁজছ ওকে?’

জিমি টমসনের চোখে ভীতি জাগতে দেখল রন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও।

বলল, ‘ওর কাছে আমি জানতে চাইব যে-রাতে বুলেট ট্রেইনে ডাকাতি হলো, সে-রাতে কোথায় ছিল ও।’ জিমি টমসনকে পাশ কাটাল রন, শুনতে পেল বৃদ্ধের চমকে শ্বাস নেয়ার আওয়াজ।

হয়তো অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে ও, ভাবল রন, কিন্তু এমনও হতে পারে, ঢিলটা জায়গামত লাগবে, ভয়ে লুকিয়ে পড়বে শেয়ালের দল। লুকাতে হলে নড়তে হবে তাদের। ঘাপটি মেরে বসে থাকা শিকারের চেয়ে চলন্ত শিকার চোখে পড়ে সহজে। জিমি টমসনের কথা ভেবে দুঃখ বোধ করল ও।

রানিং আয়ার্নের ব্যাট উইং ঠেলে হনহন করে ভিতরে ঢুকে পড়ল রন। সেলুনে ব্লেক ও চূপচূপে ভেজা দু’জন কাস্টমার ছাড়া আর কেউ নেই। লোক দু’জন হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছে, ব্লেক দাঁড়িয়ে আছে বার-এর পিছনে, কাপড় দিয়ে কাউন্টার মুচছে।

রনকে দেখে চোখের দৃষ্টি শীতল হয়ে উঠল সেলুন-মালিকের, নতুন উদ্যমে বার কাউন্টার মুচতে শুরু করল সে।

তার ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়াল রন, কড়া গলায় বলল, ‘প্যাট্রিককে খুঁজছি আমি।’

রুঢ় আচরণ মোকাবিলা করে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ব্লেক, বিন্দুমাত্র ভড়কাল না সে। ত্যাড়া স্বরে জিজ্ঞেস করল, ‘ভাবছ আমি জানি ও কোথায় আছে?’

‘ওর কাছে হুইস্কি বিক্রি করছ তুমি।’

‘বিক্রি করব না সেটা কখনও ভাবিনি। হুইস্কি বিক্রি করাই আমার পেশা।’

খপ করে মোটাসোটা ব্লেকের শার্টের কলার চেপে ধরল রন, এক টানে তাকে নিয়ে এল সামনে, ব্লেকের মুখের কাছে মুখটা নিয়ে বলল, ‘প্যাট্রিক টমসন কোথায়?’

‘ছাড়ো!’ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল ব্লেক। মুখটা তার বেগুনী হয়ে গেল রাগে। দ্রুত শ্বাস নিতে শুরু করেছে। ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, ‘জানলেও তোমাকে বলতাম না কোথায় আছে!’

বিরাট একটা হাত ছুটে গেল রনের কাঁধের উপর দিয়ে, পাকানো মুঠোটা আছড়ে পড়ল ব্লেকের মুখে। ঘুসিটা এত জোরাল যে পিছিয়ে গেল ব্লেক। রনের হাতে রয়ে গেল তার ছেঁড়া শার্টের অংশ। পিছনের বার-এ গিয়ে জোরে ধাক্কা খেল ব্লেক, সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশে ঝনঝন করে পড়তে শুরু করল গ্লাস-স্নোতল।

হঠাৎ করে রনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জর্জ ব্রাউন। কড়া গলায় সে বলল, ‘মিস্টার মার্লো কোনও প্রশ্ন করলে সেটার জবাব দেবে তুমি, ব্লেক। সে যদি জবাব না-ও পায়, আমি কিন্তু পাব।’

ব্রাউনের আকস্মিক খেপে ওঠা বোকা বানিয়ে দিল ব্লেককে, কাঁপা হাতে ঠোট মুছল সে, ম্রিয়মান কণ্ঠে বলল, ‘জানি না ও কোথায়। আধ ঘণ্টা আগে এখানেই ছিল।’

রনের দিকে ফিরল ব্রাউন। ‘যতবার ডেভ বেলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ততবার বুঝতে পারছি কত বড় হাঁদা ছিলাম আমি। চলো, টমসনকে খুঁজতে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।’

জর্জ ব্রাউনের অস্বস্তিটা উপলব্ধি করল রন। ভুল করে ওকে আক্রমণ করে বসে এখন পস্তাচ্ছে লোকটা, যেভাবে পারে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করছে। রানশারের প্রতি সামান্যতম কোনও রাগ বা ক্ষোভ যদি ওর মনে থেকেও থাকে, আন্তরিক আচরণ পেয়ে দূর হয়ে গেল সেটা।

‘তুমি সঙ্গে এলে খুশি হব,’ বলল রন।

প্যাট্রিক টমসনকে খুঁজতে বেশিদূর যেতে হলো না দু’জনকে, কিন্তু বিকেলের আগে পাওয়া গেল না মাতাল লোকটাকে। দুপুরে বারকয়েক জিং ওয়াঙের রেস্টুরেন্টে প্যাট্রিককে খুঁজেও পেল না ওরা। আজ আসেইনি প্যাট্রিক টমসন। কয়েকবার মেইমির ওখানেও গেল রন ও ব্রাউন, ওদের কাটা-কাটা কথায় রেগে গিয়ে অভিশাপ দিল মেয়েরা। কিন্তু শেষবার ওখানে গিয়ে যাকে খুঁজছিল, তার হৃদিশ পেল ওরা।

রনকে বলল মেইমি, ‘তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাকে বলেছিলাম আমার একটা মেয়ের প্রতি দুর্বল ও? ওই মেয়ে প্যাট্রিককে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু জিমি টমসন জানত ও কোথায় থাকবে, এই তো মিনিট পনেরো আগে ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে সে। খবরটা তোমাকে জানাতে এখনই বেরুচ্ছিলাম আমি।’

দেরি না করে ব্রেকম্যানের হোটেলের পিছন দিয়ে বেরিয়ে এল রন ও ব্রাউন, হোগানের গলিতে ঢুকে খালি প্লটগুলো আড়াআড়ি পার হয়ে মিনিট পাঁচেকের ভিতরপৌছে গেল বুড়ো টমসনের বাড়ির দরজায়।

টোকার জবাবে বুড়ো টমসন এল দরজা খুলতে, রনকে দেখেই বলল, ‘খুঁজে পেলাম না প্যাট্রিককে।’ বেরিয়ে এসে দরজাটায় তালা মেরে দিল সে। ‘ডিপোতে যেতে হচ্ছে, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে,’ একবারও পিছনে না তাকিয়ে হাঁটা ধরল বুড়ো। তার জন্য আবারও দুঃখ হলো রনের। মানুষটা খুব কাঁচা মিথ্যুক।

ব্রাউনকে নিয়ে বাড়ির পাশে চলে এল ও, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল এমন কোনও শব্দ, যেটা প্রমাণ করে দেবে বাড়ির ভিতর আছে প্যাট্রিক। তারপর প্যাট্রিককে দেখতে পেল ও, পিছন উঠানে বেরিয়ে চুপিচুপি ঘোড়া রাখবার ছোট করালটার দিকে চলেছে সে।

অনেক কষ্টে এ ক’দিনে জমে ওঠা রাগ-ক্ষোভ-হতাশা চেপে রেখেছিল রন, আজকে প্যাট্রিক টমসনকে দেখে ওর সমস্ত অনুভূতি আটকে রাখবার শক্তি বর্মটা ভেঙে গেল হঠাৎ। বাড়ির কোনা ঘুরেই ছুটতে শুরু করল রন, চোখের পলকে পেরিয়ে গেল উঠান, তারপর ক্ষিপ্ত বাঘের মত বাঁপিয়ে পড়ল প্যাট্রিক টমসনের উপর।

গোটা ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, পিছনে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে অস্ত্র বের করতে পারল না টমসন। রনের ধাক্কা সামলাতে না পেরে করালের বেড়ার সঙ্গে গিয়ে বাড়ি খেল সে, দু’ভাঁজ হয়ে গেল পেটের ব্যথায়।

একলাফে তার কাছে চলে গেল রন, টান দিয়ে বের করে ফেলল টমসনের সিক্সগান, কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে সিঁধে করে ঘোরাল নিজের দিকে, তারপর ডানহাতে ঘুসি ছুঁড়ল চিবুক লক্ষ্য করে। করালের বেড়ার সঙ্গে বাড়ি খেল টমসন, তারপর বসে পড়ল পায়ের জোর না পেয়ে।

‘সাবধান, মেরে ফেলো না আবার!’ রনের পিছন থেকে তাড়াতাড়ি বলল জর্জ ব্রাউন।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল টমসন, এক হাতে মুখ আড়াল করতে চাইল। মনে করেছে আবারও তাকে ঘুসি মারবে রন মার্লো।

নিজেকে সামলে নিল রন। প্যাট্রিক টমসন যদি গোপন কিছু জেনে থাকে, তো হয়তো বলে দেবে ভয়ে। সেটাই চায় ও, টমসন মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না ওর।

ধীর গলায় বলল ও, ‘তোমার বদলে আমাকে মারা হয়েছিল, প্যাট্রিক। রানশার ম্যাকের মাথায় বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে তার মানিব্যাগের সমস্ত টাকা ছিনতাই করেছিলে তুমি। ...টাকাগুলো কোথায়?’

হাঁ হয়ে গেল প্যাট্রিক টমসন, জবাবে বলল না কিছু।

এক পা সামনে বাড়ল রন।

জর্জ ব্রাউন বলল, ‘মার্লো, আমার হাতে ছেঁড়ে দাও ওকে!’

‘থমথম করছে রানশারের চেহারা।

ঘামে ভিজ়ে গেল প্যাট্রিক টমসনের ভুরু। কাঁপা গলায় বলল, ‘হেস্টিংস। ...মার্শাল নিয়ে নিয়েছে সব টাকা।’

নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল ব্রাউন, ‘মার্লো, এসব কি তুমি আগেই জানতে?’

‘জানছি এখন— আরও অনেক কিছু জানব,’ জবাব দিল রন।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জর্জ ব্রাউন, কোমর থেকে বেল্ট খুলে ফেলল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ‘হারামজাদার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব আমি চাবকে। ওর বাপ যদি ঠিক মত চাবকাত, তো আজ এভাবে পচে যেতে পারত না কুকুরটা।’

প্যাট্রিক টমসনকে দেখল সে জ্বলন্ত চোখে। ‘আমি মনের সুখে পিটিয়ে নেবার পর যখন সুস্থ হতে পারবে, পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাবে তুমি, আর কখনও ফিরবে না। যদি ফেরো, নিজ হাতে খুন করব তোমাকে আমি।’

‘একটু দাঁড়াও,’ মারমুখী রানশারকে বলল রন, ‘আরও কিছু বলার আছে ওর।’ টমসনকে নড়িয়ে দিতে চেয়ে থাকল ও একদৃষ্টিতে, তারপর বলল, ‘মুখ ছোটাও, প্যাট্রিক। তোমাকে বলতে হবে যে-রাতে কর্নেল খুন হলো, সে-রাতে কোথায় ছিলে তুমি।’

ফাঁদে পড়া ছোট জন্তুর মত ভীতচকিত অস্ফুট একটা শব্দ বেরল প্যাট্রিক টমসনের হাঁ করা মুখ থেকে। বাম দিকের কশা বেয়ে নামল লালার ধারা। মুখের সামনে এক হাত তুলে হড়বড় করে বলে উঠল, ‘ও-ব্যাপারে কিছু জানি না আমি। ঈশ্বরের শপথ, কিছু জানি না।’

এক ঝটকায় সিঁঙ্গান বের করল রন।

বিমূঢ় বিস্ময় নিয়ে অস্ত্রটার দিকে চাইল প্যাট্রিক টমসন।

‘কী করবে ভাবছ, মার্লো?’ সতর্কতার সুরে জিজ্ঞেস করল জর্জ ব্রাউন।

ভারী সিঁঙ্গানটা ঘুরিয়ে প্যাট্রিক টমসনের হাতে মারল রন। কোনাকুনি মেরেছে, ফলে বাড়ি খেয়ে সরে গেল হাত, মাথার পাশে আঘাত করল অস্ত্রটার নল। বিবশ হয়ে গেল টমসন, হাঁটুতে জোর হারিয়ে লড়বড় করতে শুরু করল। দু’পাশে ঝুলে পড়ল হাত, প্রতিরোধের সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে কাতর মুখোভঙ্গি করল। নীরবে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে।

এতটা দূর এগিয়ে আর ফিরে আসবার কোনও পথ নেই, টের পেল রন। বারবার সিঁঙ্গানের নল নামিয়ে আনল ও টমসনের মাথায়, মুখে, হাতে। মাপা আঘাত করছে, কোনও একটা আঘাতে মারাত্মক আহত হবে না লোকটা, তবে ব্যথা পাবে প্রচণ্ড।

নিচু স্বরে গোঙাতে শুরু করল প্যাট্রিক টমসন, বারবার ক্ষমা প্রার্থনা চাইল। তারপর দু’মিনিট পেরুবার আগেই গোঙানো থামিয়ে ধীর, অথচ নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়ে গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল সে।

থামল না রন, আরও কয়েকবার বাড়ি দিল অস্ত্রটা ঘুরিয়ে।

পাশ থেকে চাপা কণ্ঠে বলে উঠল জর্জ ব্রাউন: ‘মার্লো, খুন করে ফেলছ তো ওকে!’

‘করলে ক্ষতি কী? মার্শল্যাণ্ডকে গুলি করেছে ও।’ কর্কশ শোনাৎ রনের গলা, কিন্তু নিজেই সামলে নিয়ে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল।

করাল পরিষ্কার করে বাইরে ফেলে রাখা ঘোড়ার কাঁচা নাদির উপর ধপ করে বসে পড়ল প্যাট্রিক টমসন, তারপর সারা গায়ে ওই জিনিস মাখিয়ে শুয়ে পড়ে শরীর মোচড়াতে লাগল ব্যথায়। তারই ফাঁকে দু’হাতে মাথা ঢাকবার চেষ্টা

করছে মারের ভয়ে।

টমসনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সিঙ্গগানটা হোলস্টারে ভরল রন, তারপর উবু হয়ে কলার ধরে টান দিয়ে তুলল লোকটাকে, ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিল করালের বেড়ার গায়ে। হাত দুটো একসঙ্গে বেঁধে বেড়ার উপরের কাঠের ওপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে আনল দড়ি, তারপর দড়িতে টান দিয়ে টমসনকে দাঁড়াতে বাধ্য করে কড়া গলায় বলল, 'দাঁড়াও!'

হাতে প্রচণ্ড টান পড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করল টমসন, পাঁড় মাতালের মত এদিক-ওদিক দুলতে শুরু করল তার মাথা।

শীতল ক্রোধ নিয়ে তাকে দেখল রন, জিজ্ঞেস করল, সে খুন করেছে কি না কর্নেল মার্শল্যাণ্ডকে।

টমসন যেই না-সূচক মাথা নাড়ল, রন বুঝল, কাজ হচ্ছে ওর নিষ্ঠুর জিজ্ঞাসাবাদে।

গোটা চারেক জোরাল চড় খাওয়ার পর দু'বার ঠোট ফাঁক করল প্যাট্রিক টমসন, কিন্তু কথা বলতে পারল না। বারকয়েক মাথা নাড়ল। বোঝাতে চাইল, গুলি করেনি সে মার্শল্যাণ্ডকে।

তৃতীয়বারের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বলতে পারল কথাটা। উঠানের নীরবতায় স্পষ্ট শোনা গেল তার বক্তব্য: 'ক্লিভ হেস্টিংস গুলি করেছে কর্নেলকে!'

পনেরো

করালের বেড়ার গায়ে প্রায় ঝুলে আছে প্যাট্রিক টমসন। লোকটার দিকে তাকিয়ে তিক্ত অনুভূতি হলো রনের। ঠোটের দু'কোণ বেকে গেল ওর।

ওর পাশে কাঁপা কাঁপা শ্বাস ছাড়ল জর্জ ব্রাউন, ফ্যাসফেসে স্বরে বলল, 'বিরিট একটা বোঝা বুকে বয়ে বেড়াচ্ছিলে তুমি, মালো।'

সরে গিয়ে ঘোড়ার পানি খাওয়ার চৌবাচ্চা থেকে টিনের মগ ভরে পানি তুলল রন, তারপর ফিরে এসে পানিটা ছুঁড়ে দিল প্যাট্রিক টমসনের মুখে। আসলে চিন্তা করবার জন্য সময় দরকার ওর। একটু পরে বলল, 'জর্জ, ডক ব্রায়ারকে খুঁজে আনো। ডেভ বেল, ম্যাক পিলার আর নিক হাওয়ার্ডকেও নিয়ে এসো। আমি চাই ওরা গুনুক প্যাট্রিকের বক্তব্য।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল,

তারপর বলল, ‘বিনের বিল্ডিঙে থাকব আমরা।’

জর্জ ব্রাউন সতর্ক করবার সুরে বলল, ‘টমসনের কাছে এমন সব তথ্য আছে, যেগুলো প্রকাশ পাক তা চান্ন না কেউ কেউ।’

ক্ষত-বিক্ষত মুখে হাত বোলাল প্যাট্রিক টমসন, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা। হাত দুটো চোখের সামনে এনে বোকার মত চাইল, যেন বুঝতে পারছে না অত রক্ত কোথা থেকে এল।

‘কোনও সমস্যা হবে না আমার,’ দৃঢ় স্বরে বলল রন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল রানশার।

দড়ি খুলে প্যাট্রিক টমসনকে সামনে নিয়ে বিনের বিল্ডিঙের দিকে চলল রন, পার হলো একটার পর একটা বাড়ির পিছনের অন্ধকার, ফাঁকা উঠান। পথ চিনতে অসুবিধে হলো না কোনও, শৈশব থেকে শহরের এদিকটা ওর ভাল মত চেনা। এখানেই ওর শিকড়। রানিং আয়ার্নের পিছন দিয়ে হোগানের গলি থেকে বের হলো ও, অ্যাসা জোন্সের পরিত্যক্ত স্যাডল-শপ পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল ক্যানিয়নে, বিনের দালানের চেয়ে খানিক উপরে।

ক্যানিয়নের নীচের দিকে চেয়ে এক শ’ গজ দূরে সেতু পার হতে দেখল ক্লিভ হেস্টিংসকে। আশপাশের বাড়ির লণ্ঠনের আভায় বিশাল দেখাল লোকটাকে।

ক্রীকের তীর ধরে ঠেলা দিয়ে প্যাট্রিক টমসনকে সামনে বাড়াল রন, একটু পরে ক্রীকে নেমে কাদা-পানি ভেঙে ওপারে উঠতে চাইল। ওরা মাঝ-ক্রীকে থাকতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রীকের উজানের দিকে চাইল ক্লিভ হেস্টিংস।

পিঠে সিঙ্গানের গুঁতো দিয়ে টমসনকে পার বেয়ে উঠতে বাধ্য করল রন, বিনের দালানে ঢুকল ক্যানিয়ন পার হয়ে।

কাজ গুছিয়ে বেরিয়ে আসবার জন্য তৈরি হচ্ছিল লিজা, বন্দিসহ রনের সঙ্গে ছোট্ট রিসেপশন ঘরে দেখা হয়ে গেল ওর। রন ও টমসনের কাপড় থেকে নতুন কার্পেটে কাদা-পানি ঝরছে দেখে রেগে উঠেছিল লিজা, কিন্তু দ্রুত সামলে নিল রাগটা। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত প্যাট্রিক টমসনের বিকৃত চেহারার দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা, তারপর চাইল রনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুখের দিকে। কিছু বুঝছে না বোঝাতে মাথা নাড়ল দু’পাশে।

‘ওকে আটকে রাখার জন্যে একটা ঘর দরকার,’ লিজাকে বলল রন। ‘ডক ব্রায়ার আসছে। টমসনের জন্যে পরিষ্কার কাপড় আর গরম পানি লাগবে।’

ডান দিকের একটা ঘরের দিকে মাথা কাত করে দেখাল লিজা, ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল পিছন দরজা দিয়ে।

লিজার দেখানো ঘরটার ভিতর ধাক্কা দিয়ে প্যাট্রিক টমসনকে ঢোকাল রন, লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে চাইল। সামনের জায়গা বিনের

দালান ও বিল ট্রেইসির বাড়ির মাঝে ডেভ বেলের সিমেন্টের সেই চত্বর। ওখানে মাইনারকে তাঁর গাড়িতে ভাড়া দিয়েছিল ডেভ বেল।

‘বসে অপেক্ষা করো এখানে।’ লণ্ঠন জ্বলে নির্দেশ দিল রন। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করল এবার। কী করবে তার পরিকল্পনা দাঁড় করাতে হবে। বুড়ো টার্নারের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছে, সেটা মনে পড়ল। টার্নারের মত বড়লোকও ন্যায়ের বিপক্ষে গিয়ে জিততে পারেনি। মনে মনে বলল রন, ‘এখন আইনের এদিকে থেকেই বাগে পাওয়া সম্ভব হেস্টিংসকে।’

ক্যানিয়ন থেকে ভেসে আসা ডেভ বেলের আপত্তিসূচক কথার আওয়াজ শুনতে পেল রন। জড়ানো গলায় কী যেন বলছে ডক ব্রায়ার। তাদের দু’জনের কথা ছাপিয়ে উঠছে জর্জ ব্রাউনের উত্তেজিত কণ্ঠ। ভারী পদশব্দ তুলে দালানের ভিতর ঢুকল তিনজন। খালি ঘরগুলোয় প্রতিধ্বনিত হলো সেই আওয়াজ।

দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল রন, ‘এখানে!’

‘ব্যাপার কী?’ এগিয়ে এসে বিরক্ত সুরে জিজ্ঞেস করল ডেভ বেল। ‘জর্জ বলল তোমার নাকি কী দেখানোর আছে? ব্রায়ারের আবার প্রয়োজন পড়ল কেন? আহত হয়েছে কেউ?’

প্রশ্নটার জবাব দিল না রন, সবাইকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেবার জন্য একপাশে সরে দাঁড়াল। ‘প্যাট্রিক টমসন আছে এখানে।’

রোগীর চেহারার দুরবস্থা দেখে চিকিৎসা করতে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল ডক ব্রায়ার। তখনই তোয়ালে ও ধোয়া-ওঠা গরম পানি ভর্তি বালতি নিয়ে চলে এল লিজা। শার্টের হাতা গুটিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ব্রায়ার। ব্যথা পেয়ে অভিশাপ দিতে শুরু করল প্যাট্রিক টমসন। বিরক্তির সঙ্গে ডাক্তারকে সাহায্য করল লিজা।

‘আরেকবার বলো, টমসন,’ বলল গম্ভীর রন।

লিজার প্রতিটি নড়াচড়া খেয়াল করছে প্যাট্রিক, মেয়েটার উপস্থিতি যেন সাহস ও শক্তি জোগাল তাকে। তারপরও কথা শুরু করতে গিয়ে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেল না।

‘কর্নেলের ব্রিফকেসটা কোথায়?’ সূত্র ধরিয়ে দিল রন।

‘হেস্টিংসের কাছে,’ জবাব দিল টমসন। তার আড়ষ্ট কথাটা হঠাৎ করেই যেন চোখ খুলে দিল অন্যদের। এবার কীভাবে কী ঘটেছে এক নাগাড়ে বলে গেল টমসন। এতই দ্রুত যে, বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

‘আস্তে, বলো, প্যাট্রিক,’ বলল বিরক্ত ডেভ বেল। ‘কী বলছ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে।’

হাওয়ার্ড ও পিলার পাশ থেকে চাইল ডেভ বেলের দিকে। প্যাট্রিক টমসনকে এক দৃষ্টিতে দেখছে জর্জ ব্রাউন। ব্রায়ার ও লিজা ব্যস্ত হয়ে আছে আহত লোকটার ক্ষত পরিচর্যায়। শুধু রনের চোখে পড়ল লণ্ঠনের আলোর

আওতার শেষ প্রান্তে জানালার ওপাশে ঝাপসা মুখটা। শুধু রনই দেখল ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে জানালার কাঁচ, তারপর রিভলভারের নল থেকে বিচ্ছুরিত হলো অগ্নিশিখা। ঘরের ভিতর গুলির আওয়াজটা হলো কান ফাটানো। প্রচণ্ড শব্দে ছাত ও দেয়াল থেকে খসে পড়ল পুরনো আলগা রং।

চেয়ারে ঝাঁকি খেল প্যাট্রিক টমসন, তীব্র ব্যথায় বিকৃত করল মুখ, তারপর শিথিল হয়ে গেল দেহ।

হতভম্ব ব্রায়ার তখনও রক্তমাখা কাপড় হাতে ঝুঁকে রইল টমসনের উপর। স্বাভাবিক সতর্কতা থেকে এক ঝটকায় দূরে সরে গেল লিজা। সিন্ধুগানটা বের করেই জানালার আরেক পাশ লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল রন। দ্বিতীয়বারের মত গর্জন ছাড়ল অজ্ঞাত আততায়ীর রিভলভার।

একটুর জন্য রনের গায়ে বিঁধল না বুলেট, ম্যাক পিলারের আধ ফুট দূরে দরজার চৌকাঠে নাক গাঁথল গুলি। ঝরঝর করে কাঠের কুচি পড়ল পিলারের সারা গায়ে। আততায়ীর গুলির জবাব দিল রন। ওর গুলির আঘাতে জানালার অবশিষ্ট কাঁচ ভেঙে পড়ল। শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে জানালার পাশে উঠে দাঁড়াল ও, গুলি করবার জন্য তৈরি।

রনের পিছন থেকে এক ফুঁয়ে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল লিজা।

প্রায়াক্ষকার সিমেন্টের চাতালে কারও ছুটবার আওয়াজ শুনতে পেল সবাই।

জানালার পাশ থেকে আবছাভাবে বিছানার পাশে ম্যাক পিলারের ফ্যাকাসে চেহারা দেখতে পেল রন। ডক ব্রায়ার ও লিজাকে প্যাট্রিক টমসনের শিথিল দেহ মেঝেতে নামিয়ে রাখতে সাহায্য করছে স্থির মস্তিষ্ক নিক হাওয়ার্ড। ঘরের মাঝে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ডেভ বেল। কয়েক পা সরে রনের পাশে দাঁড়াল জর্জ ব্রাউন, ইতিমধ্যে শত্রুকে মোকাবিলা করতে বের করে ফেলেছে সিন্ধুগান।

থমথমে নীরবতায় প্যাট্রিক টমসনের ফ্যাসফেসে, দুর্বল কণ্ঠ শুনতে পেল রন। দ্রুত পায়ে আহত লোকটার দিকে গেল ও, ডেভ বেল ও ম্যাক পিলারকেও কাছে আসতে বলল।

যুবক টমসনের কথাগুলো শুনবার জন্য উবু হলো সবাই। দিন শেষের অস্পষ্ট আলোয় তার ফোলা চোখের পাতার নীচে ঘোলাটে দৃষ্টি। চোখ দেখেই বুঝে ফেলল রন, আর বেশিক্ষণ নেই প্যাট্রিক টমসনের। কিন্তু কথা বলে চলেছে টমসন, প্রতিটা কথা স্পষ্ট শুনতে পেল রন। শুনতে পেল অন্যরাও।

‘লিজা... আমি শুধু ওদের ঘোড়াগুলো ধরে রেখেছিলাম... তারপর... তারপর ট্রেইনে উঠলাম। ...কর্নেলকে গুলি করল হেস্টিংস... আমি কিছু করিনি... লিজা!’

ক্যানিয়নে চিৎকার করছে কৌতূহলী লোকজন, আকস্মিক গোলাগুলির কারণ জানতে ছুটে আসছে কাদা ছলকে।

আততায়ীকে খুঁজতে বের হওয়ার কোনও দরকার আছে বলে মনে হলো না রনের। এতক্ষণে অন্ধকারে অনেক দূরে সরে গেছে সে। কিন্তু রন জানে, লোকটাকে খুঁজে বের করতে বেশি দূরে যেতে হবে না ওকে।

মিনিট দুয়েকের ভিতর বৃষ্টিতে ভেজা লোকজনে ভরে গেল ঘর। প্যাট্রিক টমসনের লাশটা দেখে উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে শুরু করল তারা। সবাই আগে পৌঁচেছেন পিস্তল ফ্ল্যাটের চার্চের যাজক, ফাদার ম্যাককিওন। লাশের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়লেন তিনি। অন্যদের উঁচু গলার আওয়াজের কারণে ল্যাটিন ভাষায় বলা তাঁর শ্লোকগুলো আবছা শোনা।

ভিড় বেড়ে উঠল ক্রমেই। পথ করে নিয়ে দরজার দিকে চলল রন। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, ওর পাশে চলে এসেছে জর্জ ব্রাউন।

‘আমিও যাব তোমার সঙ্গে,’ জানাল রানশার।

‘লড়াইটা তোমার নয়,’ ক্লান্ত শোনা। রনের কণ্ঠ।

সিন্ধুগানের নলের দিকে ভুরু কুঁচকে চাইল জর্জ ব্রাউন, তারপর অস্ত্রটা হোলস্টারে পুরে বলল, ‘ভুল করেছিলাম তোমাকে সন্দেহ করে, সেজন্যে যে আমি লজ্জিত, তা প্রমাণ করতেই তোমার সঙ্গে যাওয়া উচিত আমার। তা ছাড়া, ক্লিভ হেস্টিংসকে কোনও দিনই পছন্দ করতে পারিনি। ...চলো।’

ক্যানিয়নে বেরিয়ে এসে রেল-রাস্তার দিকে চলল দু’জন। নীরবে, নিঃশব্দে রনের পাশে হাঁটছে জর্জ ব্রাউন। একটু পরেই হাওয়ার্ডস হোটেলের কোনা ঘুরল ওরা। ভেজা বোর্ডওয়াকে থপথপ আওয়াজ তুলল ওদের বুটজুতো। হাওয়ার্ডস হোটেল পেরিয়ে ম্যাক পিলারের স্টোর পাশ কাটাল দু’জন, পার হলো কয়েকটা খালি প্লট। সামনেই মার্শালের জেলহাউস। ওদের আগে আগে চলল বুটজুতোর আওয়াজ।

জেলহাউসের মুখ রেল-রাস্তার দিকে। সমতল ছাতের ছোট এক অ্যাডোবি বিল্ডিং ওটা। ভিতর হলদে আলো ছড়িয়ে জ্বলছে লণ্ঠন। সেই আলোয় জেল ও অফিস বিভক্ত করা লোহার শিকগুলো দেখা গেল। উদ্যত অস্ত্র হাতে ঘরে ঢুকল রন। কেউ নেই মার্শালের অফিসে। বেরিয়ে এসে চটজলদি দরজার পাশে ছায়ার ভিতর দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও

জর্জ ব্রাউন নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘লিউট ফেরিস?’

কাঁদা মাড়িয়ে রেল-রাস্তা পার হলো রন, ফেরিসের অফিসের আলো লক্ষ্য করে চলল। রেললাইনের কাছাকাছি পৌঁছে ফেরিসের অফিসের কাছে চার্চের পাশে একটা ঘোড়া দেখল, বেঁধে রেখেছে কেউ হিচরেইলে। সম্ভবত দেরিতে আসা কোনও ধর্মপ্রাণ মানুষ।

রেললাইন পেরিয়ে সমতলে নামতেই চাওয়া গেল লিউট ফেরিসকে। অফিসে আছে সে, ডেস্কের পিছনে তাকে দেখে অবাক হলো রন। লোকটা যেন

শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছে ওরই জন্য। অথচ এতক্ষণে পালিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু পালায়নি কেন? তাকে সতর্ক করেনি ক্লিভ হেস্টিংস?

ঘোড়াটার দিকে পা বাড়িয়ে ইশারায় দূর দিয়ে ব্রাউনকে এগুতে বলল রন। খোলা দরজা থেকে বেরুনো হলুদ আলোর সামান্য বাইরে থামল নিজে, ওখান থেকে চাইল লিউট ফেরিসের দিকে।

লণ্ডনের আলোয় সাক্ষাৎ শয়তানের মত লাগল লোকটাকে। কালো রঙের ভিজা কোট গায়ে, নারকেলের মত খুলির দু'পাশে কামড়ে পড়ে আছে সুতোর মত কিছু চুল। ঘড়ঘড় আওয়াজ করে ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে, উঠছে-নামছে বুক। মুখটা ধূসর দেখাচ্ছে উত্তেজনায়।

অস্ত্র হাতে দরজায় দাঁড়াল রন, ওখান থেকে বলল, 'খেলা শেষ, ফেরিস। মুখ খুলেছে প্যাট্রিক টমসন।' ঘরের চার কোনায় ঘুরতে শুরু করল ওর চোখ। ক্লিভ হেস্টিংস ঘরে নেই দেখে হতাশ হলো।

শান্ত কণ্ঠে বলল রন, 'উঠে দাঁড়াও, ফেরিস। শেরিফের হাতে তুলে দেয়া হবে তোমাকে। নিশ্চয়ই জানতে চাইবে কী অভিযোগে? বুলেট ট্রেইনে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকা, কর্নেলের খুনিদের সঙ্গে আঁতাত এবং প্যাট্রিক টমসনকে খুন করার অভিযোগ আনা হবে তোমার বিরুদ্ধে।'

দাঁত বের করে হাসল লিউট ফেরিস। পিশাচের মতই দেখাল তাকে। কর্কশ স্বরে বলল সে, 'একটু দাঁড়াও, মার্লো।' হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল ফেরিস, হাতের ঝাপটায় টেবিলের উপর থেকে ফেলে দিল লণ্ডন।

অন্ধকার থেকে রনের দিকে ছুটে এল বুলেট, লাগল দরজার চৌকাঠে। রনের গায়ে ছটকে পড়ল কাঠের কুচি ও প্লাস্টার। অফিসের পিছন দিকের পর্দার পিছনে ফেরিসের ডেস্কের ডান দিকে লুকিয়ে ছিল ক্লিভ হেস্টিংস, দেরিতে বুঝল রন। এক পা সামনে বেড়ে পর্দাটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল ও।

মেঝেতে পড়ে কাঁচ ফেটে গেছে লণ্ডনের। মেঝেতে তেল গড়াচ্ছে, সেই তেলে জ্বলে উঠছে আগুন, দ্রুত ছড়াচ্ছে। ভুতুড়ে আলোয় ঘর পেরিয়ে সিঁঙ্গান হাতে ফেরিসের থাকবার কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ল রন, সামনে থেকে ছুঁতু পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সজোরে খুলে গেল বাড়ির পিছন কোনও দরজা।

তিন সেকেন্ড পর দরজার কাছে পৌঁছল রন। যে-ই বেরিয়ে থাকুক, দরজা ভিড়ে গেছে আবার, ওর ছুঁতু দেহের ধাক্কা খেয়ে কজা থেকে ছটকে ভেঙে পড়ল পাল্লা দুটো।

বাইরের ঘুটঘুটে অন্ধকারে বেরিয়ে এসে পিছন উঠানে কাদা ছটকে কারও ছুটে চলবার আওয়াজ শুনতে পেল রন। আওয়াজটা লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করল। দেরিতে দেখল, ভেজা পাথরের ছোট এক স্তূপে পড়ে চিকচিক করছে নক্ষত্রের আবছা আলো। স্তূপের ভিতর ডান পায়ের ডগা ঢুকে গেল ওর। হোঁচট

খেয়ে পাথরগুলোর উপর পড়ে গেল রন, গড়িয়ে গেল ওর শরীরটা, থামল ছয় ইঞ্চি গভীর এক কাদা-পানির পুকুরের ভিতর।

চালাকি করে পাশেই একটু দূরে লুকিয়ে ছিল কেউ, এবার রাতের অন্ধকারে বেকায়দা পড়ে থাকা রনের গায়ে কাদা ছিটিয়ে এক ছুটে পাশ কাটাল সে। ব্যথায় যেন অবশ হয়ে গেছে ডান পা, তারপরও দেরি না করে চার-হাত পায়ে উঠেই বেরোয়ার মত সামনে ঝাঁপ দিল রন। ওর আঙুলের ডগাগুলো কার যেন কাদা-মাখা বুটজুতোর পিছনটা স্পর্শ করল। তারপর ছুটে চলে গেল লোকটা।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল রন। পিছনে কোথাও থেকে চিৎকার করল জর্জ ব্রাউন: 'থামো!' কথা শেষ করেই গুলি ছুঁড়ল রানশার। রনের গাল ছুঁয়ে বাতাসের ঝাপটা দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট।

সামনে, পানিতে হপহপ শব্দ তুলে আরও দূরে চলে যাচ্ছে ছুটন্ত পদশব্দ। লোকটা লিউট ফেরিস, আন্দাজ করল রন। ক্লিভ হেস্টিংস হলে অন্ধকারে ওকে শেষ করে দেয়ার জন্য লুকিয়ে অপেক্ষা করত।

জর্জ ব্রাউন গুলি করতে পারে সে-ঝুঁকি নিয়েই ফেরিসের পিছনে দৌড়াতে শুরু করল রন। আরও দু'বার গর্জন ছাড়ল ব্রাউনের সিঙ্গান। ওর মাথার উপর দিয়ে গুঞ্জন তুলে ছুটে গেল বুলেট দুটো।

হঠাৎ থেমে গেল লিউট ফেরিসের ছুটবার শব্দ। থামল রনও, কান পেতে অপেক্ষা করল। জর্জ ব্রাউনকে কিছু বলতে গেলে ওর নিজ অবস্থান ফাঁস করতে হবে, সেটা চাইল না। পিছন থেকে ব্রাউনের পায়ের আওয়াজ পেয়েও চুপ করে থাকল।

ধীর পায়ে এগিয়ে এল ব্রাউন— উত্তেজিত একজন মানুষ, সামান্য শব্দ বা নড়াচড়া দেখলেই গুলি ছুঁড়বে।

গুটিসুটি মেরে অন্ধকারে বসে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল রন, শ্বাস আটকে রেখেছে। কাছে চলে এল ব্রাউন, তারপর ওকে ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ফুট দশেক।

লিউট ফেরিস কী করছে আন্দাজ করতে চাইল রন। এখনও কি উঠানেই আছে উকিল? ব্রাউন আর ওকে অ্যামুশ করতে কোথাও ওঁৎ পেতে আছে ক্লিভ হেস্টিংস? নাকি হেস্টিংস...

ওর চিন্তার সূতো ছিঁড়ে গেল রাস্তায় ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দে। দ্রুত ছুটছে ঘোড়াটা, চলে যাচ্ছে দূরে। সামনে থেকে জর্জ ব্রাউনের গালি শুনতে পেল ও। চার্চের ভিতর দৌড়ে ঢুকল কে যেন। আর দেরি করল না রন, বাড়ির কোনো ঘুরে চলে এল রেল-রাস্তায়। চার্চের দরজা দিয়ে বেরুনো বাতির আলোয় আবছা আলোকিত হয়ে আছে পথ।

সামনে ব্রাউনকে দেখতে পেল রন, অন্ধকারে সিঙ্গান তাক করে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে রানশার। রনকে দেখে হতাশ ভঙ্গিতে নামিয়ে নিল অস্ত্রটা। গুলি করবার মত কোনও লক্ষ্যবস্তু নেই ওদিকে। কেউ নেই। হালকা বৃষ্টির ভিতর ফাঁকা পড়ে আছে কাদাময় রাস্তা।

‘আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার,’ রাগ চেপে বলল জর্জ ব্রাউন, ‘চার্চের দরজা কখনোই বন্ধ করা হয় না। উঠান থেকে বেরিয়ে চার্চের ভেতর দিয়ে ঘোড়াটার কাছে চলে গেছে, আর এদিকে আমি বোকার মত খুঁজছি। অবশ্য আরেকটু হলেই গেঁথে ফেলতে পারতাম। ...তুমি কোথায় ছিলে, মার্লো?’

‘আরেকটু হলে আমাকেই গেঁথে ফেলেছিলে তুমি,’ শুকনো গলায় বলল রন। ‘গুলি তিনটে আমাকে লক্ষ্য করেই ছুঁড়েছ।’

ওদের পিছনে লিউট ফেরিসের বাড়িটার শুকনো কাঠে ভাল মত ধরেছে আগুন। কাঠ পুড়বার পটপট আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, কিন্তু পিছন ফিরে চাওয়ার ইচ্ছে হলো না ওদের দু’জনের কারোর। আগুনটা ছাত পর্যন্ত পৌঁছুবার পর এমনিতেই নিভে যাবে বৃষ্টিতে, ভাবল রন।

বাঁধ পেরিয়ে রেল-রাস্তার মাঝ বরাবর উঠে এল দু’জন অস্থারোহী। চিৎকার করে তাদের ডাকল ব্রাউন। পাশে এসে থামল তারা। ব্রাউনেরই দু’জন কাউবয়।

‘একটা ঘোড়া লাগবে আমার,’ নির্দেশ দিল ব্রাউন। ‘এইমাত্র পালিয়েছে লিউট ফেরিস। যে-করে হোক ওকে ধরতে হবে।’

বিড়বিড় করে গাল বকল এক কাউবয়। ‘এইমাত্র ক্যানিয়নের কোনায় আমাদের পাশ কাটাল লোকটা। খনির দিকে গেল।’

‘ধরা ওকে পড়তেই হবে,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল ব্রাউন, বাম দিকের রাইডারের পিছনে উঠে বসল সে; অন্যজনকে দেখিয়ে ইশারা করল রনের উদ্দেশে। ‘উঠে পড়ো ওর পেছনে।’

‘হেস্টিংস রয়ে গেছে,’ তাকে মনে করিয়ে দিল রন।

মাথা দোলাল রানশার। ‘ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা।’

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রন। ‘তুমি ফেরিসের পেছনে যাও।’

‘ঠিকই ধরে আনব, দেখো,’ জোর দিয়ে বলল ব্রাউন। তার হাতের ইশারায় বেপরোয়া গতিতে ঘোড়া ছোটাল দুই কাউবয়।

অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে কী করবে ভাবতে শুরু করল রন, ক্লিভ হেস্টিংসের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করল। তারই ফাঁকে দেখল, চার্চ থেকে বেরিয়ে এসেছে চিকন এক লোক। এখনও ওকে দেখেনি সে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লোকটা: ‘মার্শাল! আমার ঘোড়া চুরি হয়ে গেছে!’ রেলরোড পেরিয়ে ছুটল সে হেস্টিংসের অফিস লক্ষ্য করে।

লিউট ফেরিস কী করবে আন্দাজ করাই সহজ মনে হলো রনের কাছে।

ছেলেবেলায় কখনও কোনও খেলায় ন্যায়-নীতি-নিয়মের ধার ধারত না ফেরিস, সব সময় জিততে চাইত চুরি-বাটপাড়ি করে। আর এখন পরিণত বয়সে যে-খেলার সামনে পড়েছে, হারলে জীবনটাই দিতে হবে তাকে। ধরে নেয়া যায়, পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে বহু দূরে কোথাও পালাবার চেষ্টা করবে লোকটা। হয়তো জর্জ ব্রাউনের হাতে ধরা পড়বে সে, হয়তো পড়বে না।

আসল লোক হচ্ছে ক্লিভ হেস্টিংস। সংঘটিত সমস্ত অপরাধে তার ভূমিকাই মুখ্য, কাজেই তাকে ধরতে পারাটাই জরুরি।

রেল-রাস্তায় কয়েকটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে সেদিকে পা বাড়াল রন। রেল-লাইনে উঠে ছ'সাতজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল। যারা হাঁটছে, তাদের কারও কারও হাতে দুলছে লণ্ঠন।

রেল-রাস্তা ছেড়ে ক্যানিয়নের ভিতর ঢুকল সামনের সারির কয়েকজন। তাদের আগে আগে চলেছে সতর্ক দু'তিনজন অশ্বারোহী। জোরাল কণ্ঠে সবাইকে সামনে বাড়তে তাগাদা দিচ্ছে জর্জ ব্রাউন। তারা সবাই ক্যানিয়নের আরও ভিতরে চলে যাওয়ায় দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল ক্ষুরধ্বনি।

হঠাৎ বুকের ভিতরটা শূন্য ঠেকল রনের। মনে পড়ল মিশেলের সান্নিধ্য, লিজার নৈকট্য। পিছনে, ফেরিসের বাড়ির দিক থেকে গুনতে পেল মানুষজনের উত্তেজিত কথাবার্তা। ভালমত আগুন ধরে গেছে ফেরিসের বাড়িটাতে। ছাত বেয়ে আকাশের দিকে উঠছে লকলকে লাল শিখা, তাতে বৃষ্টির পানি পড়ে হিসহিস, শব্দ হচ্ছে। সতর্ক হয়ে উঠল রন। লালচে আভায় ওকে দেখে ফেলতে পারে ক্লিভ হেস্টিংস। এখন থেকে কোনও জানালা বা দরজার দিকে পিঠ দিতে পারবে না ও, একা দাঁড়াতে পারবে না যেখানে সেখানে— যতক্ষণ না ধরা পড়ে ক্লিভ হেস্টিংস।

রেল-রাস্তা ধরে দ্রুত পায়ে ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল রন, বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচবার জন্যহাওয়ার্ডস হোটেলের দেয়ালের পাশে থাকল।

বিনের দালানের রিসেপশনে স্লোতে কমিয়ে জেলে রাখা হয়েছে একটা লণ্ঠন, বাড়িটাতে ঢুকে করিডরের দু'পাশের ঘরগুলোয় উঁকি দিয়ে দেখল রন। নেই কেউ। বেরিয়ে আসবে, এমন সময় সিঁড়ির পিছনের একটা ঘর থেকে ছুটে এল লিজা, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। অজান্তেই লিজাকে জড়িয়ে ধরল অসচেতন রন, শব্দ করে ধরে রাখল।

নিজেকে ছাড়ানোর কোনও চেষ্টাই করল না লিজা। একটু পর এক পা পিছিয়ে ওকে দেখল রন, লিজার ধূসর অ্যাপ্রনটা ওর কোটে ঘষা খেয়ে ভিজে কালচে হয়ে গেছে দেখে হেসে ফেলল। তারপর দেখতে পেল লিজার চোখের দু'ফোঁটা অশ্রু। মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল রন, 'কেন, লিজা?' ওর মনে হলো, অতীতের সেই দামাল কিশোরী মেয়েটাকে আবারও নতুন করে সেই একই ভাবে

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দেখছে।

‘কেন?’ পাল্টা প্রশ্ন করল লিজা। ‘আর কত?’ মুখ নিচু করে নিল। ‘প্রথমে নিরুপায় হয়ে প্যাট্রিককে বিয়ে করে ভুল করলাম, তারপর থেকে... তারপর তুমি এলে... মারামারি, গোলাগুলিতে জড়িয়ে গেলে... তারপর... আর কত সহ্য করতে পারে একটা মেয়ে, রন?’ ঘুরে দাঁড়াল লিজা হঠাৎ করেই ফোঁপাতে শুরু করল।

ওর কাঁধে হাত রাখল রন, তারপর জানে না কখন শক্ত করে জড়িয়ে ধরল আবার। ওর মন বলল, দুনিয়ার কোনও শক্তি নেই ওর কাছ থেকে লিজাকে আর কেড়ে নিতে পারে।

রনের আলিঙ্গনের ভিতর ঘুরল লিজা, মুখ তুলে চাইল রনের চোখে। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে আছে ওর।

ষোলো

বিশ্বের দালান থেকে এক মাইল উজ্জানে ক্যানিয়নটাকে রুদ্ধ করেছে বনিলাস বাঁধ। পিস্তল ফ্ল্যাট থেকে ওই বাঁধ পর্যন্ত প্রায় সোজাই চলে গেছে ক্যানিয়ন। বনিলাস ক্রীকের মাঝখানে সামান্য একটু বাঁক অবশ্য আছে। ওটার কাছাকাছিই বাঁধের ওপারে গভীর সেই বিশাল গহ্বর, ওখানে চারপাশের এক শ’ বর্গ মাইলের সমস্ত বাড়তি পানি জড় হয়।

যারা বাঁধের পরিকল্পনা করেছিল, তারা বড় একটা মজবুত বাঁধ বানাতে চেয়েছিল, কিন্তু ওটার দীর্ঘ স্থায়িত্বের দিকে খুব একটা নজর ছিল না তাদের। ধরে নেয়া হয়েছিল, খনি যত দিন চালু থাকবে, বাঁধটা ততদিন টিকলেই যথেষ্ট। হাতের কাছে যা পাওয়া গিয়েছিল, তা দিয়েই তৈরি করা হয় বনিলাস বাঁধ—পাহাড়ি ঢালে পাওয়া পাথর এবং ধুলো দিয়ে। দু’পাশে চেপে আসা ন্যাড়া টিলাগুলোর সমান উঁচু, পুরু দেয়াল তৈরি করে ক্যানিয়নটাকে বন্ধ করে দেয় বাঁধ-নির্মাতারা।

অতীতে কখনও এই বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প এত পরীক্ষার মুখে পড়েনি, গত কয়েক দিনের প্রায় একটানা বৃষ্টিতে জমা পানির প্রবল চাপ তৈরি হয়েছে।

বাঁধের কারণে তৈরি হুদটা যে-পরিমাণ পানি ধরতে পারে, তার চেয়ে বেশি

অনেক পানি জমে গেল হুদে, ফলে আর কোনও দিকে যাওয়ার পথ না পেয়ে বাঁধের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল পানি। তারপর একসময় পাথুরে প্রাচীরটাকে উপচে পড়তে চাইল বিপুল জলরাশি। বাধ-না-মানা পানির চাপে বাঁধের প্রাচীরের উপর তৈরি হলো বেশ কয়েকটা চওড়া ফাটল। গড়িয়ে যাওয়া প্রতিটা মিনিট বড় ও গভীর করে তুলল ফাটলগুলোকে। কংক্রিটের তৈরি সুইস গেটগুলো বাড়তি পানির স্রোত চরমভাবে বের করতে ব্যর্থ হলো। পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় ডুবেও গেল ওগুলো। এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হলো, ঠিক জায়গায় কোদাল দিয়ে খানিক পাথর-বালি সরানো, বা দু'একটা ডিনামাইট স্টিকের ব্যবহার ধসিয়ে দিতে পারে পুরো বাঁধ।

নির্দিষ্ট সময় পর পর বাঁধের অবস্থা জানানোর জন্য ফ্লিন্টস্টোন ফেলটন যে-দু'জন লোক রেখেছে, তাদের একজন বিপদ বুঝে খনি ও শহরের সবাইকে আসন্ন ভয়ানক প্লাবনের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে কুটির ছেড়ে রওনা হলো। কয়েক পা গিয়েই চোখ পড়ল তার বাঁধের উপরের পুরনো পাউডার-হাউস ও টুলশেডের দিকে। ওখানে একটা লণ্ঠন দুলাতে দেখে ব্যাপারটা কী দেখতে কাদা মাড়িয়ে চলল সে। সতর্ক মানুষ বলেই রিভলভারটা বের করে ফেলল দেরি না করে।

এদিকে বাঁধের নীচ থেকে জ্বলন্ত লণ্ঠন দেখতে পেল জর্জ ব্রাউনও। অনুসরণকারীদের চিৎকার করে থামতে বলে রাশ টেনে থামল সে। হঠাৎ করেই তার মনে হলো, নষ্ট করবার মত এক তিল সময় নেই আর। ঘোড়াটার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ক্যানিয়নের পাশের ঢালু পাড় বেয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করল সে। তার পিছু নিল আর সবাই।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তাদের।

কানে তালা ধরানো বিকট বিস্ফোরণের পর পরই ভেঙে গেল বনিলাস বাঁধ।

তরল একটা বিশাল দর্নিব যেন অলসভাবে মাথা তুলল আকাশে, মনে হলো বাঁধের উপর থেকে নেমে আসছে কারও দীর্ঘ সফেদ দাড়ি। তারপর নীচের গভীর, কিন্তু সরু ক্রীকে অবিশ্রান্তপড়তে শুরু করল লক্ষ লক্ষ গ্যালন জলরাশি। দৃশ্যটা আতঙ্কজনক, শ্বাসরুদ্ধকর। অন্ধকার রাত ভরে গেল পৃথিবী কাঁপানো গুরুগম্ভীর গর্জনে।

প্লাবনের প্রথম ধাক্কা সামলাতে হলো খনিটাকে। তিন সেকেণ্ড পেরুনের আগেই পাহাড়-প্রমাণ বাদামী পানির দেয়ালের নীচে তলিয়ে গেল খনিতে ঢুকবার সুড়ঙ্গটা। খলখল আওয়াজ করে সর্বগ্রাসী রাক্ষসীর মত পানি গিলতে শুরু করল সুড়ঙ্গ। কিন্তু তাতে সামান্যতম কমল না বিপুল জলরাশির অগ্রগতি, ঘন ঘন বজ্রপাতের মত মুহূর্মুহ ভয়ঙ্কর গর্জন ছেড়ে নীচের শহরের দিকে ছুটল অপ্রতিরোধ্য পানির নিরেট, উঁচু প্রাচীর।

ওটার প্রথম ধাক্কাতেই প্রাচীন স্মেলটারের উপরের চিমনিটা কাত হয়ে ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো অ্যাডোবির তৈরি দালানটা, দেয়ালের বড় বড় চাপড়গুলো ছিটকে গেল কামানের গোলার মত। ছাতের করোগেটেড লোহার তৈরি পাতগুলো টেনে ছিঁড়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল প্লাবন। হাতে চাঁছা পাইনগাছের ভারী, প্রকাণ্ড খুঁটিগুলো এদিক-ওদিক দু'মাথা দুলিয়ে বিদ্যুৎস্রোতের ভাটির দিকে নামতে শুরু করল— যেন লাঠিখেলায় মগ্ন কয়েকটা দানবের হাতের ব্যস্ত লাঠি ওগুলো।

লক্ষ লক্ষ গ্যালন জলরাশির ভাসিয়ে আনা কাঠের খুঁটি, গাছের গুঁড়ি, লোহার নানা যন্ত্রাংশের সরাসরি সামনে যেসব বাড়ি-ঘর পড়ল, কোনও প্রতিরোধই তৈরি করতে পারল না সেগুলো। শহর যেখানে ক্যানিয়নে ঢুকেছে, সেখানে চায়নিজদের ব্যারাকের উপর আছড়ে পড়ল প্লাবন, এক সেকেন্ড পর গ্রাস করল বিল ট্রেইসির জুয়ার আসর। চোখের পলকে প্রলয়ঙ্করী জল-প্রাচীরের তলায় ডুবে গেল গোটা বাড়ি।

বিনের দালানে মগ্ন রন মার্লো বা লিজার কাছে প্রথমে বিস্ফোরণের আওয়াজটা তাৎপর্য বহন করল না। অন্তত প্রথমেই নয়। যতক্ষণ না লিজা থাকল রনের বাহুবন্ধনে। পুরনো বাড়িটার দেয়ালগুলোর খরখর করে কাঁপা তো বজ্রপাতের কারণেও হতে পারে! তারপর রন খেয়াল করল, একবারও বিজলির চমক দেখেনি। এবার বুঝতে পারল, পায়ের নীচে মেঝেটাও বিরতিহীন ভাবে কাঁপছে, লাফ দিতে চাইছে যেন।

কান পেতে শুনল রন চাপা, ভারী গর্জন। সতর্কতাবোধ ওকে গভীর অনুভূতি ভুলে যেতে সাহায্য করল, করে তুলল সচেতন। আরও ধেয়ে এল আওয়াজটা, কাছে চলে আসছে। ভয়ে রক্তশূন্য চেহারায় রনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল লিজা। ওর চোখ দুটো যেন পরিণত হলো নির্জন, গভীর সাগরে।

‘বাঁখটা ভেঙে গেছে!’ বলেই লিজাকে ঘুরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে ছুটল রন।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ওদের।

পুরনো দালানের দোতলার ছাতে ওঠা ছাড়া কোনও উপায় নেই এখন। কিন্তু ছাতে উঠে কী হবে, যদি বয়সের ভারে জরাজীর্ণ ছাতটাই ভেঙে পড়ে? তারপরও ওই ছাত থেকে হাওয়ার্ডস হোটেলের ছাতে উঠতে পারবে। কিন্তু চার মানুষ সমান উঁচু প্লাবন আছড়ে পড়লে টিকবে হাওয়ার্ডস হোটেলটা?

ক্যানিয়নের কোথাও পুরোপুরি নিরাপদ নয় কেউ।

লণ্ঠনের আলোয় রনের মনে হলো, বিনের দালানের দেয়ালগুলো কোনও দানবীয় সাঁড়াশির চাপে কাছিয়ে আসতে শুরু করেছে। দেরি না করে লিজাকে আঁকড়ে ধরে সিঁড়ির দিকে ছুটল ও।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে মাত্র পা রাখল লিজা, আর তখনই পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হানল জলোচ্ছ্বাস।

প্রথম কামড়েই পুরনো দালানের এক দিকে, ক্রীকের ধারের দুর্বল ভিত্তি খাবলে নিয়ে গেল প্লাবন, সেই সঙ্গে এক ধাক্কায় ধসিয়ে দিল বাড়ির সামনের পুরো দেয়াল।

ভাঙা অ্যাডোবি থেকে বালি ও নুড়ি পাথর ছিটকে এসে লাগল লিজা-রনের শরীরে, যেন গায়ের জোরে ঢিল ছুঁড়ছে কেউ। দেয়াল ভেঙে পড়বার ধূপধাপ আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল জানালার কাঁচ ভাঙবার তীক্ষ্ণ ঝনঝন শব্দ।

জলীয় বাষ্পের কণা ভরা ভেজা বাতাস ধেয়ে এল রন ও লিজার দিকে। লষ্ঠনের চিমনির ভিতর বাতাস ঢুকে পড়ায় নিভে গেল সামান্য শিখাটুকু। অন্ধকারে বন্দি হলো ওরা দু'জন।

বাড়ির ভিতর থেকে বিদায় নিল সমস্ত উষ্ণতা। শীতল মৃত্যু-ফাঁদ হয়ে উঠল দালানটা।

বাস্তব দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা পিছলা সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করল লিজা ও রন। জলোচ্ছ্বাস যেন কোনও ক্ষুধার্ত রাক্ষসী, গলগল-খলখল শব্দ করে বারবার ধরতে চাইল ওদের। লেগেই থাকল পিছনে। ওরা থামলেই ডুবিয়ে দেবে।

বিপুল পানির চাপে একতলার মেঝে থেকে ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল বেশিরভাগ তক্তা। আরও জোরেসোরে পানি উঠতে শুরু করল ফাঁক দিয়ে। পানির প্রবল চাপ মুহূর্তের ভিতর ভেঙে ফেলল অবশিষ্ট মেঝে, যেন ম্যাচের কাঠি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল মেঝেটা। ভাঙা তক্তার কয়েকটা ছিটকে লাগল রনের বুটজুতোর গোড়ালিতে।

সিঁড়ির পাশের দেয়ালে হাত রেখে ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে রন টের পেল, হারিকেন কবলিত গাছের কচি পাতার মত কাঁপছে দেয়ালটা।

লিজাকে সামনে নিয়ে হুড়মুড় করে দ্বিতীয় তলায় উঠে এল রন। দোতলার গাঢ় অন্ধকার যেন হার মানাবে কালো কালিকেও।

‘এদিকে!’ রনের কানের কাছে মুখ নিয়ে চৈঁচাল লিজা, হাত ধরে রনকে টেনে নিয়ে ঢুকল একটা ঘরে।

ঘরে পূর্ব পাশে দেয়াল-লাগোয়া একটা মই আছে, ওটা দিয়ে ট্র্যাপডোর হয়ে সমতল ছাতে ওঠা যায়। উপরে উঠবার জন্য মইয়ের আঙটায় হাত রাখল লিজা। বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে তাল ধরে গেল ওদের। পাশের দেয়ালটা তিন ইঞ্চি ছিঁড়ে সরে গেল পিছনের দেয়াল থেকে।

ওদের মাথার উপর কড়কড়-মড়মড় আওয়াজ করে ভাঙতে শুরু করল ছাতের কড়ি-বরগা।

হঠাৎ করেই ধসে গেল হুঁটের তৈরি চিমনি। আধ টন ওজনের আলগা হুঁটগুলো পড়ল ছাতে, সেখান থেকে ছাত সহ নীচে। গাঁথনির মিহি ধুলো ফুলেফেঁপে উঠল উপরের দিকে, অন্ধ করে দিল রন ও লিজাকে। শ্বাস-নিতে কষ্ট হলো ওদের।

ভারী কী যেন আঘাত করল রনের কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেল কাঁধটা। আরেকটু হলেই লিজা আর মইটাকে হাত থেকে ছেড়ে দিত ও।

ছাতের গর্ত পেয়ে ছড়মুড়িয়ে বাইরে বেরুতে লাগল ভেজা বাতাস, সেই বাতাসে সূক্ষ্ম ধূলিকণার মেঘ পাক খেতে শুরু করল।

‘ওঠো!’ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল রন। ‘মই বেয়ে উঠে যাও!’

স্পষ্ট অনুভব করল, বাঁচতে চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না। তার পরও, উপরে উঠতে পারলে বাঁচবার সামান্য আশা থাকবে। ...কিন্তু ছাতে ওঠা মানেই কোনও না কোনও ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আরও উপর থেকে নীচে পড়া। কিন্তু চূপ করে নিয়তি মেনে নিয়ে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার চেয়ে কিছু করবার চেষ্টা করা অনেক ভাল!

ভদ্রতার ধার না ধরে লিজার নিতম্বে হাত দিয়ে উপরের দিকে জোরে ঠেলা দিল রন। দ্রুত আঙুটার পর আঙুটায় পা রেখে উঠতে শুরু করল লিজা। ওর মাথা ট্র্যাপডোর পেরুচ্ছে, এমন সময় পাশের দেয়ালটা বাইরের দিকে ধসে পড়তে দেখল রন।

মইটা পুব দিকে, পিছন দেয়ালের সঙ্গে আটকানো। মৃগী রোগীর মত থরথর করে কাঁপতে শুরু করল পিছন দেয়াল।

হঠাৎ করেই কাত হয়ে গেল রনের পায়ের নীচে মেঝেটা, যখন-তখন নীচ থেকে উঠে আসা বানের পানিতে ধসে পড়বে। একটা পলক ফেলবার আগেই লিজার সঙ্গে বিশ ফুট দূরত্ব তৈরি হলো ওর। ঘুরে দাঁড়িয়ে সর্বগ্রাসী ক্রীকটাকে পিছনে রেখে কাত হয়ে যাওয়া পিছলা মেঝে বেয়ে দৌড়ে উঠতে চাইল রন। লিজাকে আর দেখতে পেল না। অন্ধকারে কোথায় আছে লিজা, কে জানে!

তারপর লিজার কণ্ঠ শুনল: ‘রন! তুমি কোথায়!’

ওই মিষ্টি কণ্ঠস্বর যেন শক্তি জোগাল রনকে। আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে ঘুরল ও। হঠাৎ টের পেল, পিছন দেয়ালটা ফুলে উঠে বাইরের দিকে বেকে যাচ্ছে। ভুতুড়ে আলো ঢুকল দেয়ালের ফাটল দিয়ে। কিন্তু সে-আলোয় কিছু দেখা বা চেনা সম্ভব নয়।

ছাত জোড়া দেয়া কড়ি-বরগা কর্কশ শব্দে সকেট থেকে খসে পড়তে শুরু করেছে। বিকট মড়মড়-কড়কড় আওয়াজ করে হঠাৎ খসে পড়ল ছাতের বড় একটা অংশ।

চেতনা হারানোর আগে লিজার তীক্ষ্ণ আত্মচিৎকার শুনতে পেল রন।

ভাঙাচোরা কড়ি-বরগার এলোমেলো পতনটাই বোধহয় জীবন বাঁচাল রন মালোর। জ্ঞান ফিরতেই দেখল, কড়ি-বরগার ভিতর আটকা পড়েছে। ওর নীচে জড় হওয়া তক্তাগুলোর মাঝ দিয়ে গলগল করে উঠে আসছে বন্যার পানি। কাঁপছে মেঝে, ডুবছে ধীরে ধীরে। নড়তে চেষ্টা করে পারল না রন। চরম আতঙ্কের ভিতর কাটল দুটো মিনিট, তারপর টের পেল, পানির সেই প্রলয়ঙ্করী শক্তি যেন আর নেই, কমছে প্লাবনের উচ্চতা।

ক্রীকের কলধ্বনিও যেন আস্তে আস্তে কমছে। সচেতন হয়ে উঠল রন। ওর মনে পড়ে গেল লিজার শেষ চিৎকার: ‘রন! তুমি কোথায়!’

‘লিজা!’ রনের মনে হলো চিৎকার করতে গিয়ে গলা চিরে যাচ্ছে ওর। কী যেন আঁকড়ে ধরছে বুকের পাঁজর। ‘লিজা!’ নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল ও। আবারও ডাকল। আরও জোরে।

হয়তো এই ভাঙাচোরা বাড়ির কোথাও আটকা পড়েছে অসহায় লিজা, শুনতে পাচ্ছে না ওর ডাক। হয়তো পড়ে গেছে উন্মত্ত ক্রীকে, ডুবে গেছে বানের পানিতে।

চিন্তাটা আরও এগোতে সাহস পেল না রন। লিজার কী হয়েছে সেটা জানবার একটা মাত্র উপায় আছে। লিজাকে খুঁজে বের করতে হবে ওকে।

মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করল রন, শিথিল করে দিল শরীর। সাবধানে ভাবতে চাইল কী অবস্থায় আছে ও নিজে। তক্তার তৈরি একটা কফিন বা চৌবাচ্চার ভিতর শুয়ে আছে। চার-বাই-আটফুট একটা ছাতের বরগার নীচে শক্ত ভাবে চাপ খেয়ে আছে ডান হাত। বাম হাতটা চাপা পড়েছে শরীরের তলায়। ব্যথা করছে হাতটা। তবে আশা করা যায়, হাড় ভাঙেনি।

পা দুটো যেন আটকা পড়েছে শক্তিশালী কোনও ভালুকের আলিঙ্গনে। মেঝের এক গাদা তক্তার নীচে আসলে চাপা পড়েছে ওগুলো। তক্তাগুলোর চোখা কিছু অংশ ঢুকে গেছে ওর উরুর মাংসে।

জিভ বের করে ঠোঁটের কোণ চাটল ও, শুকনো রক্তের নোনতা স্বাদ পেল জিভে। মাথাটা যেন ব্যথায় ছিঁড়ে পড়বে। ...করোটিতে কি চিড় ধরেছে?

গলা ও কাঁধ মুচড়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করল রন। পেটে চেপে বসা তক্তাগুলো নড়ল সামান্য। চোখের কোণে দেখতে পেল, ও আছে ঢালু মেঝের কিনারায়। হয়তো যখন-তখন নীচে বহতা ক্রীকে খসে পড়বে দোতলার মেঝে। ফুলেফেঁপে ওঠা ক্রীকটা বইছে এখন বিনের দালানের তলা দিয়ে।

নড়াচড়ার চেষ্টা করতেই আলগা আবর্জনাগুলো এদিক-ওদিক পড়তে শুরু করল, নড়ে উঠল রনের পেটের উপর আড়াআড়ি চেপে থাকা কাঠের ভারী বিম। ওটার এক প্রান্তের তীক্ষ্ণ অংশ গাঁথে গেল ওর চাপা পড়া ডান-বাহুর পেশিতে।

ব্যথায় শিউরে উঠল রন। তারই ফাঁকে খেয়াল করল, একবার যেন ওজন বাড়ছে বিমের, আরেক বার কমছে। সী-স'র মত অবস্থায় আছে নাকি গুঁড়িটা? এবার আতঙ্কজনক সত্যটা উপলব্ধি করল। নীচ থেকে কুলকুল আওয়াজ করে ধীরে ধীরে নামছে পানির উচ্চতা। পানির উচ্চতার সঙ্গে সংযোগ আছে ওর উপর আড়াআড়ি পড়ে থাকা মোটা গুঁড়ির। বয়ার মত ভাসছে ভারী গুঁড়িটা, কর্কের মত নড়ছে-চড়ছে। কিন্তু পানি যখন আরও নেমে যাবে, তখন...

বাঁচতে চাইলে এখানে গুয়ে অপেক্ষা করা চলবে না। বাঁ হাতটা পিঠের তলা থেকে বের করবার চেষ্টা করল রন। কাঁধের হাড়ের জোড়ায় এত ব্যথা লাগল, কপালে জমট বাঁধতে শুরু করা রক্তের সঙ্গে মিশল ঘাম। ভিজে গেল বাম হাতটা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেহের তলা থেকে ওটাকে মোচড়ামুচড়ি করে বের করতে পারল।

বাম হাত মুক্ত করে চুপচাপ পড়ে থাকল রন। রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল চিনচিনে ব্যথা। মনে হলো, যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যাবে। তারপর কমল ব্যথা, রক্ত সঞ্চালনের ফলে ধীরে ধীরে শিথিল হলো আড়ষ্ট পেশি।

ওখানে গুয়ে পানির ছলছল আওয়াজের উপর দিয়ে মৃদু একটা গলার আওয়াজ শুনতে পেল। 'লিজা?' চিৎকার করে জানতে চাইল রন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। জবাব পেল না কোনও। ক্যানিনিয়ের ধ্বংসযজ্ঞের ভিতর কোথাও না কোথাও মানুষ আছে। আবারও চিৎকার করল ও: 'কেউ আছ কোথাও?'

কিন্তু কেউ শুনল না ওর চিৎকার। জবাব দিল না কেউ।

ওর পেটের উপর থেকে সামান্য চাপ কমাল বরগা; তারপর বসে পড়ল আগের মত। চাপা পড়া হাতের ব্যথায় রনের মনে হলো, পেট ফাটিয়ে মেরুদণ্ডের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ওটা। বাম হাতে পুরোপুরি সাড়া ফিরে পাওয়ার পর কনুইটা মেঝেতে রাখল ও, শক্ত করে ধরল গুঁড়ি, অপেক্ষায় থাকল, কখন আবার একটু উঁচু হবে ওটা।

যেই আবার খানিক উঁচু হলো বিম, কাঁধ ও বাহুর সমস্ত শক্তি দিয়ে ওটাকে আরও একটু তুলতে চাইল রন। মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড দরকার ওর।

সময়টা পেল ও। টান দিয়ে ডান হাত বের করে আনল গুঁড়ির তলা থেকে। আন্তে করে আবার নামিয়ে দিল গুঁড়ি। অতি সচেতন হয়ে খেয়াল করল, ভারী বিম আর ওর পেটের আড়ষ্ট পেশির মাঝের ফাঁক আধ ইঞ্চিরও কম।

ক্রমেই নেমে যাওয়া পানির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। জিতলে হয়তো বাঁচবে, এবং হারলে... মৃত্যু!

ডান পায়ের পাতা মুচড়ে জুতোর ভিতর থেকে বের করতে চাইল রন।

একটু পর ঘামে ভিজে গেল বুটজুতোর ভিতর চামড়া। বার কয়েক টানাটানি করতেই বুটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল পা-টা।

আবর্জনার স্তূপে গোঙানি শুরু হলো। কাঁপছে মেঝেটা। জুতোর ভিতর থেকে বাম পা বের করতে পাগল হয়ে উঠল রন। ওর মনে হলো, অনন্তকাল চেষ্টার পর মুক্ত হলো পা।

এখন শুধু পেটের উপর আড়াআড়ি ভাবে পড়ে থাকা বরগাটা সরাতে হবে, তা হলেই মুক্ত হতে পারবে ও। ডান হাত সরিয়ে নিয়ে গুঁড়ির সঙ্গে পেটের যে ফাঁকটুকু তৈরি করতে পেরেছিল, পানির উচ্চতা কমে যাওয়ায় এরইমধ্যে তা বুজে গেছে। দেহের পাশে দু'হাত নিয়ে এল রন, তারপর দু'কনুই মেঝেতে ঠেকিয়ে হাতের তালু দুটো রাখল বিমের তলায়। কাঁধ ও কোমরের জোরে এবার তুলতে চেষ্টা করল ভারী বিমটা।

নড়ছে ওটা। সামান্য একটু উঠল। উঠছে আরও। শরীরের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে ওটাকে উপরে ঠেলে শরীর গড়িয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ও। মেঝের প্রান্ত থেকে হাত-পা ছড়িয়ে ঝপাস করে কয়েক গজ নীচের পানিতে পড়ল হঠাৎ। ওকে এক পাক ঘুরিয়েই টান দিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলল জোরাল স্রোত।

ক্ষণিকের জন্য বিনের দালানের ধ্বংসাবশেষে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করল রন, কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটবার শক্তি ওর নেই। ক্রীকে বহতা পানির তোড়ে ভেসে যেতে দিল নিজেকে, সেই সঙ্গে অল্প-অল্প হাত-পা নেড়ে ভেঙে পড়া রেললাইনের কালভার্টের দিকে সরতে চাইল।

পিছন থেকে পতন ও ভাঙচুরের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার মত ক্যানিয়নটার দিকে।

একটু আগেও বিনের দালানের অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, প্রচণ্ড জোরে ঝপাস আওয়াজ করে ভেঙে পড়েছে ক্রীকে। পুরো ক্রীকে যেন বাঁধ তৈরি করেছে বিধ্বস্ত দালান। ধ্বংস-স্তূপে ফুটোফাটা যা কিছু আছে, সেগুলো দিয়ে সামান্য পানিই আসতে পারছে এপাশে। ক্রীকের দু'দিকের পার অনেকখানি উঁচু হওয়ায় সদ্য তৈরি বাঁধের পিছনে দ্রুত বাড়ছে পানির উচ্চতা।

স্রোত কমে যেতেই পায়ের নীচে মাটি ঠেকল রনের। আধ মিনিট লাগল ওর ক্রীকের তীরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠতে। প্রথমেই লিজার কথা মনে পড়ল। পাগলের মত চারপাশের পানিতে ওকে খুঁজল রন। ওই জঞ্জালের ভিতর যদি লিজা থেকে থাকে...

তারপর জোরাল শব্দ করে হাজারো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল অকস্মাৎ সৃষ্ট বাঁধ।

ভাঙা তক্তা, ভাসমান দরজা, কোনও এক তলার মেঝের খানিক অংশ আর জানালার একটা আস্ত চৌকাঠ ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ল না ওর। দালানের

অবশিষ্টাংশগুলো দ্রুত ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল রাতের অন্ধকারের আড়ালে। আর কিছুই নেই, আছে শুধু নীচের মেসার দিকে ছুটে চলা জোড়াল স্রোত।

রনের হঠাৎ করে মনে হলো, শরীরের সমস্ত শক্তি, সমস্ত মনোবল হারিয়ে গেছে ওর। প্রলয়ঙ্করী বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েও হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ও, আচ্ছন্ন বোধ করল। মনটা ওর বারবার নীরবে ডাকল: ‘লিজা! লিজা! কোথায় তুমি?’

আরও ভাটির দিকে, রেল-রাস্তায় লোকজনের সাড়া পেল। হাঁটাচলা করছে মানুষ। নাচছে লণ্ঠনের আলো। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর এর-ওর নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। তবুও মাথা নিচু করে বসে থাকল রন।

নানাজনের কথাবার্তার টুকরো-টাকরা অংশ কানে এল। আকস্মিক বিপর্যয়ের কারণে চড়া গলায় কথা বলছে সবাই।

‘...একটানে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কোনও চিহ্নও রাখেনি কারও...’

‘...মার্কেটাইল কোম্পানি। জর্জ ব্রাউনের ভাইয়ের ছেলে, আর হার্মানদের ছোট মেয়েটা...’

‘...ক্রীকে আছে। যদি আমরা শকুন আর কয়োটিদের আগে হাজির হতে পারি, মেসা থেকে লাশ তুলে আনতে...’

‘...চুরানবুইয়ের পর থেকে কখনও এরকম...’

বাতাসে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার মত শরীর মোচড়ানো মেঘের ভিতর থেকে ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিল চাঁদ, আবছা আলো ছড়াল পৃথিবীতে। নীচের দৃশ্যটা মর্মস্পর্শী ও ভয়ঙ্কর বলেই হয়তো মেঘের চাদর আবার ঢেকে দিল চাঁদটাকে। তার পরেও, সাহস করেই বোধহয়, আরও একবার উঁকি দিল চাঁদ।

ধ্বংসলীলা সাজ করে শান্ত হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি। একটানা পুবালী হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল বৃষ্টির ভারী, কালো মেঘগুলোকে। এবার আলো ছড়াবার পূর্ণ অধিকার পেল চাঁদ।

বনিলাস সেতুর এক পাশ ভেঙে পুরোটা সেতু ঘুরে চলে এসেছে রেল-সড়কের উপর, দেখলে মনে হয় যত্নের সঙ্গে খুলে নতুন করে সেতুটা সড়কের বুকে বসিয়েছে কোনও দানব।

রন যেখানে আছে, তার উল্টোপাশে, ডিপোর প্ল্যাটফর্মের এক অংশ দানবীয় বাটাল দিয়ে যেন কেটে নিয়ে গেছে জলোচ্ছ্বাস।

ডেভ বেলের মার্কেটাইল কোম্পানির চিহ্ন বলে কিছুই নেই আর। প্লাবনের সরাসরি সামনে পড়েছিল স্টোরটা। বিনের দালানের মত একই ভাবে ডুবে গিয়েছিল ওটাও, তারপর ভেঙেচুরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ওটাকে প্রবল স্রোত।

কিন্তু রেল-রাস্তার দিকে মুখ করা একটা বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। রন

আন্দাজ করল, জলোচ্ছ্বাসের ভয়ঙ্কর তোড় ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে, ধ্বংস করে দিয়েছে দু'পাশের বসতি, কিন্তু শহরের অন্যান্য বাড়ি-ঘরগুলো ঠিক আছে।

বরাবরের মতই গম্ভীর চেহারায় মর্যাদার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে হাওয়ার্ডস হোটেল। বারান্দার পিলারের মাঝে পানির দাগ রয়ে গেছে, যেন পোশাক পরা কোনও পুরুষের ইস্ত্রি করা প্যাণ্টের হাঁটুতে কাদা লেগেছে।

হাওয়ার্ডস হোটেলের পিছনে সামান্যতম চিহ্নমাত্র নেই বিনের দালানের।

পেটের ভিতর গিঁঠ পাকানো অনুভূতি হলো রনের। টলতে টলতে ক্রীক্কের পার থেকে নেমে লোকজনের জটলার দিকে পা বাড়াল।

খালি পায়ে কাদার স্পর্শ খুব শীতল মনে হলো। বিড়বিড় করে বলল রন, মেসা থেকে লিজাকে খুঁজে বের করতে হলে একজোড়া জুতো দরকার।

ঘরে আরেক জোড়া জুতো আছে, মনে পড়ল ওর। ভিড় ঠেলে হোটেলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছল রন, তারপর লবিতে উঠতে পা রাখল সিঁড়ির ধাপে। কে যেন ধরে ফেলল ওর হাত। চরম বিরক্তির সঙ্গে হাতটা ঝাপটা দিয়ে ছুটিয়ে নিল রন। কিন্তু আবারও ওর বাহু খামচে ধরল ওই হাত, একটা কণ্ঠস্বর উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'ফেরিসকে ধরতে ক্যানিয়নে গিয়েছিল ব্রাউন!' চাঁদের আলোয় লোকটার ফ্যাকাসে চেহারা দেখল রন। হ্যাট থেকে টুপটুপ করে পানি ঝরছে তার। আত্মমগ্ন স্বরে বলল লোকটা, 'আমিও ওর সঙ্গে যেতাম আরেকটু হলে!'

'ওই জলোচ্ছ্বাসের সামনে পড়লে বাঁচত না কেউ,' নির্বিধায় বলল হতোদ্যম রন। 'শুধু এটুকুই আশা করতে পারি যে লিউট ফেরিসও বাঁচেনি।' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে কাদা ভরা লবিতে ঢুকল ও।

লবিতে জড় হয়েছে ক্যানিয়নের বেশ কিছু বাসিন্দা— প্লাবনের সরাসরি পথ থেকে দূরে ছিল বলে কোনও না কোনও ভাবে রক্ষা পেয়েছে এরা। তাদের ভিতর চায়নিজরা আছে, রয়েছে সদ্য আগত বসত হারা সাদামানুষদের অনেকেই। তাদের ভিতর অপেক্ষাকৃত লম্বা বিল ট্রেইসিকে দেখতে পেল রন।

ওকে দেখে এগিয়ে এল জুয়াড়ী। বিষণ্ণ সুরে বলল, 'ভেবেছিলাম মারা গেছ। ছাদটা যখন নীচে পড়ল, মনে করেছিলাম ওটার তলাতেই ছিলে।'

'মিস্টার ট্রেইসি, লিজা... লিজা আর নেই,' রনের মনে হলো কী যেন বৃকের ভিতর গিঁঠ পাকিয়ে শ্বাস আটকে দিচ্ছে। মাথা নিচু করে নিজ ঘরের দিকে পা বাড়াল ও।

'লিজা?' ওর পিছন থেকে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বিল ট্রেইসি।

ঘরের দরজায় পৌঁছুবার আগে বলবার সুরটা খেয়াল করল না রন, আনমনে ভাবল, আমার ঘরে বাতি জ্বালল কে?

দরজায় দাঁড়িয়ে লিজাকে দেখতে পেল রন। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে

আছে। রনকে দেখে গভীর আয়ত চোখদুটো বড়বড় হয়ে উঠল ওর, বিষণ্ণ চেহারা ঝলমলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আরও বেশ কয়েক দিন বনিলাস ক্রীকে বইবে পানির বাড়তি স্রোত, কিন্তু তর্জন-গর্জনের ভয়াবহতা কমেছে। ছুটন্ত পানির জোরাল ছল-ছলাৎ আওয়াজটা অবশ্য এখনও আসছে।

একহাতে গলা স্পর্শ করল লিজা, যেন কথা বলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ‘রন! শেষবার যখন তোমাকে দেখি... তোমাকে দেখলাম ক্রীকে পড়ে যেতে! আমি তো হাতে উঠে হাওয়ার্ডস হোটেলের জানালা গলে ঢুকে পড়লাম... নীচে এসে দেখি লবিতে পানি উঠছে... আমার কোমর ডুবে গেল... ভীষণ ভয় হলো, তুমি...’ খেমে গেল লিজা।

‘সবই এখন অতীত,’ মৃদু হাসল ক্লান্ত রন। ‘কালকে নতুন দিন আসছে, লিজা। ভবিষ্যতের কথা ভাবার জন্যে নতুন দিন আসছে!’

জানালায় কাছ থেকে ছুটে এসে দরজার কাছে দাঁড়ানো রনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল লিজা। দু’জন দু’জনকে আলিঙ্গন করল মাঝপথে।

সতেরো

পরদিন ভোরে সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া এক পিস্তল ফ্ল্যাটে তাপ ঢালল সূর্য। চমৎকার একটা দিন। পলাতক সাদা মেঘগুলো জায়গা ছেড়ে দিল সুনীল আকাশকে। বাড়িগুলোর ছাতে ও ডিপোর আশপাশের কটনউড গাছগুলোর শিখরে চিকচিক করল ভোরের শেষ-বৃষ্টির জলকণা।

শহরের বেশিরভাগ এলাকাই ঢেকে গেছে প্লাবনে ভেসে আসা কাদা-মাটিতে। রাত নামবার আগেই ওই ভেজা কাদা শুকিয়ে পাউডারের মত গুঁড়ো হবে, বাতাসে উড়বে সেই মিহি ধুলো।

বাড়িগুলোর উঠানের বেড়ায় আটকে আছে নানা আবর্জনা— তবে মেসকিট, ইউক্লা ও ওকোটিলোর ভাঙা ডালপালার সংখ্যাই বেশি। জমিন ঢেকে গেছে শুকনো ঘাসের পুরু কার্পেটে। মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বেশ সময় নেবে ওই কার্পেট।

একটু নিচু জমিগুলোয় এখনও জমে আছে পানি, রাস্তার খানা-খন্দও পানিতে ভরা। রেললাইনের ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা শান্ত পানিতে প্রতিফলিত

হচ্ছে নীল আকাশ।

সকাল হতেই দ্রুত পানি শুষতে শুরু করল ঝলমলে তপ্ত সূর্য। দম বন্ধ করা ভ্যাপসা গরম পড়ল। বাতাসে জলীয় রাশ্পের পরিমাণ এত বেশি যে হাঁসফাঁস করতে শুরু করল সবাই। তারই ফাঁকে এগিয়ে চলল জীবিতদের অনুসন্ধান ও উদ্ধার করবার অভিযান।

ক্যানিয়নে আরও অনেকেই স্বেচ্ছ কপালগুণে বেঁচে গেছে বিল ট্রেইসির মত। মাত্র একজন কাউবয়কে হারিয়েছে জর্জ ব্রাউন।

সূর্য আরেকটু উপরে উঠবার পর অন্যান্যদের সঙ্গে নীচের মেসায় দুর্ভাগ্যদের লাশ খুঁজতে গেল জর্জ ব্রাউন ও বিল ট্রেইসি। চাপা পড়া লাশ বের করতে স্যাডলহর্নের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে আলাদা করল তারা ঝোপঝাড় ও আবর্জনাগুলো। রনের তত্ত্বাবধানে একদল লোক নিয়ে বনিলাস সেতুটা মেরামতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফ্লিন্টস্টোন ফেনটন।

দুপুরে রনের কাছে খবর নিয়ে এল জর্জ ব্রাউন, তিক্ত স্বরে বলল, ‘ফেরিসকে পেয়েছি আমরা। কবর দেওয়ার কোনও দরকার আছে বলে মনে হলো না, যেটুকু আস্ত ছিল, একটা গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিয়েছি সেটুকু।’ ক্লান্ত ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্রাউন। ‘ওর হাতে ডিনামাইটের একটা ফিউজ ছিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বাঁধটা এমনি এমনি ভাঙেনি? ফেনটন যে-দু’জনকে বাঁধের পাহারায় রেখেছিল, তাদের একজনকে খুঁজে পেয়েছে ট্রেইসি। বুকে গুলি খেয়েছিল লোকটা। অনেকে হয়তো বলবে ব্যাপারটার কোনও তাৎপর্য নেই, কিন্তু আমার মনোভাব ভিন্ন।’

মনোভাব রনেরও ভিন্ন। এটা পরিষ্কার যে দখলে রাখতে না পেরে বাঁধ ভেঙে খনি প্লাবনে ডুবিয়ে দিয়েছে লিউট ফেরিস। কিন্তু এই নোংরা পরিকল্পনার কতটা ফেরিসের, আর কতটা ক্লিভ হেস্টিংসের?

একটু পর রনকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল ডেভ বেল, সতর্ক করে বলল, ‘হেস্টিংসকে দেখেনি কেউ। বানের পানিতে যদি মারা না গিয়ে থাকে, হয়তো আশপাশেই আছে ও।’

‘কর্নেলকে ও খুন করেছে সেটা আমরা জানি,’ আপত্তির সুরে বলল রন। ‘এর পরেও থাকবে ও? ঝুঁকিটা নেবে?’

‘হয়তো,’ নিজের মত থেকে সরল না ডেভ বেল। ‘ভুল হতে পারে আমার, তবে সেই ছোটবেলা থেকে ক্লিভ হেস্টিংসকে দেখছি আমি। ভয় বলে কিছু নেই ওর, শুধু ওর চেয়ে শক্তিশালীরা প্লুতি শ্রদ্ধাবোধ আছে। তুমি পিস্তল ফ্ল্যাটে আসবার আগে ওকে শায়েস্তা করার মত কেউ ছিল না এখানে।’ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বেল। ‘বোকা নয় হেস্টিংস। ও জানে, মারা গেছে প্যাট্রিক টমসন; ফেরিসও বেঁচে নেই— ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার লোক আর থাকল কোথায়?’

অপলক ডেভ বেলকে দেখল রন, তারপর বিস্মিত হয়ে বলল, ‘তুমি তো নিজ কানে প্যাট্রিকের কথা শুনেছ। পিলার আর হাওয়ার্ডও শুনেছে। শুনেছে লিজা, জর্জ ব্রাউন, ডাক্তার ব্রায়ারও। আমি নিজেও শুনেছি।’

আবার মাথা নাড়ল ডেভ বেল। ‘নিরপেক্ষ কোনও আদালতে যদি বিচারের মুখোমুখি হেস্টিংসকে দাঁড় করানো হয়, বিচারক বলতে বাধ্য হবেন, মানুষের মুখের কথা ছাড়া আর কোনও প্রমাণ নেই ওর বিরুদ্ধে। কারও প্রমাণহীন মুখের কথাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না আদালত। তা ছাড়া, হেস্টিংস অন্তত দশজন লোক জোগাড় করতে পারবে, যারা আদালতে বলবে, কর্নেলের মৃতদেহ ডিপোতে পৌঁছানো পর্যন্ত ও তাদের সঙ্গেই ছিল।’

তিজ্ঞ, রুঢ় সত্যটা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল রন।

প্যাট্রিক টমসন ও লিউট ফেরিসের মৃত্যু, বা প্লাবনের ফলে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তনই হয়নি আসলে। এখনও, এত কিছুর পরেও ক্লিভ হেস্টিংসের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মোকাবিলা করতে হবে ওকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে রনকে দেখল ডেভ বেল, তারপর বলল, ‘শুরু থেকে ভুল পথে চলেছি, রন। যে-পরিমাণ কষ্ট তুমি সহ্য করেছ, যে-পরিমাণ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও দমে না গিয়ে লড়াই করেছ, তাতে এটা বলতেই হয়, পক্ষ নিতে হলে তোমার মত মানুষের পক্ষই নেয়া উচিত। কোনও শর্ত ছাড়াই টাকা ধার দিতে রাজি আছি আমি... যদি তুমি এখনও আমাকে সঙ্গে রাখতে চাও।’ হাসলেও বিষণ্ণ দেখাল অনুতপ্ত ব্যবসায়ীকে। ‘ম্যাক পিলারও থাকতে চায় তোমার সঙ্গে। ...দোকানটা গেছে আমার। ক্যানিয়নের ভিতর বাড়ি-ঘরগুলোও শেষ। তবে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই নতুন করে গড়ে তুলতে পারব শহরটা।’

স্বীকারোক্তি দিয়ে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল ডেভ বেল, ঘুরে দাঁড়িয়ে দুর্বল ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল আরেক দিকে।

বুড়ো টমসনের টেলিগ্রাফ পেয়ে বিকেলে সাহায্য নিয়ে এল বুলেট ট্রেইন। জংশন থেকে পাহাড়ি পথে তাড়াতাড়ি আসবার জন্য টেণ্ডার ও কোচ ছাড়া অন্য কোনও বগি আনেনি ইঞ্জিনটা।

চিকিৎসা সেবা দেবার জন্য তিনজন ডাক্তার, প্রচুর ওষুধপত্র এবং পর্যাপ্ত খাবার পাঠানো হয়েছে বিপর্যস্তদের কাছে।

ওই ট্রেইনে আরও এসেছে মিশেল মার্শল্যাণ্ড।

কাদাময় ক্রীকে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে পারে দাঁড়ানো ফ্লিণ্টস্টোন ফেনটন ও তার সঙ্গীদের নিয়ে সেতুটা মেরামতের চেষ্টায় ব্যস্ত রন। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ক্রীকের উপর জায়গা মত বসানো গেল সেতু। জলোচ্ছ্বাসের মাত্র একটা ধাক্কা দরকার হয়েছিল ওটা সরাতে, কিন্তু আগের জায়গায় ওটাকে ফিরিয়ে আনতে ফেনটন ও তার লোকজনের লাগল প্রায়

সারাটা দিন।

ক্রীকের পুব পাড় থেকে রনকে ডাকল মিশেল। সামান্য বিস্ময় বোধ করল রন, সেই সঙ্গে খানিক হতাশও হলো। হতাশাটুকু অনুভব করে নিজেকে অবিশ্বস্ত মনে হলো ওর। ‘এক মিনিট মিশেল,’ বলে রেললাইনের খুঁটির উপর সেতুর একটা স্প্যান রাখতে ইশারা করল রন, তারপর বেয়ে উঠল ক্রীকের পিছলা পার।

গ্রীবা কাত করে রনকে দেখল মিশেল, গভীর স্বরে বলল, ‘আমি ফিরে এলাম, রন। ... শুধু তোমার জন্যে।’

কী বলবে ভেবে পেল না রন, চরম অস্বস্তিকর দ্বিধার ভিতর ওর নাকে এল তিতা-মিষ্টি মেশানো জোরাল মেয়েলি সুবাস। মেইমি ও তার মেয়েরা পাশ কাটাল রনকে, ওদের দু’হাত বোঝাই হয়ে আছে কমল ও ব্যাণ্ডেজে।

‘আশ্চর্য ব্যাপার তো!’ বিদ্রূপের স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল মিশেল।

মেইমি ও তার পার্লারের মেয়েদের পরনে কাদামাখা রংচঙে পোশাক। স্কার্টের তলার দিকটা উল্টে কোমরে গুঁজেছে তারা। এতে হাসির কিছু আছে বা অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে বলে মনে হলো না রনের। ও ধরনের পোশাক ছাড়া পরবার মত আর কিছুই নেই ওদের। হোঁচট খাচ্ছে মেয়েগুলো, পিছলে যাচ্ছে— তারপরও সাধ্যমত চেষ্টা করছে যে-যার দায়িত্ব পালন করতে।

কত বড় একটা বিভেদের পরীখা আছে ওর সঙ্গে মিশেলের, সেটা হঠাৎ অনুভব করল রন। নরম গলায় বলল ও, ‘হাওয়ার্ডের হোটেলে যাও, মিশেল।’ হাতের ইশারায় চারপাশ দেখাল। ‘এখানে অনেক কাজ পড়ে আছে। একটু পরে আসছি আমি। তখন কথা হবে।’

ভীষণ অবাক হয়েছে এমন ভঙ্গিতে ভুরু উঁচু করল মিশেল। ‘কথার কী আছে, রন? খনি তো পানিতে ডুবে গেছে— তার মানে তো ধ্বংস হয়ে গেছে ওটা, তা-ই না? এখন তো এখানে আর কিছুই নেই তোমার জন্যে।’

অপলক চেয়ে মিশেলকে দেখল হতভম্ব, বিরক্ত, বিব্রত রন, এতক্ষণে বুঝতে পারল, কেন ফিরেছে মেয়েটা। আস্তে করে মাথা নাড়ল ও। ‘খনিটা ধ্বংস হয়ে যায়নি, মিশেল। অন্তত আমি যেভাবে খনন কাজ করব, তাতে বড় কোনও সমস্যা হবে না ওই খনি থেকে তামা তুলতে। সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বা পাম্প বসিয়ে পানি সরিয়ে ফেলতে পারব আমরা।’

দু’দিনের না-কামানো রুক্ষ দাড়িসহ ওদের সামনে এসে দাঁড়াল নিক হাওয়ার্ড। পরিশ্রমের কারণে নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে তার। রন তাকে বলল, ‘নিক, মিশেলকে যদি একটু হোটেলে নিয়ে গিয়ে...’

‘আমি নিজেই যেতে পারব,’ আড়ষ্ট কণ্ঠে রনকে থামিয়ে দিল মিশেল, মেইমির মেয়েদের ব্যবহৃত কর্দমাক্ত পথটা মাড়িয়ে টলমল করতে করতে রওনা

হলো হাওয়ার্ডস হোটেলের দিকে।

হোটেলের দিকে চলল নিক হাওয়ার্ডও।

পিস্তল ফ্ল্যাট ছাড়িয়ে দূরে, অনেক উঁচুতে এলিফ্যান্ট হেড বাট দেখতে পেল রন। ওদিকেই সেই গিরিখাদটা, যেটার মাঝ দিয়ে এসেছে রেললাইন। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পিস্তল ফ্ল্যাটের যোগাযোগ রক্ষা করছে ওই রেললাইন। রনের মনে হলো, ওটা দূরে— তবে খুব বেশি দূরে নয়। এখনও পিস্তল ফ্ল্যাট ছেড়ে নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে পারে, ও, ভুলে যেতে পারে খনিটার কথা, নিউ ইয়র্কে মিশেলের স্বামী হয়ে বাকি জীবন কাটাতে পারে বিলাসে গা ভাসিয়ে।

এলিফ্যান্ট হেড বাট-এর অসংখ্য খাঁজ-ভাঁজ-খানা-খন্দে ছায়া ফেলেছে মাঝ-আকাশ পেরিয়ে যাওয়া সূর্যটা। লাল আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হচ্ছে রিজগুলো— গা*থেকে নেমে আসা ঢালু জমিন দূর থেকে দেখতে হাতির দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের মত লাগে বলেই ওই এলাকার নাম এলিফ্যান্ট হেড বাট হয়েছে।

বিকেলের মৃদু বাতাসে ঢালু পাহাড়ি জমি, পিস্তল ফ্ল্যাট শহর ও নীচের মেসার উপর ভাসছে মিহি ধুলোর লালচে মেঘ। ওই ধুলো এসেছে শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্লাবনের কাদা থেকে। সূক্ষ্ম ধুলোর মেঘ যেন শ্বাস আটকে দিতে চাইছে সবার।

সারাটা দিন সবার কাজ তদারক করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রন। মিশেলের মুখোমুখি হতে হবে সে-চিন্তাটাও চেপে বসল ওর মাথায়। চলে যাচ্ছে বোঝাতে হাত নেড়ে ফোনটনকে ইশারা করল, তারপর রওনা হয়ে গেল হাওয়ার্ডস হোটেলের দিকে।

হোটেলের বারান্দায় উঠে থামল ও, রেল-রাস্তার এপাশে-ওপাশে চাইল। ওর উল্টো দিকে রেললাইনের উপর বসে আছে ট্রেইনের সঙ্গে আসা একমাত্র যাত্রীবাহী বগিটা। ওটার জানালার ভিতর দিয়ে রক্তগোলাপের মত লাল সূর্যালোক আসছে এপাশে। বগির ভিতর মানুষের নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর। অস্থায়ী হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য রেললাইনের উপর রাখা হয়েছে বগিটা। সারা দিন রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত ডাক্তার তিনজন অপেক্ষাকৃত গুরুতর আহতদের চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে এখনও, ব্যবস্থা নিচ্ছে, যাতে বুলেট ট্রেইনে করে রওনা হতে পারে তারা। আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য জংশন-শহরে নিয়ে যাওয়া হবে ওই রোগীদের।

অস্থায়ী হাসপাতালের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ক্লান্ত পায়ে লিজা ট্রেইনিকে নামতে দেখল রন। বগির কাঠের বডিতে কালচে রঙ করা, সেই গাঢ় পটভূমিতে স্পষ্ট দেখা গেল লিজার অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের পোশাক।

রনকে দেখে হাত নাড়ল লিজা।

প্রত্যুত্তরে হাত তুলে ধীরে ধীরে নাড়ল রন।

বুলেট ট্রেইনের ইঞ্জিনটা পানির টাক্কির দিক থেকে পিছিয়ে এল। কাপলিংক লাগানো হলো বগির সঙ্গে। ইঞ্জিনের সিলিণ্ডার থেকে বাষ্প বেরুল, প্রেশার ডোম থেকে সূর্যের লাল আলোয় লম্বা একটা ধূসর রেখা সৃষ্টি করল বাষ্পের কলাম।

লবি পার হয়ে নিজের ঘরে চলে এল রন, কাদা ধুয়ে পরিষ্কার করল নিজেকে, সদ্য ইস্ত্রি করা পরিষ্কার নতুন কাপড় পরতে শুরু করল। কাপড় পরা মাঝ অবস্থায় থাকতেই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কর্দমান্ড জর্জ ব্রাউন, চৌকাঠে হাত রেখে নিম্পলক চাইল রনের চোখে, গম্ভীর চেহারায় জানাল, 'কে যেন এইমাত্র হেস্টিংসদের ওই ম্যানশনে ক্লিভ হেস্টিংসকে ঢুকতে দেখেছে।'

গানরেষ্টটা কোমরে পেঁচিয়ে পরে নিল রন, সিন্ধুগানের সিলিণ্ডার খুলে পরীক্ষা করল সবক'টা গুলি ভাল অবস্থায় আছে কি না, তারপর চাইল ব্যারেলের ভিতর দিয়ে। সিলিণ্ডারটা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে হোলস্টারে সিন্ধুগানটা পুরে ড্র করল বার কয়েক। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। হোস্টারের ডেজা চামড়া আঁকড়ে ধরতে চাইছে অস্ত্রটাকে।

'তোমাকে একা যেতে হবে এমন কোনও কথা নেই,' সহযোগিতার সুরে বলল জর্জ ব্রাউন। 'ক্লিভ হেস্টিংস কখনোই সমান সুযোগ দেবে না তোমাকে।'

'কিন্তু একা আছে ও এখন,' দৃঢ় স্বরে বলল রন।

জর্জ ব্রাউন দ্বিধা করে মুখ খুলল, 'অস্ত্রে হাত ভাল ওর।'

কাঁধ ঝাঁকাল রন, বিনা দ্বিধায় বলল, 'অস্ত্রের কোন্‌দিক দিয়ে গুলি বের হয় সেটা জানি আমি।'

হঠাৎ ব্রাউনকে ঠেলে সরিয়ে দরজায় দাঁড়াল মিশেল। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে ওর। বেসুরো স্বরে বলল, 'তোমাদের দু'জনের কথা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি। রন, আমি বলে দিচ্ছি, তুমি এখন থেকে বেরিয়ে গোলাগুলি করবে না মিস্টার হেস্টিংসের সঙ্গে!'

'করব, মিশেল,' শান্ত কণ্ঠে বলল বিরক্ত রন। 'দরকার হলে তা-ই করব আমি।'

রাগে লালচে মুখে থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল মিশেল, রনকে দরজার দিকে আসতে দেখল। ওকে পাশ কাটাল রন, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রনকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে গিয়ে যন্ত্রচালিতের মত গ্রীবা ঘোরাল মিশেল।

করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল রন। ওর পিছনে, মিশেলের পাশ থেকে নিচু স্বরে জর্জ ব্রাউন বলল, 'তুমি যদি আমার মেয়েমানুষ হতে, মিস মার্শল্যাও, তা হলে চড়িয়ে তোমার দু'পাটির সব ক'টা দাঁত ফেলে দিতাম আমি। ...রন মার্লো তোমার বাবার খুনিকে খুঁজতে বাইরে যাচ্ছে!'

ব্রাউনের বলা কথাটা মিশেলের চিন্তাধারায় কোনও পরিবর্তন আনবে না,

ভাবল রন । ও নিয়ে আর ভাবতে রাজি নয় মিশেল । ওর একমাত্র চিন্তা, নিজের ইচ্ছামত আমাকে চালাতে পারছে না কেন ।

মন থেকে মিশেলের কথা পুরোপুরি মুছে ফেলল রন । দুনিয়ার সবকিছু দূর করে দিল মন থেকে— শুধু মনে রাখল, ক্লিভ হেস্টিংসের মুখোমুখি হতে হবে ওকে ।

ঘনায়মান সন্ধ্যার আবছায়ায় রেল-রাস্তা ধরে উত্তরে চলল রন— মার্শালের অফিসের পাশে পৌছে যাওয়ার আগে পর্যন্ত । মার্শালের অফিসের সামনে থামল ও, আঁধার নামতে শুরু করায় কর্মব্যস্ত শহরটা রাতের মত শান্ত হচ্ছে, বাড়িগুলো থেকে আসছে নানা গৃহস্থালী শব্দ, মন দিয়ে শুনল সেগুলো ।

অন্ধকার নেমে আসছে বলে প্লাবনের ক্ষত-চিহ্নগুলো চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে । রনের কল্পনার সেই চিরকালের পুরনো, পরিচিত পিস্তল ফ্ল্যাটের মতই মনে হচ্ছে এই বিপর্যস্ত, মৃতপ্রায় শহরটাকে ।

রান্নার আগুন থেকে একেবেঁকে তারার রাজ্য লক্ষ্য করে উঠছে ধোঁয়া । পোড়া মেসকিটের ডালের সুবাস পেল । সেই সঙ্গে ভাজা মাংসের ঘ্রাণ ওকে মনে পড়িয়ে দিল, খুব খিদে লেগেছে ওর ।

ধুলো ওড়ানো বাতাস ভাসিয়ে আনল নানান শব্দ । কোথায় যেন জোরে জানালা বন্ধ করল কেউ । হঠাৎ একঝলক বাতাসে রেল-রাস্তার আরেক দিক থেকে উড়তে শুরু করল ধুলোর মেঘ । বিড়বিড় করে গাল বকল কোনও লোক । ধূপ করে বন্ধ হলো একটা দরজা । পিছনে, শহরের দিক থেকে মহিলা কণ্ঠ শুনতে পেল রন, অবাধ্য দুই বাচ্চাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে মায়েরা । আরও দূরে থেকে কাতর আহাজারি করল বাছুর হারা একটা গরু ।

হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে জেল-এর পিছনটা লক্ষ্য করে রওনা হলো রন । বয়ে যাওয়া বাতাসে অশান্ত হয়ে উঠেছে অগভীর একটা বড় ডোবার পানি । ঘুরে ডোবাটা পার হলো রন, ওখান থেকে হেস্টিংসদের প্রাসাদোপম ম্যানশন দেখতে পেল— বহুবার সীমানার বাইরে থেকে দেখা সেই ছাত, ম্যানশন ঘিরে থাকা লম্বা কটনউড গাছের সীমানা— পরিচিত দৃশ্য ।

সাবধানে ম্যানশনের কাছাকাছি পৌছে গেল রন । নিখর, নীরব দালানটাকে ওর মনে হলো নীরবে অপেক্ষমাণ কোনও প্রাচীন দুর্গ । আকাশের পটভূমিতে আরও গাঢ় একটা প্রকাণ্ড আকৃতি । কিন্তু ওটার দিকে নিঃশব্দে চলল, দিনের আলো সামান্য হলেও এখনও আছে ।

কাঠের ঢালু ছাউনিওয়ালা একটা ঘর আর তেকোনা ক্যারিজ হাউসের মাঝখান দিয়ে বিরাট ম্যানশনের পিছনে চলে এল ও, এগোল ছায়া-ঢাকা দেয়ালের পাশ দিয়ে । প্রতিটা পদক্ষেপ মেপে মেপে ফেলছে । ম্যানশনের কোনায় পৌছে গিয়ে ভাল করে দেখল আশপাশ । নেই কেউ । কোনও শব্দ বা

নড়াচড়াও নেই।

তারপর ওর পিছনে ক্যারিজ হাউসের অন্ধকার থেকে ব্যাখ্যাভীত একটা আওয়াজ হলো। দ্রুত ঘুরল রন, তার চেয়েও দ্রুত হোলস্টার থেকে বের করে ফেলল সিঙ্গগান। এবার কিঁচকিঁচ ডাকগুলো চিনতে পারল। অন্ধকারে দৌড়াদৌড়ি করছে ইঁদুরের পাল।

পুবাকাশের আঁধার-প্রায় পটভূমিতেবাম দিকে পঞ্চাশ গজ দূরে কালো একটা আকৃতি দাঁড়িয়ে আছে— ভাঙা একটা উইণ্ডমিলের অবশিষ্টাংশ ওটা। আড়াল হিসেবে ওটা ভাল মনে হওয়ায় ছাউনির তলা থেকে বেরিয়ে সাবধানে উইণ্ডমিলের ধ্বংসাবশেষের দিকে চলল রন। ওখান থেকে ম্যানশনের সামনের দরজার দিকেও নজর রাখা সহজ হবে।

অর্ধেকটা দূরত্ব পেরিয়ে জায়গায় হঠাৎ জমে গেল ও। জং-পড়া একটা কজা জোরেসোরে ক্যাচকোঁচ আওয়াজ তুলেছে।

আওয়াজটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল ওকে। শব্দ না করে মূল ভবনের দিকে দ্রুত চলল রন। ম্যানশনের সঙ্গে দূরত্ব পনেরো ফুট থাকতে থামল আবার। অপেক্ষা করল কান পেতে। অস্বাভাবিক কোনও শব্দ হলে শুনতে পাবে।

গাছের মাঝ দিয়ে পাতা নাড়িয়ে সরসর করে বয়ে যাওয়া বাতাসের ফিসফিস ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। নিঃশব্দে দোতলা ম্যানশনের বারান্দায় উঠবার সিঁড়িতে পা রাখল রন। ওর ওজন বইতে গিয়ে শুকনো কাঠের পুরনো ধাপগুলো মচর-মচর আওয়াজ করল। হাত রেখে টের পেল, বারান্দার রেইলিংটার কাঠ ফেটে গেছে। সামনের খোলা, অন্ধকার দরজা দিয়ে হালকা বাতাস আসছে। উষ্ণ, ঝিরিঝিরি হাওয়া। গালে বাতাসের স্পর্শে আরও সতর্ক হয়ে উঠল রন।

বাড়ির ভিতর কোথাও পায়ের শব্দ হলো?

হাঁটছে কেউ?

ইঁদুর দৌড়াচ্ছে?

ওই আওয়াজটার তলায় চাপা পড়ল রনের সাবধানী পদক্ষেপের শব্দ।

শামুকের গতিতে বারান্দায় উঠল রন।

চাপ পড়ায় জোরাল আর্তনাদ ছাড়ল পুরনো কাঠের মেঝে।

দরজার কালো গহ্বরটার কাছাকাছি থামল রন, শ্বাস আটকে কান পাতল। বাড়ির ভিতরটা কবরের মত নীরব। ওর মনে হলো, বিরাট এই দালানটা যেন অপেক্ষা করছে অনভ্যাসগত কারও পদশব্দ শুনবার জন্য। অথও নীরবতা যেন চিরন্তন, চিরস্থায়ী। টানটান উত্তেজনার ভিতর দিয়ে অশুভ সময় পার হতে লাগল অতি ধীরে।

তারপর রন খেয়াল করল, নৈঃশব্দ্য পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন নয়। প্রকাণ্ড প্রাচীন দালানটা যেন নিজের সঙ্গেই বিড়বিড় করে কথা বলছে, শীতল হতে শুরু করায় রোদের তাপে উত্তপ্ত বিরাট ছাতটা চিড়বিড় শব্দ করছে। বাড়ির ভিতর খুলে বন্ধ হলো একটা দরজা।

আপনাআপনি?

দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল রন। বাইরে সামান্য আলো ছিল, কিন্তু ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে ওর চোখ সয়ে এল অন্ধকারে, অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল সামনেটা। একটা খালি করিডরে আছে ও। বাম দিকে সিঁড়ির রেইলিং ধরে রাখা প্রথম খুঁটি।

শীতল ঘামের একটা ফোঁটা ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। পিঠের সঙ্গে সঁটে গেল শার্ট।

মনে হলো দোতলায় দ্রুত পায়ে হাঁটছে কে যেন।

ককিয়ে উঠল মেঝের একটা তক্তা।

ধূপ করে হালকা একটা শব্দ হলো।

পা টিপে টিপে সিঁড়ির কাছে চলে গেল রন। থেমে গেল দোতলার সেই শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে থামল রনও। বড় বেশি দ্রুত থামল। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে বুঝে ধরতে চাইল রেইলিংের খুঁটি। অন্ধকারে ধরতে পারল না ওটা, পড়তে শুরু করে বুকে গেল শরীর। সিঁড়ির খুঁটিতে জোরে বাড়ি দিল ওর কাঁধ। ঘুনে খাওয়া পোকায় কাটা পুরনো কাঠ সইতে পারল না ধাক্কাটা। কাঠের গভীর থেকে উপড়ে আসা জং-পড়া পেরেকগুলো তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল। বাইরের দিকে হেলে পড়ল পুরো রেইলিং।

সিঁড়ির গোড়ায় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রন, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে সময় নিল। অনুভব করল, বুকের খাঁচায় ধূপধাপ লাফাচ্ছে রুপিও, ঘন ঘন শ্বাস নিতে গিয়ে ফুলে ফুলে উঠছে বুক। অন্ধকার সিঁড়ির উপরের দিকে চেয়ে রইল ও।

জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটছে কেউ সজোরে বন্ধ হলো একটা দরজা। দোতলায় কার যেন ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শুনতে পেল রন, এবার নিশ্চিত হলো, ম্যানশনে একা নয় ও।

‘নীচে নেমে এসো, ক্লিভ,’ শাস্ত গলায় বলল বন।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল থমথমে নীরবতায়। তারপর হেস্টিংসের ভারী কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল: ‘শুয়োরের বাচ্চা!’

সিঁড়ির উপর থেকে আগুনের ঝলকানি উগরাল সিঁক্কাগান

রনের পিছন দেয়ালে গাঁথল বুলেট। গুলির বিকট শব্দ হলো বন্ধ জায়গায়। একেক বারে তিন-চার ধাপ সিঁড়ি টপকে দ্রুত উঠতে শুরু করল রন, তারই

ফাঁকে গুলি করল সিঁড়ির মাথা লক্ষ্য করে। পাল্টা জবাব দিল ক্লিভ হেস্টিংস, তারপর পিছিয়ে গেল।

এত দ্রুত দৌড়ে উঠল যে অন্ধকার সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে হাঁচট খেয়ে সামনে বাড়তে বাধ্য হলো রন। প্রাণপণ চেষ্টা করল ভারসাম্য রক্ষা করতে, কিন্তু পারল না, জোরে ধাক্কা খেল ছোট্ট ল্যাণ্ডিংয়ের শেষে ছিটকিনি না-আটকানো ভিড়ানো দরজায়। খুলে গেল দরজা। ঘরের ওপাশে একটা জানালায় কালো একটা আকৃতি দেখতে পেল, বেশির ভাগ নক্ষত্র ঢেকে রেখেছে আকৃতিটা। ভারসাম্য ফিরে পেয়েই লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল রন।

সরে যাওয়ার ফাঁকে আরেকটা গুলি করল ক্লিভ হেস্টিংস। অন্ধকার ঘরে মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য আগুনের ঝিলিকটাকে উজ্জ্বল কমলা রঙের একগাদা সূতোর মত দেখাল।

রনের মনে হলো, বাম কাঁধে মোটা একটা লাঠি দিয়ে গায়ের জোরে বাড়ি দিয়েছে কেউ। আঘাতের ধাক্কায় আধপাক ঘুরে গেল ও, সে সঙ্গে পিছাতে বাধ্য হলো, পিঠ দিয়ে গুঁতো খেল দরজার চৌকাঠে। তারই ফাঁকে গুলি ছুঁড়ল দু'বার।

ক্লিভ হেস্টিংসকে জানালার পটভূমিতে ঝুলন্ত একটা প্রকাণ্ড বাদুড়ের মত লাগল। অথবা এমন একটা পুতুল, যেটার পেটের ভিতর থেকে সমস্ত কাপড় বের করে নেয়া হয়েছে।

ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল হেস্টিংস, 'আমাকে ঠেকাতে পারবে না, রন।' তারপর জানালা থেকে অদৃশ্য হলো তার দেহ।

রনের মনে হলো, কাঁধ দুটো অবশ হয়ে যাচ্ছে ওর, সেইসঙ্গে অবশ হয়ে যাচ্ছে দেহের বামদিক। ধীর পায়ে সামনে বাড়ল, জানালার কাছে যেতেই পায়ে বাধল নরম কী যেন। হাঁচট খেল রন, পড়ে যেতে শুরু করে দেয়ালের সঙ্গে মাথাটা বাড়ি খেল।

তীক্ষ্ণ ব্যথা ছাপিয়ে উপলব্ধি স্থান করে নিল ওর মনে: ক্লিভ হেস্টিংস গুলি খেয়ে জানালার এপাশে পড়েছে, ওপাশে নয়!

ক্ষিপ্ত বুনো জন্তুর মত গর্জন ছাড়ল ক্লিভ হেস্টিংস, তার পর মুঠো তুলে হাতুড়ির মত করে মেরে বসল রনের ঘাড়ের পিছনে।

ঘাড়ের হাড় নড়ে যাওয়ার মটমট আওয়াজ শুনতে পেল রন। তীব্র ব্যথা! শক্তিশালী দুটো পা অজগরের মত পঁচিয়ে ধরল ওর কোমর।

নিজেকে মুক্ত করতে চাইল রন। সিঁঙ্গানের গর্জনে কানে তালা লেগে গেল ওর। আগুনের আঁচ লাগল মুখে। ওর মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে দেয়ালে গাঁথল বুলেট, ছিটাল কাঠের কুচি। ওগুলো বিধে যাওয়ায় রনের মনে হলো আগুনের মত লাল, হাজার খানেক গরম পিন ঢুকল মুখে। শরীরটাকে শিথিল করে দিল ও, টের পেল, কোমর থেকে পা ছাড়িয়ে নিচ্ছে ক্লিভ হেস্টিংস।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধূপধাপ ভারী পদশব্দ তুলে মেঝে কাঁপিয়ে দরজার দিকে চলল লোকটা।

সারা মুখ থেকে দরদর করে আঠালো চটচটে রক্ত পড়ছে, গরম ছোঁয়াটা অনুভব করল রন। ওর আহত বাঁ হাতে কোনও সাড়া নেই বললেই চলে। মাথার ভিতর যেন কেমন ধোঁয়াটে ঠেকছে। চিন্তাগুলো স্পষ্ট নয়। তার পরও নিজেই মর্মে করিয়ে দিল কী করতে হবে। কাঁপা হাতে মেঝে থেকে সিক্সগান তুলে নিল রন, কনুইয়ে ভর করে উঁচু করতে পারল শরীর। জেদের সঙ্গে ভাবল, খুনি হেস্টিংসকে কিছুতেই পালাতে দেব না।

পায়ের আওয়াজের দিকে মনোযোগ দিল রন, তারপর আওয়াজটা যেখান থেকে আসছে, তার কেন্দ্রবিন্দু আন্দাজ করে সাড়ে চারফুট উপরে গুলি ছুঁড়ল।

গুলির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর পুরো একটা মিনিট পেরিয়ে গেল, আর কোনও আওয়াজ হলো না। তারপর নিচু একটা গোঙানি শুনতে পেল রন। তার পর পরই ধূপ করে মেঝেতে পড়ে গেল ভারী কোনও কিছু।

ধীরে ধীরে কসরৎ করে উঠে দাঁড়াল রন, পকেট থেকে ম্যাচ বের করে কাঠি জ্বালল।

‘স্থির একজোড়া চোখে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল হলদে আলো। ওই অস্বচ্ছ চোখ দুটোতে ফাঁকা দৃষ্টি।

বুকে গুলি খেয়ে মরেছে ক্লিভ হেস্টিংস।

ম্যাচের কাঠিটা পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই হেস্টিংসের দেহের নীচে আংশিক চাপা পড়া একটা ব্রিফকেস দেখতে পেল রন। অঙ্গকারে টানাটানি করে লাশের শিথিল দেহের নীচ থেকে ওটা বের করে আনল। ব্রিফকেসটা খুব ভারী।

ওটা হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একতলায়। ব্রিফকেসের ওজন থেকে বুঝতে পারছে, বুলেট-ট্রেইনে ডাকাতির সমস্ত টাকাই আছে ওটার ভিতর। হয়তো রানশার ম্যাকের কাছ থেকে ছিনতাই করা টাকাগুলোও আছে।

রেললাইনের শেষ প্রান্ত পাশে রেখে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল রন। শীতল বাতাস আলতো পরশ বুলিয়ে দিল ওর দেহে। রাস্তায় লষ্ঠনের আলো দেখে বুঝল, মানুষজন বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, গোটা শহর জেগে আছে, অপেক্ষা করছে কী হয় জানবার জন্য।

ধীর পায়ে মার্শালের অফিসটা পাশ কাটাল রন, ব্রায়ারের ড্রাগ-স্টোর ও নাপিতের দোকানের সামনে এসে দেখল, দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষারত ব্রায়ার। ‘রন,’ ডাকল ব্রায়ার, ‘দাঁড়াও, চিকিৎসা দরকার তোমার।’

কিন্তু থামল না রন, পাশ কাটাল ড্রাগ-স্টোর, দু’পাশে টলছে মাতালের

মত। কিন্তু আরও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে, ওটা না করলেই নয়।
...মিশেলকে...

ম্যাক পিলার ও হাওয়ার্ডস হোটেলের মাঝের অন্ধকার খালি জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এল জর্জ ব্রাউন। পিছন থেকে বলে উঠল ব্রায়ার, 'কেউ ওকে ধরে ধরে নিয়ে যাও। বোকাটা জেদ করেছে থামবে না।'

'আমি একাই যেতে পারব, জর্জ,' রানশার এগিয়ে আসতেই দুর্বল স্বরে আপত্তি জানাল রন। চোখ তুলে দেখল, হাওয়ার্ডস হোটেলের কোনায় ডেভ বেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লিজা।

হোটেলের লবি থেকে বের হওয়া আলোর পাশে চলে এল রন, এবার জানালা দিয়ে দেখতে পেল মিশেলকে। নিক হাওয়ার্ডের কাদামাথা ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিশেল, গ্লাভস পরছে হাতে। ওর পায়ের কাছে মেঝেতে একটা সুটকেস।

বোর্ডওয়াকে টলটলায়মান রনকে দেখতে পেয়ে তাড়াহুড়ো করে বারান্দায় বেরিয়ে এল নিক হাওয়ার্ড। লবিতে স্থির দাঁড়ানো মিশেলের ভিতর কোনও প্রতিক্রিয়া নেই, যেন দেখেইনি আহত রনকে।

রন অনুভব করল, যদি এখন মিশেলকে পাশে চায়, তো ওকেই যেতে হবে মিশেলের কাছে।

দশ-বারো গজ দূরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে লিজা ট্রেইসি, চেহারায় প্রশান্ত একটা ভাব। রনের মনে হলো, ওই প্রশান্তি যেন বিচ্ছুরিত হয়ে প্রবেশ করছে ওর মাঝেও। লিজা যেন গভীর কোনও খরস্রোতা ঝর্ণার বুকে জেগে থাকা অনড় হীরক খণ্ড, ডুবন্ত মানুষ ওকে ধরে বেঁচে যেতে পারবে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে লিজার দিকে এগোল রন। অর্ধেকটা দূরত্বও পেরুতে হলো না ওকে, তার আগেই ওর সামনে এসে দাঁড়াল লিজা, শান্ত স্বরে রনকে বলল, 'সব গোলমাল মিটে গেল, রন।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রন। 'ক্লিভ হেস্টিংস মারা গেছে, লিজা।'

'ওর পরিণতির ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না আমার মনে,' রনের চোখে আয়ত চোখ রাখল লিজা।

হঠাৎ ব্রিফকেসটা খুব ভারী মনে হলো রনের, হাত থেকে পড়ে গেল ওটা। জর্জ ব্রাউনের শক্তিশালী হাত ওকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করছে, টের পেল রন। ডিপোর সামনে থেকে বিরাট কটনউড গাছগুলোর শিহরিত পাতার গান ভেসে এল ওর কানে। ফিসফিস করে গান গাইছে ওরা রাতের বাতাসে, সেই গানের সঙ্গে কানের কাছে মৃদু মিষ্টি বাজনা বাজাচ্ছে লিজার কণ্ঠস্বর।

ফাদার ম্যাককিওন দৌড়ে চলে আসতেই ডক ব্রায়ার বলল, 'রন মার্লের আপাতত দরকার নেই আপনাকে, ফাদার; তবে ক্লিভ হেস্টিংসের জন্যে কিছু

করার সুযোগ এসেছে আপনার ।’ বৃদ্ধ যাজক ঘুরে দাঁড়াতেই ব্রায়ার আবারও বলল, ‘মনে হচ্ছে আরও কয়েক দিন পর রন মার্লোকেও একটু অন্য ধরনের সাহায্য করতে পারবেন আপনি ।’ একগাল হাসি নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ানো নীরব রন ও লিজাকে দেখল ব্রায়ার, তারপর ফিরে চলল নিজের দোকানের দিকে ।

এক

পৃথিবীকে জ্বালিয়ে দেওয়ার শপথ নিয়ে মাথার উপর স্থির হয়ে আছে সূর্যটা। মাঝেমধ্যে বয়ে যাচ্ছে গায়ে ফোস্কা ফেলবার মত গরম বাতাস। অবিরাম কম্পনে ঝাপসা হয়ে গেছে দূরের দিগন্ত। টেক্সাস এখন নরক।

ঝোপঝাড়ে ভরা রাস্তাটা এগিয়ে গেছে ফোর্ট ডেভিস থেকে মার্সার দিকে। অনেক দূরে কোথাও হয়তো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এক পাল গরুকে, দিগন্ত বেয়ে সেই ধুলো হাজির হয়েছে এখানেও। প্রাণের চিহ্ন বলতে ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে কান উঁচু করে লাফিয়ে বেড়ানো গুটিকয়েক খরগোস, শিকারের আশায় মুখের বাইরে অর্ধেক জিভ বের করে হেঁটে চলা একটা-দুটো নেকড়ে আর একটা গাছের ছায়ায় নিজেদের ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে বসে থাকা ওরা দু'জন। একটানা দৌড়ানো ঘোড়া দুটোকে কিছুটা বিশ্রাম দিতে থেমেছে ওরা।

ওদের একজন, স্যাম ওয়েড, বাম হাতে লাগাম ধরে রেখে কনুই বাঁকিয়ে ডান হাতটা রেখেছে কোমরের উপর। চওড়া কার্ট্রিজ বেল্টের ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছে বুড়ো আঙুলটাকে। বেল্টটার ডান প্রান্তে হোলস্টার, সেখান থেকে বের হয়ে আছে কালো হাতলঅলা একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ।

চৌকোনা চোয়ালের সাথে বেমানান খাড়া নাক আর চওড়া ঠোঁট স্যামের। কপালের ডান দিকে একটা গভীর কাটা দাগ। সব সময় চোখ কুঁচকে রাখে সে, ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও ওর চেহারায় একটা শয়তানী ভাব চলে এসেছে। রোদে পুড়ে লাল হয়ে গেছে ওর মুখ। তাই আরও খারাপ দেখাচ্ছে ওকে এখন।

সঙ্গী জেক রায়ারের দিকে ধসর চোখ মেলে একবার মাত্র তাকাল স্যাম। কোন কথা না বলে বুটের হিল দিয়ে গুঁতো দিল নিজের ঘোড়ার পেটে। আগে বাড়ল ঘোড়াটা। সেই সাথে স্যামের চওড়া, মেদহীন, লম্বা দেহটাও। সঙ্গীকে পিছনে ফেলে দুলকি চালে কিছুদূর এগিয়ে গেল সে। একটু পরেই স্যামের রোনটাকে ধরে ফেলল জেকের বাককিন।

চেহারায়, চালচলনে স্যামের ঠিক বিপরীত জেক। স্যামের মত লম্বা না হলেও কাঁধ দুটো চওড়া তার, কিন্তু এক ছটাক বাড়তি চর্বি নেই শরীরে। এত গরমেও বিকৃত হয়নি ওর সর্বদা হাসিখুশি, সুদর্শন চেহারাটা। লাগাম ধরা হাত দুটো স্যাডলহর্নের উপর রেখে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে বসে আছে সে।

মুখ ঘুরিয়ে স্যামের দিকে তাকাল জেক। বিনা কারণে হাসল। জিজ্ঞেস

করল, ‘গরমটা কেমন? দারুণ না?’

রসিকতাটা পছন্দ হলো না স্যামের। উত্তর দিল না সে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ধূলিধূসর শাটের পকেট থেকে একটা হারমোনিকা বের করল জেক। পরনের জিন্সে বার কয়েক ঘষে নিয়ে লাগাল মুখে। একটা করুণ সুর বাজাতে আরম্ভ করল।

পরিবেশের সাথে মোটেও মানানসই হলো না সুরটা। বিরক্ত হয়ে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল স্যাম। বলল, ‘থামাও তো। ভাল লাগছে না একদম।’

রোনটাকে ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিল বাকস্কিনটা, বাম হাত দিয়ে লাগাম টেনে ধরল জেক। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বন্ধুর মুখোমুখি হলো।

‘কী ব্যাপার?’

‘চলতি পথে যতবার তুমি এরকম করুণ সুর বাজাও, ততবার কোন না কোন বিপদে পড়ি আমরা।’

‘কুসংস্কার,’ হেসে মন্তব্য করল জেক।

‘কুসংস্কার হোক বা না হোক, ব্যাপারটা খেয়াল করেছি আমি।’

‘কই, আগে তো কখনও বলোনি?’

‘হয়তো সুযোগ পাইনি বলার। এখন দয়া করে এসব ফালতু জিনিস বাজানো বন্ধ রাখো।’

প্রিয় হারমোনিকাটাকে ফালতু বলায় কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হলেও বন্ধুর ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিল জেক। জিনিসটাকে আবারও কয়েকবার জিন্সে ঘষে নিয়ে রেখে দিল পকেটে।

‘তারমানে,’ জেকের চেহারায় বেপরোয়া ভাব, ‘তুমি বলতে চাও, শীঘ্রিই একটা বিপদে পড়তে যাচ্ছি আমরা?’

‘হ্যাঁ। কারণ, গতরাতে ফোর্ট ডেভিস থেকে রওয়ানা হওয়ার পর বলতে গেলে পানি খায়নি আমাদের ঘোড়া দুটো। সূর্য ডুবতে দেরি আছে অনেক। আর মার্কায় পৌঁছুতে তো রাত হয়ে যাবে। এই অচেনা ট্রেইলে আর ঘণ্টা দুয়েকের ভেতর পানি না পেলে স্রেফ মারা পড়বে ওরা। তখন বুঝবে বিপদ কাকে বলে।’

‘পানি পাব আমরা,’ জেকের গলায় আত্মবিশ্বাস।

‘ভাল,’ রোনের পেটে আবার গুঁতো দিল স্যাম। ধীর গতিতে এগুলো সামনে। তাকে অনুসরণ করল জেক।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর জিজ্ঞেস করল স্যাম, ‘কাজের কথা কিছু ভেবেছ?’

‘নতুন করে ভাবার দরকার কী? ঠিক করাই তো আছে সব। মার্কায় যাচ্ছি আমরা। কপাল ভাল থাকলে কাজ জুটে যাবে সেখানেই। নইলে আশপাশের রানশে আবার সেই একঘেয়ে কাউবয়ের কাজই করতে হবে। ফোর্ট ডেভিসে

দু'একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। ওরা বলল, স্প্লিট এক্স নামে একটা বড় রানশ্ আছে মার্ফা থেকে মাইল দুয়েক দক্ষিণে। ওখানে একবার টু মেরে দেখতে হবে আমাদের।'

‘আর এখানে কাজ না পেলো?’

‘সোজা চলে যাব বিগ বেডে। মাইনিং শহরটাতে এখন গোল্ড রাশ না থাকলেও আমেজটা পুরোপুরি কেটে যায়নি। জিম নামে আমার একজন বন্ধু কাজ করে সেখানে। ওকে তার করেছিলাম আমি। জবাবে সে জানিয়েছে, সারা বছরই লোকের প্রয়োজন লেগে থাকে বিগ বেডের মাইনিং ক্যাম্পগুলোতে। টুকটাক কাজ জানলেই নাকি ভাল বেতন দেয় মালিকরা।’

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল স্যাম। ওর ভবঘুরে জীবনের একমাত্র বন্ধু হচ্ছে জেক। বন্ধুর উপর অনেকখানি নির্ভর করে সে। জেকের বেলাতেও তা-ই।

দুই বন্ধু মিলে ঘুরে বেড়ায় বুনো পশ্চিমের এক শহর থেকে আরেক শহরে, আজ এখানে তো কাল ওখানে। স্থায়ী হয় না কোন জায়গাতেই। ভবঘুরে হলেও অকর্মা না ওরা, সুবিধামত কাজ পেলো লেগে যায় সেই কাজে। কোন পিছুটান নেই ওদের, নেই সংসার নামের মায়ার বাঁধন। একে অপরকে এবং যার যার পিস্তলকে বিশ্বাস করে ওরা। একারণে ভবঘুরে জীবনেও টিকে আছে, অনেক বিপদকে মোকাবেলা করতে পেরেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

‘মরীচিকা নাকি?’ আবার দীর্ঘসময়ের নীরবতার পর মুখ খুলল স্যাম।

‘কীসের মরীচিকা? এখানে মরীচিকা আসবে কোথা থেকে? এলাকাটা আর যাই হোক মরুভূমি না।’

তর্জনী উঁচিয়ে মাইলখানেক দূরের ধূসর পাহাড়গুলোর দিকে নির্দেশ করল স্যাম। আকাশের নীল আর গাছের সবুজ একসাথে হয়ে প্রচণ্ড তাপে কাঁপছে সেখানে। মরুভূমির মরীচিকার মতই দেখাচ্ছে অবিকল।

‘নাহ্,’ নিশ্চিত হতে পারছে না স্যাম, ‘আসল উইলোর মতই তো দেখাচ্ছে।’

‘হ্যাঁ, আসল উইলোই ওগুলো। মরীচিকা মনে হলো কেন তোমার?’

‘এই পশ্চিম টেক্সাসে, অর্থাৎ খোদার আরেক নরকে, সবুজ উইলোর মানে কী জানো? পানি। ফোর্ট ডেভিসের সেলুনে বসে গত রাতে গলা ভেজানোর সময় গল্প করছিলাম এক লোকের সাথে। আমরা মার্ফায় যাচ্ছি শুনে লোকটা বলল, সারা রাত্তায় একটাও ওয়াটার হোল পাব না আমরা। দূরের ওই কাঁপতে থাকা গাছগুলো এজন্যই মরীচিকা বলে মনে হয়েছিল প্রথমে।’

ঘোড়া দুটোকে আবার সামনে বাড়াল ওরা। নীরবে পাশাপাশি চলল বেশ কিছুক্ষণ। একসময় স্যাম বলল, ‘কটনউডও আছে। তারমানে সামনে পানি পাব আমরা। তোমার কথা দেখছি ঠিক হলো।’

‘অর্থাৎ,’ শাটের পকেট থেকে একটানে হারমোনিকাটা বের করল জেক। ‘বিপদ নিয়ে যে-দুশ্চিন্তা করছিলে তুমি, সেটা অমূলক,’ বলেই আগের চেয়েও করুণ একটা সুর বাজাতে আরম্ভ করল।

রাগে পিস্তি জ্বলে গেল স্যামের। কিন্তু, বলবার মত কিছু না পেয়ে চুপ করে রইল। মেরুদণ্ড সোজা করে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সামনের দিকে। এগিয়ে চলল ওর রোনটা, আর পিছন পিছন ধীরগতিতে জেকের বাকস্কিন।

আগে থাকায় স্কার্ফটা প্রথমে স্যামের নজরেই পড়ল। একটা বাঁক ঘুরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল সে, মেসকিটের ঝোপে স্কার্ফটাকে আটকে থাকতে দেখে লাগাম টেনে দাঁড় করাল ঘোড়াটাকে। অপেক্ষা করে রইল জেকের জন্য।

চোখ বন্ধ করে, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে হারমোনিকা বাজাতে বাজাতে হাজির হলো জেক। ওর ঘোড়াটা থেমে দাঁড়ালেই পা দিয়ে গুঁতো দিচ্ছে সে, ফলে আবার চলতে আরম্ভ করছে বাকস্কিনটা। ব্যাপারটা অভ্যাস হয়ে গেছে জেকের জন্য, কাজেই অসুবিধা হয় না তার। কিন্তু, স্যামের রোনটাকে থেমে থাকতে দেখে আর সামনে বাড়ল না ওর ঘোড়াটা; পা দিয়ে গুঁতিয়েও কাজ হচ্ছে না বুঝতে পেরে চোখ খুলল জেক। ‘একদৃষ্টিতে স্যামকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হারমোনিকা বাজানো বন্ধ করল।

‘কী হয়েছে?’

‘স্কার্ফ,’ চোখের ইশারায় মেসকিটের ঝোপটার দিকে ইঙ্গিত করল স্যাম।

দেখল জেক। ধূসর রঙের রেশমী স্কার্ফটা একজন সাধারণ কাউবয়ের এক মাসের বেতনের সমান দামি।

মুখ গোল করে হালকা একটা শিস দিল জেক। হারমোনিকাটা ঢুকিয়ে রাখল পকেটে। বলল, ‘একটা জিনিস খেয়াল করেছে? স্কার্ফটাকে গিঁঠ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।’

‘তারমানে ইচ্ছেকৃতভাবে কেউ করেছে কাজটা,’ বলল স্যাম। ‘স্কার্ফটার মালিক কাজটা করে থাকলে,’ এদিক-ওদিক তাকাল সে, ‘ধরে নাও আশপাশেই আছে মেয়েটা।’ একটু থেমে যোগ করল, ‘ধনীর দুলালী। আর নইলে কোন বড় রানশায়ের সুন্দরী বউ।’

‘হতে পারে। চলো, দেরি না করে রওনা হই।’

অল্প কিছুদূর এগুতেই দাবদাহে গুকিয়ে যাওয়া ছোট্ট একটা নালার প্রান্তে এসে হাজির হলো দুই বন্ধু। অপর প্রান্তে এক সারিতে কয়েকটা গাছ, তার ফাঁকে চকচক করছে পানির একটা ক্ষীণ স্রোত। স্রোতটা দেখে কিছুটা আশ্চর্য হলো ওরা।

‘মনে হয় কোন ওয়াটার ট্যাঙ্ক উপচে পড়ছে,’ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল স্যাম। ‘যাই হোক, আমাদের ঘোড়া দুটো বেঁচে গেল এ-যাত্রা,’ আগে বাড়ল

সে।

কিছু একটা বলবার জন্য মুখ খুলেছিল জেক। কিন্তু, তার আগেই একটা নারীকণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, ‘বাঁচাও! বাঁচাও!’

একে অন্যের দিকে একবার মাত্র তাকাল জেক আর স্যাম। তারপরই ঘোড়ার পেটে বুটের হিল দিয়ে জোরে ওঁতো দিল দু’জনই। ছিটকে বের হওয়া গুলির মত দৌড় দিল ঘোড়া দুটো।

মুহূর্তেই নালাটা পার হলো ওরা। তারপর গাছের সারি। সামনে একটা ঢাল, সেটা বেয়েই নেমে আসছে পানির স্রোত। ঢাল বেয়ে উপরে উঠতেই একটা প্রাকৃতিক বাঁধে এসে হাজির হলো ওরা। চারদিকে ঘন গাছের সারি, মাঝখানে ওয়াটার ট্যাঙ্কটা। এক প্রান্তে একটা সুইস গেট। সেটার কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী এক লোক। পরনে মাটির দাগ লাগা ময়লা জিন্স, ভিজ়ে চূপচূপে হয়ে যাওয়া লাল রঙের শার্ট আর মাথায় কালো হ্যাট। নাকের নীচে চিবুক পর্যন্ত লম্বিত ধূসর গোঁফ। কোমরের দু’দিকে নিচু করে বাঁধা দুটো হোলস্টার, সেখান থেকে বাইরে উঁকি মেরে আছে দুটো সিন্স শূটার। গেটটা খুলবার চেষ্টা করছে লোকটা। সফলও হয়েছে খানিকটা, যার কারণে পানির ধারা গড়িয়ে পড়ছে ঢাল বেয়ে।

নিজের কাজে এতই ব্যস্ত লোকটা যে, ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পেল না। ওয়াটার ট্যাঙ্কটার কিনারায় এসে যার যার ঘোড়া থেকে নামল স্যাম আর জেক।

‘পাগল নাকি লোকটা? এই গরমের সময় এভাবে পানির অপচয় করে কেউ?’ ঘোড়া থেকে নেমে নিচু গলায় জানতে চাইল স্যাম।

উত্তর দিল না জেক। নেমেছে সে-ও। মেয়েটাকে দেখতে পেয়েছে। ওয়াটার ট্যাঙ্কটার ঠিক মাঝখানে ওদের দিকে পিছন ফিরে ভেসে আছে মেয়েটা। সে-ও ওদের উপস্থিতি টের পায়নি।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল স্যাম। চেষ্টা করে ডাকল, ‘এই যে, মিস্টার, এই!’

একই সাথে ওদের দিকে ফিরে তাকাল লোকটা আর মেয়েটা। দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেছে দু’জনই।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। তারপরই খাবা মারল হোলস্টারে। কিন্তু, প্রস্তুত ছিল স্যাম। লোকটা অস্ত্র বের করার আগেই তার বুটের কাছে মাটিতে একজোড়া বুলেট পাঠাল।

লাফিয়ে উঠে কিছুটা পিছনে সরে গেল লোকটা। আলাগা পাথরের উপর পা পড়াতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল অনেকখানি। চেষ্টা করল দাঁড়িয়ে থাকবার, পারল না। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। পড়বার আগে হোলস্টার থেকে

অস্ত্রজোড়া বের করতে সক্ষম হয়েছিল সে, পতনের ধাক্কা সামলাতে না পেরে হাত থেকে ছুটে গেল দুটো সিক্স শূটারই। জিনিস দুটো তুলবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল সে, আবার একজোড়া বুলেট পাঠিয়ে তাকে নিবৃত্ত করল স্যাম। বুলেটগুলো মাটিতে বিধবার আগে লোকটার দুই হাত থেকে বেশ কিছু চামড়া-মাংস নিয়ে গেল।

অস্ত্রের আশা বাদ দিয়ে হাঁচড়ে-পাচড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। খিঁচে দৌড় দিল হাতের ডানদিকে। অল্প কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল দুটো ঘোড়া, একটার উপর চড়ে যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে গেল সে।

লাফিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ল স্যাম। পিছু ধাওয়া করল লোকটার।

নিজের পিস্তল বের করে অপেক্ষা করছিল জেক। লোকটাকে পালিয়ে যেতে দেখে পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে দৌড় দিল সুইস গেটটার দিকে। সেখানে পৌঁছে থামল কিছুক্ষণ। বুক ভরে দম নিল। তারপর একক প্রচেষ্টায় লাগিয়ে ফেলল গেটটা। ধীর পদক্ষেপে ফিরে এল আগের জায়গায়।

ততক্ষণে পানি ছেড়ে উঠে এসেছে মেয়েটা। ওর দিকে ভালমত তাকাল জেক।

রোদে পোড়া বাদামী চেহারা মেয়েটার। ঘন, গাঢ় সোনালী চুল। চোখের মণিদুটো নীল। বাঁশির মত তীক্ষ্ণ খাড়া নাক। অপরূপ সুন্দরী। খুব একটা লম্বা নয়, কিন্তু, হালকা-পাতলা হওয়ার কারণে কিছুটা লম্বা দেখাচ্ছে তাকে। তার পরনে জিন্স আর ধবধবে সাদা একটা শার্ট। পায়ে কালো রঙের দামি বুট। কোমরের কারুকার্যময় বেল্টটা থেকে ঝুলছে রূপার গহনা।

তাড়াহুড়ো করে বলল জেক, ‘দুঃখিত, ম্যাম। এটাকে কপালের দোষ না গুণ বলব বুঝতে পারছি না। মহাবিপদের সময় দেখা হলো তোমার সাথে। কিন্তু, তুমি আমাকে ভয় পেয়ো না। তোমার কোন ক্ষতি করব না আমি।’

‘ভয় পেলে কি পানি ছেড়ে উঠে আসতাম?’ সুদর্শন জেকের দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। একটা ঢোক গিলল জেক।

‘তোমার পার্টনার তোমাকে ফেলে পালাল নাকি?’

‘না,’ দূরের কটনউড গাছগুলোর দিকে তাকাল জেক। ‘হয়তো ফিরে আসবে এফুনি।’ অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রশঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করল সে। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমি জেক রায়ার।’

‘মিস্টার জেক রায়ার, এই মুহূর্তে লরা জেমিসনের সাথে কথা বলছ তুমি।’

‘হ্যালো, লরা। লোকটা গেট খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল কেন বলো তো? আর তুমিই বা চিৎকার করছিলে কেন?’

‘এই ওয়াটার ট্যাঙ্কে প্রায়ই গোসল করতে আসি আমি। ট্যাঙ্কটা আমাদের রানশ, মানে স্প্লিট এস্ত্রের মধ্যে পড়েছে। এটা আমাদেরই সম্পত্তি। আমি...’

‘কী বললে? স্প্লিট এক্স তোমার রানশ?’ লরাকে কথা শেষ করতে দিল না জেক।

‘আমার না, আমার বাবার। তোমরা এই এলাকায় নতুন, তাই না?’

মাথা ঝাঁকাল জেক।

‘আগেই বুঝেছিলাম। মার্কসার ট্রেইল ধরে এসেছ না তোমরা?’

‘হ্যাঁ।’

‘পেছনের বাঁকটায় একটা মেসকিটের ঝোপে কোন স্কার্ফ আটকে থাকতে দেখেছ?’

‘দেখেছি। ধূসর রঙের একটা রেশমী স্কার্ফ।’

‘জিনিসটা আমার। এখানে গোসল করতে এলে ওই ঝোপে স্কার্ফ আটকে দেই আমি। তাতে আমাদের রানশের লোকেরা বুঝতে পারে যে, আমি আছি এখানে। কেউ বিরক্ত করে না আমাকে তখন।’

‘কিন্তু, আজকের ঘটনাটা কী? ওই লোকটা তোমাকে বিরক্ত করছিল কেন?’

‘লোকটা খুব সম্ভবত পাগল। আমি আসার আগেই পানির কিনারায় বসে কিছু একটা করছিল সে। আমার ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখের পলকে অস্ত্র বের করে গুলি করল। খুব তাড়াহুড়ো করায় আমাকে মিস করল, কিন্তু, একটা গুলি লাগাতে পারল ড্যাভি, মানে আমার ঘোড়ার গায়ে। ড্যাভি তখন পাগলের মত দৌড় দিল সামনের দিকে। একলাফে গিয়ে পড়ল পানিতে। একটু পরে পানি থেকে উঠে আবার কোথায় যেন চলে গেল ঘোড়াটা।’

‘আমার মাথা থেকে হ্যাট খসে পড়ায় লোকটা বোধহয় বুঝতে পারল যে, আমি একটা মেয়ে। তখন দাঁত বের করে হাসল শয়তানটা। ধীরে-সুস্থে গুলি ভরতে আরম্ভ করল ওর সিন্স শ্যুটার দুটোতে। তারপর অস্ত্র দুটো হোলস্টারে ভরে রাখতে রাখতে বলল, “তুমি দেখে ফেলেছ, কাজেই তোমাকে তো খুন করতেই হবে, সুন্দরী। তবে তার আগে আত্মাকে একটু শান্তি দেওয়া যাক। সারা জীবনেও তোমার মত সুন্দরী জোটেনি কপালে,” ’ বলতে বলতে লজ্জায় লাল হয়ে গেল লরা। চোখ নামিয়ে তাকাল মাটির দিকে।

লজ্জা পেলে একটা মেয়েকে যে এতটা সুন্দর লাগতে পারে, আগে জানত না জেক। প্রায় অভিভূত হয়ে একদৃষ্টিতে লরার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। দৃষ্টিটা অনুমান করতে পেরে আরও লাল হয়ে গেল লরা। অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলল জেক, ‘তারপর?’

জেকের দিকে তাকাল লরা। ‘তারপর অনেকবার পানি ছেড়ে আমাকে উঠে আসতে বলল পাগলটা। আমি উঠলাম না। পিস্তল বের করে গুলি করার ভয়ও দেখাল কয়েকবার। কিন্তু, করল না। শেষে আর কোন উপায় না পেয়ে শুইস

অস্ত্রজোড়া বের করতে সক্ষম হয়েছিল সে, পতনের ধাক্কা সামলাতে না পেরে হাত থেকে ছুটে গেল দুটো সিক্স শূটারই। জিনিস দুটো তুলবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল সে, আবার একজোড়া বুলেট পাঠিয়ে তাকে নিবৃত্ত করল স্যাম। বুলেটগুলো মাটিতে বিধবার আগে লোকটার দুই হাত থেকে বেশ কিছু চামড়া-মাংস নিয়ে গেল।

অস্ত্রের আশা বাদ দিয়ে হাচড়ে-পাচড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। খিঁচে দৌড় দিল হাতের ডানদিকে। অল্প কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল দুটো ঘোড়া, একটার উপর চড়ে যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে গেল সে।

লাফিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ল স্যাম। পিছু ধাওয়া করল লোকটার।

নিজের পিস্তল বের করে অপেক্ষা করছিল জেক। লোকটাকে পালিয়ে যেতে দেখে পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে দৌড় দিল সুইস গেটটার দিকে। সেখানে পৌঁছে থামল কিছুক্ষণ। বুক ভরে দম নিল। তারপর একক প্রচেষ্টায় লাগিয়ে ফেলল গেটটা। ধীর পদক্ষেপে ফিরে এল আগের জায়গায়।

ততক্ষণে পানি ছেড়ে উঠে এসেছে মেয়েটা। ওর দিকে ভালমত তাকাল জেক।

রোদে পোড়া বাদামী চেহারা মেয়েটার। ঘন, গাঢ় সোনালী চুল। চোখের মণিদুটো নীল। বাঁশির মত তীক্ষ্ণ খাড়া নাক। অপরূপ সুন্দরী। খুব একটা লম্বা নয়, কিন্তু, হালকা-পাতলা হওয়ার কারণে কিছুটা লম্বা দেখাচ্ছে তাকে। তার পরনে জিন্স আর ধবধবে সাদা একটা শার্ট। পায়ে কালো রঙের দামি বুট। কোমরের কারুকর্মময় বেল্টটা থেকে ঝুলছে রূপার গহনা।

তাড়াহুড়ো করে বলল জেক, ‘দুঃখিত, ম্যাম। এটাকে কপালের দোষ না গুণ বলব বুঝতে পারছি না মহাবিপদের সময় দেখা হলো তোমার সাথে। কিন্তু, তুমি আমাকে ভয় পেয়ো না। তোমার কোন ক্ষতি করব না আমি।’

‘ভয় পেলে কি পানি ছেড়ে উঠে আসতাম?’ সুদর্শন জেকের দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। একটা ঢোক গিলল জেক।

‘তোমার পার্টনার তোমাকে ফেলে পালাল নাকি?’

‘না,’ দূরের কটনউড গাছগুলোর দিকে তাকাল জেক। ‘হয়তো ফিরে আসবে এফুনি।’ অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করল সে। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমি জেক রায়ার।’

‘মিস্টার জেক রায়ার, এই মুহূর্তে লরা জেমিসনের সাথে কথা বলছ তুমি।’

‘হ্যালো, লরা। লোকটা গেট খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল কেন বলো তো? আর তুমিই বা চিৎকার করছিলে কেন?’

‘এই ওয়াটার ট্যাঙ্কে প্রায়ই গোসল করতে আসি আমি। ট্যাঙ্কটা আমাদের রানশ্, মানে স্প্লিট এস্ত্রের মধ্যে পড়েছে। এটা আমাদেরই সম্পত্তি। আমি...’

‘কী বললে? স্পিট এক্স তোমার রানশ?’ লরাকে কথা শেষ করতে দিল না জেক।

‘আমার না, আমার বাবার। তোমরা এই এলাকায় নতুন, তাই না?’

মাথা ঝাঁকাল জেক।

‘আগেই বুঝেছিলাম। মার্ফার ট্রেইল ধরে এসেছ না তোমরা?’

‘হ্যাঁ।’

‘পেছনের বাকটায় একটা মেসকিটের ঝোপে কোন স্কার্ফ আটকে থাকতে দেখেছ?’

‘দেখেছি। ধূসর রঙের একটা রেশমী স্কার্ফ।’

‘জিনিসটা আমার। এখানে গোসল করতে এলে ওই ঝোপে স্কার্ফ আটকে দেই আমি। তাতে আমাদের রানশের লোকেরা বুঝতে পারে যে, আমি আছি এখানে। কেউ বিরক্ত করে না আমাকে তখন।’

‘কিন্তু, আজকের ঘটনাটা কী? ওই লোকটা তোমাকে বিরক্ত করছিল কেন?’

‘লোকটা খুব সম্ভবত পাগল। আমি আসার আগেই পানির কিনারায় বসে কিছু একটা করছিল সে। আমার ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখের পলকে অস্ত্র বের করে গুলি করল। খুব তাড়াহুড়ো করায় আমাকে মিস করল, কিন্তু, একটা গুলি লাগাতে পারল ড্যাভি, মানে আমার ঘোড়ার গায়ে। ড্যাভি তখন পাগলের মত দৌড় দিল সামনের দিকে। একলাফে গিয়ে পড়ল পানিতে। একটু পরে পানি থেকে উঠে আবার কোথায় যেন চলে গেল ঘোড়াটা।’

‘আমার মাথা থেকে হ্যাট খসে পড়ায় লোকটা বোধহয় বুঝতে পারল যে, আমি একটা মেয়ে। তখন দাঁত বের করে হাসল শয়তানটা। ধীরে-সুস্থে গুলি ভরতে আরম্ভ করল ওর সিন্স শ্যুটার দুটোতে। তারপর অস্ত্র দুটো হোলস্টারে ভরে রাখতে রাখতে বলল, “তুমি দেখে ফেলেছ, কাজেই তোমাকে তো খুন করতেই হবে, সুন্দরী। তবে তার আগে আত্মাকে একটু শান্তি দেওয়া যাক। সারা জীবনেও তোমার মত সুন্দরী জোটেনি কপালে,” ’ বলতে বলতে লজ্জায় লাল হয়ে গেল লরা। চোখ নামিয়ে তাকাল মাটির দিকে।

লজ্জা পেলে একটা মেয়েকে যে এতটা সুন্দর লাগতে পারে, আগে জানত না জেক। প্রায় অভিভূত হয়ে একদৃষ্টিতে লরার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। দৃষ্টিটা অনুমান করতে পেরে আরও লাল হয়ে গেল লরা। অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলল জেক, ‘তারপর?’

জেকের দিকে তাকাল লরা। ‘তারপর অনেকবার পানি ছেড়ে আমাকে উঠে আসতে বলল পাগলটা। আমি উঠলাম না। পিস্তল বের করে গুলি করার ভয়ও দেখাল কয়েকবার। কিন্তু, করল না। শেষে আর কোন উপায় না পেয়ে শ্বুইস

গেটটা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। ওর ইচ্ছে ছিল, সব পানি বাইরে ফেলে দেবে। ফলে আর ভেসে থাকতে পারতাম না আমি। তখন সহজেই আমাকে ধরতে পারত সে।’

‘লোকটাকে চেনো তুমি?’

‘না। তবে এই এলাকার কেউ বলে মনে হয় না আমার। এখানে কারও এত সাহস নেই যে, লরা জেমিসনকে খুন করার হুমকি দেয়। শহরের কোন স্ট্রেকার হবে হয়তো।’

দূর থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ ভেসে এল। ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল জেক আর লরা। ফিরে আসছে স্যাম। একহাতে নিজের রোনের লাগাম ধরে আছে, অন্য হাতে একটা বে স্ট্যালিয়নের। ঘোড়াটার গলার চামড়া কিছুটা কেটে গেছে, খেয়াল করল জেক। অনুমান করল, ঘোড়াটা লরার।

কাছে এসে রাশ টানল স্যাম। মাথা সামান্য নুইয়ে ডান হাত দিয়ে হ্যাটের কিনারা স্পর্শ করল। আবার একটা আন্তরিক হাসি দিয়ে অভিবাদনটুকু গ্রহণ করল লরা।

‘তোমাদেরকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। তোমরা সময়মত না পৌঁছলে এতক্ষণে হয়তো আমাকে মেরেই ফেলত শয়তানটা। রানশে চলো তোমরা। বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই তোমাদের। সব কথা গুনলে খুব খুশি হবে বাবা।’

‘যেতে পারলে ভালই লাগত, কিন্তু, হাতে একদম সময় নেই আমাদের। মার্ফায় যাচ্ছিলাম আমরা, ইচ্ছে ছিল বিকেলের আগেই পৌঁছব। কিন্তু, এখন দেখা যাচ্ছে মাঝরাতের আগে সেখানে পা দিতে পারব না। এই নিয়ে পথে চারবার থামতে হলো আমাদের,’ বরফের মত শীতল গলায় কথাগুলো বলল স্যাম।

বহরখানেক আগে নারী সংক্রান্ত একটা দুর্ঘটনার পর থেকে ভদ্র-অভদ্র যে-কোন মেয়ের সাথে সহজে ভাল ব্যবহার করে না স্যাম। মেয়েদের উপর এখন আর কোন আকর্ষণই নেই তার। লরা জোরাজুরি করলে সে আবার কী না কী বলে বসে ভেবে তাড়াতাড়ি বলল জেক, ‘তোমার ঠিকানা তো জানা থাকলই আমার। একদিন সুযোগ বুঝে হাজির হয়ে যাব তোমার রানশে। কিন্তু, এখন নয়। আজকে সত্যিই তাড়া আছে আমাদের। অনেকদূর থেকে আসছি আমরা, রওনা হওয়ার পর থেকে একফোঁটাও পানি খায়নি আমাদের ঘোড়া দুটো। ওগুলোকে পানি খাইয়ে আবার ছুটতে হবে। আর, লোকটার ন্যাপারে খুব বেশি কিছু করার ছিল না আমাদের। ওকে হয়তো গুলি করে মেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু, উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাউকে মেরে ফেললে সেটা খুন করা হয়। লোকটা পিস্তল বের না করলে হয়তো গুলিই চালাত না স্যাম।’

‘ঠিক আছে,’ কিছুটা আহত গলায় বলল লরা, ‘যেতে না চাইলে আমি তো তোমাদের জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারব না।’

মুখ গোমড়া করে নিজের ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল সে। ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখল। বলল, ‘অগ্নির জন্য বেঁচে গেছে ড্যান্ডি। গুলিটা আর এক ইঞ্চি বামে ঢুকলেই...’ প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, ‘লোকটার ব্যাপারে চিন্তা কোরো না তোমরা। রানশে গিয়ে এখনই বাবাকে জানাচ্ছি আমি সব। বাবা একটা পাসি নিয়ে লোকটাকে খুঁজতে বের হবে। তারপর...’ কথাটা শেষ না করে রেকাবে পা রেখে স্যাডলে উঠে বসল মেয়েটা। জেককে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘ভদ্রলোকেরা কথা দিয়ে কথা রাখে,’ তারপরই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

লরা চলে যাওয়ার পর হেঁটে নিজেদের ঘোড়ার কাছে পৌঁছুল স্যাম আর জেক। ওদের জন্য অপেক্ষা না করে ঘোড়া দুটো নিজেরাই চলে গিয়েছিল পানির কাছে। এখনও একটু পর পর ওয়াটার ট্যাঙ্কটাতে মুখ ডুবিয়ে পানি খাচ্ছে।

পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখল স্যাম। প্রায় সাড়ে চারটা। ঘড়িটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে উদাস জেকের মুখোমুখি হলো সে। রাগত স্বরে বলল, ‘বলেছিলাম না, বিপদ হবে?’

‘কী আশ্চর্য!’ কিছুটা রেগে গেল জেক। ‘তুমি বিপদ দেখতে পেলো কোথায়? বিপদে কেউ পড়ে থাকলে ওই মেয়েটা পড়েছিল। আমাদের কিছু হয়নি।’

‘কিন্তু, পড়েছে তো কেউ না কেউ? সব দোষ তোমার হারমোনিকার।’

অবঝের সাথে তর্ক চলে না। হাঁটু গেড়ে ওয়াটার ট্যাঙ্কটার কিনারায় বসে পড়ল জেক। আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মুখ ধুলো। তারপর মাথায়, ঘাড়ে, শার্টের ভিতরে ছিটাল। কিছুক্ষণ নিশুপ দাঁড়িয়ে থেকে একই কাজ করল স্যাম।

‘মেয়েটা কী বলল জানো? লোকটা নাকি...’

‘মেয়েটা মেয়েটা করছ কেন? নাম নেই ওর? নাকি নামটা বলতে অসুবিধা আছে?’

‘আগে আমার হারমোনিকার উপর থেকে দোষ তুলে নাও,’ উঠে দাঁড়াল জেক, ‘তারপর মেয়েটার নাম বলব তোমাকে।’

‘সে এমন কোন হেলেন অভ ট্রয় না যে, তার নামটা আমাকে জানতেই হবে। কোন দরকার নেই আমার নামটা জানার। মুখ বন্ধ করে রাখো তুমি।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেক বলল, ‘লোকটা পানির কিনারায় বসে কিছু একটা করছিল। মেয়েটাকে দেখামাত্রই গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। কেন?’

‘জানি না। মারফায় যদি দেখা হয়, তাহলে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।’

ঠোট বাঁকা করে হাসল জেক। বলল, ‘দুটো ঘোড়া নিয়ে এসেছিল

লোকটা। একটা নিয়ে পালিয়েছে, আর অন্যটা ওই যে,' দূরের একটা কটনউড গাছের দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'বাঁধা আছে এখনও। ঘোড়াটার পায়ের কাছে ওটা কী পড়ে আছে? একটা বস্তা না? চলো তো, দেখি।'

হাঁটতে হাঁটতে কটনউড গাছটার কাছে হাজির হলো দুই বন্ধু। চারদিকে বড় বড় ঘাস আর ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। গাছগুলোর আড়ালের অন্ধকারকে মুছে দেওয়ার জন্য শেষ বিকেলের আলো যথেষ্ট নয়। তাই, দূর থেকে চেষ্টা করেও জঙ্গলের বেশি ভিতরে দেখতে পেল না জেক।

ওদেরকে দেখে মাথা নেড়ে, হালকা আওয়াজ করে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করল ঘোড়াটা। নিচু কণ্ঠে প্রাণীটাকে অভয় দিতে দিতে মাটি থেকে বস্তাটা তুলে নিল জেক। অনেক ভারী বোধ হওয়াতে আবার রেখে দিল মাটিতে। বস্তাটাকে হেঁচড়ে নিয়ে এল কিছুটা দূরে। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা, ঘাসে ছাওয়া।

'বাপরে,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল জেক, 'কোমরটা গেছে আমার।'

'দেখি সরো,' হালকা একটা ধাক্কা দিয়ে জেককে সরিয়ে দিল স্যাম। বস্তার মুখটা খোলাই ছিল, আরও একটু ফাঁক করল মুখটা। দু'জনই উঁকি দিল ভিতরে।

মাঝারি আকৃতির একটা মোটা লোহার পাত দেখা গেল ভিতরে। স্যাম আর জেক মিলে ধরাধরি করে পাতটাকে বাইরে বের করল।

'কী এটা?' বোকার মত জানতে চাইল স্যাম।

'দেখতেই পাচ্ছ লোহার পাত। তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, জিনিসটা দিয়ে কী করছিল লোকটা।'

'জিজ্ঞেস করলে কি বিশেষ কোন লাভ হত? উত্তরটা জানা আছে তোমার? নাকি ওর ঘোড়াটা কথা বলতে পারে?'

'কোনটাই না,' স্বীকার করল জেক। 'জিনিসটা দেখে কেন যেন পরিচিত মনে হচ্ছে।'

'তাই? আগে কোথাও দেখেছ?'

'মাইনিং ক্যাম্পে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। বছর পাঁচেক আগে কলোরাডোর একটা মাইনিং ক্যাম্পে কাজ করতাম আমি। সেখানে এ-ধরনের লোহার পাত ব্যবহার করা হত। সোনার খোঁজে খুব গভীর করে গর্ত করা হলে মাটিকে ধস থেকে বাঁচাতে এসব পাত কাজে লাগাত শ্রমিকরা। আমাদের পাগল লোকটা কি তাহলে ওয়াটার ট্যাঙ্কটার কিনারায় সোনার খোঁজ করছিল নাকি?'

দৌড়ে ট্যাঙ্কটার কিনারায় এসে দাঁড়াল দুই বন্ধু।

'লোকটা ঠিক কোন্ জায়গায় কাজ করছিল, আগে সেটা জানতে হবে আমাদের,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল স্যাম। 'মেয়েটা থাকলে খুব উপকার হত

এখন।’

‘ঠিক,’ একমত হলো জেক। ‘এখন কি মেয়েটাকে হেলেন অভ ট্রয় বলে মনে হচ্ছে?’

‘না, কখনোই না। মেয়েটার কথা বলে ভুল করেছি আমি।’

স্যাম উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ পাল্টাল জেক, ‘একটু খোঁজ করলেই আমরা বের করে ফেলতে পারব কোথায় কাজ করছিল লোকটা। ট্যাক্সটার কিনারা ধরে হাঁটতে হবে আমাদের।’

হাঁটতে আরম্ভ করল ওরা। এক জায়গায় কিছুটা কাদা আর মাটিতে গভীর হয়ে বসে যাওয়া বেশ কিছু বুটের দাগ দেখতে পেল। ভালমত দেখবার পর বুঝল, সবগুলো দাগ একজনেরই।

‘পেয়ে গেছি,’ উৎফুল্ল গলায় বলল স্যাম। ‘কিন্তু,’ আশপাশে তাকাল সে, ‘কোন গর্তের নাম-নিশানাও তো দেখা যাচ্ছে না। তাহলে করছিল কী লোকটা?’

‘বুঝতে পারছি না।’

‘চলো তো, লোকটা যেখানে হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, সেই জায়গাটা দেখে আসি। আমার মনে আছে, দুই হাতে গুলি খেয়ে অস্ত্রজোড়া ফেলে দিয়েছিল সে।’

কিছুদূর হেঁটে সুইস গেটটার কাছে এসে দাঁড়াল স্যাম আর জেক। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু ছোট-বড় পাথরের টুকরো পড়ে আছে সেখানে। চোখ নীচের দিকে রেখে সাবধানে হাঁটতে আরম্ভ করল ওরা।

‘এই যে, এখানে একটা,’ উবু হয়ে মাটি থেকে একটা সিব্ব শূটার তুলে নিল জেক। দেখাল বন্ধুকে।

চকচক করছে অস্ত্রটা। বোবাই যায়, নিয়মিত যত্ন নেওয়া হয় জিনিসটার। বাঁটাটা একদম মসৃণ। তাতে বড় করে একটা “বি” খোদাই করা এবং পাঁচটা দাগ কাটা।

শব্দ করে গলা পরিষ্কার করল জেক। জিজ্ঞেস করল, ‘কী বুঝলে?’

‘বুঝলাম, আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। একটা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে এক গানম্যানের শত্রুতে পরিণত হয়েছি আমরা। গুলি করে আমি আহত করেছি তাকে এবং পালিয়ে বেঁচে গেছে সে। কাজেই আজ হোক কাল হোক আমার উপর প্রতিশোধ নেবেই সে। তোমাকেও হয়তো ছাড়বে না।’

‘যে-কথাটা পরে বলা উচিত ছিল, সেটা আগে বলে ফেললে তুমি।’ যাই হোক, পুরনো হলেও অস্ত্রটা চকচক করছে। বাঁটাটাও মসৃণ। তারমানে নিয়মিত ব্যবহার করা হয় জিনিসটা। একজন কাউবয় বা সাধারণ লোক কাজটা করে না। তাহলে কে করে? একজন গানম্যান। তো, এই গানম্যান সাহেব যে-নামে পরিচিত, সেটার আদ্যাক্ষর হচ্ছে “বি”। এবং এ-পর্যন্ত পাঁচটা খুন করেছেন

ভদ্রলোক ।’

‘হয় নম্বর আমি আর সাত নম্বর তুমি । আগেই বলেছিলাম হারমোনিকাটা বাজালেই বিপদে পড়ি আমরা...’

‘বাজে কথা বোলো না তো স্যাম । এর আগেও অনেক গানম্যানের মোকাবেলা করেছি আমরা । ভুলে গেছ?’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল স্যাম । তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘আরেকটা কোথায়?’

দ্বিতীয় অস্ত্রটার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল জেক । ফিট পাঁচেক দূরে একসময় খুঁজে পেল । ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ইশারা করে বলল, ‘ওই যে ।’

দেখল স্যাম । তারপর বলল, ‘তোমার আর কিছু দেখার না থাকলে চলো রওয়ানা হই । সূর্য ডুবতে বসেছে, খেয়াল করেছ? দুপুরে কিছু খাইনি আমরা । আমার পেটের ভেতর হুঁচো নাচছে ।’

‘আমার অবস্থা আরও খারাপ । আমার হুঁচোগুলো নাচতে নাচতে মরে গেছে,’ বলতে বলতে হাত থেকে সিক্ত শ্যুটারটা ফেলে দিল জেক । ‘লোহার পাত আর অস্ত্রদুটো এখানেই পড়ে থাক । তবে লোকটার ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত আমাদের । পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারলে ভাল, নইলে এখানেই ঘাস-পানি খেতে পারবে ।’

ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল জেক । ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী যেন দেখল বোবা জানোয়ারটা । কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করল কি না বোঝা গেল না । ঘোড়াটার গলার কাছে হাত বুলিয়ে আদর করল জেক । বাধা দিল না জন্তুটা । জেক সরে যেতে এগিয়ে গেল ওয়াটার ট্যাঙ্কটার দিকে । মুখ ডুবিয়ে পানি খেতে আরম্ভ করল ।

ওয়াটার ট্যাঙ্কটা ছেড়ে আবার যখন ট্রেইলে উঠছে স্যাম আর জেক, তখন ওদের দিকে আরেকবার মুখ তুলে তাকাল বেস্টম্যানিয়নটা ।

দুই

আধ ঘণ্টা চলবার পর বেড়ে গেল গাছপালার পরিমাণ । কিন্তু, ট্রেইলটা আর আগের মত সমতল থাকল না, এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেল অনেকখানি । যতই সামনে এগুতে থাকল ওরা, বহুল ব্যবহৃত ট্রেইলটাতে তত বেশি ছোট-বড় নুড়ি পাথর দেখতে পেল । খেয়াল করল, ট্রেইলটা একেবেঁকে উঠে গেছে উপরের

নির্জন এক পাহাড়ী এলাকার দিকে। ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃত্যুপুরী বলে মনে হচ্ছে পুরো এলাকাটাকে।

ঝুঁজু ভঙ্গিতে স্যাডলের উপর বসে ছিল স্যাম। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে জেকের দিকে তাকাল সে। বলল, ‘এসে গেছি মনে হয়। ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না অন্ধকারে, কিন্তু, দূরের ওই ঢালটা পার হয়ে ডানদিকের রাস্তাটাই মার্ফার দিকে গেছে খুব সম্ভবত। সাইনবোর্ডের তীর চিহ্নটা সেদিকেই নির্দেশ করছে।’

ট্রেইলটা ভাগ হয়ে গেছে তিন দিকে। একটা সোজা, একটা ডানে আর শেষেরটা বামে গেছে। ডানদিকেরটা আবছা, বোঝা যায় কি যায় না। ট্রেইলটার শুরুতে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখা আছে সাইনবোর্ডটা। সেটার কাছে এসে থামল দুই বন্ধু।

‘একটা কাঠের বোর্ডের উপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা আছে—“মার্ফা চার মাইল”। নীচে একটা তীর-চিহ্ন আঁকা। খেয়াল করল ওরা, সাইনবোর্ডটা কিছুটা ডানদিকে বাঁকানো।

সাদা রঙ বলে সাইনবোর্ডটা পড়তে পারল ওরা। অন্য কোন রঙ দিয়ে লেখা হলে এই অন্ধকারে পড়া যেত না।

‘কিন্তু,’ মাথা নেড়ে সন্দেহ প্রকাশ করল স্যাম, ‘ঠিক মিলছে না ব্যাপারটা।’

‘মিলছে না মানে?’

‘গতরাতে যে লোকটা আমাকে মার্ফার ব্যাপারে জ্ঞান দিচ্ছিল, সে কিন্তু একবারও কোন সাইনবোর্ডের কথা বলেনি।’

‘হয়তো বলতে ভুলে গিয়েছিল।’

‘উই, মানতে পারলাম না। পথে কোন সাইনবোর্ড দেখতে পাব কি না, এ ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করেছিলাম তাকে। পরিষ্কার মনে আছে আমার, সে না বলেছিল।’

কথাটা শুনে দ্বিধাশ্রুত হয়ে পড়ল জেক। কিছু না বলে চুপ করে রইল।

জেক চুপ করে আছে দেখে আবার বলল স্যাম, ‘আমরা যে ট্রেইল ধরে এসেছি, ফোর্ট ডেভিস থেকে মার্ফায় যাওয়ার সহজ রাস্তা কিন্তু সেটাই। অন্তত লোকটা সেরকমই বলেছিল। আরেকটা ট্রেইল আছে এখান থেকে দশ মাইল দূরে। কিন্তু, সেটা ফোর্ট ডেভিস থেকে মার্ফায় যায়নি, ওহায়ো থেকে এসেছে। মার্ফা আর ওহায়োর মধ্যকার স্টেজকোচগুলো ওই পথেই চলে। তাহলে সাইনবোর্ডের ব্যাপারটা কী?’

‘জানি না,’ মাথা নাড়ল জেক। ‘দাঁড়িয়ে না থেকে চলো রওয়ানা হই। রাত হচ্ছে।’

‘কিন্তু, যাব কোন পথে? বামে, ডানে নাকি সোজা?’

‘সাইনবোর্ডটা ডান দিকে বাঁকানো,’ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল জেক।
‘তারমানে, ডানদিকের ট্রেইলটাই হচ্ছে মার্ক্যার ট্রেইল।’

আর কথা বাড়াল না স্যাম। সাইনবোর্ড নির্দেশিত পথে মধ্যম গতিতে
ঘোড়া ছুটাল আবার। তাকে অনুসরণ করল জেক। এবারও আগে থাকল স্যাম।

আরও আধ ঘণ্টা একটানা চলবার পর লাগাম টেনে ঘোড়া থামাতে বাধ্য
হলো স্যাম। ওর দেখাদেখি জেক।

‘আমরা ভুল করছি, জেক। এটা কিছুতেই মার্ক্যার ট্রেইল হতে পারে না।
চারদিকে তাকিয়ে দেখো।’

স্যাম বলবার আগেই ব্যাপারটা খেয়াল করেছিল জেক। চারদিকে গাছের
সারি আরও বেড়ে গেছে। সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আর
মাইলখানেক এগুলেই একটা জঙ্গলে গিয়ে হাজির হবে ওরা।

‘চলো, ফিরে যাই। কোন দুষ্টু ছেলের পাল্লায় পড়েছি আমরা। ছেলেটা
ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে আমাদের,’ স্পষ্ট স্ফোভ জেকের গলায়, ‘ট্রেইলটা
যেখানে তিন ভাগ হয়েছিল, সেখান থেকে ডানে না এসে বামে যাওয়া উচিত
ছিল আমাদের। কী আর করা যাবে,’ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।’

সাইনবোর্ডটার কাছে এসে থামল ওরা। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল
স্যাম। গাল দিল কি না ঠিক বোঝা গেল না।

বামের ট্রেইলটা ধরল দুই বন্ধু। এবার অল্প কিছুদূর এগুবার পরই একটা
ত্রিকোণাকৃতির মেসায় প্রবেশ করল ওরা। একটা ঢালের মাথায় অনুজ্জ্বল একটা
আলো দেখতে পেল।

আরও কিছুদূর এগুবার পর বোঝা গেল, একটা কেবিন থেকে আসছে
আলোটা। সামনে বড় বড় কয়েকটা জুনিপার গাছ থাকায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না
কেবিনটাকে। এখনও দুশো ফিটের মত দূরে আছে সেটা।

‘শোনো,’ ঘোড়ার গতি কমিয়ে জেকের কাছাকাছি হলো স্যাম, ‘সোজা
চলে গেলে কেবিনটাকে পাশ কাটিয়ে যাব আমরা। কিন্তু, কাজটা করতে চাই না
আমি। কেবিনটাতে একবার টুঁ মারতে হবে আমাদের। ঠিক পথে যাচ্ছি কি না
জানতে হবে। আর ওরা যদি ডিনারের আমন্ত্রণ জানায়, তাহলে তো কথাই
নেই।’

চারপাশটা একবার যাচাই করল জেক। থালার মত চাঁদ উঠেছে আকাশে।
সুনসান নীরবতা চারদিকে। এমনকী একটা ঝিঝিও ডাকছে না। সারাদিনের
প্রচণ্ড গরমের পর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে পরিবেশ। থেকে থেকে বয়ে
যাচ্ছে হালকা বাতাস। জুনিপার আর ঝোপঝাড়ের জঙ্গল থেকে কেমন একটা
অদ্ভুত গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে বাতাসটা। রাত তার সমস্ত আঁধার নিয়ে যেন
চেপে বসেছে এই মেসায়। একটা অজানা আশঙ্কা পাক খেয়ে জেগে উঠল

জেকের মনের ভিতর।

স্যামের দিকে তাকাল সে। কিছু বুঝতে পেরেছে কি না যাচাই করল। হঠাৎ কেন যেন খুশি খুশি দেখাচ্ছে স্যামকে। ব্যাপারটা কী, ধরতে পারল না জেক।

‘বাদ দাও,’ স্যামকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করল সে, ‘আমার মনে হয় এবার ঠিক পথেই চলেছি আমরা। হয়তো আর বেশি দূরে নেই মার্ক। সেখানে গিয়েই ডিনারটা সারব একবারে। ওই কেবিনে ঢোকার দরকার নেই।’

‘সারা রাত এভাবে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে চাই না আমি,’ রোনের পেটে গুঁতো মেরে গতি বাঁড়াল স্যাম। ছাড়িয়ে গেল জেককে। অল্প কিছুক্ষণ পরই মোড় নিল বামে। ঢুকে পড়ল ছোট ছোট ঘাসে ছাওয়া একটা মাঠে। তার পিছন পিছন জেক।

চাঁদের ক্ষীণ আলোতে চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল জেক, আসলে একটা রানশে হাজির হয়েছে ওরা। খুব ছোট রানশটা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা ছোট ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে রানশটার ভিতর দিয়ে। চলতে চলতে একটা কোরাল আর প্রায় ধসে পড়া একটা বার্নও দেখতে পেল।

অন্ধকারে ডুবে আছে কেবিনটা। বাইরে, সদর দরজার কাছে একটা খুঁটি থেকে ঝুলছে একটা হারিকেন। সেটার আলোই দেখতে পেয়েছিল ওরা। কেবিনটার কাছাকাছি পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল দুই বন্ধু।

‘ব্যাপার খুব বেশি সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না আমার,’ গলা নামিয়ে বলল জেক। ‘কেবিনটা যদি পরিত্যক্ত না হয়, তা হলে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে ভেতরে। কী, সেটা ধরতে পারছি না। তুমি পারছ?’

স্যাম নিজেও অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছে। কী বলবে ভেবে না পেয়ে গলা চড়িয়ে ডাকল সে, ‘হ্যালো? কেউ আছ ভেতরে?’

চারদিকের নীরবতায় স্যামের ভরাট কণ্ঠটা বড় বেশি কানে বাজল জেকের। বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে আওয়াজটা ফিরে এল ওদের দিকেই। তারপর একসময় মিলিয়ে গেল বাতাসে। কেবিনের ভিতর থেকে সাড়া দিল না কেউ।

হারিকেনের মৃদু আলোয় খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরে দেখবার চেষ্টা করল দুই বন্ধু। জমাট বাঁধা অন্ধকার ফিরিয়ে দিল ওদের দৃষ্টিকে। আবার ডাকল স্যাম। কিন্তু, খোলা দরজাটা দিয়ে বাইরে বের হয়ে এল না কেউ। আগের মতই প্রাণহীন থাকল কেবিন, কোরাল আর বার্নটা।

‘চলো, কেটে পড়ি,’ পরামর্শ দিল জেক। ‘যে রাস্তায় যাচ্ছিলাম যেতে থাকি। ঠিকই পৌঁছে যাব মার্কায়।’

‘আমারও কেটে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু, সাইনবোর্ডটা যদি কোন দৃষ্ট ছেলের কারসাজি না হয়, তাহলে কত বড় বিপদে পড়তে হবে আমাদের সেটা ভেবে দেখেছ? তিনদিকে ভাগ হয়ে গেছে ওই ট্রেইলটা। ডানদিকেরটা ধরে

এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে আমাদের। সোজা এঙলে কোথায় যেতাম, জানি না। বামেরটা ধরে এগিয়ে হাজির হলাম এখানে। আজ সারাটা রাত এভাবে ঘোড়ার পিঠে কাটাতে চাই না আমি। তুমিও নিশ্চয়ই চাও না?’ একটু থেমে যোগ করল সে, ‘এই কেবিনের লোকটা হয়তো একা থাকে। কোন কারণে বাইরে গেছে, হয়তো ফিরে আসবে এক্ষুণি। তখন তাকে জিজ্ঞেস করে আবার রওয়ানা হব আমরা। তাছাড়া, আমাদের সঙ্গ পেলে ওর একাকীত্ব কিছুটা হলেও ঘুচবে। এখন দেরি না করে কেবিনটার ভেতরে ঢুকে পড়ি চলো।’

জেক বিবেচনা করে দেখল, যুক্তি আছে স্যামের কথায়। মৃদু গলায় বলল, ‘ঠিক আছে, চলো।’

ঘোড়া দুটোকে গ্রাউন্ড হিচিং করে সিঁড়ি বেয়ে ধীর পদক্ষেপে কেবিনের দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

‘কেউ আছ ভেতরে?’ আবার চেষ্টা স্যাম।

উত্তর দিল না কেউ।

পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল জেক। আগে বেড়ে স্যামের পাশে এসে দাঁড়াল সে। বলল, ‘মনে হয় কোন বুড়ো থাকত কেবিনটাতে। বেচারার মরে গেছে বোধহয়। একটা ম্যাচ জ্বালাও তো। ভেতরে ঢুকে দেখি ঘটনা কী।’

লম্বা করে কয়েকবার শ্বাস টানল স্যাম। বলল, ‘বাতাসে মরা পচার কোন গন্ধ নেই। তার মানে কেউ মরে পড়ে নেই ভেতরে।’ বেল্টে ঘষে ফস্ করে একটা ম্যাচ জ্বালল সে। কাঠিটা উঁচু করে ধরে কেবিনের ভিতরে ঢুকল। ওর পিছনে জেক। ম্যাচের আলোয় কেবিনটাকে যতদূর সম্ভব দেখে নিল দুই বন্ধু।

দুটো কামরা কেবিনটাতে। ঢোকামাত্রই বসবার ঘর। এক প্রান্তে পুরনো এক সেট সোফা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একটা মাঝারি আকৃতির কাঠের টেবিলও আছে সেখানে। অন্য প্রান্তে একটা ডাইনিং টেবিল, সেটাকে ঘিরে চারটা কাঠের চেয়ার। ডাইনিং টেবিলটার বামদিকে ছোট্ট একটা রান্নাঘর আর ডানদিকে আরেকটা ঘর। সেটার দরজা বন্ধ। ঘরটা বেডরুম, অনুমান করল ওরা। বসবার ঘরটার দু’দিকে দুটো জানালা।

এক প্রান্তে একটা কেরোসিন ল্যাম্প দেখতে পেয়ে তাড়াহুড়ো করে সেটার দিকে এগিয়ে গেল স্যাম। প্রায় নিভে আসা কাঠিটার সাহায্যে জ্বালল ল্যাম্পটাকে। আগের চেয়ে উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল ঘরটা।

ল্যাম্পটাকে মাটি থেকে তুলে ডাইনিং টেবিলের উপর রাখল স্যাম। ঘরটাকে ভালমত দেখল আরেকবার।

পনেরো বাই পনেরো হবে বসবার ঘরটা। মেঝেতে ব্যবহার করা হয়েছে পাইন কাঠ। ঘরটার দু’প্রান্তে দুটো রকিং চেয়ার দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল। আর কোন আসবাবপত্র দেখা যাচ্ছে না।

‘এই কেবিনটা যদি কোন বুড়োর হয়েও থাকে, তা হলে একজন বুড়িও ছিল তার সাথে। কতটা ছিমছাম ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে পুরো কেবিনটা, খেয়াল করেছে? একজন নিঃসঙ্গ পুরুষের কাজ নয় এটা।’

উপরে-নীচে মাথা দুলিয়ে স্যামের কথায় সায় জানিয়ে বলল জেক, ‘পর্দা ঝুলছে জানালায়, সোফার সামনের টেবিলটাতে রাখা আছে ফুলদানি, তাতে এক কি বেশি হলে দুই দিনের বাসি ফুল। ভদ্রমহিলার রুচি আছে, স্বীকার করতেই হবে।’

‘কিন্তু, যার এত প্রশংসা করা হচ্ছে, সে গেল কোথায়? এ রকম একজন দায়িত্ববান মহিলা ঘরবাড়ি ছেড়ে, তা-ও আবার সদর দরজা খোলা রেখে চলে যাবে-ঠিক মানায় না ব্যাপারটা।’

‘দেখে তো মনে হচ্ছে মিনিটখানেক আগেও ভদ্রমহিলা ছিল এখানে। ওয়াটার ট্যাঙ্কের মেয়েটা ছাড়া আর কোন মহিলার সাথে পথে দেখা হয়নি আমাদের। তুমি এতবার ডাকলে, সাড়া দিল না কেউ। তারমানে, কাছেপিঠে নেই মহিলা। দূরে গিয়ে থাকলে শহর ছাড়া আর কোথায় যেতে পারে?’

‘ঠিকই বলেছ। তাহলে খুব সম্ভবত মার্কায় গেছে সে। কিন্তু, মহিলা এখানে একা বাস করত, সেটাও মেনে নিতে পারছি না। এ রকম নির্জন জায়গায়...একজন মহিলা...একা...নাহ্, হতে পারে না।’

কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ল্যাম্পটা ডাইনিং টেবিল থেকে তুলে নিল জেক। বলল, ‘চলো, বেডরুমে ঢুকে দেখি।’

বন্ধ দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল জেক। হাতল ধরে জোরে মোচড় দিল। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে ঢুকল ওরা।

এক কোণায় একটা ডাবল বেড। তাতে দুটো বালিশ। বালিশ দুটোতে কভার আছে, কিন্তু, বিছানাতে কোন চাদর নেই। ঘরটার দু’দিকে দুটো জানালা। দুটোই খোলা। একদিকের জানালার কাছে একটা ড্রেসিং টেবিল। সেটার উপর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে কয়েকটা চিরুনি আর ব্রাশ। আরেকদিকের জানালার নীচে একটা বড় ট্রান্স। তার পাশে একটা ক্লয়িট। সেটার সবগুলো ড্রয়ার খোলা। শুধু তা-ই না, কে বা কারা ভিতর থেকে কাপড়-চোপড় আর কাগজপত্র বের করে ইচ্ছেমত ছুড়ে ফেলেছে মেঝেতে। এক নজর দেখেই বুঝল স্যাম আর জেক, একজন পুরুষ আর একজন মহিলার কাপড় ওগুলো।

হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল জেক। ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল খাটের নীচে। কেউ লুকিয়ে নেই। উঠে দাঁড়াল সে। জিজ্ঞেস করল, ‘কী ভাবছ, স্যাম?’

‘ভাবছি,’ উদাস গলায় বলল স্যাম, ‘কী ভাবা উচিত। লোকটা তার বউকে নিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। নাকি হানিমুন করতে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল?’

এপাশ-ওপাশ মাথা দুলিয়ে আবার বলল, ‘ডাকাতি হয়েছে মনে হয় এই কেবিনে। কেমন এলমেলো করে দিয়ে গেছে সব, দেখেছ?’

‘এই এলাকায় ডাকাতি করবে কে? প্রায় সবাই সবাইকে চেনে এসব জায়গায়,’ একমত হতে পারল না জেক। ‘তাছাড়া, কেবিনের মালিককে খুব একটা ধনী বলে মনে হচ্ছে না আমার। আসবাবপত্রগুলো দেখছ না? সব কম দামি। রানশটাও একেবারে ছোট। লোকটার টাকার টানাটানি ছিল মনে হয়।’

‘তাহলে?’ জেকের কাছে একটা ব্যাখ্যা দাবি করল স্যাম।

‘জানি না। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে এখানে। বাইরে চলো।’

জেকের পিছু পিছু ড্রইংরুমে এসে দাঁড়াল স্যাম। তারপর আবার ডাইনিং টেবিলটার সামনে। হাত থেকে ল্যাম্পটাকে টেবিলের উপর রাখল জেক। দেখল, অভুক্ত-অর্ধভুক্ত কিছু খাবার পড়ে আছে সেখানে। বোধহয় তিনজন লোক খেতে বসেছিল; কোন কারণে খুব তাড়াহুড়ো করে খাওয়া ফেলে উঠে যেতে হয়েছে তাদের। প্লেট, কাঁটাচামচ সব এলমেলোভাবে পড়ে আছে।

‘আমাদের কাজে লাগতে পারে, এরকম কিছু খুঁজে পেলাম এতক্ষণে,’ পিছন থেকে মন্তব্য করল স্যাম। খুশিতে দাঁত বের হয়ে গেছে ওর। ‘আমরা খাবারগুলো খেয়ে নিলে আশাকরি ‘খুব বেশি রাগ করবে না ওরা,’ জেককে তাকাতে দেখে ওকে উদ্দেশ্য করে একবার চোখ টিপল স্যাম।

‘ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওগুলো,’ কাজটাতে পুরোপুরি সায় দিতে পারছে না জেক, আবার নিষেধও করতে পারছে না। দুপুর থেকে না খেয়ে আছে ওরা। ভাগ্যক্রমে যখন কিছু খাবার পাওয়া গেছে এবং মালিক অনুপস্থিত, তখন সেগুলোর সদব্যবহার করা উচিত বটে।

‘এক কাজ করো,’ স্যামকে পরামর্শ দিল জেক। ‘খাবারগুলো চুলোয় বসিয়ে দাও তুমি। আমি ঘোড়া দুটোকে কোরালে রেখে আসি। ওদের পেটেও কিছু পড়া উচিত। রান্নাঘরে খুঁজে দেখো তো আরেকটা হারিকেন পাও কি না। পেলো ওটা নিয়ে বাইরে যাব আমি। সিঁড়ির উপরে ঝোলানো হারিকেনটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি না।’

পাওয়া গেল আরেকটা হারিকেন। সেটা জ্বালিয়ে দিল স্যাম। জিনিসটা হাতে নিয়ে বাইরে বের হয়ে গেল জেক।

প্রথমেই ঘোড়া দুটোর কাছে গেল না জেক। কেবিনটার আশপাশে ধীর গতিতে চক্কর দিল একবার। তারপর পরিধি বাড়াল। হাঁটবার সময় হারিকেনটাকে ইচ্ছে করে দোল খাওয়াল। ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে আরও দূরে ছড়িয়ে গেল আলো। কিছু একটা চোখে পড়বার আশা করছে জেক। কিন্তু, সেরকম কিছু দেখতে পেল না। রানশটা বেশি বড় নয় বলে চক্কর দেওয়া শেষ

করতে সময় লাগল না তার।

হাঁটতে হাঁটতে ট্রেইলটার কাছে এসে পৌঁছুল জেক। ত্রিকোণাকৃতির মেসার পুরোটাও ঘুরল একবার। মাঝেমধ্যে স্যামের অনুকরণে “হ্যালো” বলে চৈচাল। ডাক শুনে কেউ সাড়া দেয় কি না, সেটা শুনবার জন্য কান পেতে অপেক্ষা করল। সাড়া দিল না কেউ।

ঘোড়া দুটোর কাছে ফিরে গেল জেক। ওগুলোকে নিয়ে রওয়ানা হলো কোরালের দিকে। চোখ রাখল মাটিতে। কিন্তু, আবারও হতাশ হতে হল তাকে। ঘেসো জমিতে কোন চিহ্নই নেই। বুটের ছাপ, ছেঁড়া কাগজ, সিগারেটের পোড়া টুকরো—কিছুই দেখতে পেল না জেক।

কোরালের কাছে পৌঁছে গেটটাতে হালকা একটা ধাক্কা দিল সে। মৃদু শব্দ করে খুলে গেল গেট। শব্দ শুনে উৎসুক হয়ে উঠল ভিতরের জানোয়ারগুলো। কিন্তু, গেটে দাঁড়ানো মাঝারি উচ্চতার লোকটা অপরিচিত বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে, আওয়াজ করে অস্বস্তি প্রকাশ করতে আরম্ভ করল জন্তুগুলো। তাদেরকে অভয় দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করল জেক।

হারিকেনটা উঁচু করে ধরল সে। কোরালের ছাদ থেকে নেমে আসা একটা আংটা দেখতে পেয়ে সেটার মধ্যে ঝুলিয়ে দিল হারিকেনটাকে। তারপর চোখ বুলাল চারদিকে।

তিনটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে ভিতরে। সবগুলোর ভাবভঙ্গিতে অসহিষ্ণুতা প্রকট। একটার পিঠে জিন পরানো। প্রতিটা ঘোড়ার সামনে খড় আর আলাদা আলাদা বালতিতে পানি রাখা। এক কোণায় ছোট পাহাড়ের মত খড়ের স্তূপ। ওই তিনটা ঘোড়া মিলে এক সপ্তাহ ধরে খেয়েও শেষ করতে পারবে না স্তূপটা।

নিজেদের ঘোড়া দুটো থেকে জিন খুলবে কি খুলবে না, সে ব্যাপারে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল জেক। শেষ পর্যন্ত খুলবার সিদ্ধান্ত নিল। উল্টোদিকের একটা খুঁটির সাথে বাঁধল ওগুলোকে। তারপর জিন খুলে নামিয়ে রাখল মাটিতে। অল্প একটু দূরে একটা হে-ফর্ক পড়ে থাকতে দেখে এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা তুলে নিল। ফর্কটার সাহায্যে খড় এনে ফেলল ঘোড়া দুটোর সামনে। তারপর এক কোণায় একটা বালতিকে উল্টে পড়ে থাকতে দেখে সেটার দিকে এগিয়ে গেল। বালতিটা তুলে কোরাল ছেড়ে বের হয়ে এল বাইরে। চারদিকে তাকাল আবার।

দূরে ছোট্ট একটা বার্ন। হাঁ হয়ে খুলে আছে সেটার দরজা। ছাদের একাংশ বোধহয় ধসে পড়েছে, সেখান দিয়ে অনায়াসে ঢুকছে চাঁদের আলো। অনিশ্চিত পায়ে বার্নটার খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল জেক। তাকাল ভিতরে।

সত্যিই ধসে পড়েছে ছাদটার একদিক। টিকে থাকা অংশটুকুর নীচে রাখা

আছে একটা ছোট ওয়াগন। রোদ-বৃষ্টির কবল থেকে বাঁচানোর জন্য তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সেটাকে। হারিকেনের আলোয় চকচক করা কাঠের চাকা আর সদ্য করা রঙ দেখে বুঝল জেক, খুব বেশিদিন আগে কেনা হয়নি ওয়াগনটা। আবছা আলো-আঁধারে আর কিছু চোখে পড়ল না তার।

এরপর ঝরনার কাছে গিয়ে বালতিটাতে পানিভর্তি করল সে। তারপর আবার ফিরে এল কোরালে। আজলা ভরে পানি নিয়ে ধুইয়ে দিতে লাগল ঘোড়া দুটোর শরীর। তারপর কিছু খড় হাতে নিয়ে ডলতে আরম্ভ করল জানোয়ার দুটোকে। ঘোড়া দুটোর যত্ন নেওয়া শেষ হলে বালতির পানিতে হাত ধুয়ে কেবিনের পথ ধরল জেক।

হঠাৎ খেয়াল হলো তার, জরুরি মুহূর্তে দরকার হতে পারে ঘোড়া। তখন হয়তো কোরালে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে না। কেবিনের দিকে অল্প কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিল সে, থেমে গেল আচমকা। আবার ফিরে গেল কোরালে। নিজের স্যাডলটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বাঁধন ছুটাল বাকস্কিনটার। ঘোড়াটাকে জিন পরাল আবার। তারপর লাগাম ধরে বের করে নিয়ে এল কোরালের বাইরে। একবার চোখ তুলে তাকাল কেবিনের দিকে। দেখল, ভিতরে হাঁটাইটি করছে স্যাম। অল্প আলোতে একটা ভৌতিক মূর্তির মত দেখাচ্ছে তাকে। কেন যেন বন্ধুর উপর মায়া হলো তার। দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট হচ্ছে বুঝতে পেরে আবার হাঁটা ধরল সে। রানশ্টার সীমানা পেরিয়ে গিয়ে ঢুকল কাছের এক জুনিপারের জঙ্গলে। ঝোপঝাড় আর ঘাসে ভরা একটা জায়গা পছন্দ করে ঘোড়াটাকে বাঁধল সেখানে নিয়ে। জন্তুটার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ‘আর খড় খেতে হবে না তোকে। এবার ঘাস খা।’ তারপর ক্লান্ত পায়ে রওয়ানা হলো কেবিনটার উদ্দেশে।

রানশ্টার গেটে দাঁড়িয়ে একবার ফিরে তাকাল জেক। ঘোড়াটাকে দেখা যাচ্ছে কি না যাচাই করল। যাচ্ছে না। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল সে।

একটু আগেই থালার মত ছিল চাঁদটা, এখন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে অর্ধেক। বাঁকা শিং-এর মত চাঁদটার হলদে-সাদা আলোয় ফ্যাকাসে হয়ে আছে আকাশটা। হয়তো রাতের প্রথম প্রহর বলে এখনও হালকা গোলাপি রয়ে গেছে দিগন্তের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। মুখ নামাল জেক। অদ্ভুত এই আলো-আঁধারির পটভূমিতে আলকাতরার মত কালো দেখাচ্ছে জঙ্গলটাকে। মনে হচ্ছে, মেসার্সের এক প্রান্তে হঠাৎ তৈরি হয়েছে একটা অতল গহবর, সবকিছুকে গিলে খাওয়ার জন্য যেন মুখ হাঁ করে আছে সেটা। অকারণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবিনের পথ ধরল জেক।

‘স্বামী-স্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, জেক,’ কেবিনের দরজা দিয়ে জেককে ঢুকতে দেখে হাতে ধরা অর্ধেক বোনা একটা সোয়েটার দেখাল স্যাম। আকৃতি

দেখে বোঝা গেল, কোন এক নবজাতকের জন্য তৈরি করা হচ্ছিল সোয়েটারটা।
'মহিলা মনে হয় পোয়াতি। সামনের শীতে হয়তো জন্ম দেবে বাচ্চাটাকে।'

'কোথায় পেয়েছ জিনিসটা?'

'সোফার সামনের রকিং চেয়ারটার উপর। দুটো কাঁটাও আছে সেখানে।
তুলতে গিয়ে কাঁটা দুটো খুলে গেছে আমার হাত থেকে।'

'খুব ভাল করেছ। তোমাকে পেলে চিবিয়ে খাবে মহিলা।'

'ইচ্ছে করে তো আর করিনি। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। কোরালে কী
দেখলে?'

'তিনটা ঘোড়া। একটার আবার জিন পরানো। আমার মনে হয় কোন এক
জরুরি কারণে ঘোড়া না নিয়ে পায়ে হেঁটে দূরে কোথাও গেছে লোকটা আর তার
বউ।'

'এই পশ্চিমের দেশে জরুরি কারণে ঘোড়া না নিয়ে বাইরে বের হয় কেউ,
কখনও শুনেছ সেরকম কিছু?'

'না, শুনিনি,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল জেক। 'পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন
এলমেলো মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'বাদ দাও। ওরা ফিরে এলে ভাল, না এলেও আমাদের কোন ক্ষতি নেই।'
প্রসঙ্গ পাল্টাল স্যাম, 'খাবারগুলো চাপিয়ে দিয়েছি চুলোয়। গরম হলে কফি
বানিয়ে খেতে বসে যাব।' জেককে অন্যমনস্ক দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ?'

'ভাবছি, খারাপ কিছু আবার ঘটল না তো? চিন্তা করে দেখো, রুচিশীল
একজন ভদ্রমহিলা, তা-ও আবার পোয়াতি, খাবার ফেলে, অর্ধেক বোনা
সোয়েটার ফেলে, কেবিনের সদর দরজা খুলে উধাও হয়ে গেল। মহিলার সাথে
একটা লোক থাকত, ধরলাম তার স্বামী, সে-ও নিখোঁজ। আশপাশের রানশে
ব্যাপারটা জানানো উচিত আমাদের।'

'মাথা কি খারাপ হয়েছে তোমার? ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘটনাটা সবাইকে
জানাই আর লোকে আমাদেরকেই সন্দেহ করুক, তাই না? তুমি কি সেটাই
চাও? মনে রেখো, আমরা এখানে স্ট্রঞ্জার। কাজ খুঁজতে এসেছি। যেচে পড়ে
কারণ উপকার করতে আসিনি। এর আগে লোকের উপকার করতে গিয়ে
কতবার মরতে বসেছিলাম, ভুলে গেছ সব?'

নিকট অতীতের কথা মনে পড়ে গেল জেকের।

অ্যামবুশ করা হয়েছিল এক লোককে। পাহাড়ের চূড়ায় বসে কুকর্মটা
করেছিল দুই গানম্যান। মাইলতিনেক দূরে ওই পাহাড়ের চূড়াতেই অস্থায়ী
ক্যাম্প গেড়েছিল স্যাম আর জেক। গুলির শব্দ শুনে ছুটে গিয়েছিল তারা।
ধরবার চেষ্টা করেছিল দুই গানম্যানকে। কিন্তু, ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর ঘোড়া
দাবড়ে হাজির হয়েছিল গুলি খেয়ে কাতরাতে থাকা লোকটার কাছে। দু'জন

গানম্যানই ছিল আনাড়ি, ঠিকমত নিশানা করতে পারেনি বলে মারাত্মকভাবে আহত হয়নি তাদের শিকার। লোকটাকে শহরের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল স্যাম আর জেক। সুস্থ হয়ে লোকটা অভিযোগ করেছিল, স্যাম আর জেকই গুলি করেছিল তাকে। সেবা-শুশ্রূষা করাটা আসলে তাদের একটা অভিনয়, সূক্ষ্ম কোন চাল। স্ট্রেঞ্জার বলে শহরবাসীর সকলেই সন্দেহ করেছিল ওদের, প্রাণ নিয়ে পালাতে খুব কষ্ট হয়েছিল স্যাম আর জেকের।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেক। কিছু একটা বলবার জন্য মুখ খুলল সে, দূর থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ ভেসে আসাতে কথাটা পাল্টে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘শুনতে পাচ্ছ?’

নিচু কণ্ঠে বললেও জেকের স্বরে স্পষ্ট উত্তেজনা টের পেল স্যাম। বলল, ‘দুটো ঘোড়া এগিয়ে আসছে ট্রেইল ধরে।’ জেকের চেহারার দিকে তাকিয়ে একবার হাসল সে। ‘এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হয়তো লোকটা তার বউকে নিয়ে ফিরে আসছে। আগেই তো বলেছিলাম মহিলা পোয়াতি। হয়তো ডাক্তার দেখানোর জন্য তাকে শহরে নিয়ে গিয়েছিল লোকটা। কাজ শেষে ঘরে ফিরে আসছে মিয়া-বিবি।’

‘কিন্তু, আমি কোরালে তিনটা ঘোড়া দেখেছি,’ দাবি করল জেক।

‘তোমার মাথা কি পুরোপুরি গেছে, জেক? পোয়াতি বউকে কি কেউ ঘোড়ায় চড়িয়ে ঝাঁকি খাওয়াতে খাওয়াতে নিয়ে যায় শহরে? তা-ও আবার এরকম পাথুরে ট্রেইলে? হতেই পারে না। হয় ক্যারিজ আর নইলে ওয়াগনে চেপে গিয়েছিল ওরা। এখন ফিরে আসছে ঘোড়ায় টানা গাড়িটা।’

‘ঘোড়াদুটো কত দ্রুত ছুটে আসছে খেয়াল করেছ? পোয়াতি বউকে নিয়ে এত জোরে ওয়াগন চালায় কেউ? তাছাড়া চাকার আওয়াজ কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মন বলছে, বিপদে পড়তে যাচ্ছি আমরা, স্যাম।’

‘তোমার মন আবার এত সতর্ক হলো কবে থেকে?’ স্যামের গলায় স্পষ্ট পরিহাস। ‘সারাজীবন তো হারমোনিকা বাজিয়েই কাটালে তুমি। যা-ই হোক,’ হোলস্টারের ফিতে ঢিলে করতে করতে বলল সে, ‘এত করে যখন বলছ, তখন বরং কিছুটা প্রস্তুতই থাকা যাক। আমার মন কী বলছে জানো? ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাটা আমাদেরকে দেখে যারপর নাই আশ্চর্য হবে প্রথমে। তারপর এতক্ষণ ওদের বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানাবে। ডিনারের বিনিময়ে এঁটো থালাবাসনগুলো ধুয়ে দিতে হবে আমাদের। সহজ হিসাব।’

‘এক কাজ করি,’ পরামর্শ দিল জেক, ‘কেবিনের বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকি আমি। আর তুমি কথা বলো ওদের সাথে। অবস্থা পুরোপুরি নিরাপদ বুঝবার আগে ভুলেও এমন কোন কথা বোলো না, যাতে আমার উপস্থিতি ফাঁস

হয়ে যায়। তোমাদের সব কথা শুনতে পাব আমি। বিপদ টের পেলে সাহায্য করতে পারব তোমাকে।’

‘বুদ্ধিটা খারাপ না। তাহলে কেটে পড়ো এখন তাড়াতাড়ি।’

কেবিনের সদর দরজাটা দিয়ে বের হতে যাচ্ছে দেখে জেককে পিছু ডাকল স্যাম, ‘উঁহু, ওদিক দিয়ে না, বোকা। ওরা এতক্ষণে পৌঁছে গেছে রানশের বেড়ার কাছে। বের হওয়ামাত্রই দেখে ফেলবে তোমাকে। রান্নাঘরে একটা দরজা আছে, দেখেছি আমি। ওটা খুলে বের হয়ে যাও বাইরে।’

ক্ষিপ্ৰ গতিতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল জেক। তারপর আরও দ্রুত পৌঁছল দরজাটার কাছে। ততক্ষণে রানশটার ভিতরে ঢুকে পড়েছে দুটো ঘোড়া।

দরজাটার হাতল ঘুরাল জেক। খুলল না দরজাটা। হাতল ধরে সর্বশক্তিে টান দিল সে। খুলে চলে এল হাতলটা, ভারসাম্য ঠিক রাখতে কয়েক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো জেক। দরজাটার দিকে তাকাল সে। আগের মতই বন্ধ আছে সেটা।

স্যাম শুধু দরজাটা দেখেছিল, সেটা খোলে কি না, পরীক্ষা করেনি। একটা ঢোক গিলল জেক। বাইরে থেকে ভেসে এল একটা উত্তেজিত পুরুষ কণ্ঠ, ‘ঘোড়া দুটো এখানেই থাক, শেরিফ। তুমি তাড়াতাড়ি চলো ভেতরে।’

তারমানে স্থানীয় শেরিফকে নিয়ে হাজির হয়েছে কেউ। এবং, ওয়াগনে চড়ে আসেনি তারা।

বিদ্যুৎ চমকের মত বার্নে দেখা ওয়াগনটার কথা মনে পড়ে গেল জেকের। কথাটা স্যামকে বলতে ভুলে গিয়েছিল সে।

স্বামী-স্ত্রী যদি বাইরে গিয়েও থাকে, ঘোড়া বা ওয়াগন কোনটাই নিয়ে যায়নি। অথচ, সম্পূর্ণ উল্টো ধারণা করে কেবিনের ভিতর তাদেরকে স্বাগত জানাতে রয়ে গেছে স্যাম।

হাতলটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরের একমাত্র জানালাটার কাছে এগিয়ে গেল জেক। দেখল, উপরের দিকে তুলে দেওয়া আছে পাল্লাটা। হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে বাইরে ফেলে দিল সে। তারপর প্রথমে হাত, পরে মাথা এবং সবশেষে বুক গলিয়ে দিল খোলা জানালাটা দিয়ে। পেটের উপর ভর করে মাথা নীচের দিকে দিয়ে পড়ল কেবিনের বাইরের মাটিতে। খুলি আর ঘাড়কে আঘাত থেকে বাঁচাতে ব্যবহার করল দু’হাত।

একদিকে মাটিতে পড়ল জেক, আর অন্যদিকে একজন লোক আর পিস্তল হাতে শেরিফ ঢুকল কেবিনে।

তিন

স্যামকে কেবিনের ভিতরে দেখে হাঁ হয়ে গেল লোকটা। শেরিফও একটা ধাক্কা খেয়েছে বুঝতে পারল স্যাম। ওরা দু'জন বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সেই সুযোগে শেরিফের সঙ্গে লোকটাকে যাচাই করল স্যাম।

রোদে পোড়া বাদামি চামড়ার অল্প বয়সী এক যুবক। পরনে কালো রঙের স্যাটিন শার্ট আর জিন্স। কালো স্টেটসন হ্যাটের নীচে বেমানান ধূসর ভুরু। ওদুটোর নীচে আরও বেমানান একজোড়া কালো চোখের তারা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই চোখ থেকে আশ্চর্যের চিহ্ন মুছে গিয়ে দেখা দিল সাপের শীতলতা। স্যাম খেয়াল করল, কোমরে গানবেল্ট বুলায়নি লোকটা।

হাতের হারিকেনটা উঁচু করে ধরে প্রায় চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'কে তুমি? কী করছ আমার কেবিনের ভেতর? আমার ভাই কোথায়? আর লুসি?'

'জানি না। মানে, তোমার শেষ প্রশ্ন দুটোর উত্তর আমি জানি না। কী করছি জানতে চাইছিলে না? অপেক্ষা করছি এই কেবিনটার মালিকের জন্য। আজ রাতের ডিনারটা তার সাথে সারার ইচ্ছে আছে আমার।'

'কী বলছ পাগলের মত?' এক ধাক্কা স্যামকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল লোকটা। দু'পদা পদা ফেলে গিয়ে ঢুকল বেডরুমে। চিৎকার করতে আরম্ভ করল, 'টম? লুসি? কোথায় তোমরা?'

ওর ডাকে সাড়া দিল না কেউ। আগের মতই নীরব থাকল কেবিনটা। উৎসাহ হারাল না লোকটা। বেডরুমের জানালার সামনে গিয়ে ডাকতে লাগল গলা চড়িয়ে।

এবার শেরিফের দিকে তাকাল স্যাম। বয়স হয়েছে লোকটার। লম্বা, বিশাল দেহটা কিছুটা বাঁকে পড়েছে সামনের দিকে। ক্লিন শেভড মুখটাতে বলিরেখার প্রাবল্য। কিন্তু, বয়সের ভার সেই চেহারা থেকে খুশির আভাস কেড়ে নিতে পারেনি। ধূর্ততায় ভরপুর, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শেরিফের চোখ দুটো বিশেষভাবে খেয়াল করল স্যাম। কিছু একটা পাওয়ার আশায় জ্বলজ্বল করছে চোখজোড়া। লোকটার পরনের রঙ জ্বলা শার্টটা ময়লা। সেটার উপরের তিনটা বোতাম খোলা। উদ্ধতভাবে সেখান থেকে বের হয়ে আছে বাদামি লোমের জঙ্গল শার্টটার বামদিকে চূড়ান্ত অবহেলায় ঝুলছে একটা রূপালী তারা। ঘাড়ে

একটা লাল রঙের রুমাল গিট দিয়ে বেঁধে রেখেছে শেরিফ। দুই কোমরে দুটো হোলস্টার বাঁধা; ডানদিকেরটা খালি, বামদিকেরটায় থাবা খাওয়ার অপেক্ষায় আছে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ। ডানহাতে অনায়াসে আরেকটা ফোর ফাইভ ধরে আছে শেরিফ। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, অস্ত্রটা নেই ওর হাতে।

এ জাতীয় শেরিফ আগেও দেখেছে স্যাম। এরা ন্যায়-নীতির প্রতীক। সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল সে।

সময় নিয়ে নিজেকে যাচাই করবার সুযোগ দিল শেরিফ স্যামকে। তারপর বলল, ‘হাউডি, স্ট্রেঞ্জার।’

স্যাম বুঝতে পারল, শেরিফ বলতে চাচ্ছে—আমি তোমাকে চিনি না।

‘হাউডি, শেরিফ। আমার নাম স্যাম ওয়েড। ভবঘুরে। কাজ খুঁজতে মার্কায় যাচ্ছিলাম। পথ ঠিকমত চিনতে না পারায় এই কেবিনে ঢুকতে বাধ্য হয়েছি। আমি আসলে এমন কাউকে খুঁজছিলাম, যে আমাকে সঠিক পথটা বলতে পারত।’

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল শেরিফ, অল্প বয়সী লোকটা দৌড়ে বেডরুম থেকে বের হয়ে এল এমন সময়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘বলেছিলাম না কেউ নেই এখানে? কোন পাত্তা নেই টমের। লুসিও উধাও। কিন্তু, এই শালাটা এখানে কী করছে? এই, কে তুমি?’ কর্কশভাবে স্যামকে জিজ্ঞেস করল সে।

মাথার ভিতর একটা রাগ জেগে উঠছিল স্যামের। নিজেকে সামলে রেখে শান্ত গলায় বলল সে, ‘আমি কে, সেটা বলেছি একবার শেরিফকে।’

‘আমি শুনি নি। আরেকবার বলো।’

দাঁতে দাঁত পিষে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখল স্যাম। আরেকবার বলল ওর পরিচয়টা।

‘তো মিস্টার স্যাম, আমার ভাই আর তার বউ কোথায়?’

‘জানি না। আমি চিনি না তাদের।’

‘চেনো না যখন, তখন এখানে কী করছ? কানা নাকি তুমি? এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, হোটেল-মোটেল না।’

‘মার্কায় যাচ্ছিলাম পথ হারিয়ে চলে গিয়েছিলাম আরেকদিকে। ফেরার সময় এই কেবিনটা দেখতে পেলাম। ভাবলাম, রাস্তাটা জেনে নেই। ভেতরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলাম না। দুপুর থেকে খাইনি কিছু, তাই ডাইনিং টেবিলে খাবার দেখতে পেয়ে সেগুলো গরম করার জন্য চাপিয়ে দিলাম চুলোয়। আমার একমাত্র অপরাধ সেটাই, এছাড়া বিনা অনুমতিতে আর কিছু করিনি আমি।’

‘তাই নাকি? শালা মিথ্যুক কোথাকার!’ বলেই স্যামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। কিন্তু, তার তুলনায় স্যাম ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা আর দ্বিগুণেরও বেশি

চওড়া। নিজের দিকে উড়ে আসা লোকটাকে কলার ধরে থামাল সে, তারপর হাঁটু ভাঁজ করে প্রচণ্ড এক ঝঁতো দিল তলপেটে। “হুক” জাতীয় একটা শব্দ করে মুখ দিয়ে সব বাতাস বের করে দিল লোকটা। কোমর থেকে নীচের দিকে আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে গেল তার শরীর। এক পা পিছিয়ে গেল স্যাম। তারপর প্রচণ্ড জোরে একটা পাঞ্চ হাঁকাল লোকটার চোয়ালে। মাটি থেকে ফুটখানেক উপরে উঠে গেল লোকটার দুই পা, বিকট একটা আওয়াজ করে কাঠের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সে। একতরফা লড়াইটা শেষ হতে চার সেকেন্ডের বেশি লাগল না।

হোলস্টারের দিকে হাত বাড়ানিছিল স্যাম, বাঘের মত গর্জন করে তাকে সাবধান করল শেরিফ, ‘খবরদার! মরতে না চাইলে কোমর থেকে দূরে রাখো হাতটাকে। তুমি কোন জাতের মানুষ, জানা হয়ে গেছে আমার।’

শেরিফের ডান হাতের পিস্তলটার রক্তলোলুপ দৃষ্টি বুঝতে পেরে নিবৃত্ত হলো স্যাম।

‘তুমি ঠিক আছ, কার্ক?’ স্যামের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে জানতে চাইল শেরিফ।

মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছিল যুবক। শেরিফের ডাক শুনে উঠে বসল সে। ঠোঁটের বামপাশটা খেঁতলে গেছে তার, চামড়া ফেটে বের হয়ে এসেছে রক্তের ধারা। উহ্-আহ্ শব্দ করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, ‘ডাকাতিটা কী করল, দেখলে, লুথার?’

তাহলে, মনে মনে বলল স্যাম, এই চামচিকা যুবকটার নাম কার্ক আর শেরিফের লুথার।

‘দেখলাম বটে,’ কার্কের প্রশ্নের জবাবে বলল শেরিফ, ‘শুধু তাই না, আরও এমন কিছু দেখেছি, যা হয়তো তুমি দেখোনি।’

উঠে দাঁড়িয়ে বলল কার্ক, ‘এই লোকটা একটা ডাকাতি। টম আর লুসির নিখোঁজ হওয়ার পেছনে হাত আছে এর। তুমি দেখে নিয়ো, লুথার।’

একদৃষ্টিতে স্যামকে যাচাই করছিল শেরিফ। হঠাৎ আদেশ করল সে, ‘গানবেস্ট খোলো।’

‘আমাকে বলছ?’ আদেশটার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল স্যাম।

‘তুমি কানা নাকি বোকা? কার্কের কোমরে যে কোন গানবেস্ট ঝুলছে না, সেটা দেখতে পাচ্ছ না?’

‘শোনো, শেরিফ, ভুল হচ্ছে তোমার। আমি...’ গুলির প্রচণ্ড আওয়াজে থেমে গেল স্যাম। তার পায়ের কাছে গুলি করেছে শেরিফ।

‘পরের গুলিটা তোমার পেটে ঢুকবে। আগে গুলি করে পরে কথা বলতে পছন্দ করি আমি।’

বিনা বাক্য ব্যয়ে গানবেস্টটা খুলে হাত থেকে ছেড়ে দিল স্যাম। তার পায়ের কাছে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সেটা।

‘পা দিয়ে ঠেলে বেস্টটাকে আমার কাছে পাঠাও। সাবধান, কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলেই ফুটো করে দেব।’

চালাকির চেষ্টা করল না স্যাম।

‘ভাল,’ ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে স্যামের প্রশংসা করল শেরিফ। ‘তোমার মাথাটা তাহলে একেবারে খালি না। আর কী কী আছে তোমার কাছে? শার্টের হাতায় লুকানো ডেরিজার? ঘাড়ের পেছনে থ্রোয়িং নাইফ?’

ঘাড়ের পিছনে থ্রোয়িং নাইফ রাখে জেক। অভ্যাসটা নিয়ে অনেকবার বন্ধুকে উপহাসও করেছে স্যাম, কান দেয়নি জেক। ওর বক্তব্য, ভবঘুরেদেরই বিপদ বেশি। পিস্তলের ছয়টা গুলি শেষ হলেই যেন খেল খতম না হয়ে যায়, বা হাতে পিস্তল না থাকলে যেন শত্রুর মোকাবেলা করা যায়, তার জন্য বাড়তি ব্যবস্থা থাকা উচিত। নাইফ থ্রোয়িং-এ জেকের পারদর্শিতা সত্যিই দেখবার মত।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল স্যাম। বলল, ‘না, আর কিছু নেই।’

‘না থাকলেই ভাল। আমার বুড়ো হাতে কিন্তু এখনও তেজ আছে, বলে রাখলাম। যাই হোক, তোমার কাহিনিটা শোনাও দেখি এখন।’

‘বলেছি একবার, শেরিফ,’ ক্লান্ত গলায় বলল স্যাম।

‘কতক্ষণ আগে এখানে এসেছ তুমি?’

‘আধ ঘণ্টা হবে। শোনো শেরিফ, এখানে থামতাম না আমি। মাইল দেড়েক পেছনে, ট্রেইলটা যেখানে তিন ভাগ হয়ে গেছে, একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেয়ে হাতের ডানে মোড় নিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম জঙ্গল। ফিরতে বাধ্য হলাম তখন। কেবিনটা...’

‘কোথায় সাইনবোর্ড দেখেছ তুমি?’ চোখমুখ গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করল কার্ক।

‘বললাম তো মাইল দেড়েক পেছনে। ট্রেইলটা তিন ভাগ হয়ে একটা এসেছে এদিকে, একটা ডানদিকে আর অন্যটা সোজা। ঠিক সেই জায়গাটাতে।’

কথাটা শুনে ভুরু জোড়া কুঁচকাল কার্ক। শেরিফকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘তুনলে, লুথার?’

অনাবিল হাসিতে ভরে গেছে শেরিফের সারা মুখ। ঠাট্টা করে বলল সে, ‘কী লেখা ছিল সেই সাইনবোর্ডে?’

‘মার্ক্স চার মাইল।’

এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল শেরিফ। কিছুক্ষণ পর হাসি ধামিয়ে বলল, ‘এখান থেকে মার্ক্স মাত্র এক মাইল দূরে। এক মাইলের সাথে দেড় মাইল যোগ

করলে হয় আড়াই মাইল। তারমানে দাঁড়াচ্ছে, আড়াই মাইল পেছনে এক জায়গায় একটা সাইনবোর্ড দেখেছ তুমি যাতে লেখা ছিল, মার্ফা চার মাইল। গাঁজা খেয়েছিলে নাকি তখন? নাকি মায়ের দুধ ছাড়ার পর থেকেই তুমি ভবঘুরে? স্কুলে যাওনি কখনও?’

কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল স্যাম।

‘আমি আগেই বলেছিলাম লুথার, মিথ্যে বলছে লোকটা। ওকে...’

হাত তুলে কার্ককে থামিয়ে দিল শেরিফ। আবার জিজ্ঞেস করল স্যামকে, ‘কোথা থেকে আসা হচ্ছে?’

‘ফোর্ট ডেভিস।’

‘রওয়ানা হয়েছিলে কখন?’

‘গতরাতে। ডিনারের পর। রাত সাড়ে দশটা-এগারোটার দিকে।’

আবার হাসল শেরিফ লুথার। ‘কীসে চেপে রওয়ানা হয়েছিলে তুমি? ঘোড়া না উট? গত দশ বছর ধরে মার্ফার শেরিফ আমি। এই এলাকার প্রতিটা জঙ্গল, প্রতিটা রানশ্, প্রতিটা ট্রেইল হাতের উষ্টো পিঠের মত চিনি। জেমিসনদের ওয়াটার ট্যাঙ্ক আর জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা ছোট ছোট নালা বাদে এই গরমের সময় আর কোথাও পানি পাওয়া যায় না। ফোর্ট ডেভিস থেকে এই বার স্টিরাপ-এত লম্বা পথ তাহলে পানি ছাড়াই পার হয়েছে? তোমার ঘোড়াটা নিশ্চয়ই উটের বাচ্চা?’ নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল শেরিফ।

‘আমার ঘোড়াটা পানি খেয়েছে একবার। সাইনবোর্ডে পৌঁছানোর আরও আগে একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক পেয়েছিলাম। সেখানে পানি খেয়েছে ঘোড়াটা।’

‘আচ্ছা, আচ্ছা,’ উপরে-নীচে মাথা দোলাল শেরিফ। ‘রানশে ঢোকান সময় ট্রেইলে দুটো ঘোড়ার ট্র্যাক দেখলাম। কারণটা কী?’

মনে মনে প্রমাদ গুলল স্যাম। এবার মিথ্যে বলতেই হবে তাকে। কথাগুলো সাজিয়ে নিয়ে বলল, ‘ঠিকই দেখেছ। আমি ভবঘুরে। দুটো ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াই। একটা প্যাক হর্স, আমার সব মালপত্র থাকে ওটাতে। অন্যটাতে চড়ি আমি। আর এবার তো পাড়ি দিচ্ছিলাম লম্বা পথ...’

‘লম্বা পথ?’ বুঝতে পারল না কার্ক।

‘হ্যাঁ। কাজ খুঁজতে মার্ফায় যাচ্ছিলাম। মার্ফায় কাজ না পেলে চলে যেতাম বিগ বেডে।’

‘আমাদের কার্কও কাজ করে সেখানে। ওকে ঘুসিটা না মারলে হয়তো...’ হয়তো কী, আর বলল না শেরিফ। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, ‘যাই হোক, মিস্টার স্যাম ওয়েড, তোমার সাইনবোর্ডের গল্পটা বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি। কারণ, ফোর্ট ডেভিস থেকে মার্ফা পর্যন্ত সারা রাস্তায় কোন সাইনবোর্ড নেই। এই দশ বছরে হাজারবার যাতায়াত করেছি আমি রাস্তাটা দিয়ে, কোনদিনও

সাইনবোর্ড জাতীয় কিছু দেখিনি। কাজেই...’

‘আমি তো আগেই বলেছিলাম, লোকটা এক নম্বরের মিথ্যুক,’ শেরিফের মুখের কথা কেড়ে নিল কার্ক।

‘সাইনবোর্ডটা দেখেছি আমি,’ ঠাণ্ডা গলায় ঘোষণা করল স্যাম। ‘এখন তোমাদেরকে চোখের সামনে যেভাবে দেখতে পাচ্ছি, ঠিক সেভাবে। তাছাড়া, মিথ্যে বলার কোন দরকার নেই আমার।’

‘দরকার আছে কি নেই, সেটা পরে বোঝা যাবে। শোনো মিস্টার স্যাম ওয়েড, তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ঘুসি মেরে যার নাকমুখ খেঁতলে দিয়েছ, তার নাম কার্ক পোলার্ড। কাজ করে বিগ বেন্ডে। আর এই রানশ্টা হচ্ছে বার স্টিরাপ। কার্কের বড় ভাই টম পোলার্ড আর টমের বউ লুসি পোলার্ড থাকত এখানে। ছোট রানশ্ বলে কোন কাউন্সিল ছিল না ওদের। সব কাজ নিজেরাই করত। যাই হোক, আজ দুপুরে বিগ বেন্ড থেকে মার্ফায় এল কার্ক। প্রথমেই দেখা করল আমার সাথে। তারপর সারাটা দুপুর সেলুনে কাটানোর পর বিকেলের দিকে মার্ফা থেকে এখানে ফিরল সে। দেখল, কেবিন ফাঁকা, কেউ নেই ভেতরে। এখানে-সেখানে খুঁজল, অনেক ডাকাডাকি করল, কিন্তু, পেল না ভাই-ভাবিকে। তখন ঘটনাটা আমাকে জানাতে মার্ফায় গেল। আমি ছিলাম শহরের বাইরে, একটা ব্যক্তিগত কাজে সিলভার ক্রীকে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার পর ফিরে এসে কার্কের মুখে সব ঘটনা শুনলাম। দেরি না করে চলে এলাম। আর এসেই পেলাম তোমাকে।’

‘ব্যাপারটা কাকতালীয়,’ নিজের সাফাই গাইল স্যাম, ‘আমার কিছু করার ছিল না।’

‘ওর কথা বিশ্বাস করলে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করবে তুমি, শেরিফ।’

‘আমারও সেটাই মনে হয়,’ থমথম করতে আরম্ভ করেছে শেরিফের আগের কৌতুকপূর্ণ চেহারাটা। ‘সে যে মিথ্যে বলছে, সেটা ইতিমধ্যেই বুঝে গেছি আমরা। কিন্তু, অন্যায় করা হবে না তার সাথে। টম আর লুসিকে আমরা খুঁজে বের করতে পারলে ভাল, নইলে...’ কথাটা শেষ না করে কঠোর দৃষ্টিতে স্যামের দিকে তাকাল শেরিফ। কিছুটা ভয় পেয়ে গেল স্যাম।

‘তুমি এক কাজ করো,’ কার্ককে আদেশ দিল শেরিফ, ‘শক্ত দেখে দড়ি যোগাড় করো। একে বেঁধে রেখে টম আর লুসিকে খুঁজতে বের হব আমরা।’

এক দৌড়ে বাইরে চলে গেল কার্ক।

‘দেখো শেরিফ,’ প্রতিবাদ করবার শেষ চেষ্টা করল স্যাম, ‘আমার অপরাধটা কী? কেন বেঁধে রাখতে চাইছ আমাকে? তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নিলাম, মিথ্যে বলেছি আমি। কিন্তু, মিথ্যে বলার জন্য গ্রেপ্তার করার কোন আইন

আছে দেশে? এটা তোমার অন্যায় হচ্ছে।’

‘মিথ্যে বলার জন্য না, টম আর লুসির নিখোঁজ হওয়ার পেছনে হাত থাকতে পারে সন্দেহ করে তোমাকে খেপ্তার করছি আমি। যদি বলি এই কেবিনটা ক্রাইম স্পট, তাহলে তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এখানে ছিলে তুমি। এবং, তোমার উপস্থিতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারোনি।’

‘কার্কও তো ছিল। বিকেলে। তুমিই বলেছ একটু আগে। সে তো আমাকে তখন দেখতে পায়নি?’

‘কীভাবে জানব যে, ওর ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে পাশের জঙ্গলে লুকিয়েছিলে না তুমি তখন?’

কথা খুঁজে না পেয়ে কেবিনের দরজা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল স্যাম। চিন্তার ঝড় চলছে তার মাথার ভিতর। বাইরে করছেটা কী জেক? যাওয়ার আগে বলেছিল, বিপদে পড়লে সাহায্য করতে ভিতরে ঢুকবে সে। কিন্তু, কোন পাত্তাই নেই তার। শেরিফের কথা শুনে কি ভয় পেয়ে গেল জেক? নাকি আক্রমণটা কীভাবে করবে সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না? দরজাটা দিয়ে ঢুকে সোজা শেরিফের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো হয়। শেরিফ লোকটা জেকের তুলনায় অনেক লম্বা-চওড়া বটে, কিন্তু, আর যাই হোক, বয়স হয়েছে তার। আগের মত ক্ষিপ্ত থাকতে পারে না সে। নাকি কার্ককে ভয় পাচ্ছে জেক? কিন্তু, কার্ক তো এখনও বাচ্চা ছেলে-দুই চড় খেলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে মাটিতে। সবচেয়ে বড় কথা, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র বাচ্চাটা।

স্যাম টের পেল, ওর ভিতরে একটা রাগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। হারমোনিকাটা বাজাতে নিষেধ করেছিল সে জেককে। শোনেনি জেক। এখন বিপদে পড়ল কে?

স্যাম আর কিছু ভাববার আগেই কেবিনের ভিতরে ঝড়ের মত ঢুকল কার্ক। ঘোড়া বাঁধবার কাজে ব্যবহৃত হয়, সেরকম দু’টুকরো দড়ি নিয়ে এসেছে সে।

‘আমিই বাঁধি? শেরিফের কাছে অনুমতি চাইল কার্ক। ‘সারাজীবন চেষ্টা করলেও ছুটতে পারবে না।’

ডাইনিং টেবিলের সামনে থেকে একটা চেয়ার এনে স্যামের পাশে রাখল কার্ক। বলল, ‘বসো, মিস্টার। আর কোনরকম চালাকির চেষ্টা কোরো না। শহরে আমাদের শেরিফের দুর্নাম আছে খুব। চালাকি করার অপরাধে অনেক সন্দেহভাজন অপরাধীকে গুলি করে মেরেছে সে।’

বসল স্যাম। চেয়ারটার সাথে কষে তার হাত-পা বাঁধল কার্ক। প্রথমে পিছমোড়া করে হাত দুটো, তারপর বেঁচে যাওয়া দড়িটা ঘাড়, গলা আর পেটের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে চেয়ারটার পিছনের পায়ার সাথে। এরপর সামনের পায়ার সাথে পা জোড়া। টানাটানি করবার জোর চেষ্টা করলে চেয়ার সহ উল্টে

পড়বে স্যাম। বাঁধবার ভঙ্গি টের পেয়ে বুঝল স্যাম, এ কাজে খুব পটু কার্ক।

কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল কার্ক। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল। কিন্তু, মুহূর্তের মধ্যেই বাম পায়ের উপর ভর করে স্যামের কাছে চলে গেল অনেকখানি, ডান হাতে সর্বশক্তিতে একটা পাঞ্চ হাঁকাল স্যামের চোয়ালে।

দুর্বল দেহ কার্কের। তাই, খুব বেশি ক্ষতি করতে পারল না। চোখে কিছুক্ষণ তারা দেখল স্যাম। 'দেখা শেষ হলে অনবরত গাল দিতে আরম্ভ করল কার্ককে।

কার্কের হাত ধরে টেনে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিল শেরিফ। হারিকেনটার আলো বাড়িয়ে নিয়ে দু'জনে গিয়ে ঢুকল টমের বেডরুমে। চারদিকে তাকাল শেরিফ। হ্যাঁ হয়ে খুলে থাকা ট্রাঙ্ক আর ক্লিফটটা দেখল। মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাপড়-চোপড় আর এলমেলো কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করল।

খোলা ট্রাঙ্কটার দিকে এগিয়ে গেল কার্ক। ঘাঁটাঘাঁটি করল কিছুক্ষণ। তারপর আচমকা বলে উঠল, 'হায়, হায়, ফাইলটা কোথায়?'

'কীসের ফাইল?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'এখানে একটা নীল রঙের ফাইল ছিল। সেটার ভেতরে রাখা ছিল চুক্তিনামাটা।'

'চুক্তিনামা? বুঝলাম না।'

'তোমার মনে নেই লুথার? জেড বি-র সাথে পানি নিয়ে বিরোধ ছিল আমাদের। খুনোখুনি হওয়ার মত অবস্থা হলো একবার। তারপর তোমার সামনেই তো ওই চুক্তিনামাটায় সই করল টম আর এড রুফাস। এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে তুমি?'

মনে করতে পারল শেরিফ। বলল, 'না, ভুলিনি। কী হয়েছে চুক্তিনামাটার? হারিয়ে গেছে?'

'সেরকমই তো মনে হচ্ছে। ট্রাঙ্কটার কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না ফাইলটা।'

'আর যা-ই করুক, অন্তত ওই ফাইলটা চুরি করতে যাবে না স্যাম ওয়েড। কথাটা মানো নিশ্চয়ই?' কার্ককে জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'তা বটে,' অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কার্ক। 'আসার সময় মার্ফার সেলুনে দেখেছিলাম এড রুফাসকে।'

জেড বি-র মালিকের সম্বন্ধে কথাটা কেন বলল কার্ক, অনুমান করতে পেরে তাকে হুমকি দিল শেরিফ, 'খবরদার, ভুলেও আমার শহরে মারামারি করার চিন্তা কোরো না। করলে তোমাদের দু'জনকেই হাজতে ভরব আমি।'

কার্কের চেহারা দেখে মনে হলো, হাজতের ব্যাপারে খুব একটা চিন্তিত না সে। ক্রোধে বাঘের মত জুলজুল করছে তার চোখজোড়া। শক্ত হয়ে গেছে দুই

চোয়াল ।

বাইরের অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে দ্রুত মনে মনে একটা হিসাব কমল জেক । জেড-বি ছাড়িয়ে ওয়াটার ট্যাঙ্কটাতে পৌঁছেছিল সে আর স্যাম । কিন্তু, ইচ্ছে করেই ঢোকেনি তখন জেড-বিতে । রানশটার মালিক এখন মারফয়, কথাটা মনে মনে টুকে রাখল সে ।

বেডরুমটাতে দেখবার মত আর কিছু না পেয়ে কার্ক আর শেরিফ ফিরে এল বসবার ঘরে । এদিক-ওদিক তাকিয়ে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে । চুলোয় খাবার চড়ানো আছে দেখে এগিয়ে গেল কার্ক, নিভিয়ে দিল চুলোটা । চারদিকে তাকিয়ে কিছু পেল না সেখানে । তাকাল মেঝের দিকে । একটা হাতল পড়ে থাকতে দেখল । জিনিসটা মেঝে থেকে তুলে নিল সে ।

‘এই কাজটা করল কে? দেখো শেরিফ, হাতলটা ধরে টানতে গিয়ে কে যেন ছুটিয়ে ফেলেছে সেটাকে ।’

‘কে আর হবে? নিশ্চয়ই স্যাম ওয়েড । আমাদেরকে রানশে ঢুকতে দেখে পালাবার ফন্দি আঁটে সে । সদর দরজা দিয়ে বের হলে আমরা দেখে ফেলব বুঝতে পেরে রান্নাঘরের দরজাটা দিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা চালায় । কিন্তু, দরজাটা নিশ্চয়ই নষ্ট । ফলে, ধরা খেয়ে গেছে বোকা লোকটা ।’

হাসল কার্ক । ‘আমিও আজ বিকেলে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে...’ হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে থেমে গেল সে । বলল, ‘শোনো শেরিফ, আর একটা জিনিস তোমাকে দেখানোর আছে । এদিকে এসো,’ রান্নাঘর থেকে বের হয়ে সোফাগুলোর দিকে এগিয়ে গেল কার্ক । তাকে অনুসরণ করল শেরিফ লুথার ।

হারিকেনটা নিচু করে ধরল কার্ক । বলল, ‘তাকাও মেঝের দিকে ।’

হাঁটুর উপর ভর করে বসল শেরিফ । মাথা নামিয়ে দেখল ।

মেঝের একজায়গায় লেগে আছে রক্তের দাগ । শুকিয়ে কালচে-খয়েরী হয়ে গেছে দাগটা ।

‘কিছু বুঝলে লুথার?’ শেরিফ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর তাকে জিজ্ঞেস করল কার্ক । শেরিফ উত্তর দিল না দেখে নিজেই বলল, ‘রক্তপাত হয়েছে এখানে । হিংসাত্মক কোন ঘটনা অবশ্যই ঘটেছে এই কেবিনে । এবং, ঘটনাটার সাথে এই হারামজাদা স্যাম নিশ্চয়ই জড়িত ।’

থমথম করছে লুথারের চেহারা । একবার স্যামের দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে কার্ককে বলল সে, ‘চলো, বাইরে গিয়ে খুঁজে দেখি কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কি না টম বা লুসির ।’ যাওয়ার আগে স্যামের গানবেল্টটা নিজের গানবেল্টের উপর পরে নিল শেরিফ ।

বাইরে গিয়েই টেঁচাতে আরম্ভ করল কার্ক । মাঝেমধ্যে তার সাথে গলা মেলাল শেরিফ । রাতের নীরবতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল ওদের চিৎকারে ।

দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল স্যামের কপালে। অবশ্যই কোরালে ঢুকবে শেরিফ। তখন ওদের ঘোড়া দুটো পরিষ্কার দেখতে পাবে সে। প্যাক হর্সের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছিল স্যাম, সেটা ধরতে খুব বেশি সময় লাগবে না তার। দুটো ঘোড়া দেখতে পেলেও কোন মালপত্র খুঁজে পাবে না ওরা। আর যদি জেকের স্যাডলব্যাগ খুলে সেখান থেকে ওর বাড়তি কাপড়-চোপড় বের করতে পারে, তাহলে তো প্রমাণই হয়ে যাবে যে, স্যামের সাথে আরও একজন ছিল। তারপর ওর প্রতি কেমন আচরণ করবে কঠোর শেরিফ, সেটা কল্পনা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যাম।

এতক্ষণ বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে থেকে কেবিনের ভিতরের সব কথা শুনছিল জেক। কার্ক আর লুথার বের হওয়ামাত্রই যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে জেনেও রান্নাঘরের জানালা দিয়ে আগের পদ্ধতিতে আবার ভিতরে ঢুকল সে। তারপর বসে পড়ল রান্নাঘরের দরজাটার কাছে মেঝেতে। আওয়াজ শুনে পিছনে তাকাল স্যাম।

‘কী হলো?’ যথেষ্ট রাগ স্যামের নিচু গলার স্বরে, ‘পা অবশ্য হয়ে গেল নাকি তোমার? অত দূরে বসে রইলে কেন? থ্রোইং নাইফটা বের করে আমার বাঁধন কাটো তাড়াতাড়ি।’

‘তারপর?’

‘তারপর!’ আকাশ থেকে পড়ল স্যাম, ‘তারপর মানে? গাধা, তারপর আমরা পালাব এই নরক ছেড়ে।’

‘কিন্তু, ফলাফলটা কী হবে ভেবেছ একবার? এক ঘণ্টার ভেতরেই পাসি নিয়ে আমাদের পেছনে ধাওয়া করবে শেরিফ। এখন তোমার উপর কিছুটা হলেও দয়ামায়া আছে তার। তুমি পালালে সেটাও থাকবে না। লোকটা তখন নিশ্চিতভাবে ধরে নেবে, এই কেবিনে কোন না কোন কুকর্ম করেছে তুমি। পালানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই পশ্চিমের শহরগুলোতে তোমার নামে ছাপা হবে ওয়ান্টেড পোস্টার; হয়তো আমিও বাদ যাব না তাতে। তাছাড়া, আমাদের ঘোড়া দুটো ক্লান্ত, বেশিদূর একটানা দৌড়াতে পারবে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের গন্তব্য জানা আছে শেরিফের।’

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল স্যাম। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘তাহলে কী করব আমরা এখন?’

‘যা-ই ঘটুক না কেন, মাথা ঠাণ্ডা রাখব। আমাদের একটা বড় সুবিধা হচ্ছে, ওরা এখন পর্যন্ত জানে না যে, দু’জন ছিলাম আমরা। তুমি ধরা পড়লেও আমি তো মুক্ত আছি। যতদূর মনে হয়, সহজে তোমাকে ছাড়বে না শেরিফ। কয়েকদিন হাজতে কাটাতে হবে তোমাকে। ঘাবড়িয়ো না, আমি বাইরে থেকে ফুঁর্তি করে বেড়াব না। তোমাকে মুক্ত করার আশ্রয় চেষ্টা করব। তবে, সেটা

বেআইনি উপায়ে নয়, বুদ্ধি খাটিয়ে।’

‘কী করবে তুমি?’

‘আর কিছু পারি বা না পারি, প্রমাণ করার চেষ্টা করব, মিথ্যে বলছ না তুমি। আসলে সাইনবোর্ডটার কথা বলেই ফেঁসে গেছ তুমি। একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়...’

কথা শেষ করতে পারল না জেক। বাইরে থেকে উঁচু গলায় ডাক শোনা গেল, ‘টম! লুসি! কোথায় তোমরা?’

চিৎকার করে ভাই-ভাবিকে ডাকছে কার্ক।

‘ওই কার্কটা একটা হারামজাদা,’ দাঁতে দাঁত পিষে বলল স্যাম, ‘কবে যে আবার হাতের নাগালে পাব ওকে!’

হাতের নাগালে পেল কী ঘটবে, স্যামের গলার স্বরেই স্পষ্ট বোঝা গেল।

‘তোমাকে এইমাত্র কী বললাম আমি?’ চাঁপা কণ্ঠে স্যামকে ধমকাল জেক।

‘মাথা ঠাণ্ডা রাখতে না পারলে ভুল হবে আমাদের। তখন আমাদের দু’জনকেই ধরে ফেলবে শেরিফ লুথার। খেয়াল রেখো, কোন দোষ না করেও ফেঁসে গেছ তুমি, মানে আমরা। নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য এখন নিখুঁত চাল দিতে হবে আমাদের। আমাদের জন্য ভুল করা মানে হয় জেল নইলে কটনউড গাছ। মনে থাকবে কথাটা?’

অসহায় রাগে ছটফট করতে করতে উপরে-নীচে মাথা দোলাল স্যাম।

‘আমি তোমার সাথে ছিলাম বা আছি—কথাটা কিছুতেই জানানো যাবে না কাউকে। বুঝেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘রক্তপাতের ব্যাপারে কিছু একটা বলছিল কার্ক। তারমানে, টম আর লুসিকে খুঁজে না পেলে শেরিফ সন্দেহ করতে পারে যে, অপহরণ বা খুন করা হয়েছে তাদের। সেক্ষেত্রে তুমি হবে এক নম্বর সন্দেহভাজন ব্যক্তি। ঘাবড়ায়ো না। যদি প্রমাণ করতে পারো যে, গতরাতে ফোর্ট ডেভিসে ছিলে তুমি, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে শেরিফ। তোমার কাছে কারও নাম জানতে চাইলে ফোর্ট ডেভিসের বারটেন্ডার গর্ডন ফেবলসের নাম বলবে। আমাদেরকে খুব ভালমত চেনে লোকটা। আমরা কখন ফোর্ট ডেভিস ছেড়েছি, সেটা জানে। আর ওয়াটার ট্যাঙ্কের ঘটনাটাও বোলে।’

‘বুঝলাম সবই। কিন্তু, ফোর্ট ডেভিসে খবর নিলেই শেরিফ জেনে যাবে, একা রওয়ানা হইনি আমি, আরেকজন ছিল আমার সাথে। তখন কী করব?’

‘পরেরটা পরে চিন্তা করা যাবে। আপাতত মুক্ত থাকতে হবে আমাকে। এই কেবিনে আসলে কী ঘটেছে, জানতে হবে,’ কেবিনের বাইরে থেকে কার্কের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে গলা আরও নামিয়ে ফেলল জেক, ‘এখন

পালাচ্ছি আমি। তোমাকে খেঁগার করলে মার্ফায় নিয়ে যাবে শেরিফ। আমিও যাব পিছু পিছু।’

কার্কের গলার আওয়াজ আরও কাছে এগিয়ে আসাতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল জেক। তারপর আগের পদ্ধতিতে জানালা দিয়ে বের হয়ে গেল বাইরে। অন্ধকারে গা ঢেকে কান পেতে রইল আবার।

কেবিনের বাইরে থেকে শোনা গেল কার্কের উত্তেজিত গলার আওয়াজ, ‘আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, শেরিফ। একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ওরা। তোমার কী মনে হয়? এই লুথার? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? কেবিনের ভেতরে কী অবস্থা খেয়াল করেছে একবার? টেবিলের উপর খাবার সাজানো, তারমানে দুপুরে খেতে বসেছিল ওরা। বেডরুমে এলমেলো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র। সোফার সামনে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। এসবের মানে কী?’

‘হয় অপহরণ আর না হয় খুন করা হয়েছে তোমার ভাই-ভাবিকে।’

‘কী?’ চিৎকার করে উঠল কার্ক। তারপর সামলে নিল নিজেকে। বলল, ‘এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলার আছে আমার।’

‘কেবিনে চলো। স্যামকে জিজ্ঞেস করে দেখি আরেকবার। তারপর তোমার কথা শুনব।’

কেবিনে ঢুকে একটা রকিং চেয়ার টেনে নিল শেরিফ। ওর দেখাদেখি ডাইনিং টেবিলটার সামনে থেকে আরেকটা চেয়ার নিয়ে এল কার্ক। বসল হাত-পা ছড়িয়ে।

‘মিস্টার স্যাম ওয়েড,’ কথা শুরু করল শেরিফ, ‘মোট চারটা ঘোড়া পাওয়া গেছে কোরালে। তিনটা জিন ছাড়া, আর একটায় জিন পরানো।’

কথাটা শুনে মনে মনে ভীষণ চমকে উঠল স্যাম। জেক বলেছিল, তিনটা ঘোড়া দেখেছে সে কোরালে। তাহলে ওদের দুটো সহ ঘোড়ার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ। অথচ, শেরিফ বলছে, চার। ব্যাপারটা কী?

‘তুমি যে ঘোড়ায় চড়ে, সেটা কী জাতের?’

‘বড় আকৃতির একটা রোন।’

‘আর তোমার প্যাকহর্সটা?’

‘মাঝারি একটা বাকস্কিন,’ জেকের ঘোড়াটার কথা উল্লেখ করল স্যাম।

‘কার্ক, কোরালে কোন বাকস্কিন দেখেছি আমরা?’

‘না,’ এত দ্রুত উত্তরটা দিল কার্ক যে, মনে হলো, শব্দটা ঠোঁটের আগায় এনে বলবার অপেক্ষায় ছিল সে।

বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নীচের ঠোঁটে কামড় দিল জেক।

‘তাহলে তুমি এমন একটা বাকস্কিনকে প্যাকহর্স হিসেবে ব্যবহার করো,

যেটাকে চোখে দেখা যায় না। ঠিক না? তোমার কোন মালপত্রও তো খুঁজে পেলাম না আমরা। পেয়েছি, কার্ক?’

‘পাইনি।’

‘তা হলে মিস্টার স্যাম ওয়েড, অদৃশ্য একটা বাকস্কিনের উপর অদৃশ্য মালপত্র বহন কর তুমি। আর তা না হলে, তোমার পার্টনার বাকস্কিনটা নিয়ে মার্ফা বা ফোর্ট ডেভিসের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে আরও আগেই। অথবা হয়তো লুকিয়ে আছে আশপাশে। কোন্টা ঠিক?’

‘কোনটাই না,’ মিথ্যে বলতে আরম্ভ করল স্যাম, ‘বাকস্কিনটাকে ঠিকমত বাঁধিনি আমি। তোমাদের ষাঁড়ের মত গলার আওয়াজ শুনে হয়তো ভয় পেয়ে পালিয়েছে ওটা। যে জোরে চিৎকার করছিলে তোমরা, শুনলে মরা মানুষও জ্যান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। খুঁজে দেখো, আশপাশের কোন জঙ্গলে ভয়ে হয়তো ঠকঠক করে কাঁপছে বোবা জানোয়ারটা।’

স্যামের কথা শেষ হওয়ামাত্রই হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়বার মত অবস্থা হলো কার্কের। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘কথা বলতে পারলে কী বলত জানোয়ারটা? স্যাম, হারামজাদা, আমাকে বাঁচাও?’ নিজের রসিকতায় নিজেই আবার হাসতে আরম্ভ করল কার্ক।

‘তোমার পার্টনার কোথায়, স্যাম?’ জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

‘কোন পার্টনার নেই আমার।’

‘তারমানে বলবে না তুমি?’

‘যা বলার বলেছি। বিশ্বাস করা বা না করা তোমার ইচ্ছে।’

‘বিশ্বাস করলাম না আমি,’ বলে কার্কের দিকে ফিরল শেরিফ। ‘তুমি কী যেন বলবে বলছিলে?’

‘তুমি তো জানোই যে বিগ বেডে একটা মাইনিং ক্যাম্পে কাজ করি আমি। মাস দুয়েক আগে নতুন এক শ্রমিককে নিয়োগ দেওয়া হয় আমাদের ক্যাম্পে। নাম, রোম মসটার। এক রাতে হুয়িস্কি খেতে খেতে গল্প করছিলাম আমি আর মসটার। লোকটা আগে স্পিট এক্সে কাউবয় হিসেবে কাজ করত। রানশ্টার ফোরম্যান, ফ্র্যাঙ্ক মেলন ছিল ওই মসটারের বস। খুব খাতির ছিল দু’জনের মধ্যে। তো, একটু বেশিই গিলে ফেলেছিল মসটার, তখন নেশার ঘোরে আজোবাজে কথা বলতে আরম্ভ করল সে। এই মেসার নাম নিয়ে বলল, এখানে বাস করে এক ডানা কাটা পরী, ওকে হাসিল করার খুব ইচ্ছে মেলনের। মসটারের কথা শুনেই বুঝলাম, পরীটা কে। বোকার ভান করে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, নাম কী পরীটার। মসটার বলল, লুসি। তখন আর কোন সন্দেহ রইল না আমার মনে। হারামজাদাটার কাছে তারপর জানতে চাইলাম, মেলন কীভাবে হাসিল করবে লুসিকে। মসটার জানাল, প্রয়োজনে লুসির স্বামী টম পোলার্ডকে

খুন করবে মেলন।

‘সেই রাতেই একটা চিঠি লিখলাম টমকে। জানালাম, আসছি আমি। আসলে মেলনের ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলার ইচ্ছে ছিল টমের সাথে। সতর্ক করতে চেয়েছিলাম টম আর লুসিকে। কিন্তু...’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কার্ক।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শেরিফ। একসময় বলল, ‘ওই মসটার লোকটাকে চিনি না আমি। কিন্তু, খুব একটা ভুল বলেনি সে। শহরের প্রায় সবাই জানে, লুসির প্রতি দুর্বল ছিল মেলন।’

‘কী?’ একটা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কার্ক। ‘এখনই চলো স্প্লিট এস্ট্রে। ওই হারামজাদা মেলনকে আমি...’

হাত ধরে টেনে দুর্বল কার্ককে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিল শেরিফ। কড়া গলায় বলল, ‘থামো। এখন মাথা গরম করার সময় না।’

‘তাহলে এখন কী করার সময়? ওই মেলনই ধরে নিয়ে গেছে লুসিকে। হয়তো বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল টম, তখন বাধ্য হয়ে তাকে গুলি করেছে সে। এক্ষুণি স্প্লিট এস্ট্রে গেলে হয়তো জীবন্ত উদ্ধার করতে পারব আমরা লুসিকে।’

‘স্প্লিট এস্ট্রে না হয়ে যদি অন্য কোন রানশ হত, তাহলে যেতাম আমি। এখন স্প্লিট এস্ট্রে গেলে পল জেমিসন ঢুকতেই দেবে না আমাদের। বিশজন কাউবয় কাজ করে ওর ওখানে। এতজনের সাথে একা পারব না আমি। অন্তত আমার ডেপুটিকে সঙ্গে নিতে হবে। সুতরাং, আগে মার্কীয় ফিরতে হবে আমাদের,’ উঠে দাঁড়াল শেরিফ। ‘মিস্টার স্যাম ওয়েড, তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। টম বা লুসির ভাগ্যে কী ঘটেছে জানি না আমি। কিন্তু, ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে তোমাকে। ক্রমাগত মিথ্যে বলার কারণে এখন তুমিই এক নম্বর সন্দেহভাজন। ফোর্ট ডেভিসে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার আছে কেউ?’

‘আছে। ওখানকার সেলুনের বারটেন্ডার গর্ডন ফেবলস।’

‘আগেই জানিয়ে রাখি, ফেবলস যদি তোমাকে চিনতে অস্বীকার করে অথবা বলে যে ডিনারের পরে নয়, আরও আগেই ফোর্ট ডেভিস থেকে রওয়ানা হয়েছিলে তুমি, তা হলে পৃথিবীর আলো-বাতাস আর বেশি দিন দেখতে হবে না তোমাকে। আর বোকা মনে কোনো না আমাদের। তোমার পার্টনারকে খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগবে না আমার।’

‘এক কথা বার বার বলতে ভাল লাগে না, শেরিফ। আগেই বলেছি, কোন পার্টনার নেই আমার। যা-ই হোক, ফেবলস আমার পক্ষেই কথা বলবে,’ স্যামের গলায় আত্মবিশ্বাস, ‘আর শুধু ফেবলসই নয়, ইচ্ছে করলে আরও একজনকে আমার ভালমানুষির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।’

‘কে সে?’

নামটা বলতে গিয়ে আরেকবার বোবা হয়ে গেল স্যাম। আশ্চর্য হয়ে উপলব্ধি করল, ওয়াটার ট্যাঙ্কে দেখা মেয়েটার নাম জানে না সে। ফ্যালফ্যাল করে শেরিফের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

‘এই লোকটাও কি তোমার ঘোড়া, মালপত্র বা পার্টনারের মত অদৃশ্য?’ শেরিফের গলায় পরিহাসের সুর।

‘না, অদৃশ্য নয়। বরং, তাকে দেখলে অনেক পুরুষের বুকে কাঁপন ধরে যাবে।’

‘তাই নাকি?’ এবার ব্যঙ্গ করল কার্ক। ‘এত সুন্দর মেয়েটার কোন নাম নেই, কোন জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছ তাকে?’

‘কোন জঙ্গলে না। এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা কৃত্রিম ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে, সেখানে।’

‘কোথায়?’ ধতমত খেয়ে গেছে কার্ক।

‘একটা ওয়াটার ট্যাঙ্কে। গোসল করছিল সে। তাকে একা পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল এক লোকের, উত্থাপ করতে আরম্ভ করল। তখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। ঘোড়া নিয়ে সেখানে গেলাম আমি। লোকটাকে সাবধান করলাম। কিন্তু, বিনা নোটিশে পিস্তল বের করল লোকটা। নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাকে গুলি করতে বাধ্য হলাম। দুই হাতে গুলি খেয়ে পালাল লোকটা। পানি থেকে উঠে এসে আমাকে কোনরকমে ধন্যবাদ দিয়েই চলে গেল মেয়েটা। তার নাম আর জানা হলো না আমার।’

‘মেয়েটার বর্ণনা দাও,’ আদেশ করল শেরিফ।

‘রোদে পোড়া বাদামী চেহারা। মাথায় সোনালী চুল। চোখের মণি নীল, নাক খাড়া। স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেঁটে মেয়েটা। একটা জিপ্সের প্যান্ট আর সাদা রঙের একটা শার্ট পরে ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েটা অপূর্ব সুন্দরী। এত সুন্দরী মেয়ে আমি আমার সারা জীবনেও দেখিনি।’

ধমধম করতে আরম্ভ করেছে কার্কের চেহারা। কোলা ব্যাণ্ডের মত আওয়াজ করে জানতে চাইল, ‘আর লোকটা?’

‘বিশালদেহী। মাটির দাগ লাগা জিম, লাল শার্ট আর কালো হ্যাট পরে ছিল। ধূসর একজোড়া বিরাট গৌফ ছিল তার। সে একজন গানম্যান, নামের আদ্যাক্ষর “বি”।’

‘এত কিছু জানলে কীভাবে তুমি?’ কার্কের কণ্ঠে বিস্ময়।

বেশ কিছুটা রেখে-ঢেকে ঘটনাটা খুলে বলল স্যাম। শুনে পুরোপুরি গম্ভীর হয়ে গেল কার্ক আর শেরিফ।

‘মেয়েটা কে বুঝতে পেরেছ কার্ক?’ জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

উপরে-নীচে মাথা দুলিয়ে উত্তরটা দিল কার্ক। স্যামকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকে পালাল লোকটা?'

‘ওয়াটার ট্যাক্টের পেছনে পাইন গাছের একটা জঙ্গল আছে। ঘোড়া নিয়ে সেটার ভেতরে ঢুকে পড়ল লোকটা। তাকে ধাওয়া করতে গিয়ে মনে পড়ল, এই এলাকায় আমি নতুন, ভালমত চিনি না সব জায়গা। নিজেই আবার প্যাচের মধ্যে পড়ে যেতে পারি ভেবে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে গেলাম মেয়েটার কাছে।’

‘তোমার কথা বিশ্বাস করা কঠিন। পাইনের ওই জঙ্গলটার ভেতর দিয়ে কোন রাস্তা নেই। তাহলে’ গেল কোথায় লোকটা? যা-ই হোক, তুমি বলছ, লরা, মানে মেয়েটা গোসল করছিল সেখানে, তারপর লোকটা গিয়ে তাকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করে। তারমানে, ওয়াটার ট্যাক্টায় আগে গিয়েছিল লরা, লোকটা নয়?’

‘মেয়েটার নাম যদি লরা হয়, তাহলে তা-ই।’

‘শুনলে শেরিফ?’

‘শুনলাম,’ স্যামের বাঁধন খুলতে আরম্ভ করল শেরিফ। ‘মার্কায় চলো, মিস্টার স্যাম। তোমাকে হাজতে ভরা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই আমার।’

চার

‘একটা জিনিস বুঝলাম না,’ পিছমোড়া করে দুই হাত বাঁধা স্যামকে ধরে কেবিনের বাইরে বের করে নিয়ে আসবার পর বলল শেরিফ, ‘কোরালে জিন পরানো ঘোড়াটা কার?’

‘জানি না। ব্যাপারটা কিছুই বুঝিনি আমি,’ স্বীকার করল কার্ক। ‘তবে যতদূর মনে হয়, কেউ একজন এসেছিল এই বার স্টিরাপে। সেই লোকটাই কি টম আর লুসিকে...’ কথাটা শেষ করল না সে।

‘ঘটনাটার মাত্র দুটো ব্যাখ্যা আছে আমার কাছে এই মুহূর্তে,’ রেকাবে পা রেখে বলল শেরিফ, ‘হয় খুবই অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে এখানে দুপুরে, যার কারণে কাউকে কিছু না জানিয়ে পায়ে হেঁটে দূরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে টম আর লুসি। নইলে, এই স্যাম লোকটা ওদেরকে খুন করে লাশদুটো গুম করেছে এমন এক জায়গায়, যেখানে খুব সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না লাশগুলোকে।’

‘দোয়া করো, যেন তোমার দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা সত্য না হয়, শেরিফ,’ দাঁতে দাঁত পিষে বলল কার্ক। ‘সত্য হলে এই হারামজাদা স্যামকে খুন করার দায়ে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে হবে তোমার।’

‘বাড়াবাড়ি কোরো না,’ ঠাণ্ডা গলায় জানিয়ে দিল শেরিফ, ‘স্যাম যতদিন হাজতে থাকবে, ততদিন সে আমার বন্দী। আমি থাকতে আমার কোন বন্দীর গায়ে আঁচড় দিয়েছে কেউ, এমন ঘটনাও ঘটেনি আমার দশ বছরের শেরিফ জীবনে। এখন যাও, কথা না বাড়িয়ে স্যামের ঘোড়াটাকে নিয়ে এসো কোরাল থেকে।’

চলে গেল কার্ক।

‘তাহলে আমাকে খুনী ভেবে ধরে নিয়ে যাচ্ছ তুমি?’ ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল স্যাম।

‘হ্যাঁ,’ অবিচল কণ্ঠে ঘোষণা করল শেরিফ, ‘বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার অনুমান ঠিক। আমার জায়গায় তুমি থাকলে কী করতে? ছেড়ে দিতে আমাকে?’

কথাটা ভেবে দেখল স্যাম। না, ছাড়ত না সে শেরিফকে। কিন্তু, যেচে পড়ে কেউই চোন্দ শিকের আড়ালে সময় কাটাতে চায় না। তাই নিজের পক্ষে সাফাই গাইবার চেষ্টা করল স্যাম, ‘বসার ঘরের মেঝেতে তোমাকে কী দেখিয়েছে কার্ক? শুকিয়ে আসা রক্তের দাগ?’

‘হ্যাঁ,’ চোখ সরু করল শেরিফ।

‘ভেবেচিন্তে বলো, মেঝের রক্তের রঙ কী ছিল?’

‘কালচে-খয়েরী।’

‘তুমি অভিজ্ঞ লোক, মানুষের রক্ত জীবনে বহুবার দেখেছ। এখন আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। লাল রক্ত মাটিতে বা মেঝেতে পড়ার কতক্ষণ পর সেটা কালচে-খয়েরী হয়ে যায়?’

মেঘের আড়াল থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে এসেছে রূপালী চাঁদ। একধরনের অদ্ভুত ঘোলাটে-সাদা আলোয় ভরে গেছে চারদিক। সেই আলোতে শেরিফের চেহারায় স্পষ্ট অনিশ্চয়তা দেখতে পেল স্যাম।

‘আমি ঠিক জানি না,’ স্যামের প্রশ্নের জবাবে বলল লুথার, ‘তিন-চার ঘণ্টা হবে মনে হয়।’

‘ভাল,’ কিছুটা সম্ভ্রষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দোলাল স্যাম, ‘ধরলাম, তিন ঘণ্টা। এখন ক’টা বাজে?’

‘প্রায় সাড়ে সাত। কেন?’

‘সাড়ে সাত থেকে তিন বাদ দিলে হয় সাড়ে চার। শেরিফ, সাড়ে চারটার সময় এখন থেকে মাইল তিনেক পেছনের কৃত্রিম ওয়াটার ট্যাক্সটাতে লরানামের এক মেয়েকে এক দুর্বৃত্তের কবল থেকে বাঁচাচ্ছিলাম আমি। বিশ্বাস না

হয়, তো লরাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো,' দাঁত বের করে হাসতে আরম্ভ করল স্যাম।

বলবার মত কিছু খুঁজে পেল না শেরিফ লুথার।

শেরিফ কাবু হতে আরম্ভ করেছে বুঝতে পেরে আত্মপক্ষ সমর্থনটা চালিয়ে গেল স্যাম, 'তাছাড়া আরও একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো। তুমি তো হাজারবার মার্ফী থেকে ফোর্ট ডেভিস গেছ। এই দুই শহরের মধ্যকার দূরত্বটা নিশ্চয়ই ভালমত জানা আছে তোমার?'

উপরে-নীচে মাথা দোলাল লুথার।

'ফোর্ট ডেভিস থেকে আমি যদি রাত দশটার পর রওয়ানা দেই এবং সারাটা পথ একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে আসি, তাহলে বার স্টিরাপে আমি কখন পৌঁছুব?'

চট করে উত্তরটা দিল না শেরিফ। সময় নিয়ে যোগ-বিয়োগের কাজটা করল। তারপর বলল, 'বিকেল পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা তো বাজবেই কমপক্ষে।'

'খুনটা কখন হয়েছে বলে তোমার ধারণা?'

'খুন যে হয়েছে, সেটা কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি না। আসলে...'

'আমাকে তো খুনী ভেবেই ধরে নিয়ে যাচ্ছ তুমি, নাকি? এখন তোমার অনুমানটা বলো। কখন হয়েছে খুনটা?'

'তিনটা-সাড়ে তিনটার দিকে।'

'ফোর্ট ডেভিস থেকে একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে বার স্টিরাপে এলাম বিকেল পাঁচটায়। আর খুনটা করলাম দুপুর তিনটায়। কী, মিলল?'

লুথার নিশ্চুপ।

'আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ যাও কিন্তু, মনে রেখো, দু'জন সাক্ষী আছে আমার। ফোর্ট ডেভিসের বারটেন্ডার গর্ডন ফেবলস, আর একটা মেয়ে, যার নাম লরা। তোমার কথা শুনেই বুঝেছি, মেয়েটাকে ভালমতই চেনো তুমি।'

'তারা তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে মুক্তি পাবে তুমি, কথা দিলাম।'

'তুমি লোকটা আসলে খারাপ না। তবে অনেক বেশি নীতিঘোঁষা-এই যা। আরেকটা ব্যাপার চিন্তা করে দেখো,' কার্ক ওর রোনটাকে জিন পরিয়ে হাজির করবার পর বলল স্যাম, 'খুনের মোটিভটা কী আমার? ডাকাতি?'

'হ্যাঁ,' শেরিফের বদলে উত্তরটা দিল কার্ক।

মনে মনে তাকে খুব অশ্লীল একটা গাল দিল স্যাম। মুখে বলল, 'তা হলে আমার স্যাডলব্যাগ পরীক্ষা করে দেখলেই তো হয়। মূল্যবান জিনিসপত্র কী পাও দেখো।'

লুথার হ্যাঁ-না কিছু বলবার আগেই স্যামের স্যাডলব্যাগের উপর একটা ঝড় বইয়ে দিল কার্ক। কিন্তু, কিছু পুরনো কাপড়-চোপড়, জায়গায় জায়গায় ফুটো

হয়ে যাওয়া একটা বাতিল ক্যান্টিন আর দুটো বই ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। জিনিসগুলো বের করে ইচ্ছেমত মাটিতে ছুঁড়ে ফেলছিল সে, ওর কাজ শেষ হলে থমথমে গলায় শেরিফকে অনুরোধ জানাল স্যাম, ‘জিনিসগুলো ওকে গুছিয়ে রাখতে বলো, শেরিফ। নইলে এর পরেরবার সত্যিই খুনের অভিযোগে আমাকে গ্রেপ্তার করতে হবে তোমার। কিন্তু, নিহত মানুষটার নাম টম বা লুসি হবে না, হবে কার্ক।’

‘শুনলে তুমি, লুথার? হারামজাদা ডাকাতটা কী বলল শুনলে? ওকে এখনই ঝুলিয়ে দাও। দেরি কোরো না।’

‘আয়,’ প্রাণপণ শক্তিতে হাতের বাঁধন ছিঁড়বার চেষ্টা করল স্যাম, ‘কে কাকে ঝুলায় দেখি।’ বন্য গরুর মত রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে দুই হাত দুই দিকে টানল সে। কিন্তু, লাভ হলো না। সামান্যতম টিলে হলো না বাঁধন।

স্যামের ভাবভঙ্গি দেখে দুই পা পিছিয়ে গেল কার্ক। ডানদিকের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করল লুথার, আকাশের চাঁদকে নিশানা করে গুলি করল একটা। রাতের নিস্তব্ধতায় কামান দাগবার মত বিকট শোনা গেল সেই আওয়াজ। চমকে শেরিফের দিকে তাকাল স্যাম আর কার্ক দু’জনই।

‘ঘোড়ায় চড়ো,’ কার্ক আর স্যাম দু’জনকেই উদ্দেশ্য করে কথাটা বলল লুথার। না চড়লে কী হবে, সেটা তার ভারী গলার আওয়াজই বুঝিয়ে দিল।

অনায়াসে নিজের ঘোড়ায় চড়ল কার্ক। দুই হাত বাঁধা থাকায় যথেষ্ট কষ্ট হলেও একসময় নিজের রোনটাতে চড়তে পারল স্যাম। এদিক-ওদিক কোমর দুলিয়ে স্যাডলে জায়গা করে নিতে নিতে বলল, ‘আমি কিন্তু কোনকালেই সার্কাসে কাজ করতাম না।’

কার্ক বা লুথার কেউই কথাটার মানে বুঝল না।

‘কী বলতে চাইছ তুমি?’ কড়া গলায় জানতে চাইল লুথার।

‘বলতে চাইছি, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা থাকা অবস্থায় আমার রোনটা দৌড় দিলে স্যাডল থেকে পড়ে মরব আমি।’

‘আমি সেটাই চাই,’ ফোড়ন কাটল কার্ক।

‘কিন্তু, আমি চাই না,’ ঘোষণা করল শেরিফ। ‘মার্ক্স পর্যন্ত হেঁটেই এগুবে আমাদের ঘোড়াগুলো। দূরত্বটা খুব বেশি না, কাজেই, সময় লাগবে না আমাদের তেমন একটা।’ একটু থেমে যোগ করল সে, ‘সবার আগে থাকবে কার্ক। মাঝখানে আমি তোমার ঘোড়াটার লাগাম ধরে থাকব, স্যাম। তুমি কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলেই গুলি করব তোমাকে। ভেবে দেখো, চালাকি না করলে মার্ক্সের জেলে হয়তো দুটো দিন থাকতে হবে তোমাকে। আর চালাকি করলে পৃথিবী থেকেই বিদায় নিতে হবে। তোমার জায়গায় আমি থাকলে ফুলবাবুর মত বসে থাকতাম ঘোড়ার উপর। কার্ক, আগে বাড়ো।’

যার যার ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল ওরা তিনজন। সামনে যেতে যেতে একসময় দূরের একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ওদের ঘোড়া তিনটা। তারও আগে বাতাসে মিলিয়ে গেল তাদের কথোপকথনের আওয়াজ।

অবস্থা নিরাপদ বুঝে কেবিনের আড়াল ছেড়ে বের হয়ে এল জেক। একবার তাকাল এদিক-ওদিক। নিজের একাকীত্বটা টের পেল পুরোপুরি। কেবিনটা চোখে পড়ামাত্রই ভাবল ভিতরে ঢুকবে কি না। কিন্তু, আগে স্যামের কাছে পৌঁছানোটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে পেরে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। খেয়াল করল, কেবিনে এখন আলোর অভাব নেই। সদর দরজাটার সামনের খুঁটিতে আগের মতই ঝুলছে হারিকেনটা। টিমটিম করে আলো বের হচ্ছে সেটা থেকে। বসবার ঘরে নিশ্চয়ই এখনও জ্বলছে ল্যাম্প আর অন্য হারিকেনটা। আলোয় ঝলমল করছে ঘরটা। চোখ সরিয়ে নিল জেক। তাকাল ট্রেইলটার দিকে। দ্রুত পায়ে হেঁটে পার হলো রানশ্টার বেড়া, এসে দাঁড়াল ট্রেইলটাতে। ডানে-বামে তাকাল।

খাঁ খাঁ করছে নির্জন ট্রেইলটা। সূর্য ডুববার পর থেকেই শীতল হয়ে আসছিল চারদিক, জেককে একা পেয়ে তার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কোথা থেকে যেন হাজির হলো এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। বাতাসটার স্পর্শে সত্যিই কেঁপে উঠল জেক। এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকল জুনিপারের জঙ্গলে, ওর ঘোড়াটা রাখা আছে যেখানে। রাতের আঁধার যখন মনের উপর চেপে বসে, তখন একজন ভবঘুরের জন্য তার ঘোড়াটার মত আপন আর কে হতে পারে? ঘোড়াটার গলার কাছে হাত বুলাতে বুলাতে কথাটা ভাবল জেক।

আদর পেয়ে মৃদু একটা শব্দ করল ঘোড়াটা। সেটার বাঁধন ছুটাল জেক। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অনেকদূর এগিয়ে গেছে শেরিফ। সুতরাং, এবার রওয়ানা হওয়া যায়। জোর কদমে ঘোড়া ছুটালে ওদেরকে ধরে ফেলতে বেশি সময় লাগবে না তার।

জুনিপারের জঙ্গলটা থেকে বের হওয়ার জন্য এক পা আগে বাড়িয়েছিল জেক, ট্রেইলটা ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে আসা একটা ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পেয়ে প্রায় জমে গেল সে। পরক্ষণেই ঘোড়াসহ কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে জঙ্গলটার আরও ভিতরে গিয়ে ঢুকল। নিঃশব্দে অপেক্ষা করে রইল একাকী ঘোড়সওয়ারের জন্য।

মাথার উপরের চাঁদটা পূর্ণিমার না হলেও যথেষ্ট গোলাকৃতির। মেঘের আশ্রয় ছেড়ে সেটা বের হয়ে এসেছে অনেক আগেই। ঘোলা আলোয় বে স্ট্যালিয়নটাকে দূর থেকে দেখতে তেমন কোন অসুবিধা হলো না জেকের।

একটা ব্যাপার খেয়াল করে খুব আশ্চর্য হলো জেক। ঘোড়াটাতে জিন পরানো আছে ঠিকই, কিন্তু, কোন আরোহী নেই স্যাডলের উপর। কখনও ধীর

গতিতে দৌড়ে, কখনও হেঁটে আবার কখনও থেমে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা। আরোহী না থাকায় চলছে নিজের খুশি মত।

আরও কাছে এগিয়ে এল ঘোড়াটা। বে স্ট্যালিয়নটাকে চিনতে পেরে একই সাথে খুশি আর উদ্ভিগ্ন হলো জেক।

বিকেলের গানম্যানের দ্বিতীয় ঘোড়াটাই হচ্ছে এই বে স্ট্যালিয়ন। এটাকেই মুক্তি দিয়েছিল জেক, ঘোড়াটার সাথে তার কিছুটা খাতিরও হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির পথ ধরেছে ঘোড়াটা।

এই মুহূর্তে জেকের একটা ঘোড়া দরকার। নিজের বাকস্কিনটা নিয়ে শেরিফের পিছু দৌড়াতে পারে না সে। প্যাক হর্সের কাল্পনিক গল্প শোনানোর সময় বাকস্কিনটার উল্লেখ করেছিল স্যাম; কাজেই, ঘোড়াটা লুথারের চোখে পড়লে খুব সহজেই বুঝে যাবে ধূর্ত লোকটা, স্যামের পার্টনার কে। সুতরাং, সঙ্কটটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাকস্কিনটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে কোন গোপন জায়গায়। এই জুনিপারের জঙ্গলেই বেঁধে রাখা যায়, ভাবল জেক, কিন্তু, তা হলে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়ানোর জন্য দিনে দু'বার করে এখানে আসতে হবে ওকে। খুব একটা বড় সমস্যা না সেটা, মনে মনে বলল জেক।

বড় সমস্যা হচ্ছে, নিজের ঘোড়া এখানে বেঁধে রেখে গেলে কার ঘোড়ায় চেপে মার্কায় হাজির হবে সে। বার স্টিরাপের কোরাল থেকে একটাও ঘোড়া নেওয়া যাবে না। নিজের ভাই-ভাবির ঘোড়া নিশ্চয়ই খুব ভালমত চেনে কার্ক; চুরির অভিযোগে জেককে ফাঁসাতে দুই মিনিটও লাগবে না তার। পশ্চিমের বুনো দেশগুলোতে ঘোড়া চোরকে বিন্দুমাত্র খাতির করে না লোকে, ধরতে পারলে দেরি না করে সোজা ঝুলিয়ে দেয় কটনউডের ডালে।

জিন পরানো তৃতীয় একটা ঘোড়া আছে কোরালে। ঘোড়াটা কার, জানে না কার্ক। হয়তো শেরিফও জানে না জানলে কার্ককে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু, ওই ঘোড়াটাও নেওয়া যাবে না নিশ্চয়ই শেরিফ খুব ভাল মত দেখেছে ঘোড়াটাকে, চিনে রেখেছে। তাহাড়া ঘোড়াটা বার, সে ফিরে এলে খেল খতম হয়ে যাবে জেকের

সুতরাং, একটাই মাত্র উপায় আছে। উপায়টা মথায় আসামাত্রই এক দৌড়ে জুনিপারের জঙ্গল ছেড়ে বের হয়ে এল জেক। ছুটল আরোহীবিহীন ঘোড়াটার উদ্দেশে

রানশটাকে ছাড়িয়ে অল্প কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিল বে স্ট্যালিয়নটা। ট্রেইলের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল চূপ করে, কাঠের মূর্তির মত। বোধহয় ঝিমুচ্ছিল। জেকের ছুঁতু পায়ে আওয়াজ পেয়ে লম্বা কানদুটো পিছনের দিকে ঘুরাল জন্তুটা। আওয়াজটা পরিচিত কি না, বুঝবার চেষ্টা করল বোধহয়।

দৌড় থামাল জেক। দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটার থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে

নিচু কণ্ঠে কথা বলতে আরম্ভ করল জম্ভটার সাথে ।

জেককে চিনতে পারল ঘোড়াটা । মৃদু শব্দ করে লক্ষণটা প্রকাশ করল । অবস্থা নিরাপদ বুঝতে পেরে কাছে এগিয়ে গেল জেক । বে স্ট্যালিয়নটার ঘাড়ের কাছে হাত বুলিয়ে আদর করল । ঘোড়াটার কানের কাছে মুখ নিয়ে এমনভাবে কথা বলতে লাগল, যেন ঘোড়াটা তার-ই । মিনিট দুয়েকের ভিতরেই জেকের বশ্যতা স্বীকার করল জম্ভটা ।

স্যাডলে চেপে বসল জেক । ঘোড়াটা বাধা দিল না দেখে লাগাম ধরে সেটার মুখ জুনিপারের জঙ্গলের দিকে ঘুরাল । তারপর প্রথমে আলতো করে, পরে জোরে ঠুতো দিল ঘোড়াটার পেটে । দৌড় দিল বে স্ট্যালিয়নটা ।

জুনিপারের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল জেক । থামল নিজের বাকস্কিনটার কাছে । স্যাডল থেকে নেমে আবার বাঁধল ঘোড়াটাকে । তারপর নিজের স্যাডলের সাথে বে স্ট্যালিয়নটার স্যাডল পাল্টাল । কাজটা শেষ হওয়ায়ই এক দৌড়ে জঙ্গল ছেড়ে বের হলো জেক, সময় বাঁচানোর জন্য বার স্টিরাপের খোলা গেট দিয়ে না ঢুকে বেড়া ডিঙাল । গতি না কমিয়ে সোজা চলে গেল কোরালে ।

মাথার উপর থেকে ঝুলন্ত একটা আংটায় একটা হারিকেন আটকে দিয়েছিল জেক । কেবিনে ফিরবার সময় সাথে করে সেটা নিয়ে গিয়েছিল সে । হারিকেনটা নিয়ে আসতে গেলে দেরি হতে পারে ভেবে অন্ধকারেই এদিক-ওদিক তাকাল জেক । স্যামের ঘোড়ার সামনে যে বালতিটা রেখেছিল, সেটা চোখে পড়ল তার । হাতে তুলে নেওয়ার পর বুঝতে পারল, পানি নেই বালতিটাতে । আবার দৌড় দিল সে । ঝরনাটার কাছে পৌঁছে ভর্তি করল বালতিটাকে । তারপর দ্রুত হেঁটে গিয়ে ঢুকল জুনিপারের জঙ্গলে । বাকস্কিনটার সামনে বালতিটাকে নামিয়ে রাখল । বে স্ট্যালিয়নটার স্যাডলে চড়তে চড়তে নিজের ঘোড়াটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘চললাম রে । বেশি ডাকাডাকি করিস না তুই । বিপদে পড়ে যাবি ।’

নির্দয়ভাবে বে স্ট্যালিয়নটার পেটে ঠুতো দিল সে । নিষ্কিণ্ত তীরের মত জুনিপারের জঙ্গল ছেড়ে বের হয়ে এল ঘোড়াটা । ছুটল মার্ক্সার ট্রেইল ধরে ।

কিন্তু, খুব বেশিদূর এগুতে পারল না জেক । দিগন্ত ফুঁড়ে হঠাৎ উদয় হলো তিনজন রাইডার, ঘোড়া হাঁটিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে । মার্ক্সার দিক থেকে আসছে রাইডার তিনজন, বুঝতে পারল জেক । এবৎ, দূরত্বটা যখন আর দুশো ফিট, তখন লোকগুলো কারা, বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেল সে ।

স্যাম, কার্ক আর শেরিফ লুথার । কোন একটা কারণে আবার বার স্টিরাপের দিকে ফিরে আসছে ওরা । কারণটা কী, অনুমান করতে পারল না জেক ।

ঘোড়ার গতি কমাল সে । শেরিফ আর বিশ ফিট দূরে থাকা অবস্থায় রাশ টেনে থামাল ঘোড়াটাকে । ওদিকে শেরিফও থেমে দাঁড়িয়েছে । চাঁদের আলোতে

যতদূর সম্ভব দেখে নিচ্ছে জেককে। এক সময় জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে বলল শেরিফ, 'হাউডি, স্ট্রেঞ্জার। আমি মার্ক্যার শেরিফ। লোকে আমাকে লুথার নামে ডাকে।'

'হাউডি, লুথার,' কথাটা এমনভাবে বলল জেক, যেন শেরিফ তার বহুকালের বন্ধু। 'আমি জেক রায়ার। কাজ খুঁজতে যাচ্ছি মার্ক্যার।'

'তুমি ভবঘুরে?' আরও কাছে এগিয়ে এল শেরিফ।

'ঠিক ভবঘুরে না। এক জায়গায় বেশি দিন কাজ করতে ভাল লাগে না, এই যা। তবে, পশ্চিমের অনেক জায়গায় আমি ঘুরেছি, এটা ঠিক।'

'মার্ক্যার তোমাকে কাজ দেওয়ার জন্য বসে আছে কে?'

'হয়তো এড রুফাস।'

'এড রুফাস!' লুথারের কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়।

'আর বোলো না। সেই ভোর থেকে খেটে মরছি আমি। রওয়ানা হয়েছিলাম ফোর্ট ডেভিস থেকে। একটানা...'

'কোথা থেকে আসছ তুমি?' জেকের কথা শুনে আরও বেড়ে গেল শেরিফের বিস্ময়টা।

'ফোর্ট ডেভিস। সেই ভোর থেকে স্যাডলের উপর বসে আছি। বিশ্বাস হয় কথাটা? বিকেলের কিছু আগে গিয়ে হাজির হলাম জেড বি-তে। ওরা বলল, মালিক নেই, মার্ক্যার গেছে। রুফাস নেই শুনে তার ফোরম্যানের সাথে দেখা করতে চাইলাম। ওরা জানাল, সে ব্যাটাও নাকি নেই, রুফাসের সঙ্গে সেও নাকি মার্ক্যার গেছে। কী আর করা। ঘোড়া ছুটলাম আবার। একটা ওয়াটার ট্যাঙ্কের ধারে বসে বিশ্রাম নিলাম কিছুক্ষণ। তারপর বোধহয় জীবনের সবচেয়ে বড় ঠকুটা ঠকলাম,' মিথ্যে গল্পটাকে আকর্ষণীয় করবার জন্য ইচ্ছেকৃতভাবে থামল জেক, গলায় বাঁধা রুমালটার গিঁঠ খুলে হাতে নিল। তারপর সময় নিয়ে মুখ মুছল।

'ঠকলে মানে?' শেষ পর্যন্ত ধৈর্য না রাখতে পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেলল কার্ক।

'আর বোলো না। কোন্...' একটা ভয়াবহ অনীল গাল দিল জেক, 'একটা সাইনবোর্ড বসিয়েছে মাইল তিনেক পেছনের ট্রেইলে। সাইনবোর্ডটাতে লেখা আছে, মার্ক্যার চার মাইল। তুমি তো নিশ্চয়ই জানো, শেরিফ, ট্রেইলটা তিন ভাগে ভাগ হয়েছে সেখানে। একটা ডানে, একটা সোজা আর একটা এই রাস্তা বরাবর। যা-ই হোক, একটু ডানদিকে কাত করে বসানো ছিল বোর্ডটা। সেটা দেখে যে কোন স্ট্রেঞ্জার ধরে নেবে, ডানের ট্রেইলটা মার্ক্যার যাওয়ার। আমিও সেরকমই অনুমান করলাম। কিন্তু, মাইল দুয়েক এগুতেই দেখি একটা জঙ্গলে হাজির হয়েছে। শালা...' গালটা আবার দিল জেক। 'ফিরলাম আবার। সাইনবোর্ডটার সামনে দাঁড়িয়ে বামে না সোজা যাব, ভাবলাম কিছুক্ষণ। শেষ

পর্যন্ত বামেই এলাম। তারপরে ঘটল আরেক ঘটনা, আবার থামল জেক। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছল অনর্থক। লুথারের মুখটা যাচাই করে বুঝবার চেষ্টা করল, ওর গল্পটা বিশ্বাস করছে কি না ধৃত শেরিফ। আধো আলো, আধো আঁধারে বুঝতে পারল না ঠিকমত।

‘কী হলো? বোবা হয়ে গেলে কেন হঠাৎ?’ জেককে প্রায় ধমক দিল শেরিফ।

নিজের সাফল্যে ভিতরে খুশি হলেও সেটা প্রকাশ পেতে দিল না জেক। লুথারের তাড়া খেয়ে মিথ্যে গল্পটা শুরু করল আবার, ‘পেছনের ওই বাঁকটা পার হলে,’ বাম হাতের বুড়ো আঙুল তুলে পিছনের দিকে নির্দেশ করল সে, ‘একটা ছোট রানশ্ পাবে তোমরা। কী নাম, কে জানে। আমি ভাবলাম, যাক, কপাল গুণে আরেকটা রানশ্ পেয়েছি। কাজ জুটে যেতে পারে এখানে। ঢুকলাম ভেতরে। কিন্তু, একটা কোরাল, একটা বার্ন আর একটা কেবিন ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেলাম কেবিনটার দিকে। কেউ সাড়া দিল না। কেবিনের কাছে পৌঁছে দেখলাম, মাটিতে পড়ে আছে কিছু কাপড়-চোপড় আর একটা ফুটো হয়ে যাওয়া ক্যান্টিন। হাঁ হয়ে খুলে আছে কেবিনটার দরজা, অনেক ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া না পেয়ে ঢুকে পড়লাম সেটার ভেতরে। পুরো কেবিনটা ঘুরেও পেলাম না কাউকে। বেডরুমে দেখতে পেলাম এলমেলা হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে কাপড়-চোপড় আর কাগজপত্র। তারপর দেরি করলাম না আর। ঘোড়া নিয়ে সোজা রওয়ানা হয়ে গেলাম।’ একটু থামল জেক। দম নিল। তারপর বলল, ‘কিন্তু, তোমাদের ঘটনাটা কী? তোমরা যাচ্ছ কোথায়?’ স্যামের দিকে একবার ভালমত তাকাল সে। ‘তোমার বন্দী নাকি, শেরিফ?’ পিছমোড়া করে বাঁধা স্যামকে ইঙ্গিত করল সে, ‘অপরাধ কী লোকটার?’

স্যামের অপরাধটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল লুথার। তারপর জিজ্ঞেস করল জেককে, ‘তুমি তো ফোর্ট ডেভিস থেকে আসছ, তাই না? স্যামের দিকে ভালমত তাকিয়ে দেখো তো, গত রাতে ওকে ফোর্ট ডেভিসের সেলুনে দেখেছিলে কি না?’

‘স্যাম?’ নামটা যেন পূর্ব পরিচিত, এমন টঙে বলল জেক, ‘মানে স্যাম ওয়েড? আরে, গতরাতে না তোমার সাথে সেলুনে পোকার খেললাম?’

‘ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ,’ এতক্ষণ পর মুখ খুলল স্যাম, ‘তুমি জেক রায়ার না? গতরাতে ভাল একটা দান মেরেছিলাম তোমার কাছ থেকে।’

‘একেই বলে কপাল, বুঝলে বন্ধু। গতরাতে তোমার হাতে ছিল ইস্কাপনের টেক্সা, আজ সে হাতদুটোই পিছমোড়া করে বাঁধা। শালা...’ অশ্লীল গালটা আবার দিল জেক, ‘জীবনটাই একটা জুয়া।’

‘ভাবের কথা বাদ দাও এখন,’ নীরস গলায় বলল শেরিফ। ‘আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো দেখি, স্ট্রেঞ্জার। স্যাম ফোর্ট ডেভিস ছেড়ে মার্ক্যার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল কখন?’

‘রাত দশটা পর্যন্ত তো খেললামই আমরা,’ ইচ্ছেমত মিথ্যে বলছে জেক, ‘তারপর আমি চলে গেলাম স্টেবলে। আমার ঘোড়াটাকে সেখানেই রেখেছিলাম। এক ডলারের বদলে একটা চালায় আমাকে থাকতে দিল স্টেবলম্যান। ভোরে উঠার জন্য আমিও দেরি না করে শুয়ে পড়লাম। কাজেই, এই স্যাম ওয়েড কখন ফোর্ট ডেভিস ছেড়েছিল, ঠিক বলতে পারব না। তবে, গর্ডনকে জিজ্ঞেস করলে বোধহয় বলতে পারবে।’

‘গর্ডনটা কে?’ উত্তরটা জানা থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

‘গর্ডন ফেবলস। ফোর্ট ডেভিসের একমাত্র সেলুনের বারটেন্ডার। সারা শহর ওকে গর্ডি নামে চেনে। ওই গর্ডি আর এই স্যামের মধ্যে মনে হয় খুব খাতির আছে, গতরাতে হাসাহাসি করে কথা বলতে দেখেছিলাম দু’জনকে।’

যেন কিছু ঝুঁঝতে পেরেছে, এমন ভঙ্গিতে উপরে-নীচে মাথা দোলাল শেরিফ লুথার।

‘কিন্তু, স্যামকে নিয়ে তো তোমার মার্ক্যার যাওয়া উচিত, লুথার। তুমি যাচ্ছ কোন্ দিকে?’

‘মার্ক্যাতেই তো যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কার্কের, মানে ওই লোকটার,’ কার্কের দিকে ইঙ্গিত করল শেরিফ, ‘মনে হলো, বার স্টিরাপের লেটার বক্সটা খুলে দেখা উচিত। ওর ধারণা, কোথাও চলে যাওয়ার আগে হয়তো সেখানে কোন মেসেজ রেখে গেছে ওর ভাই-ভাবি।’

‘তুমি কি পাগল, কার্ক?’ সরাসরি জানতে চাইল জেক, ‘কেবিনটা দেখেছি আমি। মেসেজ রাখার অনেক জায়গা আছে সেখানে। ডাইনিং টেবিল, সোফার সামনের টেবিল, বেডরুম—এত সব জায়গা ছেড়ে লেটার বক্সের ভেতরে মেসেজ রাখতে যাবে কেন তোমার ভাই?’

‘বেশি বকবক কোরো না,’ হঠাৎ রোগে গেল কার্ক, ‘আমার মনে হয়েছে রাখতে পারে, তাই আমি দেখতে যাচ্ছি। তোমার কোন অসুবিধা আছে?’

‘আরে না। আমার আবার অসুবিধা কীসের? তোমার রানশের লেটার বক্স, তুমি দেখবে না তো কে দেখবে? অনুমতি দিলে আমিও আসি তোমাদের সাথে। ঘটনাটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে আমার কাছে।’

কী ভেবে রাজি হয়ে গেল কার্ক। শেরিফও কোন প্রতিবাদ করল না।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল জেক। যার যার ঘোড়া হাঁটিয়ে ওরা এসে থামল বার স্টিরাপের লেটার বক্সের সামনে। জায়গাটা খেয়াল করল জেক।

একটা জুনিপার গাছে কায়দা করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে বক্সটা। কোন

স্ট্যান্ড ব্যবহার করা হয়নি। আগে থেকে জানা থাকলে লেটার বক্সটা চোখে পড়তে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ফস্ করে একটা ম্যাচ জ্বালল কার্ক। বক্সটার গায়ের রঙ দেখতে পেল জেক। টকটকে লাল। তারমানে, চোখে পড়বার জন্য সব ব্যবস্থাই করেছিল টম।

বক্সটা খুলে ভিতর থেকে দুটো চিঠি বের করে আনল কার্ক। জিনিসদুটো শার্টের পকেটে রাখতে রাখতে বলল, ‘নাহ্, কোন মেসেজ নেই ভেতরে। এমনিতে খুব একটা চিঠি আসত না আমাদের নামে। মাসের পর মাস খালিই পড়ে থাকত এই বক্সটা। এখন দেখি দু’ দুটো এসে বসে আছে। বোধহয় লেটার বক্সটা খুলেও দেখেনি টম।’ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিতে নিতে কথা চালিয়ে গেল সে, ‘তুমি তো জানোই লুথার, প্রেম করে পালিয়ে ঝিয়ে করেছিল টম আর লুসি। সে জন্য লুসির উপর দারুণ ক্ষাপা ছিল ওর বাবা। টমের বিয়ের পর এখানে এসে আস্তানা গাড়লাম আমরা দুই ভাই, সাথে এল লুসি। ওহায়ো ছেড়ে এত দূরে চলে আসার পর থেকে নিজের বাড়ির সাথে বলতে গেলে কোনরকম যোগাযোগই ছিল না লুসির। এদিকে আমার পরে আর কোন সন্তান জন্ম দেওয়ার আগেই মারা গেল মা, তার এক বছরের মাথায় বাবা। কাজেই, নিকট আত্মীয় বলতে তেমন কেউ নেই আমাদের। সবই পুরনো কথা, তোমাকে আর কী বলব? আমাকে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছে টম। ও-ই আমার বাবা-মা,’ বলতে বলতে চোখ মুছল কার্ক। ধরা গলায় বলল, ‘এ কারণেই টমকে না দেখতে পেয়ে এতটা ক্ষেপে গেছি আমি।’

কোন মন্তব্য করল না কেউ। ঘোলাটে চাঁদের আলো মাথায় নিয়ে প্রায় নিঃশব্দে মার্ফার দিকে এগিয়ে চলল ওরা চারজন।

পাঁচ

মার্ফায় ঢুকে পকেট থেকে ঘড়িটা বের করল শেরিফ। দেখল মনোযোগ দিয়ে। তারপর ঘোষণা করল, ‘সাড়ে আটটা।’

সোজা জেল হাউসের দিকে এগিয়ে গেল শেরিফ। স্যামের রোনটার লাগাম ধরে আছে সে বাম হাতে, সুতরাং, তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য স্যাম। বাকি দু’জন স্বেচ্ছায় এগুল লুথারের পিছু পিছু।

দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা স্যামকে অপরাধী বলে চিনে নিতে কষ্ট হলো

না উৎসুক জনতার। দুয়েকজন এগিয়ে এল। কী দোষ স্যামের, জানতে চাইল। সংক্ষেপে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিল শেরিফ। আধঘণ্টার মধ্যেই সারা মার্ফা জেনে গেল খবরটা।

জেল হাউয়ের সামনের একটা হিচিং রেইলে প্রথমে নিজের, তারপর স্যামের ঘোড়াটাকে বাঁধল লুথার। স্যাডল থেকে স্যামকে নামতে সাহায্য করল সে। তারপর ওকে নিয়ে ঢুকল জেল হাউয়ে। ওর পিছু পিছু কার্ক আর জেক।

লোকের ঘোড়া দেখা জেকের স্বভাব। কৈশোর থেকেই সে ভবঘুরে, সে সময় এক প্রৌঢ় রেড ইন্ডিয়ানের সাথে খাতির ছিল তার। লোকটা বলেছিল, ঘোড়া দেখে পশ্চিমে লোক চেনা যায়। তাই, কার্ক ভিতরে ঢুকে পড়লেও দরজায় দাঁড়িয়ে গেল সে, উল্টো ঘুরল। একনজর দেখে নিল কার্কের ঘোড়াটাকে।

কার্কের ঘোড়াটা কালো রঙের একটা রোন। হাড় জিরজিরে শরীর। আকৃতিতে মাঝারি। কতদিন খেতে পায় না, কে জানে। বহু ব্যবহারে প্রায় ধসে গেছে সস্তা স্যাডলটা।

আবার ঘুরে ভিতরে ঢুকে পড়ল জেক।

জেল অফিসের ডেস্কের উপর রাখা একটা বড় আকৃতির কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালল লুথার। তারপর ডেস্কটার ড্রয়ার থেকে একটা ছুরি বের করে বাঁধন কাটল স্যামের। হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল হাজতের সামনে, ভেতরে ঢুকিয়ে লাগিয়ে দিল তালা। চাবিটা আগের মত ঝুলিয়ে দিল দেয়ালে গাঁথা পেরেকের সাথে। খেয়াল করল জেক, সারাজীবন চেষ্টা করলেও চাবির গোছটা আয়ত্ত্ব করতে পারবে না স্যাম বা অন্য কোন হাজতি।

ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারটায় গিয়ে বসল শেরিফ। ওর সামনের একটা চেয়ারে কার্ক। জেল অফিসের দরজাটার কাছে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জেক।

‘এবার কী করব আমরা, লুথার?’ জানতে চাইল কার্ক।

‘অপেক্ষা,’ এক কথায় উত্তর দিল শেরিফ।

‘অপেক্ষা?’ পুনরাবৃত্তি করল কার্ক। ‘বুঝলাম না।’

‘দেখছ না অফিসে নেই আমার ডেপুটি? হয়তো এই মুহূর্তে সেলুনে বসে গলা ভেজাচ্ছে সে। লোকমুখে আমার ফেরার কথা শুনে দৌড়ে আসবে এখানে। তারপর তাকে ফোর্ট ডেভিসে পাঠাব আমি। স্যামের কথাটা যাচাই করতে হবে। একজন সাক্ষী তো আছেই আমাদের কাছে,’ জেকের দিকে ইঙ্গিত করল সে, ‘দেখা যাক, গর্ডন ফেবলস কী বলে।’

কার্ক কিছু বলল না দেখে আবার বলল শেরিফ, ‘তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে, স্ট্রোজার?’

‘জেক রায়ার। শুধু জেক বলে ডাকলেই চলবে।’

‘জেক, তুমি মার্কায় থাকবে কতদিন?’

‘কোন কাজ না পেলে দুই দিন।’

‘হ্যাঁ, থাকো। তোমাকে দরকার হবে আমার। আমরা...’ কথাটা শেষ করতে পারল না লুথার। জেল অফিসের দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকল ডেপুটি শেরিফ হার্শেল ম্যাথিউয়। আরেকটু হলেই জেককে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলে দিয়েছিল সে।

‘এসব কী শুনছি, লুথার? টম আর লুসিকে নাকি খুন করা হয়েছে? স্যাম নামের এক লোককে নাকি গ্রেপ্তারও করেছে তুমি?’

‘ওদেরকে সত্যিই খুন করা হয়েছে কি না সে ব্যাপারে আমি এখনও নিশ্চিত না। কিন্তু, দুপুরের পর থেকে যে ওরা উধাও, সেটা জানি। এইমাত্র বার স্টিরাপ থেকে ঘুরে এলাম। আলামত দেখে খারাপ কিছু সন্দেহ করছি।’ একটু থামল শেরিফ। দম নিল। তারপর বলল, ‘তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, হার্শ। ফোর্ট ডেভিসে যেতে হবে।’

‘ফোর্ট ডেভিস!’ আশ্চর্য হয়ে গেল ডেপুটি। ‘কেন?’

কেন, সেটা ম্যাথিউয়কে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলল লুথার। সব শুনবার পর একটা হারিকেন জ্বালল ম্যাথিউয়। তারপর হারিকেনটা হাতে নিয়ে হাজতের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভালমত দেখল স্যামকে।

‘কী, দেখছ কী তুমি?’ খেঁকিয়ে উঠল স্যাম, ‘রূপ গজিয়েছে নাকি আমার?’

‘না, গজায়নি,’ স্বীকার করল ম্যাথিউয়। ‘চিনে রাখলাম তোমাকে।’

পিছন থেকে ডাকল শেরিফ, ‘ডিনার করেছ তুমি, হার্শ?’

‘হ্যাঁ, ডিনার সারতেই তো রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম।’

‘তা হলে আর দেরি না করে রওয়ানা হয়ে যাও। টম আর লুসির ভাগ্যে সত্যিই কী ঘটেছে, জানতে চাই আমি। এবং, খারাপ কিছু ঘটে থাকলে দোষী ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে চাই।’ কথাটা বলবার পর লুথার বুঝিয়ে বলল, ফোর্ট ডেভিসে গিয়ে কী করতে হবে ম্যাথিউয়কে। সবশেষে বলল, ‘ফোর্ট ডেভিস থেকে মার্কায় আসা রাস্তাটা এক জায়গায় তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। মনে আছে, হার্শ?’

‘মনে থাকবে না কেন? হয়েছে কী সেখানে?’

‘অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে। স্যাম আর এই লোক, নাম জেক রায়ার, দু’জনই বলছে, ওই জায়গাটাতে একটা সাইনবোর্ড দেখেছে তারা। সাইনবোর্ডটাতে লেখা ছিল, মার্ক্য চার মাইল।’

‘কিন্তু,’ প্রতিবাদ করল ডেপুটি, ‘ব্যাপারটা কীভাবে সম্ভব?’ এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সে, ‘উঁহঁ, হতেই পারে না।’

‘হতে পারে কি পারে না, সেটা দেখবে তুমি। সেখানে গিয়ে থামবে, নামবে ঘোড়া থেকে। যদি সত্যিই কোন সাইনবোর্ড দেখতে পাও, তাহলে পড়বে লেখাটা। মনে রেখো, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

আর কথা বাড়াল না ডেপুটি। গানর্যাক থেকে একটা উইনচেস্টার তুলে নিয়ে একবার পরীক্ষা করল। সন্তুষ্ট হয়ে হাত বুলাল গানবেল্টে, নিশ্চিত হয়ে নিল বুলেটে পূর্ণ আছে বেল্টটার প্রতিটা খাঁজ। তারপর স্যামের দিকে আরেকবার তাকিয়ে ঝড়ের গতিতে জেল অফিস থেকে বাইরে বের হয়ে গেল। একটু পরেই শোনা গেল তার ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ।

‘যা বলছিলাম,’ আবার শুরু করল শেরিফ। ‘আমরা এখন চিঠিদুটো পড়ে দেখব কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না। কার্ক, বের করো দেখি চিঠিদুটো।’

আদেশ পালন করল কার্ক। জেল হাউয়ের দরজা ছেড়ে শেরিফের ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেল জেক।

খামদুটোর একটা হলুদ, আরেকটা সাদা। আগে নিজের হাতে নিয়ে ওদুটো যাচাই করছিল কার্ক, সাদা খামটা দেখামাত্রই চোঁচিয়ে উঠল, ‘আরে! কী আশ্চর্য! এই চিঠিটাই তো আমি লিখেছিলাম টমকে।’ দেরি না করে হলুদ খামটা শেরিফের টেবিলের উপর রাখল সে। তারপর সাদা খামটার একপ্রান্ত ছিড়ে ফেলল। ভিতর থেকে বের করে আনল সাদা কাগজে লেখা চিঠিটা। এক মুহূর্তও দেরি না করে দুমড়ে-মুচড়ে খামটাকে ফেলে দিল ওয়েস্টপেপার বাক্সেটে। চিঠিটার ভাঁজ খুলে দেখল একনজর, তারপর বাড়িয়ে ধরল শেরিফের দিকে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে জোরে পড়তে আরম্ভ করল লুথার –

‘টম,

একই সাথে একটা ভাল আর একটা খারাপ খবর আছে তোমার জন্য। ভাল খবরটাই জানিয়ে রাখি আগে।

বিগ বেভের একটা মাইনিং ক্যাম্পে চাকরি করছি আমি। প্রথম মাসটা এই ক্যাম্পেই শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছি। আমার যোগ্যতা দেখে ওরা ক্যাম্পটার ম্যানেজার বানিয়ে দিল আমাকে। বেতন আমার একার জন্য অনেক। আবার থাকাটাও ফ্রি। ক্যাম্পের সঙ্গে লাগোয়া একটা শ্যাকে ফোরম্যানের সাথে থাকি। এখানে আমার দিনকাল মোটামুটি ভালই কাটছে।

খারাপ খবরটা এই চিঠিতে জানাব না। সাহস হচ্ছে না। খুব শীঘ্রিই টানা তিন দিনের ছুটি পেতে যাচ্ছি। ছুটিটা বার স্টিরাপে কাটাব ভেবেছি। সেখানেই দেখা হবে তোমার সাথে। খবরটা তখন জানাব তোমাকে।

এখানে কাজের অনেক চাপ। দম ফেলারও সুযোগ পাওয়া যায় না। ডিনার শেষ করে চিঠিটা লিখলাম তোমাকে। এখনই বিছানায় উঠব। খুব ভোরে কাজ আরম্ভ হবে, কাজেই ঘুম থেকে উঠতে হবে সকাল সকাল।

আর বেশি কিছু লিখলাম না। তাড়াহুড়ো করে লিখতে গিয়ে কোন ভুল হয়ে থাকলে রাগ কোরো না। ইতি—

কার্ক পোলার্ড।”

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সবাই। পরিবেশটা ভারী হয়ে উঠল অকারণেই। দাঁড়িয়ে না থেকে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল জেক। ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ অকারণে কটমট করে তাকিয়ে থাকল শেরিফ।

‘দ্বিতীয় চিঠিটাও পড়ে ফেলো, লুথার,’ তাগাদা দিল কার্ক।

হলুদ খামটা ছিঁড়বার আগে প্রেরকের নামটা ভালমত দেখল শেরিফ লুথার। লুই মিডোস। ওহায়ো থেকে এসেছে চিঠিটা।

‘ওহায়ো?’ অনিশ্চিতভাবে প্রশ্নটা করল লুথার। ‘লুসির বাপের বাড়ি না সেখানে?’

‘হ্যাঁ,’ উপরে-নীচে মাথা দোলাল কার্ক।

‘কে এই লুই মিডোস?’

‘আমি চিনি না। চিঠিটা পড়ে দেখো না, হয়তো পেয়ে যাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর।’

খামটা ছিঁড়ে ভিতর থেকে একটা দামি কাগজ বের করে আনল শেরিফ।

‘মনে হয় পয়সাআলা লোক এই মিডোস,’ ভাঁজ খুলে পড়তে আরম্ভ করল সে চিঠিটা—

‘প্রিয় লুসি,

তোমাকে হয়তো মিসেস পোলার্ড বলে সম্বোধন করতে পারতাম, কিন্তু, আমার চোখে এখনও তুমি সেই ছোট লুসিই রয়ে গেছ। জীবন কত দ্রুত পাল্টে যায়, তা-ই না?

একটা খারাপ খবর আছে তোমার জন্য। খবরটা আমাকেই জানাতে হচ্ছে বলে আরও খারাপ লাগছে আমার কাছে। কিন্তু, এমন কোন দায়িত্বশীল লোক খুঁজে পেলাম না, যার মাধ্যমে খবরটা তোমাকে দিতে পারি। তার করতে পারতাম, কিন্তু, এসব কথা তাকে বলবার মত নয়।

লুসি, বার্ষিক্যজনিত কারণে গত পরশুদিন মারা গেছে তোমার বাবা। শুক্রবার রাতে হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়ল সে, সারারাত ছটফট করবার পর শেষ রাতের দিকে তার অবস্থা কিছুটা ভাল হল। কিন্তু, সকাল আটটার দিকে আবার ছটফট করতে আরম্ভ করল। দশটার দিকে মারা গেল বেচারা।

এভাবেই প্রায় আত্মীয়-স্বজনবিহীন অবস্থায় মারা গেল তোমার বাবা, আমার স্কুল জীবনের বন্ধু জন অসকার।

ভালবেসে বিয়ে করেছিলে তুমি টম পোলার্ডকে। জন মেনে নেয়নি বলে দু’জনে পালিয়ে গিয়েছিলে মার্কায়। রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল জন। তোমাকে

তাজা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলাম ওকে। কাউকে কিছু না জানিয়ে আমার মাধ্যমে একটা উইল করল সে। তাতে লেখা থাকল, ওর মৃত্যুর পর একমাত্র সন্তান হিসাবে ওর সমস্ত সম্পত্তি পাবে তুমি।

লুসি, এখন তোমার ওহায়েতে ফিরবার সময় হয়েছে বলে আমি মনে করি। তুমি নিশ্চয়ই জানো, কত ধনী ছিল তোমার বাবা। ওহায়েতে ছয়টা বিশাল ফার্ম, সেগুলো দেখাশোনা করবার জন্য শত শত কর্মচারী। আর ব্যাঙ্কে যে কত টাকা আছে, সেটা আমি নিজেও জানি না। তোমার একমাত্র চাচা বিল অসকারের কথা তো জানোই। সহজ-সরল, ভুলোমনা মানুষ; সারাদিন গির্জার এককোণে পড়ে থাকতে পারলে আর কিছু চায় না। তার মত সাধু প্রকৃতির মানুষকে দিয়ে জনের সম্পত্তির দেখাশোনা হবে না। তোমাকেই এখন বুঝে নিতে হবে সব। নইলে লুটেপুটে খেয়ে লোকে বাকি রাখবে না কিছু।

আগামীকাল তোমার বাবাকে কবর দেওয়া হবে গির্জার পাশের কবরস্থানটাতে। তুমি উপস্থিত থাকলে ভাল হত। কিন্তু, এত তাড়াতাড়ি তুমি পৌঁছতে পারবে না জেনে আর তার করলাম না তোমাকে।

তোমার কোন প্রশ্ন থাকলে আমাকে নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করতে পারো। আর, আবারও বলছি, যত তাড়াতাড়ি পারো, এসে পড়ো ওহায়েতে। হাজার হোক, জন তোমার বাবা, সে এখন সমস্ত সেবা-শুশ্রূষার উর্ধ্বে; কিন্তু, তার সম্পত্তির প্রতি একটা দায়িত্ব আছে তোমার। ইতি—

লুই মিডোস

পরামর্শদাতা উকিল, ওহায়ে।”

আবারও নীরবতা নেমে এল পুরো জেল অফিসে। কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল কার্ক, ‘লুই মিডোস’ তাহলে একজন উকিল। আমার মনে হয়, এই চিঠিটা পেয়েই লুসিকে নিয়ে ওহায়ে দৌড় দিয়েছে টম।’

‘তোমার মাথায় বুদ্ধি একটু কম আছে, কার্ক,’ রক্ষস্বরে বলল শেরিফ। ‘চিঠিটা আমরা পেয়েছি লেটার বক্সে। সেটা কেউ খুলেওনি, পড়েওনি। আমরাই প্রথম জানলাম, মারা গেছে জন অসকার। সুতরাং, টম বা লুসির তো জানার প্রশ্নই আসে না।’

‘যদি না,’ চেয়ারে নড়েচড়ে বসল জেক, ‘চিঠিটা পোস্ট করার পর আবার একটা তার করে থাকে মিডোস।’

‘হয়তো সেই তারটা পেয়ে তাড়াহুড়ো করে রানশ্ ছেড়ে চলে গেছে ওরা,’ আবার একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল কার্ক।

‘ধরলাম ওহায়েতেই গেছে। কীভাবে গেল? স্টেজ কোচ ধরার জন্য মার্ফায় আসতেই হবে ওদের। তখনও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। মার্ফায় এল কীভাবে ওরা? ঘোড়ায় চড়ে আসেনি, ওয়াগনে চড়ে আসেনি। বরং, বার

সিঁরাপের কোরালে আমরা একটা অপরিচিত ঘোড়া পেয়েছি। এবার কী বলবে তুমি, কার্ক?’

‘বলব, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। গলা ভেজাতে সেলুনে যাচ্ছি আমি। তাছাড়া, খিদের আগুন জ্বলছে আমার পেটে। আগুনটা নিভলে হয়তো একই সাথে ঠাণ্ডা হবে পেট আর মাথা। তখন ভেবেচিন্তে কিছু একটা বলতে পারব।’

উঠে দাঁড়াল কার্ক। ধীর পায়ে হেঁটে চলে গেল বাইরে।

‘তুমি কী করবে এখন?’ জেককে জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

‘কেন? তুমি না থাকতে বললে আমাকে?’

‘মারফায় থাকতে বলেছি, আমার সাথে না। ইচ্ছে হলে যেতে পারো সেলুনে। গলা ভেজাতে পারো, ডিনার সারতে পারো। কিন্তু, ভেজাতে গিয়ে আবার বেশি ভিজিয়ে ফেলো না গলাটা। মাতাল হয়ে আইন ভঙ্গ করলে ওই স্যামের পাশে রাতটা কাটাতে হবে, আগেই বলে রাখলাম।’

ছয়

একটু পর পরই ভেসে আসছে হাসি-ঠাট্টা আর অশ্লীল গালি-গালাজের আওয়াজ। মাঝেমধ্যে সেগুলোর সাথে যোগ হচ্ছে গ্লাসে গ্লাসে বাড়ি খাওয়ার টুং টাং শব্দ অথবা ‘আমি জিতেছি!’ বা ‘দানটা আমার!’ জাতীয় চিৎকার। কথাগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে ভিতরের পরিবেশটা স্বাভাবিক।

সেলুনের বাইরে বুক সমান উঁচু ব্যাটউইং দরজাটার পাশে দাঁড়িয়ে ভিতরের পরিস্থিতি যাচাই করছিল জেক। ঢুকবার আগে নিশ্চিত হতে চায় সে, সবকিছু স্বাভাবিক আছে। পশ্চিমের সেলুন মানে কবরের দরজা। কথাটা যে জানে না, সে দুঃখপোষ্য শিশু।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকল জেক। এবং, দেরি না করে চলে গেল বারে। একটা খালি চেয়ার দখল করে আরাম করে বসল। প্রথমেই যাচাই করল বারটেন্ডারকে।

লোকটা বিশালদেহী। যেমন লম্বা, তেমন চওড়া। সারা দেহে ইচ্ছেমত মেদ জমিয়ে আরও বাড়িয়ে নিয়েছে প্রস্থটাকে। মাথায় চকচকে টাক। তার ফর্সা আঙুলগুলো ভীষণ ব্যস্ত; কখনও গ্লাস মুছেছে, কখনও মদ ঢেলে দিচ্ছে খন্দেরদের আবার কখনও চুলকাচ্ছে টাকটা। দারুণ মিষ্টক লোকটা; এক মুহূর্তও চুপ করে

না থেকে যখন যার সাথে দরকার কথা বলছে। খবর যোগাড় করবার ঘাঁটি, মনে মনে ভাবল জেক।

ঘাড় ঘুরিয়ে জুয়ার টেবিলগুলোর দিকে তাকাল সে। জমে উঠেছে খেলা প্রতিটা টেবিলে। ভাগ্য যাচাই করতে রাজি বলে মনে হচ্ছে সবাইকে। সস্তা চুরট টানতে টানতে সেলুনটার একপাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে জুয়াড়ীরা। অলসভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে গল্প করছে কেউ কেউ।

বেশিরভাগই কাউবয়, ভাবল জেক। দামি পোশাক পরা দুয়েকজন হয়তো এই শহরের অধিবাসী, আর নইলে রানশের মালিক।

কার্কও হয়তো আছে এই ভিড়টার মধ্যে, জানে জেক। কিন্তু, তাকে দেখতে না পেয়ে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

‘কী চাই, স্ট্রেঞ্জার?’

বারটেভারের গলার আওয়াজে কিছুটা চমকে গেল জেক। লোকটা যে কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, টেরই পায়নি সে।

‘খবর।’

‘আচ্ছা?’ বারটেভারের দুই চোখে কৌতুক। ‘গলা ভেজাবে না তুমি?’

‘তোমার খবরটা কি এতই শুকনো যে, গলা না ভেজালে নামবে না আমার পেটে?’

হাসল বারটেভার। ‘নির্ভর করছে তুমি কী জানতে চাও, সেটার উপর।’

কিছুক্ষণ চিন্তা করল জেক। ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়বে কি না, ভাবল একবার। তারপর জিজ্ঞেসই করে ফেলল, ‘বার স্ট্রাপে আজ দুপুরে অতিথি হয়ে কে গিয়েছিল, সেটা জানতে চাই।’

প্রশ্নটা শুনে মুখচোখ গম্ভীর হয়ে গেল বারটেভারের। জিজ্ঞেস করল, ‘কে তুমি?’

‘যে নামে তুমি আমাকে সম্বোধন করেছিলে। স্ট্রেঞ্জার।’

‘নাম?’

‘জেক রায়ার।’

‘মিস্টার জেক রায়ার, ভুল জায়গায় ভুল প্রশ্নটা করলে তুমি। সারা শহর এখন টম আর লুসির খুনটা নিয়ে মেতে আছে। প্রত্যেক স্ট্রেঞ্জারকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। তোমার জায়গায় আমি হলে মার্কায় ঢুকতামই না, কেটে পড়তাম। তুমি হয় দুঃসাহসী, আর নইলে মস্ত বড় বোকা।’

‘ধরে নাও দ্বিতীয়টাই ঠিক। এখন আমার প্রশ্নটার উত্তর দাও দেখি।’

‘আমার জানা নেই,’ বলেই নতুন একজন খন্দেরকে আপ্যায়ন করতে চলে গেল বারটেভার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেক। কথা বলবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো না

মিথ্যে বলছিল বারটেভার লোকটা। হয়তো সত্যিই কিছু জানে না সে।

আচ্ছা, মনে মনে ভাবল জেক, ভুল জায়গা বলল কেন লোকটা? ওটা কি এমনিই কথার কথা? নাকি কিছু একটা ইঙ্গিত করেছে সে?

বারটেভারের পিছনের বড় আয়নাটার দিকে তাকিয়ে নিশুপ বসে রইল জেক। রেস্টুরেন্টে যাওয়া দরকার, প্রচণ্ড ক্ষুধা টের পাচ্ছে সে, কিন্তু, কেন যেন মনে হচ্ছে, কোন একটা গোলমাল আছে এই সেলুনটাতে।

কী সেটা? কার্ক? তাকে দেখতে পাচ্ছে না বলেই কি কাঁটাটা বিধে আছে মনের ভিতরে? উত্তরটা চিন্তা করবার সময় পেল না জেক। পাশের চেয়ারে বসা ভালুকের মত লোকটা বিয়ারের গ্লাস থেকে মুখ তুলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল তাকে, ‘আজকে বার স্টিরাপ থেকে ঘুরে এসেছ নাকি তুমি?’

প্রশ্নটার আকস্মিকতায় কিছুটা চমকে উঠল জেক। এক মুহূর্ত ভেবে সত্য বলবার সিদ্ধান্ত নিল।

‘হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বটে। কেন জিজ্ঞেস করলে কথাটা?’

‘টম বা লুসি খুন হলে আমারও কিছু অসুবিধা আছে তো, তা-ই।’

‘তোমার অসুবিধা আছে মানে? কে তুমি?’

‘এড রুফাস। জেড বি-এর মালিক।’

‘তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস্টার রুফাস। কিন্তু,’ বোকার ভান করল জেক, ‘অসুবিধা আছে বলছিলে কেন?’

কয়েক মুহূর্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল রুফাস। তারপর বলল, ‘পানি নিয়ে একটা ঝগড়া ছিল আমার সাথে টমের। আমি অল্পতেই মাথা গরম করে ফেলি, নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি না নিজের উপর। এই তো, ধরো, বছরখানেক আগে এই সেলুনেই আমি টমকে খুন করার হুমকি দিয়েছিলাম। অনেক লোক শুনেছিল কথাটা। এই যে এত গল্প করছে লোকে,’ চারদিকে তাকাল রুফাস, ‘আসলে আমাকে নিয়ে কঁথা বলছে তারা। কী বলছে, অনুমান করে নাও।’

‘ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেললে না কেন তোমরা?’

‘মিটিয়ে ফেলেছিলাম তো। শেরিফ লুথারের উপস্থিতিতে একটা চুক্তি হয়েছিল আমাদের। তারপর থেকে আর কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু...’

‘সমস্যা যদি না-ই হবে, তা হলে তোমাকে নিয়ে কথা বলছে কেন লোকে? আর তুমিই বা এতটা ঘাবড়ে গেছ কেন? নিশ্চয়ই কোন না কোন সমস্যা হয়েছে। লুকাচ্ছ তুমি।’

আরেক গ্লাস বিয়ার চেয়ে নিল রুফাস। ঢকঢক করে পানির মত শেষ করল গ্লাসটা। তারপর আরেক গ্লাস। সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল জেক। যে হারে গিলছে ভালুকটা, একবার মাতাল হলে টর্নেডো বইয়ে দেবে সারা সেলুনে।

হয়তো জেকের প্রশ্নটার উত্তর দিতে মুখ খুলেছিল রুফাস, বারটেভারের

পিছনের আয়নায় চোখ পড়াতে থেমে গেল। প্রায় ঘোর লাগা চোখে অপেক্ষা করে রইল।

আয়নার দিকে তাকাল জেক।

আয়নাটা এমন এক জায়গায় বসানো আছে, যে কোন অ্যাস্বেল থেকে ব্যাটউইং দরজাটা চোখে পড়বে। কিন্তু, দরজাটা নয়, জেকের দৃষ্টি কেড়ে নিল কার্ক।

এতক্ষণ পর সেলুনে হাজির হয়েছে সে। কিছুটা আশ্চর্য হলো জেক। ওর আগেই জেল অফিস থেকে বের হয়েছিল কার্ক, অথচ হাজির হলো বেশ দেরিতে। অন্য কোথাও গিয়েছিল সে। কোথায়? মনে মনে নিজেকেই প্রশ্নটা করল জেক। হয়তো রেস্টুরেন্টে। ডিনার সেরে এসেছে মনে হয়। ডিনারের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে ক্ষুধাটা আবার উপলব্ধি করল জেক।

ধীরে-সুস্থে হেঁটে বারের কাছে এগিয়ে এল কার্ক। একটা খালি চেয়ার দখল করল। ড্রিঙ্ক নিল একটা। সময় নিয়ে চুমুক দিল তাতে। এক সময় ডানে-বামে ঘুরাতে আরম্ভ করল ঘাড়টা। এবং, সমস্যাটা শুরু হলো তখনই।

কার্কের তিন চেয়ার বামে বসে ছিল রুফাস। মুখটা হ্যাটের আড়ালে ঢেকে কার্কের নজরে না পড়বার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছিল। কিন্তু, দেহের আকৃতির জন্য বিফলে গেল তার চেষ্টাটা। তাকে ঠিকই চিনে ফেলল কার্ক। একটোকে ড্রিঙ্কটা শেষ করে এগিয়ে এল সে।

কার্ককে এগিয়ে আসতে দেখে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে গেল জেক, দেয়ালের এককোণে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল পরবর্তী ঘটনা।

‘এড রুফাস!’ প্রকট হুমকি কার্কের গলায়, ‘টম আর লুসি কোথায়?’

হ্যাটটাকে ঠেলে জায়গামত বসিয়ে দিল রুফাস। তাকে চিনে ফেলেছে কার্ক, এখন আর মুখ লুকিয়ে লাভ নেই। যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল সে, ‘আমি জানি না।’

‘বিশ্বাস করি না তোমার কথা,’ চৈঁচিয়ে উঠল কার্ক। ওর মুখটা হঠাৎ রাগে লাল হয়ে গেছে, খেয়াল করল জেক। ‘শালা মিথ্যুক, হারামজাদা, খুনী। চুক্তিনামাটার জন্য তুমিই খুন করেছ আমার ভাই-ভাবিকে।’

কথাটা শুনে রুফাসের প্রতিক্রিয়াটা হলো ভয়ানক। বিশাল শরীর নিয়ে একমুহূর্তে চেয়ার ছাড়ল সে। এবং, তারপরেই থাবা দিল হোলস্টারে। রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যাওয়ায় বোধহয় মনে ছিল না রুফাসের যে, ফিতে বাঁধা আছে ওর হোলস্টারে। এ কারণেই বেঁচে গেল কার্ক।

‘সবাই সাক্ষী থাকল, একজন নিরস্ত্র মানুষকে খুন করার জন্য পিস্তল বের করার চেষ্টা করেছিলে তুমি। তাতেই প্রমাণ হয়, টম আর লুসিকে নিরস্ত্র পেয়ে কে খুন করেছে।’ কার্কের গলা শুনে মনে হলো না, মোটেও ভয় পেয়েছে সে।

‘আজ কোমরে গানবেল্ট বাঁধিনি আমি। বাঁধলে হয়তো...’

‘হয়তো কী?’ সারা সেলুন কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল রুফাস। রাগে কাঁপতে কাঁপতে গানবেল্টটা খুলে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। তারপর মুঠি পাকিয়ে বলল, ‘আয়, লড়বি আমার সাথে? দেখি কত মুরোদ আছে তোর।’

কার্কের জন্য মায়া হলো জেকের। মনে মনে প্রার্থনা করল, লড়াইটা যেন না হয়। কিন্তু, তাকে আশ্চর্য করে দিয়ে পজিশন নিল কার্ক, মুঠি পাকাল সে-ও। ভাইয়ের জন্য সত্যিই পাগল হয়ে গেছে লোকটা, ভাবল জেক।

চওড়ায় কার্কের পাঁচগুণ হবে রুফাস। উচ্চতায় ইঞ্চি তিনেক খাটো। পাল্লাটা শেষ পর্যন্ত রুফাসের দিকেই ঝুকবে, সহজেই বুঝে গেল জেক।

কিন্তু, একেবারে নিখুঁত হলো না জেকের হিসাবটা। হাতাহাতি লড়াইয়ের সময় হালকা-পাতলা শরীর মানেই যে দুর্বলতা-লড়াইয়ের শুরুতে কথাটা মিথ্যে প্রমাণ করল কার্ক।

একে তো বিশাল দেহ রুফাসের, তার উপর প্রায় মাতাল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, লোকটা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আছে। সুযোগটা নিল কার্ক। খুব দ্রুত কয়েকবার সে চলে গেল রুফাসের হাতের নাগালে, আবার তার চেয়েও দ্রুতগতিতে বের হয়ে এল। প্রতিবারই নাগালে পাওয়া গেছে ভেবে সর্বশক্তিতে ঘুসি চালান রুফাস। একটাও লাগল না কার্কের দেহে। উল্টো নিজের ভারসাম্য বেশ খানিকটা হারিয়ে ফেলল সে, নিজের অজান্তেই চলে গেল কার্কের কাছে। তার নাকে, ঠোঁটে আর চোখের নীচে একনাগাড়ে বেশ কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিল কার্ক।

দুর্বল দেহ কার্কের। তার জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো সেখানেই শেষ হয়ে যেত লড়াইটা। কিন্তু, মারে তেমন জোর না থাকায় টিকে গেল রুফাস। টলমল করতে করতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। দুই হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ফেটে যাওয়া ঠোঁট থেকে রক্ত মুছল। অনেকটা অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকাল নিজের রক্তের দিকে। কার্কের কারণে যে এই রক্তপাত, বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

আঘাতগুলো পাওয়ার দরকার ছিল রুফাসের। ওর নেশা কেটে গেল পুরোপুরি। সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল সে। ধীর পায়ে এগিয়ে এল কার্কের দিকে। মুঠি পাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নাগালের বাইরে। কীভাবে আক্রমণ করবে, ঠিক করল বোধহয়।

হঠাৎ কার্কের দিকে দৌড়ে এল রুফাস। আসলে ধোঁকা দিল সে কার্ককে। ব্যাপারটা ধরতে না পেরে চট করে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল কার্ক, ভেবেছিল, তাকে মিস করবে রুফাস। কিন্তু, থেমে দাঁড়ানোর পর পরই কার্কের চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি চালান রুফাস। ঘুসিটা লাগল জায়গামত।

মাটি থেকে এক হাত উপরে উঠে গেল কার্ক। শূন্যে উড়াল দিল। অপেক্ষা করে রইল রুফাস। আসলে নিজেকে সময় দিল। তার ডান চোখের নীচের আঘাতটা গুরুতর, ইতিমধ্যেই প্রায় বুজে এসেছে চোখটা। বারকয়েক চোখটা খুলল আর বন্ধ করল সে। সেই সুযোগে উঠে দাঁড়াল কার্ক। মুঠি পাকিয়ে পজিশন নিল আবার।

কিন্তু, এরপর লড়াইটা হলো একতরফা। কার্ককে টলমল করতে দেখে তার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল রুফাস, কার্কের হাতের নাগালের বাইরে থেকে পা চালান আচমকা। ভারী পা-টা উঠে আসতে স্বাভাবিকের তুলনায় সময় নিল বেশি; কিন্তু, সময়টাকে কাজে লাগিয়ে সরে যেতে পারল না কার্ক। তলপেটে প্রায় দুই মণের সমান একটা আঘাত পেল সে, মুখ দিয়ে শরীরের সব বাতাস বের করে দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হলো। এটাই চাইছিল রুফাস। পা নামিয়ে নিজের ভারসাম্য ঠিক করল সে, তারপর সমানে চালান দুই হাত। কার্কের মাথায়, মুখে, বুকে, পেটে ইচ্ছেমত ঘুসি মারল। ছয়-সাতটা ঘুসি খাওয়ার পরই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কার্ক, নড়াচড়া করবারও শক্তি থাকল না তার শরীরে।

জিতে গেল রুফাস। মুখ হাঁ করে কিছুক্ষণ দম নিল সে, দুই মুঠি ক্রমাগত পাকাল আর খুলল। এতগুলো ঘুসি মেরে যথেষ্ট ব্যথা পেয়েছে হাতে, ব্যথাটা কমানোর চেষ্টা করল। তারপর এগিয়ে গেল মাটিতে নিশ্চল পড়ে থাকা কার্কের দিকে। তার মুখের উপর তুলল ডান পা; ইচ্ছে, এক আঘাতে খেঁতলে দেবে কার্কের চেহারাটা ঠিক এমন সময়ই সেলুনের দরজাটার কাছ থেকে ফাঁকা গুলির আওয়াজ হলো একটা। উপস্থিত জনতা ঘাড় ঘুরাল সেদিকে।

‘পা নামিয়ে নাও, রুফাস। তা না হলে বাকি জীবন খোঁড়া হয়ে কাটাতে হবে তোমাকে।’

শেরিফ দুখার। এবার একটা নয়, দুই হাতে দুটো পিস্তল ধরে আছে সে। দুটোই রুফাসের দিকে তাক করা।

পা নামিয়ে কার্কের থেকে তিন হাত দূরে সরে গেল রুফাস। বলল, ‘আমি না, কার্কই আগে শুরু করেছিল।’

পিস্তলের নিশানা সামান্যতম এদিক-ওদিক না করে হেঁটে সেলুনের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়াল শেরিফ। বারটেন্ডারকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, ‘কত গ্লাস গিলেছে রুফাস?’

‘পাঁচ,’ এক কথায় উত্তর দিল বারটেন্ডার।

‘ভ্রার কার্ক?’

‘এক।’

‘হাতদুটো মাথার উপরে উঠাও, রুফাস। মদ খেয়ে মাতলামি করার জন্য

তোমাকে শ্রেষ্ঠার করলাম আমি। চলো আমার সাথে জেলে।’

কথা বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না বুঝতে পেরে শেরিফের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল এড রুফাস। তাকে নিয়ে সেলুন ছেড়ে বের হয়ে গেল শেরিফ।

দুয়েকজন এগিয়ে গেল কার্কের দিকে। তবে তাদের বেশিরভাগই জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আহা-উহ করতে লাগল কেউ কেউ। কিন্তু, অজ্ঞান কার্ককে গুরুত্ব্য করবার দায়িত্ব নিল না। খারাপ লাগল জেকের, দ্রুতপায়ে গিয়ে দাঁড়াল জটলাটার সামনে। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল কয়েকজনকে। বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে গাল দিয়ে উঠল দুয়েকজন। পরোয়া করল না জেক। হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল মেঝেতে। কার্কের ঘাড়ের পিছনে হাত দিয়ে বসাল তাকে। তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। ডাক্তারখানাটা কোথায়, জিজ্ঞেস করতেই দুয়েকজন বলে দিল।

অনেকটা বীরের মত সেলুন ছেড়ে বাইরে বের হয়ে এল জেক। সময় নষ্ট না করে হাঁটা ধরল দ্রুত।

মার্কীর স্টেবল ছাড়িয়ে হাতের ডানদিকে একটা সাদা রঙের কাঠের দোতলা সাদা বাড়ি। বাড়িটা শহরের একমাত্র ডাক্তারের। দোতলায় আলো জ্বলতে দেখে বুঝল জেক, জেগে আছে বুড়ো ডাক্তার বেন।

সিঁড়ি বেয়ে কাঠের বারান্দায় উঠল জেক। কার্ককে নামিয়ে রাখল নীচে। তারপর দরজা ধাক্কাতে লাগল একটানা। কিছুক্ষণ পর উপর থেকে শোনা গেল কিছু অভিশাপের বাণী, তারপর রাগে গজরাতে গজরাতে দরজা খুলল ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। কড়া গলায় জানতে চাইল, ‘গুলিটা কি তুমিই খেয়েছ নাকি? মরোনি যখন, তখন গুলিটা ঢুকেছে কোথায়? পাছায়?’

‘আরে না,’ হেসে ভাব জমাবার চেষ্টা করল জেক, ‘পাছায় গুলি করে, এরকম কাঁচা লোকের সাথে খেলা করি না আমি।’ কার্কের দিকে ইঙ্গিত করল সে, ‘মার খেয়েছে আমার এই বন্ধু।’

‘খুব ভাল হয়েছে,’ দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল বৃদ্ধ চিকিৎসক, ‘ভেতরে ঢোকো এখন। তোমার সাথে গল্প করবার মত সময় নেই আমার।’

ভিতরে ঢুকে বসবার ঘরটার এককোণায় একটা হসপিটাল বেড দেখতে পেল জেক। সেটার উপর নামিয়ে রাখল কার্ককে। কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়ে আবার হাজির হল বেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার ভালমত যাচাই করল কার্ককে। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে? পাহাড়ি ঘোড়া ধরতে গিয়েছিলে নাকি তোমরা? দড়ি ছিঁড়ে ঘোড়াটা তোমার বন্ধুর উপর দিয়ে দৌড় দিয়েছে নাকি?’

ঘটনাটা খুলে বলল জেক। কাজ করতে করতে শুনল ডাক্তার। একই সাথে

মুখ চালিয়ে গেল।

‘এই শহরে আইন বলতে আর কিচ্ছু বাকি নেই, বুঝলে। বুড়ো হয়েছে আমাদের শেরিফ, আগের মত আর তেজ নেই ওর। এখন আর আগের মত সামলাতে পারে না সে। বুড়ো বয়সে মার্কী ছাড়তে হলে কোথায় যে যাব...’ আক্ষেপ করতে আরম্ভ করল বেন।

‘তুমি অল্পতেই ঘাবড়ে যাচ্ছ,’ সাহস দেওয়ার চেষ্টা করল জেক। ‘প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর এমনিই একটু মারামারি হয়েছে সেলুনে। তেমন গুরুতর কিছু না।’

‘তেমন গুরুতর কিছু না,’ জেককে ভেঙচাল বুড়ো ডাক্তার, ‘খোদা তোমার কানদুটো নিয়ে গেছে নাকি? কিছু শোনোনি তুমি?’

কী প্রসঙ্গে কথা বলছে বেন, ঠিক বুঝতে পারল না জেক। তারপরও সবজাতার ভান করে বলল, ‘আরে ওসব গুজব। কান দিয়ে না। দিলে ঠকবে।’

‘দিলে ঠকবে,’ আবার ভেঙচাল বেন। ‘টম আর লুসিকে খুন করেছে এক স্ট্রেঞ্জার, শোনোনি তুমি? তাকে গ্রেপ্তার করেছে শেরিফ। কিন্তু, ফাঁসিতে ঝোলাবে কি? ঝোলাবে না, ভেবে পাচ্ছে না বুড়োটা। আসলে ভয় পাচ্ছে সে। শহরবাসী ভাবছে, কাজটা তারা নিজেরাই করবে। এরকম অকর্মণ্য...’

আর কিছু শুনতে পেল না জেক। ভিতরে ভিতরে ভীষণ চমকে গেছে সে। শহরবাসী স্যামকে ঝুলিয়ে দিতে চাইছে? ভাবল সে। শেরিফকে জানাতে হবে কথাটা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

‘ঠিকই বলেছিলাম আমি। তুমি আসলে কালা,’ বেনের পরবর্তী কথাগুলো কানে এল জেকের, ‘এই যে, মিস্টার, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? কী ভাবছ? কোথায় চলে গেছে তোমার পাহাড়ি ঘোড়াটা?’

‘আরে না,’ হাসবার চেষ্টা করল জেক। কিন্তু, নিশ্চরণ হাসিটা ঠিকমত ফুটল না ওর ঠোঁটে। ‘আমি তো অনেকক্ষণ সেলুনে ছিলাম। কই, ফাঁসির ব্যাপারে তো কিছু শুনলাম না?’

রক্তভরা তুলার টুকরোগুলো ময়লা ফেলবার ঝুড়িতে ফেলল বেন। তারপর ব্যান্ডেজ বাঁধতে আরম্ভ করল কার্কের মাথায়। বলল, ‘কালারা শোনে না।’

কী বলবে ভেবে পেল না জেক। বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল বেনের কাজ। ডাক্তার রেগে যাবে কি না ভাবল একবার, তারপর সাহস করে বলেই ফেলল, ‘লোকটাকে ফাঁসিতে ঝুলালে খুব অন্যায় কাজ করবে মার্কীর লোকজন। ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার আছে লোকটার। তা ছাড়া এখনও প্রমাণিত হয়নি যে, সে-ই খুন করেছে টম আর লুসিকে।’

কার্কের পাঁজর পরীক্ষা করছিল বেন, মুখ না তুলেই বলল, ‘কথাটা অবশ্য খুব একটা ভুল বোলোনি। কিন্তু, এখানে সব চাষাভুষার বাস। কাকে ছেড়ে কাকে

আইনের কথা বলতে যাবে তুমি? তোমার কথা কেউ শুনবে না।' একটু থেমে ঘোষণা করল, 'নাহ্, ভাঙেনি মনে হচ্ছে,' তারপর আবার একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'তোমার বন্ধুকে চিনি আমি। কার্ক পোলার্ড। তুমি কে? স্ট্রেঞ্জার?'

উপরে-নীচে মাথা দুলিয়ে সম্মতি দিল জেক।

'তোমার চেহারা-সুরত খারাপ না, ভদ্রলোকের মতই দেখায়। এজন্যই বলছি, সাবধানে থেকো। আর সব রকমের ঝামেলা থেকে গা বাঁচিয়ে রেখো। মার্ক্যাবাসী কিন্তু এমনিতেই এক স্ট্রেঞ্জারের উপর খেপে আছে।'

'কে সে? শেরিফ যাকে ধরে এনেছে?'

'আরে না। লোকটার নাম ববি... না কী যেন। এই লম্বা,' নিজেকে ছাড়িয়ে আরও এক হাত উপরে ডান হাতটা তুলে দেখাল বেন, 'সেই অনুপাতে চওড়া। ধূসর একজোড়া গোঁফ আছে। আর, একেবারে নোংরা লোকটা।'

ওয়াটার ট্যাঙ্কে দেখা লোকটার কথা মনে পড়ে গেল জেকের। জানতে চাইল, 'কী করেছে লোকটা? আর যাই হোক, মার্ক্যার কারও পাকা ধানে মই দেয়নি নিশ্চয়ই?'

'তুমি দেখি ওর গুণ গাইছ!'' আশ্চর্য হয়ে বলল ডাক্তার। 'সেলুনে কারও সামনে বোলো না কথাটা। তা হলে কার্কের মত অবস্থা হবে তোমার।'

'সাবধান করার জন্য ধন্যবাদ, ডাক্তার। আমি আসলে চিনিই না লোকটাকে। সে কী করেছে, সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম।'

'কী করেছে, কেউই জানে না। কিন্তু, লোকটাকে দেখতে পারে না কেউই। সে আসার পর থেকেই কেমন যেন বদলে গেল শহরের পরিস্থিতি, একটা চাপা উৎকণ্ঠায় ভুগতে লাগল সবাই। তবে আজ সন্ধ্যার পর তাকে নিয়ে লোকজনের উদ্বেগ কিছুটা কমেছে।'

'কেন?' আশ্চর্য হয়ে গেল জেক।

'দুই হাতে গুলি খেয়ে আমার এখানে এসেছিল সে। দেখে মনে হচ্ছিল, যমের দুয়ার থেকে ফিরেছে। দুই কোমরে দুটো হোলস্টার পরত সে সব সময়, আজও পরেছিল; কিন্তু, হোলস্টারদুটোতে একটাও পিস্তল দেখতে না পেয়ে খুব অবাক হয়েছি আমি।'

সাত

হোটেলের রিসেপশন ডেস্কের পিছনে বসা লোকটা দিন শেষের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল ডেস্কের উপর মাথা রেখে। বেলের আওয়াজ পেয়ে

চমকে উঠল সে, বিরক্ত হয়ে তাকাল জেকের দিকে। যখন দেখল ব্যাভেজ বাঁধা প্রায় অজ্ঞান কার্ককে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেক, তখন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গেল তার বিরক্তির। কড়া গলায় জানতে চাইল, ‘কী চাই?’

‘একটা রুম। দুই বেডের।’

‘কতদিনের জন্য?’

‘চার।’

‘মালপত্র কোথায়?’

‘নেই।’

জেকের পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা কার্ককে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল, ‘এই লোকটা কে? কার্ক পোলার্ড না? কী হয়েছে ওর?’

‘মার খেয়েছে। আমি সেবা-শুশ্রূষা করছি।’

‘ভাল, খুব ভাল,’ হোটেল মালিকের চোখে স্পষ্ট সন্দেহ দেখতে পেল জেক। ‘ভাড়ার টাকার পুরোটা অগ্রিম দিতে হবে। পারবে?’

কার্কের পকেট থেকে আগেই বেশ কিছু টাকা সরিয়ে রেখেছিল জেক। অচেতন থাকায় কার্ক টের পায়নি ব্যাপারটা। নোটগুলো বের করল সে। পরিশোধ করল টাকাটা। ওর দিকে রেজিস্টার বইটা ঠেলে দিল হোটেল মালিক, বাম হাতে বাড়িয়ে ধরল একটা কলম।

কলমটা হাতে নিয়ে রেজিস্টার খাতাটার দিকে মনোযোগ দিল জেক।

ছয়টা কলাম করা আছে খাতাটিতে। প্রথমটাতে তারিখ, তারপরে বোর্ডারের নাম, তৃতীয়টাতে ভাড়া নেওয়া রুমের নম্বর, পরের কলামে কত দিনের জন্য ভাড়া নেওয়া হলো তার বিবরণ, তারপর পাওনা টাকার পরিমাণ এবং সবশেষে হোটেল ছেড়ে চলে যাওয়ার তারিখ। তৃতীয়, পঞ্চম আর ষষ্ঠ কলাম বাদে বাকিগুলো পূরণ করল জেক। কলমটা বাড়িয়ে দিচ্ছিল সে হোটেল মালিকের দিকে, ওর আগের নামটা চোখে পড়াতে মাঝপথে হাতটা থেমে গেল হঠাৎ।

‘কী হলো? ভুল করেছ নাকি? ইস্, লেখাপড়াটাও ঠিকমত শিখলে না। তোমাদের মত স্ট্রেঞ্জাররা সব সময়ই জ্বালায়...’

নামটার উপর ডান হাতের তর্জনী রাখল জেক। জিজ্ঞেস করল, ‘লোকটা আজকে এসেছে?’

রেজিস্টার খাতাটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল হোটেল মালিক। তারিখটা খেয়াল করল। তারপর ঝেঁকিয়ে উঠল, ‘দেখতে পাচ্ছ না? আজকের তারিখই তো লিখেছে লোকটা।’

খাতাটা আবার নিজের দিকে টেনে নিল জেক। পাশে দাঁড়িয়ে টলতে থাকা কার্কের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, ‘এই, কার্ক, দেখো কে এসেছে

মারফায়। লুসির চাচা বিল অসকার।’

নামটা শুনে কোন ভাবান্তর হলো না কার্কের। টলতে থাকল আগের মতই। আরও একবার ডাক দিয়ে নামটা দেখাল তাকে জেক। জবাবে একবার শুধু চোখ তুলে তাকাল কার্ক, কিছু বলল না।

‘লুসির চাচা এসেছে তো কী হয়েছে?’ আবার খঁকিয়ে উঠল হোটেল মালিক। খাতাটা টেনে নিল নিজের দিকে। বন্ধ করে রেখে দিল ডেস্কটার একটা ড্রয়ারে। ‘যাও, উপরে যাও,’ পিছনের কী বোর্ড থেকে একটা চাবি নিয়ে জেকের হাতে জোর করে ধরিয়ে দিল সে। বলল, ‘উনিশ নম্বর রুমটা তোমাদের।’

লোকটা খাতা টেনে নেওয়ার আগে বিল অসকারের রুম নম্বরটা দেখে নিতে ভুল করেনি জেক। নম্বরটা পনেরো।

এক হাতে রুমের চাবি নিয়ে আর এক হাতে কার্কের কোমর জড়িয়ে ধরে জেক উঠে এল দোতলায়।

এমনিতে রংগটা হলেও হোটেলটা পরিকল্পনা করেই বানিয়েছে মালিক। মাত্র দোতলা বলে একটুও জায়গা বাদ দেয়নি। সিঁড়ি বেয়ে উঠামাত্রই গুরু হয়েছে ঘরগুলো। মাথার উপর থেকে ঝুলতে থাকা পর পর চারটা বড় হারিকেনের আলোয় চারদিক একবার জরিপ করল জেক।

হাতের ডানদিকে এক সারিতে বারোটা ঘর। দরজার আকৃতি দেখে বুঝল জেক, ঘরগুলো সিঙ্গেল খাটের। একেবারে মুখোমুখি ডাবল বেডের দুটো রুমের দরজা, আর তাদের দু’দিকে দুটো করে সিঙ্গেল রুমের দরজা দেখতে পেল সে। হাতের বাম পাশে এক সারিতে আটটা ঘর। এগুলোতে দুটো করে বিছানা পাতা আছে, অনুমান করল জেক।

উনিশ নম্বর ঘরটা হাতের বামদিকে, একেবারে শেষে। কার্ক সঙ্গে থাকায় দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কিছুটা বেশি সময় লাগল জেকের।

রুমের ভিতরে ঢুকবার পর আবছা আলোতে দুটো বিছানা দেখতে পেল সে। একটাতে আলতো করে শুইয়ে দিল কার্ককে। তারপর পকেট থেকে ম্যাচ বাজ্জটা বের করে একটা কাঠি জ্বালল। এককোণায় একটা ডেস্কের উপর একটা কেরোসিন ল্যাম্প দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল সেটার দিকে। প্রায় নিভে আসা কাঠিটার সাহায্যে জ্বালল ল্যাম্পটাকে।

কাঁচের চিমনিটার ভিতরে কালি জমে কালো হয়ে আছে। তাই ঠিক মত দূর হলো না ঘরটার অন্ধকার। এদিক-ওদিক নজর বুলাল জেক।

একটামাত্র জানালা ঘরটাতে, সেটার সাথেই রাখা আছে ডেস্কটা। তার দু’দিকে দুটো খাট। ডেস্কটার সামনে একটা হাতল ভাঙা চেয়ার। কার্ককে নড়াচড়া করতে দেখে চেয়ারটা নিয়ে তার বিছানার সামনে বসল জেক।

‘কেমন বোধ করছ এখন?’ নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

সাথে সাথে উত্তর দিল না কার্ক। কী যেন ভাবল জেকের দিকে তাকিয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘আমাকে এখানে এনেছ কেন?’

‘রক্ষাসের হাতে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে তুমি। সেলুনের সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে যায়নি। তোমার জন্য মায়া হলো আমার, তোমাকে নিয়ে গেলাম ডাক্তার বেনের কাছে। তারপর এখানে এলাম।’

‘এখানে এলে কেন?’

‘আর কোথায় যেতাম? আমি স্ট্রেঞ্জার, তার উপর দু’দিনের জন্য আমাকে মারফায় থাকতে বলেছে শেরিফ। হোটেল ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই আমার।’

বিড় বিড় করে কী যেন বলল কার্ক। ধন্যবাদ দিল কি না বুঝতে পারল না জেক। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘ডিনার করেছ বলে তো মনে হয় না।’

হ্যাঁ-না কিছু বলল না কার্ক। তার দু’চোখের পাতা আবার ঢুলুঢুলু করতে আরম্ভ করেছে, খেয়াল করল জেক।

‘চলো, ডিনারটা সেরে নেই।’

‘তুমি যাও,’ চোখ খুলে বিড় বিড় করে বলল কার্ক, ‘খিদে নেই আমার। খুব কাহিল লাগছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারব বলেও মনে হয় না। পারলে একটু পানি খাওয়াও আমাকে।’

কার্কের জন্য পানির ব্যবস্থা করল জেক। তৃষ্ণার্তের মত পান করল কার্ক। তারপর বিছানায় পিঠ লাগিয়ে দিল আবার।

‘শোনো,’ ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার আগে বলল জেক, ‘তোমার পকেট থেকে কিছু টাকা সরিয়েছি আমি। দরকার ছিল বলে করেছি কাজটা। ডাক্তারের ফিস দিয়েছি, এই ঘরের চারদিনের ভাড়া দিয়েছি অগ্রিম। বাকিটা আমার কাছেই আছে। তুমি চাইলে দিয়ে দিতে পারি এখনই।’

চাইল না কার্ক। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে সে। ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল জেক।

পানি আনতে যাওয়ার সময় লম্বা একটুকরো কাগজ যোগাড় করেছিল জেক। সেটাকে ভাঁজ করে নিজের শার্টের পকেটে রেখে দিয়েছিল। ঘর ছেড়ে বের হওয়ার সময়, দরজাটা পুরো বন্ধ করবার আগে কাগজটাকে খাড়াভাবে বসিয়ে দিল পাল্লার একদম নীচে, মেঝের সাথে। দরজাটা কেউ খুললেই আর খাড়া থাকবে না কাগজটা, কাত হয়ে পড়ে যাবে মাটিতে। ফলে, সহজেই বোঝা যাবে, কেউ একজন ঢুকেছিল ওদের ঘরে। অথবা, ঘর ছেড়ে বাইরে বের

হয়েছিল কার্ক।

জেকের এই কারিগরিটা ধরতে পারল না কার্ক। চোখ বন্ধ করে বিছানার উপর মড়ার মত পড়ে থাকল।

রেস্টুরেন্টটা হোটেলের পাশেই। ঢুকবে কি ঢুকবে না, একবার চিন্তা করল জেক। স্যামের কথা ভাবল। হাজতে বসে থিদেয় নিশ্চয়ই কষ্ট পাচ্ছে বেচার। তারপর খেয়াল হলো, এতক্ষণে হয়তো তাকে কিছু না কিছু খেতে দিয়েছে শেরিফ।

রেস্টুরেন্টের দরজা খোলামাত্রই টুং করে আওয়াজ হলো একটা। দরজাটার সাথে লাগানো একটা বেল বেজে উঠল। ভিতরে পা রাখল জেক।

ডিনার সারবার সময় পার হয়ে গেছে আরও আগেই। এ কারণে ভিড় তেমন একটা নেই। বেশিরভাগ টেবিলই খালি। একপাশের একটা টেবিলকে ঘিরে তৈরি হয়েছে একটা জটলা, অন্যান্য টেবিল থেকে চেয়ার নিয়ে সেখানে গোল হয়ে বসেছে লোকজন। তাদের কারও হাতে বিয়ারের গ্লাস, কারও হাতে কফির কাপ। সময় নিয়ে তাদের মাথা গুণল জেক। বারো জন।

এককোণার একটা টেবিল দখল করে বসে পড়ল জেক। উপস্থিত সবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিজের উপর অনুভব করতে পারল। পশ্চিমে এটা খুবই স্বাভাবিক; কাজেই পান্ডা না দিয়ে কাউন্টারের পিছনে বসা লোকটার চোখে চোখ মেলাল।

‘কী খাবে তুমি?’ পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা। উত্তর দেওয়ার আগে লোকটাকে একনজর দেখল জেক। চেহারায় কিছুটা আভিজাত্য থাকায় তাকেই রেস্টুরেন্টটার মালিক বলে মনে হলো।

‘বিন, গরু আর সবশেষে কফি।’

মাথা নেড়ে চলে গেল লোকটা। আবার জটলাটার দিকে তাকাল জেক। এখনও ওকে যাচাই করছে ওরা। একসময় উৎসাহ হারিয়ে ফেলল তাদের কেউ কেউ, কথা বলতে আরম্ভ করল নিজেদের মধ্যে।

‘দেরি না করে শেরিফের কাছে যাওয়া উচিত আমাদের। এরকম একটা খুনীকে কেন হাজতে পুরে রেখেছে সে, জানা দরকার।’

কাউন্টারের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে কান খাড়া করল জেক।

‘ঠিক বলেছ,’ সমর্থন করল আরেকজন। ‘আমার মনে হয়, শেরিফ সায় না দিলে কাজটা আমাদেরই করা উচিত। আশপাশে, কটনউড গাছের অভাব নেই।’

কথাটা কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, বুঝতে পেরে খিদে নষ্ট হয়ে গেল জেকের।

‘সাহস দেখেছ লোকটার?’ আলোচনায় অংশ নিল আরেকজন। ‘টম আর লুসিকে খুন করল। তারপর ডিনার সারার জন্য বসে রইল ওই কেবিনে। আমি হলে কখন পালাতাম!’

‘আসলে সাহস না, মস্ত বড় বোকা লোকটা,’ মন্তব্য করল অন্য কেউ।

অর্ডার দেওয়া খাবারগুলো এনে রাখা হলো জেকের টেবিলে। অন্যমনস্ক থাকায় কিছুটা চমকে উঠল সে। হাত বাড়িয়ে কাঁটা-চামচ তুলে নিল, খেতে আরম্ভ করল।

লোমে ভর্তি হাতঅলা এক লোক দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিল টেবিলটার উপর। গর্জে উঠল, ‘একটা পোয়াতি মহিলা খুন হয়ে গেল এভাবে, আর আমাদের শেরিফ কিছুই করতে পারল না! তা হলে তাকে কেন রেখেছি আমরা? অফিসে বসে ওর ডেপুটির সাথে আঁডা দেওয়ার জন্য?’

প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারল না কেউ। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করবার জন্য গপাগপ গিলতে আরম্ভ করল জেক। জনতা উন্মত্ত হয়ে উঠবার আগেই খবর দিতে হবে শেরিফকে।

‘আচ্ছা,’ বলল একজন, ‘শুনলাম, লোকটার নাকি একজন সহযোগী ছিল। ওর ব্যাপারে কিছু বলছ না কেন তোমরা?’

‘আমিও সেরকমই শুনেছি। দু’জনে মিলে নাকি কুকর্মটা করেছে। তবে আমাদের শেরিফও পুরোপুরি নিশ্চিত না সে ব্যাপারে।’

‘ইস! যতই বয়স বাড়ছে লুথারের, ততই অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে। একজন নতুন শেরিফের খোঁজ করা উচিত আমাদের। ডেপুটিটাকে শেরিফ বানিয়ে দিলে কেমন হয়?’

‘কে? হার্শ?’ প্রশ্নকর্তার গলায় স্পষ্ট পরিহাস, ‘না, শেরিফের কাজ ওকে দিয়ে হবে না। ও এখনও কাঁচা। তা ছাড়া, মেয়েদের পেছনে ঘুরেই তো দিনের বেশিরভাগ সময় পার করে দেয় সে। শেরিফের কাজ করবে কখন?’

‘ঠিকই বলেছ,’ সমর্থন করল আরেকজন। ‘হার্শকে শেরিফ বানাতে দেখা যাবে অপরাধীরা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর সে শুধু মেয়েদেরকে ধরে ধরে জেলে ভরছে।’

হেসে উঠল সবাই।

খাওয়া শেষ করে প্লেটটা একদিকে ঠেলে দিল জেক। তার কফি নিয়ে এল আগের লোকটা। গরম কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে শার্টের পকেট হাতড়ে তামাকের প্যাকেট, পাইপ আর দেয়াশলাইয়ের বাস্র বের করল জেক। ঠেসে তামাক ভরল পাইপে, তারপর আগুন ধরিয়ে আয়েশ করে টান দিতে আরম্ভ করল। আসলে উপস্থিত লোকদের দেখাতে চাইছে কোন তাড়া নেই তার। ওদের মনে সন্দেহ উৎপাদন করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

‘যাই হোক,’ লালমুখো একটা লোক ঘোষণা দিল, ‘ফাঁসির সমস্ত আয়োজন আমাদেরই করা উচিত। বছর দুয়েক আগে আমাদের মার্ফায় একজন চায়নাম্যান খুন হয়েছিল, মনে আছে তোমাদের?’ প্রশ্নটার জবাবে অনেককেই মাথা নাড়তে দেখে উৎসাহ পেল লালমুখো। বলে চলল, ‘ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছিল লোকটাকে। আমাদের জাজ তো রায় ঘোষণার আগের রাতে বলতে গেলে পাগল হয়ে গিয়েছিল। সারারাত বইপত্র ঘেঁটে পরদিন সকালে কী রায় দিয়েছিল সে জানো?’ এবার সবাই চুপ হয়ে গেছে দেখে আরও খুশি হলো সে। ‘পরদিন সকালে জাজ বলল, সাতটা আইনের বই ঘেঁটেছে সে। কিন্তু, কোনটাতেই নাকি লেখা নেই, চায়নাম্যানকে খুন করলে শাস্তি হবে খুনীর। হাসতে হাসতে কোর্ট হাউস থেকে বের হয়ে গেল খুনী। আমরা কিছু না করলে এই স্যাম ওয়েডের বেলাতেও সেরকম কিছু একটা হবে, দেখে নিয়ো তোমরা। কেসটা আদালতে গেলে আবার আগের মত বই ঘাঁটবে জাজ, তারপর বলবে, মহিলাকে খুন করার অপরাধে ফাঁসির নিয়ম আছে বটে, কিন্তু, পোয়াতি মহিলাকে খুন করার ব্যাপারে কিছু লেখা নেই। হাসতে হাসতে তখন চলে যাবে স্যাম।’

প্রতিবাদের ঝড় উঠল জটলাতে। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠল সবাই। দাঁড়িয়ে গেল অনেকে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলল দুয়েকজন। বিপজ্জনভাবে অস্ত্র নাড়াতে নাড়াতে বর্ণনা করল, হাতের কাছে স্যামকে পেলে কী করবে। নিজ খরচে দড়ির ব্যবস্থা করবে বলে কসমও খেল কেউ কেউ। বয়সে বুড়ো আরেকজন বলতে আরম্ভ করল মার্ফার কোন্ কটনউড গাছটাতে কোন্ অপরাধীকে ঝুলানো হয়েছে। ওরা চাইলে সবগুলো গাছ দেখিয়ে দিতে পারবে সে।

কফির কাপে আর চুমুক না দিয়ে বিল মেটাতে গেল জেক। কাউন্টারের পিছনে বসা লোকটা জিজ্ঞেস করল, ‘কফিটা খেলে না যে?’

‘ভাল হয়নি,’ ভাংতি টাকাটা কেড়ে নিয়ে প্রায় দৌড় দিল জেক

অন্ধকারে প্রায় ডুবে আছে জেল হাউসটা।

কী ব্যাপার? ভাবল জেক। ভিতরে নেই শেরিফ লুথার? নাকি আলোটা ইচ্ছে করেই কমিয়ে রেখেছে সে?

না চাইলেও আপনা থেকেই হাঁটবার গতি ধীর হয়ে এল তার। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশ জরিপ করল সে। অস্বাভাবিক যে কোন কিছু উপলব্ধি করবার চেষ্টা করল। কিন্তু, সেরকম কিছু ধরতে পারল না।

এখনও হিচিং রেইলে বাঁধা আছে কার্ক আর অপরিচিত গানম্যানের ঘোড়াটা। জেককে দেখে ঘাড় ফিরাল দুটোই, তারপর আবার ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিমূর্তে লাগল।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল জেক। প্রথমেই ঢুকল না লোহার খোলা দরজাটা দিয়ে। একপাশে অবস্থান নিল, ভিতরের পরিস্থিতিটা যাচাই করবার চেষ্টা করল। এবারও কোনরকম অস্বাভাবিকতা ধরতে ব্যর্থ হল সে।

সত্যিই কি কোন গণ্ডগোল নেই ভিতরে? নিজেকেই প্রশ্ন করল জেক। হালকা একটা গোঙানির আওয়াজ আসছে না?

হোলস্টারের ফিতে ঢিলে করে পিস্তলটা হাতে নিল জেক। তারপর খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরে এক পা রাখল। বসে পড়ল সাথে সাথে। ডান কাঁধের উপর ভর দিয়ে গড়াল দু'বার; শেরিফের ডেস্কটা পার হয়েই থামল। দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল। গোঙানির শব্দটাকে লক্ষ্য করে তাক করল পিস্তলটা। কিন্তু, গোঙানির কারণটা বুঝতে পেরে হেসে ফেলল। পিস্তলটা ভরল হোলস্টারে।

একই সাথে নাক ডাকছে শেরিফ আর স্যাম। শেরিফ শ্বাস টানছে তো স্যাম ছাড়ছে। আবার স্যাম যখন টানছে তখন শেরিফ ছাড়ছে। একটানা হওয়ার কারণে অনেকটা গোঙানির মতই শোনাচ্ছে শব্দটাকে।

ডেস্কের উপর রাখা ল্যাম্পটাকে কমিয়ে দিয়েছে লুথার। আলোটা বাড়াল জেক। হাতটাকে সরাতে যাবে, এমন সময় শেরিফের ভারী গলা শুনতে পেল সে, 'হাতটাকে ওখানেই রাখো, মিস্টার। গুলি করার সময় হাত কাঁপে না আমার।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরাল জেক। দেখল, ডানহাতে একটা পিস্তল ধরে আছে লুথার। লোকটা এই বয়সেও কতটা ফাস্ট, বুঝতে পারল সে।

'পিস্তলটা নামাতে পারো, শেরিফ। আমি জেক।'

'আওয়াজ না করে ঢুকলে কেন?' হোলস্টারে পিস্তলটা ভরে রাখল শেরিফ।

'আসলে তোমার ঘুম ভাঙতে চাইনি।'

'তা হলে কার ঘুম ভাঙতে চেয়েছিলে? স্যামের?'

লুথারের মুখে বন্ধুর নাম শুনে ডানদিকে ঘাড়টা ঘুরাল একবার জেক। দেখল, কথার আওয়াজে স্যামেরও ঘুম ভেঙে গেছে, উঠে বসেছে সে। তার পাশে জেড বি-এর মালিক এড কুফাসকেও দেখতে পেল জেক।

'তোমার সাথে কাজের কথা বলতে এসেছি আমি, শেরিফ। মার্ফার লোকজন ক্ষেপে উঠেছে স্যামের বিরুদ্ধে। ওরা তাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে চায়। এইমাত্র রেস্টুরেন্ট থেকে ডিনার সেরে এলাম আমি। আমার সামনেই কথা বলছিল ওরা। আমি...'

হাত তুলে জেককে থামিয়ে দিল শেরিফ। 'দশ বছর ধরে মার্ফার শেরিফ আমি। এই দশ বছরে শহরটার লোকজনকে খুব ভালমতই চিনেছি। এরা শুধু বড় গলায় কথা বলতে পারে, কিন্তু, কাজের বেলায় লাপান্তা।'

লুথারের কথা শেষ হয়নি বুঝতে পেরে চুপ করে থাকল জেক।

‘সুতরাং, ওরা যত বেশি চেষ্টায়, পরিস্থিতি তত স্বাভাবিক বলে ধরে নেই আমি। আসলে তেমন কিছু একটা করার নেই তো ওদের, তাই সুযোগ পেলেই গজরাতে থাকে। নিজেদের উপস্থিতির জানান দেয় আর কী।’ একটু থেমে যোগ করল শেরিফ, ‘শুধু কি স্যামকে ঝুলানোর ঘোষণা দিয়েছে ওরা? আমাকে চাকরিচ্যুত করার কথা বলেনি?’

‘বলেছে।’

হাসল শেরিফ। ‘এ পর্যন্ত কতবার যে আমার চাকরি খেল ওরা,’ বামদিকে একবার তাকিয়ে দুই বন্দীকে দেখল সে। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘কার্কের খবর কী? কেমন আছে এখন?’

‘আছে একরকম। ওকে তো প্রায় ভর্তা বানিয়ে ফেলেছে রুফাস। ওর জন্য হোটেলে দুই বেডের একটা ঘর ভাড়া নিতে হয়েছে আমাকে। ও,’ কিছু একটা মনে পড়ে যাওয়াতে ডান হাতের তর্জনী উঁচু করল জেক, ‘খবর আছে একটা। লুসির চাচা বিল অসকার এসেছে মার্কায়।’

‘তাই নাকি? কবে?’

‘আজ।’

‘চলে গেছে?’

‘না।’

‘বিল অসকারের মার্কায় আসা মানে কী জানো?’

জেক জানে মানেটা কী। বিল অসকারের মার্কায় আসার মানে হচ্ছে বার স্টিরাপে যাওয়া। তা হলে, কোরালে দেখা জিন পরানো ঘোড়াটা কার, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

কিন্তু, কথাটা প্রকাশ করল না জেক। তাকে হয়তো বাজিয়ে দেখতে চাইছে ধূর্ত শেরিফ। ফাঁদটাতে পা দিল না সে। বলল, ‘না, জানি না। তোমার কী মনে হয়?’

‘আমার কী মনে হয়?’ হাসল শেরিফ। বলল, ‘আমার মনে হয়, ডেপুটি শেরিফ হিসেবে কাউকে অন্তত দুটো দিনের জন্য দরকার আমার।’

কথাটা শুনে বেশ কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গেল জেক। বুঝতে পারল, তাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছে শেরিফ। কিন্তু, প্রস্তাবটা গ্রহণ করবার আগে ব্যাপারটা আরও তলিয়ে দেখা দরকার। জিজ্ঞেস করল, ‘এইমাত্র বললে, মার্কায় লোকজন মুখের কথায় বাঘ মারে। তা হলে লোক দরকার কেন তোমার?’

‘কারণ, অসজ রাতে বাঘ মারতে যে আসবে, সে মার্কায় অধিবাসী না। সে মার্কায় বাইরে থাকে। সারা তল্লাটে যদি এককথার মানুষ বলে কেউ থাকে, তা হলে একমাত্র সে-ই আছে।’

লুথারের কথাটা হেঁয়ালি বলে মনে হলো জেকের কাছে। বলল, ‘ঝেড়ে কাশো, শেরিফ। আমি তোমার মত দশ বছর ধরে মার্ফায় থাকি না।’

‘লোকটা পল জেমিসন।’

বোকা সাজল জেক। জানতে চাইল, ‘কে সে?’

হাসল শেরিফ। ‘সে এই এলাকার সবচেয়ে বড় রানশার। যাকে ফাঁসি দেবে বলে চেষ্টাচ্ছে মার্ফার লোকজন, ইচ্ছে করলে তাকে জেল ভেঙে সাথে করে নিয়ে যেতে পারে।’

‘এসব তুমি কী বলছ? এতই দাপট লোকটার? তা ছাড়া লোকটা যদি দুর্বৃত্ত হয়, তা হলে তাকে গ্রেপ্তার করছ না কেন তুমি?’

‘গ্রেপ্তার? পল জেমিসনকে?’ হা হা করে হাসল শেরিফ। জেলের ভিতরে বসে তার সাথে গলা মেলাল রুফাস।

‘এমনিতে ভাল মানুষ পল,’ বলতে আরম্ভ করল লুথার। ‘কিন্তু, ওর লেজে কেউ পা দিলে তাকে ক্ষমা করে না সে। প্রয়োজনে আইন ভাঙতেও দ্বিধা করে না। খুব সম্ভবত আজ রাতেই সে কাজটা করবে।’

‘কেন?’

স্যামের মুখ থেকে শোনা ওয়াটার ট্যাক্সের কাহিনিটা জেককে শোনা ল শেরিফ। মনোযোগ দিয়ে শুনবার ভান করলেও আসলে অন্যমনস্ক হয়ে গেল জেক, ওর মানসপটে ভেসে উঠল লরার অপূর্ব সুন্দর চেহারাটা।

‘স্যামের কথা যদি সত্য হয়,’ জেক কিছু বলছে না দেখে আবার বলল শেরিফ, ‘তা হলে মেয়ের অপমানের শোধ নিতে মার্ফায় আসবেই পল।’

‘তা হলে আরও আগেই কেন এল না? আর শুধু মার্ফায় কেন? লোকটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যে কোনদিকে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে।’

‘আরও আগে আসেনি, কারণ, হয়তো আশপাশের রানশগুলো এতক্ষণ তছনছ করেছে সে। তবে আসবে সে। পল জেমিসন কী ধাতুতে গড়া, জানা আছে আমার। লরার দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী যতজনকে খুঁজে পাবে, সবাইকে খুন করবে। ঠেকানো যাবে না তাকে। সারা তল্লাটে এই একজনকেই ভয় পাই আমি।’

আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল জেক। লরার একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর, ‘তবে এই এলাকার কেউ বলে মনে হয় না আমার। এখানে কারও এত সাহস নেই যে লরা জেমিসনকে খুন করার হুমকি দেয়, শহরের কোন স্ট্রেঞ্জার হবে হয়তো।’

বাস্তবে ফিরে এল জেক। বলল, ‘তাহলে বারোটা বেজে গেছে মার্ফার আইন-শৃঙ্খলার। এবং, তোমার ডেপুটিও নেই।’

উদাস দৃষ্টিতে গরাদের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল লুথার। তারপর মুখ

ফিরাল জেকের দিকে। বলল, ‘তুমি না কাজ খুঁজছিলে?’

‘হ্যাঁ,’ বলেই থেমে গেল জেক। বুঝে গেছে কী বলতে চায় শেরিফ। তারপরও জিজ্ঞেস করল, ‘কেন?’

‘হার্শ ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার ডেপুটি হিসেবে কাজ করতে পারো।’

‘পনের গুলি খেয়ে মরার জন্য?’ ব্যঙ্গ করল জেক।

আর কিছু না বলে চুপ করে গেল শেরিফ।

প্রস্তাবটা আরেকবার ভেবে দেখল জেক। ডেপুটি শেরিফ হলে আইনের লোক হিসাবে বিনা বাধায় টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যটার তদন্ত করতে পারবে সে। সমাধান করতে পারলে মুক্ত করতে পারবে স্যামকে।

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি রাজি,’ ঘোষণা দিল জেক।

পরের দশ মিনিট শুধু আনুষ্ঠানিকতা পালন করল শেরিফ। ডেকে নিয়ে এল বারটেন্ডার আর হোটেল মালিককে। তাদেরকে সাক্ষী রেখে শপথ করাল জেককে। নিজের ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা টিনের তারা বের করে পরিয়ে দিল জেকের শার্টের বামদিকে।

বিদায় নিয়ে চলে গেল বারটেন্ডার আর হোটেল মালিক। ডেপুটি শেরিফের চেয়ারে আরাম করে বসল জেক। পকেট থেকে পাইপ আর তামাকের প্যাকেট বের করল। কিন্তু, পাইপে তামাক ভরবার আগেই অনেক দূর থেকে পাহাড়ি নদীর স্রোতের মত ভেসে এল অনেকগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ।

‘এসে গেছে,’ ভয়ার্ত গলায় চৈচিয়ে উঠল এড কুফাস।

আট

জেল অফিসের বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসা রাইডারদের সংখ্যা গুনবার চেষ্টা করল জেক। ক্ষুরের আঘাতে উড়তে থাকা ধুলো আর ক্ষীণ চাঁদের আলোর কারণে ব্যর্থ হলো সে। তবে দলটাকে বেশ বড় বলে মনে হলো তার কাছে।

দরজার কাছে ইতিমধ্যেই একটা ভারী শটগান হাতে পজিশন নিয়েছে শেরিফ। তার দিকে একবার তাকাল জেক। আগের মত আর অবিচল মনে হচ্ছে না লোকটাকে।

‘ভেতরে এসো, ডেপুটি,’ কড়া গলায় জেককে আদেশ দিল লুথার, ‘ল্যাম্পটা নিভিয়ে দাও।’

কাজটা করবার পর আবার বলল লুথার, ‘র‍্যাক থেকে একটা উইনচেস্টার তুলে নাও। জানালাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। ওরা বেশি বাড়াবাড়ি করলে যাকে খুশি গুলি কোরো।’

পজিশন নিল জেক। কাঁধে উইনচেস্টার ঠেকাল। জটলাটার দিকে নিশানা করল। অপেক্ষা করতে লাগল পল জেমিসনের পরবর্তী চালের জন্য।

কী করতে হবে, আগে থেকেই পরিকল্পনা করে এসেছে পল। শহরে ঢুকবার রাস্তায় দু’জনকে দাঁড় করিয়ে দিল সে। শহর ছেড়ে কেউ যেন বের হতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করল। দু’জন ঘোড়া নিয়ে ছুটে গেল স্টেবলটার দিকে। বুড়ো স্টেবলম্যান ওদেরকে দেখেই দৌড়ে পালিয়ে গেল একটা সরু, অন্ধকার গলির দিকে। স্টেবলের গেটটা লাগিয়ে দিল রাইডার দু’জন। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত এগিয়ে গেল একটা ছায়াঢাকা কোণের দিকে। অন্ধকারে ওদেরকে আর দেখতে পেল না জেক।

বাকি লোকগুলো খুব দ্রুত পাঁচটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল। দু’জন ঘোড়ার ক্ষুরে ভূমিকম্প তুলে এগিয়ে এল জেল অফিসের দিকে। স্যাডল থেকে নামল। হিচিং-রেইলে ঘোড়াদুটোকে কোনরকমে বেঁধেই দৌড় দিল দু’দিকে। একজনের কাঁধে উইনচেস্টার ঝুলতে দেখল জেক। জেল অফিসের দু’দিকে অবস্থান নিল দু’জন।

তারমানে, মনে মনে বলল জেক, জেল অফিস থেকে বের হওয়ার পথও বন্ধ করে দিল ওরা।

শেরিফের দিকে আবারও একবার তাকাল সে। কিন্তু, অন্ধকারে লোকটার মুখের ভাব দেখতে পেল না।

লুথারের বাসার দিকে রওয়ানা হলো একজন। একগুঁয়ে শেরিফ কোঁথায় আছে, বোধহয় নিশ্চিত হতে চায় পল।

বাকি নয়জন সমান তিন ভাগে ভাগ হয়ে হোটেল, রেস্টুরেন্ট আর সেলুনের পথ ধরল। একটা ছটফট করতে থাকা তেজী ঘোড়ার উপর মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল মাত্র একজন। ভঙ্গি দেখেই বুঝল জেক, লোকটা কে।

‘ওই লোকটাই পল, তা-ই না?’ নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল জেক।

‘হ্যাঁ,’ তারচেয়েও নীচু গলায় উত্তর দিল শেরিফ।

লুথারের খবর নিতে যাওয়া লোকটা ফিরে এল সবচেয়ে প্রথমে। কিছু একটা জানাল সে পলকে। ঘাড় ঘুরিয়ে জেল অফিসের দিকে একবার তাকাল পল। তারপর লোকটাকে সাথে নিয়ে ধীরগতিতে রওয়ানা হলো।

বোর্ডওয়ারকের সামনে এসে থামল পল। নামল না ঘোড়া থেকে। চেষ্টা করে ডাকল, ‘আড়াল ছেড়ে বের হয়ে এসো, শেরিফ। তোমার সাথে কোন বিরোধ নেই আমার।’

নড়বার লক্ষণও দেখা গেল না লুথারের মধ্যে। শুকিয়ে আসা গলাটা একবার পরিষ্কার করে বলল সে, ‘আমার হাতে একটা শটগান আছে, পল। কাজেই, সাবধান।’

এসব ঘটনার সাথে পরিচিত নয় জেক। ওর মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নীচে নেমে গেল। মনে হলো, তলপেটে ঢুকে পড়েছে ডজনখানেক প্রজাপতি, ইচ্ছেমত উড়ছে ভিতরে।

‘সাবধান থাকাটা আমার স্বভাব, লুথার। কখনও কখনও কেউ অসাবধান হয়ে পড়লে একটু গা ঝাড়া দিয়ে উঠি-সেটাই আমার দোষ।’

‘কী চাও তুমি?’

‘তোমার জেলে বন্দী আছে একটা লোক, স্যাম ওয়েড নাম। তাকে চাই।’

শুনে যার পর নাই আশ্চর্য হয়ে গেল জেক। পলের দাবি মিলছে না শেরিফের কথার সাথে।

লুথারও কিছুটা থতমত খেয়ে গেছে মনে হয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর জানতে চাইল সে, ‘স্যামের দোষ?’

‘কোন দোষ নেই স্যামের। তাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমি। তাকে দিয়ে একটা ছোট্ট কাজও করাতে চাই। আমার মনে হয়, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার লোকেরা একজনকে ধরে ফেলবে। আমি চাই, লোকটাকে সনাক্ত করুক স্যাম।’

‘তারপর?’ জেকের মনে হলো, প্রশ্নটা করতে দ্বিধা করল শেরিফ।

‘তারপর কী হবে, সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও।’

‘বাড়াবাড়ি কোরো না পল। আমি তোমাকে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে দেব না।’

‘তা-ই নাকি? কী করবে তুমি? গুলি করবে? করতে পারো। মরতে ভয় পায় না পল জেমিসন। অনেক আগে থেকেই আমাকে চেনো তুমি।’

অস্বস্তি বোধ করছে লুথার। বুঝতে পারছে, তাকে জেল অফিসের ভিতরে আটকে ফেলেছে পল আর তার লোকেরা। কথা বলে সময় পার করছে এখন।

‘যাকে ধরতে এসেছ, তার দোষ কী?’

ওয়াটার ট্যাঙ্কের ঘটনাটার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল পল জেমিসন। স্যামের ভূমিকা উল্লেখ করল।

‘স্যাম জেলে, জানলে কীভাবে?’

‘আসার সময় তোমার ডেপুটি হার্শের সাথে কথা হয়েছে আমার। স্যাম কী কারণে জেলে, সেটাও বলেছে সে আমাকে। আমার মনে হয়, ভুল লোককে আটকে রেখেছ তুমি। যা-ই হোক, ওই ব্যাপারে কথা বলব না আমি। আপাতত

আমার স্যামকে দরকার। ওকে দাও। লোকটাকে সনাক্ত করার পর আবার তোমার কাছে দিয়ে যাব। তুমি জানো, আমার কথার নড়চড় হয় না।’

‘যাকে খুঁজছ, তুমি কি নিশ্চিত সে মার্কীয় আছে?’

‘হ্যাঁ, নিশ্চিত। সবগুলো রানশ্ দেখে এসেছি আমি। পাইনি তাকে। জঙ্গলে লুকিয়ে না থাকলে মার্কী ছাড়া আর যাওয়ার জায়গা মেই তার।’

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে উৎসুক জনতা ভিড় জমাচ্ছে রাস্তায়। ওদের দিকে একবার তাকাল জেক।

‘স্যামের সাথে আরও একজন ছিল, জানো তুমি?’ লুথারকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল পল।

‘না তো,’ গলার স্বর শুনে স্পষ্ট বোঝা গেল, আশ্চর্য হয়ে গেছে শেরিফ।

মনে মনে প্রমাদ গুল জেক। লরাকে নিজের নাম বলেছিল সে। নিশ্চয়ই বাবাকে নামটা বলেছে লরা। এখন লুথারের সামনে নামটা বললেই...

‘সত্যিই তোমার বয়স হয়েছে, শেরিফ। আগের মত আর ধার নেই তোমার। স্যামের সঙ্গীর নাম জে...’

হোটেলের কাছ থেকে ভেসে আসা হৈ চৈ আর অশ্রাব্য গালিগালাজ শুনে থেমে গেল পল জেমিসন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সেদিকে। বার বার টোক গিলে শুকিয়ে যাওয়া গলাটা ভেজানোর চেষ্টা করল জেক। পলের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকাল হোটেলের দিকে।

এক বিশালদেহী লোককে ধরে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে বের করবার চেষ্টা করছে তিনজন। কিন্তু, লোকটার শক্তির সাথে পেয়ে উঠছে না কিছুতেই। এক ঘুসিতে তাদের একজনকে তিন হাত দূরে ফেলে দিল বিশালদেহী। তারপর ঘুরে লাথি মারল আরেকজনের পেটে। দু’ভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। তৃতীয়জন বুদ্ধিমানের মত দূরে সরে গেল, চেষ্টা করে ডাকল বাকি সঙ্গীদের।

ডাক শুনে ধাক্কা দিয়ে রেস্টুরেন্টের দরজা খুলে বের হয়ে এল আরও তিনজন। এক মুহূর্তও দেরি না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা বিশালদেহীর উপর। আগের তিনজনও যোগ দিল তাদের সাথে। ছয়জনের সাথে লড়াইতে পারল না বিশালদেহী, পরাজিত হতে বাধ্য হলো। তাকে মাটিতে ফেলে দিল ছয়জন মিলে। তারপর গুরু বাঁধবার মত করে বেঁধে ফেলল। নড়বার ক্ষমতাও রইল না লোকটার।

লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরাতে আরম্ভ করল পল। আড়াল ছেড়ে বের হয়ে এল শেরিফ। সোজা গিয়ে দাঁড়াল বোর্ডওয়াকে। এতক্ষণ কোমরের কাছে ধরে রাখা শটগানটা কাঁধে তুলে বলল, ‘শেষবারের মত সাবধান করছি, পল। আমার শহরে আইন ভাঙতে দেব না আমি।’

ভুল করল লুথার। যে দু’জন দৌড়ে এসেছিল জেল অফিসের দিকে, তারা

বোর্ডওয়াকের কিনারায় না, জেল অফিস থেকে বের হওয়ার একমাত্র দরজাটার দুই পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বুট খুলে বোর্ডওয়াকে উঠেছিল তারা এবং একই সময়ে কথা বলছিল পল, ফলে তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়নি জেক বা শেরিফ। লুথার হুমকিটা শেষ করা মাত্রই ডানদিকের লোকটা নিঃশব্দে দু'পা এগিয়ে এসে সর্বশক্তিতে থাবা দিল শেরিফের হাতে, শটগানটা উড়ে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। পিস্তলের উদ্দেশ্যে হাত বাড়াল লুথার। এবার আগে বাড়ল বামদিকের লোকটা। জানালার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা জেককে পাশ কাটাল সে। হাতের উইনচেস্টারটাকে উল্টো করে ধরে কুঁদোটা জোরে বসিয়ে দিল শেরিফের মাথায়। কাটা গাছের মত বোর্ডওয়াকের উপর লুটিয়ে পড়ল লুথার।

জেককে গুলি চালানোর অনুমতি দিয়েছিল শেরিফ, কিন্তু, না চালানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বুঝতে পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল জেক।

ততক্ষণে একটা রশির সাহায্যে বিশালদেহীকে নিজের স্যাডলের সাথে আটকে ফেলেছে পল। পেটে গুঁতো দিয়ে ঘোড়াটাকে জেল অফিসের দিকে ছুটাল সে। পিছন পিছন মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে এল তার বন্দীকে। চিৎকার করে তাকে অভিশাপ দিতে আরম্ভ করল লোকটা। কান দিল না পল।

বোর্ডওয়াকের কাছে এসে বিজয়ীর ভঙ্গিতে ঘোড়া থেকে নামল পল। পড়ে থাকা শেরিফকে দেখল একনজর। ঘটনাটা কী ঘটেছে, আঁচ করে নিল মুহূর্তেই। চিৎকার করে ডাকল একজনকে। শেরিফকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে বলল। লুথারকে ঘোড়ায় তুলে নিল লোকটা, রওয়ানা হয়ে গেল বেনের বাড়িতে।

চারজনকে সাথে নিয়ে জেল অফিসে ঢুকল পল। জ্বাল ল্যাম্পটা। তখনই দেখতে পেল জেককে। শার্টে ঝুলানো টিনের তারাটাও নজর এড়াল না তার।

জেককে দেখামাত্র পিস্তল তুলল পলের চার সঙ্গী। উইনচেস্টারটা হাত থেকে ছেড়ে দিল জেক, শব্দ করে মাটিতে পড়ল সেটা। গরাদের পিছন থেকে হা হা করে হাসতে লাগল এড রুফাস। কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বলল, 'ডেপুটি, কলিজা বলে কিছু আছে তোমার? নাকি শার্ট খুললে কঙ্কাল দেখা যাবে?'

উত্তর দিল না জেক।

'তুমি নতুন ডেপুটি নাকি?' প্রশ্ন করল পল।

উপরে-নীচে মাথা নাড়াল জেক।

'তা ভীত ডেপুটি, সাহস না থাকলেও তোমার বুদ্ধি আছে বলে মনে হয়। উইনচেস্টারটা ফেলে দিয়ে ভুল করেনি তুমি। লুথারের কী হয়েছে, দেখেছ?'

আবার উপরে-নীচে মাথা নাড়াল জেক।

'আশা করি, আমার কাজে বাধা দেবে না। লুথার আজ রাতে জ্ঞান ফিরে

পাবে বলে মনে হয় না, কাজেই, ওকে নিয়ে আর চিন্তা করছি না আমি। কিন্তু, তোমাকে নিয়ে একটা ছোট্ট সমস্যা আছে। আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গরাদের পেছনে থাকতে নিশ্চয়ই অসুবিধা নেই তোমার?’

‘নেই,’ যতদূর সম্ভব কথা কম বলবার চেষ্টা করছে জেক। পল জেমিসনের কাছে নিজের পরিচয় কিছুতেই ফাঁস হতে দিতে চায় না।

দাঁত বের করে হাসল পল। ‘তুমি একটা ইঁদুর, ডেপুটি।’

অপমানটা গায়ে মাখল না জেক।

দেয়ালে ঝুলানো চাবির গোছাটা তুলে নিল পল। এগিয়ে গেল হাজতের দিকে। আলাদা আলাদা দুই সেলে বন্দী ছিল স্যাম আর রুফাস, স্যামের সেলটার সামনে এসে থামল সে। দরজা খুলে আদেশ দিল, ‘বের হয়ে এসো।’

দেরি না করে আদেশটা পালন করল স্যাম।

‘তোমাকে কী করতে হবে, শুনেছ নিশ্চয়ই?’

‘শুনেছি।’

‘তোমাকে মুক্তি দেব ভেবে থাকলে ভুল ভেবেছ তুমি। ব্যাপারটা শেরিফ লুথারের হাতে। যা-ই হোক, লরার জীবন বাঁচানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। লরা বলছিল, তোমার সাথে আরেকজন লোক ছিল। নাম জেক রায়ার। কোথায় সে?’

‘জানি না,’ নির্জলা মিথ্যে বলল স্যাম। ‘লরা চলে যাওয়ার পর লোকটাও রওয়ানা হয়ে যায় ফোর্ট ডেভিসের দিকে।’

হাঁ হয়ে গেল এড রুফাস। শপথ করবার সময় জেকের নাম খুব ভালমত শুনেছে সে। স্যামের কথাটার প্রতিবাদ করবার জন্য সামনে এগিয়ে এল। গরাদে হাত রেখে বলল, ‘শোনো পল, লোকটা...’

‘খবরদার!’ রুফাস কী বলতে চায় অনুমান করতে পেরে হঠাৎ টেঁচিয়ে উঠল জেক, ‘আমার শহরে কাউকে আইন নিয়ে খেলতে দেব না আমি।’ কোমরে ঝুলানো হোলস্টারের দিকে ধীরে ধীরে হাত বাড়াল সে।

জবাবে ওর পায়ের কাছে গুলি করল পলের দু’জন কর্মচারী। লাফিয়ে তিন পা পিছিয়ে গেল জেক।

কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল একজন, ‘গানবেল্ট খোলো। কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলে পরের গুলিটা পেটে ঢুকবে।’

আদেশ পালন করতে করতে যথাসম্ভব কড়া গলায় বলল জেক, ‘কাজটা ভাল হচ্ছে না পল। শেরিফ দেখে নেবে তোমাকে।’

‘ভাল-মন্দের জ্ঞান দিতে এসো না আমাকে, ছোকরা। তুমি জন্মানোর বিশ বছর আগে থেকেই জ্ঞানটা আছে আমার। এখন দেরি না করে ঢোকো হাজতে।’

জেককে বন্দী করবার পর স্যামের দিকে ঘুরে বলল পল, ‘আশাকরি, সত্য

বলবে তুমি। মনে রেখো, তোমার কথার উপর একজন মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।' তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মেলন, নিয়ে এসো লোকটাকে।'

যাকে নিয়ে জেল অফিসের ভিতর ঢুকল মেলন, তাকে একনজর দেখেই চিনতে পারল স্যাম।

সেই বিশালদেহী লোকটা। এখনও তার পরনে মাটির দাগ লাগা ময়লা জিন্স আর লাল রঙের শার্ট। মাথায় কালো হ্যাটটা নেই, ধস্তাধস্তিতে কোথাও পড়ে গেছে বোধহয়। চিবুক পর্যন্ত লম্বিত ধূসর গৌফজোড়া রাস্তার মাটি লেগে খয়েরী হয়ে গেছে। কোমরের দু'দিকে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারদুটো আগের মতই খালি।

'কী নাম তোমার?' জানতে চাইল স্যাম।

জবাবে স্যামের দিকে একদলা থু থু ছুঁড়ে মারল লোকটা। অল্পের জন্য স্যামের গায়ে লাগল না।

'হ্যাঁ, এই লোকটাই,' ঘোষণা দিল স্যাম।

'ঠিক আছে। যাও সেলে গিয়ে ঢোকো। আশা করি, ডেপুটির সাথে থাকতে খারাপ লাগবে না তোমার,' স্যামকে আবার ভিতরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিল পল। যথাস্থানে রাখল চাবিটা। তারপর হুকুম দিল, 'মেলন, নিয়ে চলো ওকে।'

বন্দীকে নিয়ে জেল অফিস ছেড়ে বের হয়ে গেল ওরা।

'তা হলে শেরিফকে মারল কেন ওরা?' পাশের সেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল এড রুফাস। 'লোকটাকে ভেতরে এনে দেখিয়ে গেলেই তো পারত।'

'আমার মনে হয়,' উত্তর দিল জেক, 'লোকটাকে ফাঁসি দিতে নিয়ে যাচ্ছে পল। শেরিফ থাকলে কিছুতেই করতে দিত না কাজটা। এজন্যই ওরা আপাতত সরিয়ে দিয়েছে ওকে।'

'কিন্তু, তোমার ব্যাপারটা কী?' এবার স্যামকে জিজ্ঞেস করল রুফাস, 'মিথ্যে বললে কেন?'

'যা জোরে মেরেছে শেরিফকে,' স্যামকে উত্তরটা দেওয়ার সুযোগ দিল না জেক, 'মনে হয় সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।'

কথাটা শেষ করামাত্রই বাইরে থেকে ভেসে এল অনেকগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। চলে গেল পল। অসহায়ের মত হাজতের ভিতর বসে থাকল স্যাম আর জেক।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। ইতিমধ্যেই ঝিমুতে আরম্ভ করেছে স্যাম, আর রুফাস তো নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। দুই চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে জেকেরও। কিন্তু, দরজা দিয়ে পলকে আবার ঢুকতে দেখে তন্দ্রা ছুটে গেল তার।

দরজা খুলে জেককে বাইরে বের করে আনল পল। পিস্তল হাতে পাহারায়

থাকল মেলন। দরজাটা আবার আটকে দিয়ে জিজ্ঞেস করল পল, ‘কোথায় থাকো তুমি?’

‘হোটেলে উঠেছি আপাতত।’

‘অফিসের দরজা আটকে দিয়ে চলে যাও নিজের রুমে। এখানে তোমার আর কিছু করার নেই।’

জেকের গানবেল্ট ফেরত দিল মেলন। তারপর চলে গেল পলের সাথে।

সত্যিই কিছু করার নেই, উপলব্ধি করল জেক। জেল অফিসের দরজায় একটা বিরাট তালা ঝুলিয়ে হোটেলের পথ ধরল সে।

হোটেলে ঢুকবার সময় মালিক পিছু ডেকে জানতে চাইল, ‘নতুন ডেপুটি, ববিকে ঝুলানোর সময় কোথায় ছিলে তুমি আর শেরিফ?’

কোথায় ছিল, বলল জেক।

শুনে হা হা করে হাসল লোকটা। বলল, ‘খুব মজা হলো যা-ই হোক। অনেকদিন পর কাউকে ঝুলতে দেখলাম। শহরের বাইরের কটনউড জঙ্গলে পাবে ববিকে। খুব ভেতরে ন্, রাস্তার ধারেই। তাকে কবর দেওয়ার দায়িত্ব এখন তোমারই।’

মনে মনে কথাটা স্বীকার করল জেক। জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় কবর দাও তোমরা? চার্চের পাশের কবরস্থানটাতেই তো?’

উপরে-নীচে মাথা নেড়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল হোটেল মালিক, তাকে সে সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল জেক।

আন্ডারটেকারের সাথে দেখা করল সে। একটা কফিনের ব্যবস্থা করল। তারপর কবর খুঁড়বার নির্দেশ দিল লোকটাকে। প্রথমে রেগে গেলেও আদেশটা মেনে নিতে বাধ্য হলো লোকটা। এরপর গির্জায় গিয়ে ঘুম থেকে পাদরীকে জাগাল জেক। তাকে অপেক্ষা করতে বলে রওয়ানা হলো কটনউড জঙ্গলের দিকে।

রাত কম হয়নি। কিন্তু, ঘুম নেই মার্ফ্যাসীর চোখে। একটু আগের ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছে সবাই। সেলুন থেকে ভেসে আসছে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, পাশ কাটানোর সময় শুনতে পেল জেক। অঙ্ককারে ডুবে আছে শুধু স্টেবল আর শেরিফের বাড়িটা। লুথারের খবর নিতে হবে, ভাবল জেক।

মার্ফ্য পার হয়ে এল সে। ঢুকল কটনউডের জঙ্গলে। হাঁটিয়ে আগে বাড়াল ঘোড়াদুটোকে। ববির লাশ বহন করতে হবে বলে একটা অতিরিক্ত ঘোড়া সাথে করে নিয়ে এসেছে সে।

ঝুলন্ত লাশটার কাছে গিয়ে থামল জেক। একটা ম্যাচকাঠি জ্বালাবে কি না ভাবল একবার। কিন্তু, বাতিল করে চিন্তাটা। রাতের আঁধারে আধ হাত জিভ বের করে থাকা ববিকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে না নিশ্চয়ই।

ঘাড়ের কাছে থ্রোইং নাইফ রাখা জেকের অভ্যাস। ছুরিটা বের করল সে। ছোট হলেও জিনিসটা যথেষ্ট ধারালো। ডান হাতে ছুরিটা ধরে নিজের, মানে আসলে ববির ঘোড়ার উপর দাঁড়াল সে। কাটল দড়িটা। সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল প্রাণহীন ববি। ঘোড়া থেকে নেমে তার ঘাড় আর হাতের বাঁধনও কেটে দিল জেক। তারপর যথাস্থানে ঢুকিয়ে রাখল ছুরিটা।

বাড়তি ঘোড়াটার উপর ববির লাশ তুলবার সময় হঠাৎ থেমে গেল জেক। বিকেলের ঘটনাটা মনে পড়ল ওর। ওয়াটার ট্যাঙ্কে কিছু একটা করছিল ববি। কাজটা কী, জানতে পারেনি স্যাম আর জেক। হয়তো পারবেও না কোনদিন।

অন্তত লোকটার পরিচয় জানবার চেষ্টা করা যায়, ভাবল জেক।

ববির শার্টের পকেটে হাত ঢুকাল সে প্রথমে। বাজে গন্ধঅলা তামাক আর সিগারেট পেপার পেল। তারপর হাতড়াতে আরম্ভ করল প্যান্টের পকেট। পাওয়া গেল ভাঁজ করা একটা ছুরি, একটা দেয়াশলাই বাস্র আর একটুকরো কাগজ।

ববিকে উল্টাল জেক। লোকটার প্যান্টের পিছনের পকেটে হাত দিল। আরেকটা কাগজ ঠেকল তার হাতে। বের করে খুলল কাগজটা।

একটা ফুলস্কেপ কাগজ। মনে হয় কোন চিঠি, ভাবল জেক।

ববিকে আরেকবার ভালমত তল্লাশি করল সে। কিন্তু, আর কিছুই পেল না। দেরি না করে স্যাডলে তুলে ফেলল লাশটা। ববির কাছ থেকে পাওয়া জিনিসগুলো ভরে ফেলল নিজের শার্টের পকেটে।

গানম্যান ববিকে কবর দেওয়ার সময় হতাশ হয়ে উপলব্ধি করল জেক, লোকটার আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত থাকে তো দূরের কথা, মৃত্যুর খবরটাও জানল না কেউ।

তারপর আরেকবার জেল অফিসে গেল জেক। ববির জিনিসগুলো ডেপুটি শেরিফের ডেস্কের একটা ড্রয়ারে রেখে তালা আটকে বের হয়ে এল। এত রাতে শেরিফকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না ভেবে সোজা হাজির হলো নিজের রুমে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকবার সময় খেয়াল করল সে, কাত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে কাগজটা।

নয়

নরকের আগুন ছড়িয়ে দিতে, দিতে সূর্যটা পুবাকাশের আরেকটু উপরে উঠে এল।

চোখ মেলল জেক। কোথায় আছে, কেন আছে—মনে করল প্রথমে। তারপর একে একে মনে করল গতকালের সবগুলো ঘটনা। নাক ডাকবার শব্দ কানে আসাতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কার্কের দিকে। মুখ হাঁ করে ঘুমাচ্ছে লোকটা। তার ঠোঁটের একপাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে লাল।

কাজ আছে অনেক, মনে পড়তেই বিছানা ছাড়ল জেক। হাত-মুখ ধুয়ে চলে গেল রেস্টুরেন্টে। ব্রেকফাস্ট সেরে আগুন-গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে সারাদিনে কী করবে, ভাবল।

টম আর লুসি ফিরেছে কি না, জানতে হবে। শেরিফের খোঁজ নিতে হবে। জেল অফিসে গিয়ে দেখা করতে হবে স্যামের সাথে। গতকাল রাতে পাওয়া ববির জিনিসগুলো যাচাই করে দেখতে হবে। আর, লুসির চাচা বিল অসকার হোটেলে ফিরেছে কি না, খবর নিতে হবে। তবে একেবারে প্রথমে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে হবে সবাইকে।

আশপাশের অনেকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে জেককে। নতুন ডেপুটি শেরিফকে মেপে নিতে চায় সবাই। বাধা দিল না জেক।

কফি শেষ করে পাইপ ধরাল সে। নীরবে টানল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘শোনো সবাই। আমি তোমাদের নতুন ডেপুটি। নাম জেক রায়ার। গতরাতে আমাকে শপথ করিয়েছে লুথার। বারটেভার আর হোটেলের মালিক সাক্ষী আছে। হার্শ ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। স্পিট এন্ড্রের মালিক পল জেমিসন গতরাতে খুব বাড়াবাড়ি করে গেছে মার্ফায়। শেরিফের মাথা ফাটিয়েছে ওর লোক। শেরিফের সাথে কথা হয়েছে আমার গতরাতে,’ মিথ্যে বলল জেক, ‘সে বলেছে, সুস্থ হলেই উপযুক্ত শাস্তি দেবে পলকে।’ কথাটা শুনে চাপা স্বরে হেসে উঠল কেউ কেউ। পাস্তা দিল না জেক। বলে চলল, ‘যা-ই হোক, আমি আশা করছি তোমাদের মধ্যে আর কারও আইন ভাঙার ইচ্ছে নেই। আমি বুড়ো লুথার না, কাউকে ভয় পাই না আমি। শহরের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনে যাকে খুশি তাকে গুলি করার অনুমতি দিয়েছে আমাকে শেরিফ।

তোমাদের কাউকে চিনি না আমি, কারও সাথে খাতির নেই আমার। কাজেই, গুলি করার সময় কোন বাছ-বিচার করব না। কথাটা মনে রেখো তোমরা।’

ভাষণ শেষ করে উপস্থিত জনতাকে একবার যাচাই করল জেক। গুলি করার কথাটা শুনে লোকজন কিছুটা ঘাবড়ে গেছে বলে মনে হলো ওর। পাইপ টানতে টানতে বিল চুকাল সে, তারপর হাজির হলো জেল অফিসে।

দরজা খোলামাত্রই অবিরাম অভিশাপ শুনতে পেল জেক। গরাদে লাথি মারতে মারতে টেঁচাচ্ছে এড রুফাস। জেককে দেখতে পেয়ে বলল, ‘আমিও তো মানুষ, নাকি? গতকাল রাতে খাইনি কিছু। সকাল থেকে কোন খবর নেই তোমার। কে ফাটিয়েছিল তোমার মাথাটা? আসতে এত দেরি হলো কেন?’

এড রুফাসকে মুক্ত করে দিল জেক। বলল, ‘সোজা চলে যাও নিজের রানশে। ব্রেকফাস্টটা ওখানেই গিয়ে সারো। মার্ফায় যেন আর না দেখি তোমাকে।’

‘ইস্,’ ভেঙচাল রুফাস, ‘কাল রাতে এই মুরোদ ছিল কোথায়? পারলে দু’চারটা ধমক দিতে পলকে।’

আবার অভিশাপ দিতে দিতে জেল অফিস থেকে বের হয়ে গেল রুফাস।

স্যামের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এল জেক। গরাদের ফাঁক দিয়ে দিল স্যামকে। বন্ধুর খাওয়া শেষ হলে বলল, ‘তা হলে কী দাঁড়াল অবস্থাটা?’

উত্তর দেওয়ার আগে একবার ভাবল স্যাম। তারপর বলল, ‘তুমি ডেপুটি শেরিফ হলে, শেরিফের মাথা ফাটল, আর ফাঁসি হলো ববির।’

কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল জেক। একসময় বলল, ‘আমার মনে হয়, টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যটার সাথে একটা সম্পর্ক ছিল ববির।’

‘মনে হওয়ার কারণ?’

‘ওয়াটার ট্যাঙ্কের কিনারায় বসে কিছু একটা করছিল লোকটা। গোপন কিছু। লরা দেখে ফেলল সেটা। অথবা, ববি ভেবেছিল, মেয়েটা দেখে ফেলেছে। এজন্যই লরাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল ববি। তার বস্তা খুঁজে কী পেলাম আমরা? লোহার পাত। কিন্তু, সে যে মাইনিং করছিল না, সেটাও আমরা জানি। আমার মনে হয়, ওয়াটার ট্যাঙ্কটাতে রহস্যময় কিছু একটা আছে। এবং, কোন না কোনভাবে তার সাথে জড়িত ববি।’

‘জড়িত ছিল,’ সংশোধন করে দিল স্যাম।

‘লুসির চাচা যে মার্ফায় এসেছে, শুনেছ নিশ্চয়ই? হোটেলের রেজিস্টার বইয়ে তার নাম দেখেছি আমি।’

‘বিল অসকার নামটা কি কিনে নিয়েছিল লুসির চাচা? অন্য কারও হতে পারে না নামটা?’

‘তা পারে বটে। তবে বিল অসকার হলে বার স্টিরাপের কোরালে জিন পরানো ঘোড়াটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।’

‘গতরাতে তোমার ডেস্কে কী রাখতে এসেছিলে?’

ড্রয়ার টেনে জিনিসগুলো বের করল জেক। দেখাল স্যামকে। তারপর ভাঁজ খুলল ছুরিটার। পরীক্ষা করল জিনিসটাকে। খেয়াল করল, নতুনের মতই আছে ছুরিটা। তারমানে, খুব বেশিদিন আগে কেনা হয়নি। ফলার উপরে লেখা আছে প্রস্তুতকারকের নাম, আর বাঁটের উপর একটা কাগজ আঠা দিয়ে সঁটে দেওয়া হয়েছে। কাগজটা তুলে ফেলবার প্রয়োজন বোধ করেনি বিবি।

নামটা পড়ল জেক। ‘উইলবার অ্যান্ড সন্স, বিগ বেড।’

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকাল স্যাম আর জেক।

‘কিছু বুঝলে?’ জিজ্ঞেস করল স্যাম।

‘বিগ বেড থেকে ছুরিটা কিনেছিল বিবি। তারমানে এখানে আসার আগে বিগ বেডে ছিল সে।’

‘লোকটা দেখি আমাদের সাথে ভালমতই জড়িয়ে গেছে,’ মন্তব্য করল স্যাম।

‘নাকি উল্টোটা? আমরা জড়িয়ে গেছি তার সাথে?’

‘এখন বোধহয় কেউই আর কারও সাথে জড়িয়ে নেই। পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে বিবি।’

কিছু না বলে তামাকের প্যাকেট আর সিগারেট পেপার দেখল জেক। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু পেল না।

তারপর কাগজের টুকরোটার দিকে মনোযোগ দিল সে। অস্পষ্ট অক্ষরে পেন্সিল দিয়ে সেটাতে লেখা আছে—

ভি এন ২২

আর্ট কার্ভেল।

লেখটা জোরে জোরে পড়ল জেক। স্যামের ভঙ্গিতে তাকে প্রশ্ন করল, ‘কিছু বুঝলে?’

এ পাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল স্যাম।

‘আমি শুধু বুঝেছি, আর্ট কার্ভেল কারও নাম।’

‘আরে সেটা তো একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারবে। ভি এন দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে, পারলে সেটা বলো।’

‘আপাতত পারলাম না,’ বলে ফুলস্কেপ কাগজটা হাতে নিল জেক। একনজর দেখেই বলল, ‘গতকাল রাতেই বুঝেছিলাম, একটা চিঠি এটা।’

‘শব্দ করে পড়ো,’ আদেশ দিল স্যাম।

পড়তে আরম্ভ করল জেক—

“চাচা,

বাবা মারা গেছে জেনে খুব দুঃখ পেয়েছি। আমাকে পাঠানো লুই মিডোসের চিঠিটা পড়ে জানতে পারলাম সব। আমাকে ওহায়ো যেতে বলেছে সে। সম্পত্তি নিয়ে কী নাকি কথা আছে। কিন্তু, যাওয়ার কোন উপায় নেই আমার। আমি পোয়াতি, সামনের মাসে বাচ্চা হবে। ডাক্তার আমাকে বেশি নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছে। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো বার স্টিরাপে। দেখে যাও আমাকে। তোমার সাথে খুব জরুরি কিছু কথা আছে আমার।

ইতি—

তোমার আদরের লুসি।”

পড়া শেষ করে হতভম্বের মত বসে রইল জেক।

‘মনে হচ্ছে বাজ পড়েছে তোমার মাথায়,’ মন্তব্য করল স্যাম।

‘মাথায় বাজ পড়লেও এতটা অবাক হতাম না আমি।’

‘হয়েছেটা কী?’

‘তুমি বুঝতে পারছ না? কী লিখেছে লুসি? লুই মিডোসের লেখা চিঠি পড়ে সব জেনেছে সে। কিন্তু, চিঠিটা তো দেখেইনি সে বা টম, পড়া তো দূরের কথা। তা হলে লুসি কীভাবে জানল যে, ওর বাবা মারা গেছে? আর ওকে ওহায়ো যেতে বলেছে মিডোস, এটাই বা জানল কীভাবে?’

দেখে মনে হলো, স্যামের মাথাতেও বাজ পড়েছে একটা।

‘শুধু তা-ই না, লুসির লেখা চিঠি ববির প্যাক্টের পকেটে এল কীভাবে?’

‘আবারও ববি,’ জেকের প্রশ্নটার উত্তর দিতে না পেরে মন্তব্য করল স্যাম।

‘টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যের সাথে ববির একটা যোগাযোগ না থেকে পারে না।’

‘পঁয়চ শুধু বাড়ছেই,’ হাজতের ভিতরে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে আরম্ভ করল স্যাম।

‘ঠিক রাস্তায় চিন্তা করলে হয়তো পঁয়চ কিছুটা কমবে,’ পাইপ ধরাল জেক। ডেস্কের উপর পা তুলে দিয়ে একমনে ধোঁয়া ছাড়ল কিছুক্ষণ। ওকে ধূমপান করতে দেখে সিগারেটের খিদে লেগে গেল স্যামেরও। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট পেপার আর তামাক বের করল সে। দ্রুত, অভ্যস্ত হাতে রোল করল একটা সিগারেট। তারপর আগুন ধরিয়ে টানতে আরম্ভ করল।

‘চিঠিটা লুসি লিখতে পারে না, মানো সেটা?’

বেশ কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিল স্যাম, ‘মানি।’

‘তা হলে, এমন কেউ চিঠিটা লিখেছে, যে জানে ওহায়োতে থাকে লুসির চাচা, সম্পত্তি মারা গেছে মেয়েটার বাবা, লুই মিডোস নামের কেউ একজন একটা চিঠি লিখেছিল তাকে, লুসির সাথে সম্পত্তি নিয়ে কথা বলতে চায় লোকটা

এবং সামনের মাসে বাচ্চা হওয়ার কথা লুসির।’

বুঝতে পেরে উপরে-নীচে মাথা নাড়ল স্যাম।

‘এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতগুলো ব্যাপার কার পক্ষে জানা সম্ভব?’

‘টম বা লুসির সাথে খাতির আছে এমন যে কেউ জানতে পারে।’

‘হতে পারে। কিন্তু, আসল সমস্যা হচ্ছে লুই মিডোসের চিঠি।’

‘কী রকম?’

‘টম, লুসি বা অন্য কেউ চিঠিটা দেখেনি, ছিঁড়েনি, কী লেখা আছে পড়েনি। কাজেই...’ কথা শেষ না করে থেমে গেল জেক।

‘হয়তো একটা তার করেছিল লুই মিডোস।’

‘সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হয়তো সেটাই।’

‘এক কাজ করো,’ পরামর্শ দিল স্যাম, ‘পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখো লুই মিডোসের তরফ থেকে লুসির নামে কোন তার এসেছিল কি না। তা হলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে ব্যাপারটা।’

‘ওরা ঠিকমত মনে করতে পারবে তো?’ জেকের স্বরে সন্দেহ।

‘সেটা আমি কী জানি? তুমি গিয়ে দেখো।’

‘তবে টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যটার সমাধান করতে না পারলেও আমাদের কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। ফোর্ট ডেভিস থেকে হার্শ কী খবর নিয়ে ফিরবে, জানা আছে আমাদের। তখন তোমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হবে শেরিফ।’

‘আর যদি ধূর্ত শেরিফ কাজটা না করে? হার্শের কথা শুনেই সে বুঝে যাবে, আমার সঙ্গেই লোকটা তুমি। তখন যদি সে আমার পাশের সেলটাতে ভরে তোমাকে?’

‘শেষ ভরসা হিসেবে লরা আছে...’ আত্মবিশ্বাস নেই জেকের গলায়।

‘শেষ ভরসায় যাওয়ার দরকার কী? নিজের মগজ আর হাতদুটোকে একটু খাটিয়ে দেখো কিছু করতে পারো কি না।’

চুপ করে গেল জেক। নীরবতা নেমে এল জেল অফিসে।

‘বার স্টিরাপে পা রেখেই ফেঁসে গেছি আমরা,’ নীরবতা ভাঙল স্যাম।

‘সুতরাং, বার স্টিরাপে যাও। সেখানে কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না, খোঁজ করো।’

‘তবে, বার স্টিরাপে যাওয়ার আগে মারফায় কিছু কাজ সারতে পারি আমি।’

‘যেমন?’

‘খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি বিল অসকার নামের লোকটা আসলে কে। যদি সে সত্যিই লুসির চাচা হয়ে থাকে, তা হলে কোথায় আছে সে এখন। আর ববির ব্যাপারে তো খোঁজ-খবর করতেই হবে।’

‘ভাল বলেছ। এ ব্যাপারে কাদেরকে জিজ্ঞেস করবে ভেবেছ?’

‘ডাক্তার বেন। হোটেল মালিক। বিল অসকার যদি অনুপস্থিত থাকে, তা হলে তার রুমে ঢুকে দেখতে পারি। নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জানতে পারব। সবশেষে যাব পোস্ট অফিসে। লুই মিডোসের তরফ থেকে কোন তার এসেছিল কি না, জানতে চাইব।’

‘দরকার মনে করলে লোকটাকে একটা তারও করে দিতে পারো। আমার মনে হয়, ওহায়োর কোন বিখ্যাত উকিল সে। কারণ, লুসির ধনী বাবা নিশ্চয়ই যাকে-তাকে নিজের উকিল বানাবে না।’

‘ওর চিঠিটার শেষে কী লেখা ছিল মনে আছে? পরামর্শদাতা উকিল। মনে হয়, ঠিকই বলেছ তুমি। ববির পকেট থেকে পাওয়া জিনিসগুলো আমার ড্রয়ারেই রেখে যাচ্ছি। দৌড়াদৌড়ির মধ্যে থাকতে হবে আমাকে, চিন্তা করার সুযোগ পাব না খুব একটা। তুমি জেলে অলস বসে না থেকে ভেবো ব্যাপারটা নিয়ে।’

‘কোন ব্যাপার?’

‘ভি এন ২২ আর্ট কার্ভেল। যেহেতু ববির পকেটে পাওয়া গেছে আর্ট কার্ভেল নামটা, সেহেতু লোকটার সাথে তার যোগাযোগ না থেকে পারে না।’

‘আপাতত একটা ধারণা দিতে পারি তোমাকে,’ দরজার কাছে পৌছে যাওয়া জেককে পিছু ডেকে থামাল স্যাম। ‘ছুরিতে বিগ বেন্ডের নাম ছিল। কাজেই, আমার মনে হয়, আর্ট কার্ভেল লোকটাও ওই শহরের অধিবাসী। তোমার না একজন বন্ধু আছে বিগ বেন্ডে? ওর কাছে খবর নাও। ববি এখন জাহান্নামে, কিন্তু, আর্ট কার্ভেলের দুনিয়াতে থাকতে অসুবিধা কী?’

দশ

রেগে লাল হয়ে গেছে হোটেল মালিক। সামনে দাঁড়ানো লোকটার সাথে উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে সে।

‘তোমার ঘোড়ার কী হয়েছে তার আমি কী জানি?’ মুখ ঝামটা দিল হোটেল মালিক, ‘যাও ভাগো এখান থেকে।’

তার মুখেমুখি দাঁড়ানো লোকটাও চিৎকার-চেষ্টামেচিতে কম না। খনখনে গলায় সমান তেজে বলল, ‘ধরে ধরে চোর-বদমাশদের নিজের হোটেলে জায়গা দিচ্ছ তুমি আর এখন বলছ আমার ঘোড়ার খবর তুমি জানো না? বাটপারির

আর জায়গা পাও না?’

‘কী?’ চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে গেল মালিক, ‘তোমাকে আমি...’ জেকের উপর চোখ পড়াতে থেমে গেল সে। আগের জায়গায় বসে পড়ল আবার।

এগিয়ে গিয়ে রিসেপশন ডেস্কের সামনে দাঁড়াল জেক। শান্ত গলায় হোটেল মালিককে জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার নামটা যেন কী?’

‘কলিন্স।’

‘আমার শার্টে তারাটা দেখতে পাচ্ছ কলিন্স?’

কিছু বলল না লোকটা।

‘কথা বলছ না কেন?’

‘পাচ্ছি।’

‘আর হোলস্টারের পিস্তলটা?’

মুখে কুলুপ আঁটল কলিন্স।

‘দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার পর মার্ক্সার লোকজনের একটা বৈশিষ্ট্য আমাকে বার বার বলেছে শেরিফ লুথার। তোমাদের ঘাড় নাকি বেশিরভাগ সময়ই বাঁকা থাকে। তাই শেরিফ বলল, তোমাদের সাথে কথা বলার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে আগে গুলি করা, তারপর ঘটনা কী, জিজ্ঞেস করা। ভেবে দেখলাম, কাজটা করা উচিত আমার,’ ইচ্ছে করেই ধামল জেক। তার কথার প্রভাব পড়তে দিল বাকি দু’জনের উপর।

একেবারে চুপ করে গেল কলিন্স আর তার সামনে দাঁড়ানো লোকটা।

ওষুধ কাজ করেছে বুঝতে পারল জেক। মনে মনে হাসল সে। পাশের লোকটার দিকে তাকাল।

ছোটখাটো এক বুড়ো। পরনে ময়লা জামাকাপড়। গালে চার-পাঁচ দিনের শেভ না করা দাড়ি-গোঁফ। ঘোড়ার গন্ধ আসছে তার গা থেকে। তারমানে দিনের বেশিরভাগ সময়ই ঘোড়ার সাথে কাটায়। স্টেবলম্যান, অনুমান করল জেক।

‘তোমার নাম কী, বুড়ো খোকা?’

‘থমসন।’

‘সকালে রেস্টুরেন্টে দেখেছিলাম না তোমাকে?’ আন্দাজে টিল ছুঁড়ল জেক।

কিন্তু, টিলটা লেগে গেল জায়গামত। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল থমসন।

‘কী বলেছিলাম, খেয়াল আছে নিশ্চয়ই?’

আবারও উপরে-নীচে মাথা নাড়ল থমসন।

‘এই বয়সেও তোমার স্মরণশক্তি ঠিক আছে জেনে ভাল লাগল। এবার বলো, সমস্যাটা কী? ঝগড়া করছিলে কেন তোমরা?’

একসাথে কথা শুরু করল কলিন্স আর থমসন। হাত তুলে কলিন্সকে থামিয়ে দিল জেক। প্রথমে থমসনকে বলতে দিল।

‘আমি মার্ফার স্টেবলম্যান। গতকাল বিল অসকার নামের এক লোক একটা ঘোড়া ভাড়া করে আমার কাছ থেকে। দুপুরের কিছু আগে ঘোড়াটা নিয়ে মার্ফা ছেড়ে কোথায় যেন চলে যায় সে। এখন পর্যন্ত ঘোড়াটা আর ফিরে পাইনি আমি।’

বিল অসকার নামটা শুনেই একটা ধাক্কা খেল জেক। রহস্যটা পরিষ্কার হচ্ছে না কিছুতেই। জিজ্ঞেস করল, ‘কিন্তু, তাতে কলিন্সের দোষটা কোথায়?’

‘ওই বিল অসকার তো ওর হোটেলেই উঠেছে।’

জেক জানে, কথাটা সত্য। কাজেই, সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করে আবার জিজ্ঞেস করল, ‘লোকটার বর্ণনা দিতে পারবে?’

‘অবশ্যই। বয়স আমার থেকে কিছুটা কম, আমাদের শেরিফের মত হবে। লোকটা খুব লম্বা। হালকা-পাতলা। গালে বড় বড়, সাদা চাপ দাড়ি। ভুরুর লোমগুলোও পাকা। নাকটা খুব খাড়া, সামনের দিকে বাঁকানো। জিঙ্গ, কমদামি একটা কালো শার্ট আর বাদামী একটা বুট পরে ছিল। মাথায় ছিল পুরনো একটা কালো হ্যাট। কোন হোলস্টার ছিল না কোমরে।’

কথাগুলো মাথায় গেঁথে রাখল জেক। জিজ্ঞেস করল, ‘আর তোমার ঘোড়াটা?’

‘আর বোলো না। ঘোড়াটার জন্যই তো পাগল হয়ে গেছি আমি। শহরের শ্রেষ্ঠ ঘোড়া ছিল সেটা। বড় আকৃতির একটা রোন। বাদামী রঙ। তেল চিকচিকে চামড়া। গত বছর মার্ফায় এক গানম্যান মারা পড়েছিল আমাদের লুথারের গুলি খেয়ে। মরার আগে দু’জনকে সাক্ষী রেখে আমাকে ঘোড়াটা দিয়ে যায় সে। স্যাডল সহ। কী বলব আর! ওরকম স্যাডল! একশো রাইডারের মধ্যে একজন ব্যবহার করে।’

বার স্ট্রাপের কোরালে দেখা জিন পরানো ঘোড়াটা ভেসে উঠল জেকের চোখের সামনে। থমসনের বর্ণনার সাথে মেলানোর চেষ্টা করল। মিলে গেল পুরোপুরি।

বার স্ট্রাপে কে গিয়েছিল গতকাল, জানা গেল—ভাবল জেক।

‘বুঝলাম,’ বাম হাতের কনুই রিসেপশন ডেস্কের উপর রেখে হেলান দিল সে। ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা আটকাল হোলস্টারের বেল্টে। ‘তোমার ঘোড়াটা মার্ফার শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। কিন্তু, কলিন্সের দোষটা বুঝলাম না এখনও।’

‘গতকাল থেকে এই পর্যন্ত চারবার এসেছি আমি। গতরাতে কলিন্স স্বীকার করল, বিল অসকার কোথায় গেছে জানে। কিন্তু, বলবে না। তুমিই বলো, কথাটা শুনলে রাগ হবে না তো কী হবে।’

নীল, স্বপ্নীল দু'চোখে যতটা সম্ভব কঠোরতা এনে কলিঙ্গের দিকে তাকাল জেক।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কলিঙ্গ। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত উপরে তুলল। 'না, না, মানে... আসলে...' আমতা আমতা করতে লাগল সে।

'বলার কিছু নেই ওর। আসল ঘটনাটা তাহলে বোঝো এখন, ডেপুটি। ওই বুড়ো বিল অসকার যদি ঘোড়াচোর না হয়, তা হলে আমার নাম থমসন না। আর এই কলিঙ্গ যদি তার সহযোগী না হয়, তা হলে আমার নামে কুস্তা পুষো তুমি।'

স্পষ্ট বুঝতে পারল জেক, কিছু একটা লুকাচ্ছে কলিঙ্গ। তাকে ভড়কে দেওয়ার জন্য বলল, 'তুমি জানো, তোমাকে ঘোড়া চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করতে পারি আমি?'

হাল ছেড়ে দিয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ল কলিঙ্গ। বলল, 'বিল অসকার ঘোড়া চোর না। লোকটা আসলে খুব ভাল। একদম সহজ-সরল আর ভুলোমনা,' কথা শেষ করে তাকাল জেকের দিকে।

'হ্যাঁ, তোমার ভাই লাগে তো, সেজন্য এত গুণ গাইছ,' সুযোগ পেয়ে ফোড়ন কাটল থমসন। 'বক বক না করে আসল কথাটা বলে ফেলো তাড়াতাড়ি। সময়ের দাম আছে আমার।'

'বার স্টিরাপের নাম শুনেছ না, ডেপুটি?' থমসনের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে জানতে চাইল কলিঙ্গ।

একটা ব্যঙ্গের হাসি হাসল জেক। মনে মনে বলল, 'শুনিনি আবার?' মুখে বলল, 'হ্যাঁ। কেন?'

'ওটার মালিক ছিল টম পোলার্ড...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হাত তুলে কলিঙ্গকে বাধা দিল জেক। 'ছিল বলছ কেন?'

'ওমা, তুমি জানো না?' দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেল কলিঙ্গ। 'টম আর তার বউ লুসিকে খুন করার অভিযোগে একটা লোককে গতরাতে ধরে আনল না আমাদের শেরিফ?' দাঁত বের করে হাসল সে। 'তুমি চাইলে একটা গরম খবর দিতে পারি তোমাকে। শুনবে?'

'লোকটা কথা প্যাঁচাতে ওস্তাদ, ডেপুটি,' জেকের পাশ থেকে প্রতিবাদ করল থমসন। 'আসল কথা শেষ করতে বলো ওকে।'

'শোনাও দেখি তোমার গরম খবর,' অমঙ্গল আশঙ্কা করে প্রসঙ্গ থেকে সরে যেতে বাধ্য হলো জেক। 'খবরটা বাসি হলে কিন্তু কোন দাম পাবে না, আগেই বলে রাখলাম।'

'বাউগুলো ছোকরাদের নিষে একটা দল গড়েছে কার্ক। নেতৃত্বে আছে

সে-ই। অস্ত্র, ঘোড়া সব যোগাড় করে ফেলেছে। আজ রাতের ভেতরে শেরিফ কিছু করতে না পারলে ওরা ফাঁসিতে ঝুলাবে স্যাম ওয়েডকে। গাধাটার নাম তো সেটাই, নাকি?’

কথাটা শুনে যার-পর-নাই আশ্চর্য হয়ে গেল জেক। কী বলবে ভেবে না পেয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কলিন্সের দিকে।

হোটেল মালিক বুঝল, তার দেওয়া খবরটার গরম সহ্য করতে পারেনি ডেপুটি শেরিফ। নিজের সাফল্যে আবার দাঁত বের করে হাসল সে। খুশিতে ঝকঝক করছে তার চোখজোড়া।

‘কী? কেমন লাগল? টাটকা তো?’ আরাম করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। ‘এই কিছুক্ষণ আগে শেরিফের খবর পেয়েছি। বিছানা থেকে মাথা তুলতেই পারছে না। একবার জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে, আবার তার পাঁচ মিনিট পরেই হারাচ্ছে। সুতরাং, বুঝতেই পারছ, আজ রাতের ভেতরে কিছু করা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। আর তোমার কথা তো বাদই দিলাম। লুথারের মত ঘাণ্ড লোক যখন কিছু করতে পারেনি, তখন তো তুমি...’ কথা শেষ না করে চোখুটিপল কলিন্স।

কখন এত কিছু করল কার্ক? মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করল জেক।

‘আরে বাবা, খুন করেছিস ভাল কথা,’ জেক শুনছে না বুঝতে পেরে থমসনকেই শোনাতে লাগল কলিন্স। মার্যার শ্রেষ্ঠ ঘোড়ার কথা ভুলে গিয়ে স্টেবলম্যানও শুনতে লাগল মনোযোগ দিয়ে। ‘তারপর পালিয়ে গেলি না কেন? কেন শেরিফের হাতে ধরা খাওয়ার জন্য বসে রইলি কেবিনের ভেতরে? এতই খিদে পেয়েছিল তোর? এক মাইল দূরেই তো মার্যা। এখানে এলেই তো পারতি। রেস্টুরেন্ট নেই আমাদের এখানে? গাধা আর কাকে বলে!’

‘কার্কের দলটা এখন কোথায়?’ জেকের গলা দিয়ে কোলাব্যাণ্ডের মত আওয়াজ বের হলো।

‘কে জানে?’ ঠোট উল্টাল কলিন্স। ‘খুঁজে দেখো, মদ খেয়ে কোথায় মাতলামি করছে।’

হঠাৎ এড রুফাসের কথা মনে পড়ল জেকের। জিজ্ঞেস করল, ‘রুফাসের খবর জানো কিছু? কোথায় সে এখন?’

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কলিন্স। উত্তরটা দিল থমসন, ‘শহর ছেড়ে চলে গেছে অনেক আগেই।’

‘তুমি দেখেছ?’

‘হ্যাঁ।’

একটা সমস্যা থেকে বাঁচলাম, ভাবল জেক। কাল রাতের ঘটনাটার প্রতিশোধ নিতে হয়তো তার উপর হামলা চালাত কার্কের দলবল।

মনে মনে দ্রুত একটা হিসাব কষল জেক। কোন্টা বেশি জরুরি? কার্কের

পিছু ধাওয়া করা, নাকি টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যটার তদন্ত করা? বিকেলের আগে কার্ক কিছু করবে বলে মনে হয় না। সুতরাং, ততক্ষণ পর্যন্ত তদন্ত চালানো যেতে পারে। তারপর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অ্যাকশনে নামতে হবে। ববির মত স্যামকেও কটনউডের ডালে ঝুলতে দেওয়া যাবে না।

চিন্তার রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরে এল জেক। কলিন্সকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি যেন কী বলছিলে? টম আর লুসির সাথে বিল অসকারের সম্পর্কটা কোথায়?’

‘আরে কী বলে, সম্পর্কটা কোথায়? লুসির আপন চাচা এই বিল অসকার। বিয়ের পর ওহায়ো ছেড়ে টম আর লুসি এখানে চলে এল। মাঝেমধ্যে বার স্টিরাপে যেত বিল, খোঁজ-খবর নিত তার আদরের ভতিজির। মার্কীয় এলেই উঠত আমার হোটেল। বিয়ে-শাদী করেনি তো, তাই বাচ্চাকাচ্চাও নেই বিলের। লুসিকে আপন মেয়ের মতই আদর করত দুনিয়াছাড়া মানুষটা।’

‘তারমানে,’ থমসনের দিকে ঘুরল জেক, ‘বার স্টিরাপে যাওয়ার সময় হয়েছে তোমার। রানশ্টার কোরালে হয়তো পাবে মার্কীয় শ্রেষ্ঠ ঘোড়াটাকে।’

চলে গেল থমসন।

আবার কলিন্সের দিকে ঘুরল জেক। বলল, ‘ঘোড়াটা যে বার স্টিরাপে আছে, সেটা গোপন করছিলে কেন তুমি?’

‘থমসনকে বলতাম আমি। কিন্তু, লোকটা এমন হুমিতমি আরম্ভ করল যে, মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, ভুগুক কিছুক্ষণ দুশ্চিন্তায়। আমার সাথে বাড়াবাড়ি? ওরে বাবা... ঘুঘু দেখেছ...’

কলিন্সকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল জেক, ‘ববির ব্যাপারে কিছু বলো আমাকে। থাকত কোথায় লোকটা? করত কী?’

‘থাকত আমার এখানেই। আর কী করত জানি না।’

‘তোমার এখানে থাকত? বলো কী?’

‘আর কোথায় যাবে? মার্কীয় সে একজন স্ট্রেকার। হোটেল ছাড়া উঠবে কোথায়?’

সহজ কথাটা একবারও মাথায় আসেনি জেক বা স্যামের। নিজেই স্বীকার দিল জেক।

‘সে এসেছিল কবে?’

রেজিস্টার খাতাটা খুলল কলিন্স। একটা পাতা উল্টাল। তারপর বলল, ‘এই যে, পেয়েছি। সাত দিন আগে।’

‘কতদিনের জন্য রুম ভাড়া করেছিল?’

‘দুই সপ্তাহ,’ দেখে বলল কলিন্স।

খাতাটা নিজের দিকে টেনে নিল জেক। চোখ বুলাল একবার।

লোকটার পুরো নাম ববি মার্জ। আট নম্বর রুমটা পেয়েছিল সে। ভাড়ার পুরোটাই অগ্রিম পরিশোধ করেছিল। একটু খটকা লাগল জেকের। একজন গানম্যান সাধারণত এতটা ভদ্র হয় না।

কলিন্সকে জিজ্ঞেস করল জেক, ‘ব্যাপারটা কী? ভাড়া অগ্রিম দিয়েছিল কেন ববি?’

‘আমি কী জানি? তার চোখের দিকে তাকানোমাত্রই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ভাড়ার কথা বলব কি না, ভাবছিলাম। আমি কিছু বলার আগেই পুরো টাকা বের করে আমার হাতে দিয়ে দিল ববি। বলল, “পাওনা মিটিয়ে দিলাম। মনে রেখো, কোন র‍্যামেলা চাই না। কেউ যেন বিরক্ত না করে আমাকে। করলে সেটার হিসাব তোমাকে দিতে হবে।”’

‘তাই নাকি?’

‘অবশ্যই। জাত খুনী লোকটা। আমাকে একা পেয়ে কীভাবে ভয় দেখিয়েছিল জানো? কত দ্রুত পিস্তল বের করতে পারে, সেটা দেখিয়েছিল। ওরে বাপরে! জীবনে অনেক গানম্যান দেখেছি, কিন্তু, যিশুর কিরে, ববির মত ফাস্ট কাউকে দেখিনি। তা ছাড়া শরীর দেখেছিলে লোকটার? ওর বাপ বা দাদার কেউ একজন গ্রিজলি ভালুক ছিল, আমি নিশ্চিত। ববি আসার পর প্রথম রাতে ভালমত ঘুমুতেই পারিনি আমি।’

কলিন্সের জন্য খুব একটা মায়া হলো না জেকের। এখনও অনেক কিছু জানবার বাকি রয়েছে। আবারও জিজ্ঞেস করল সে, ‘আর কিছু বলেনি বা করেনি ববি? কিছু জানতে চায়নি তোমার কাছে?’

‘বলেছে, করেছে, জানতেও চেয়েছে।’

‘কী?’

‘দরজা দিয়ে ঢুকে আমার সামনে দাঁড়াল লোকটা। হোটেলে ঢুকলে লোকে কী করে? হাই, হ্যালো না বললেও জানতে চায় রুম খালি আছে কি না। ববি কী করল জানো?’

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জেক।

‘ওহায়ো থেকে স্টেজকোচ কখন মার্কায় এসে পৌঁছে, জানতে চাইল। আরে বাবা, শহরে এত লোক থাকতে আমার কাছে জানতে চাও কেন? জিজ্ঞেস করব বলে চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। ওকে দেখে মুখের ভেতরেই মরে গেল প্রশ্নটা। গড়গড় করে বলে দিলাম সব।’

‘আচ্ছা। তারপর?’

‘তারপর তো ওর কেরামতি দেখাল। আর আমাকে মুখ একদম বন্ধ রাখতে বলল। ওর পিস্তলের বাঁটে পাঁচটা দাগ কাটা ছিল, দেখাল আমাকে। বলল, মুখ বন্ধ না রাখলে আমাকে খুন করে ছয় নম্বর দাগটা কাটবে।’

‘করত কী সে সারাদিন?’

‘নিজের ঘরেই থাকত বেশিরভাগ। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনার সারার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে যেত রেস্টুরেন্টে। খাওয়া শেষ করে ফিরে আসত খুব তাড়াতাড়ি। একদিনের জন্যও তাকে সেলুনে যেতে দেখিনি। মদ খায় না, এরকম অদ্ভুত গানম্যান জীবনে প্রথমবার দেখলাম আমি।’

‘ঘরের ভেতরে কী করত ববি?’ বিড় বিড় করে প্রশ্নটা নিজেকেই জিজ্ঞেস করল জেক।

‘কিন্তু, ‘শুনে ফেলল কলিন্স। বলল, ‘জানি না। নিষেধ করেছিল আমাকে, তাই তাকে ঘাঁটাইনি আমি। বউ-বাচ্চা আছে আমার।’

কথাগুলো শুনতে পেল না জেক। অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি ভুল করছ না তো? কারও সাথে যোগাযোগ করত না ববি? একা একা সময় কাটানোর জন্য মার্ফায় এসেছিল সে? তোমার কাছে অদ্ভুত মনে হয় না ব্যাপারটা?’

‘মনে হয় না’ আবার? আমার কী ধারণা জানো? দূরের কোন একটা শহর থেকে খুন-খারাপি করে মার্ফায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল লোকটা। তবে কারও সাথেই যে যোগাযোগ করত না, কথাটা ঠিক না। প্রতি দু’দিন পর পর পোস্ট অফিসে যেত। কী করত, খোদা মালুম। আসার ছয় দিন পর, মানে গতকাল কোথায় যেন চলে গেল সে। সকাল থেকে কোন পাস্তা ছিল না তার। সন্ধ্যার দিকে দুই হাতে ব্যান্ডেজ নিয়ে হোটেল ফিরে এল। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েই সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল উপরে। ধরা খাওয়ার আগে আর নামল না নীচে।’

দুইয়ে দুইয়ে চার মিলানোর চেষ্টা করল জেক। পারল না। এখনও কিছু শূন্যতা রয়ে গেছে। সেগুলো ভরাট করতে হবে। মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে ঘন, বাদামী, ঈষৎ কোঁকড়া চুলে হাত বুলাল সে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রেজিস্টার খাতাটার দিকে। ভালমত খেয়াল করল রুম নম্বরগুলো। ববির আট, বিল অসকারের পনেরো আর ওদের, মানে ওর আর কার্কের উনিশ।

কাগজের টুকরোটার কথা হঠাৎ মনে পড়ল জেকের। জিজ্ঞেস করল কলিন্সকে, ‘গতকাল রাতে হোটেল ছেড়ে বাইরে কোথাও গিয়েছিল কার্ক?’

‘নাহ্। রুফাস যেরকম পিটিয়েছে ওকে, তাতে তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠারই কথা না ওর।’

হোটেল ছেড়ে বের হয়নি কার্ক, ভাবল জেক, কিন্তু, রুম ছেড়ে বের হয়েছিল কি হয়নি সেটা কে জানে? অথবা ওর রুমে হয়তো ঢুকেছিল কেউ। ঢুকে থাকলে সেটা কে?

‘আচ্ছা, ভালমত ভেবে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো,’ কলিন্সকে

অনুরোধ করল জেক, ‘গতরাতে আমি বাইরে যাওয়ার পর আর কে কে ঢুকেছিল হোটেল?’

ধুলো উড়ে বেড়াচ্ছে খটখটে শুকনো রাস্তাটায়। খোলা দরজাটা দিয়ে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কলিন্স। মনে করবার চেষ্টা করছে সে। বলল একসময়, ‘কেউ না। বোর্ডারদের কেউ বেরও হয়নি, নতুন কেউ আসেওনি।’

খোলা রেজিস্টার খাতাটা প্রমাণ করছে, জেকের পর আর কেউ রুম ভাড়া নেয়নি গতকাল। তা হলে কে? আবার ভাবল জেক।

তারমানে, কার্ক হয়তো অন্য কোন বোর্ডারের রুমে গিয়েছিল অথবা অন্য কোন বোর্ডার ঢুকেছিল কার্কের রুমে।

‘কার্ক পোলার্ড,’ নামটা উচ্চারণ করল জেক। ‘লোকটা কেমন, কলিন্স?’

‘এমনিতে তো ভালই। কারও সাথে-পাঁচে নেই। ভদ্র, অমায়িক।’ তবে খুব সহজেই রেগে যায়, আবার সেই রাগ ঠাণ্ডা হতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু, রাগটা যতক্ষণ তার মাথায় থাকবে, ততক্ষণ সে একটা পশু। আর, বুদ্ধি-শুদ্ধি একটু কম আছে ওর।’

‘তুমি কবে থেকে চেনো তাকে?’

‘মার্কীয় আসার পর থেকেই। প্রেম করে বিয়ে করেছিল ওর বড় ভাই টম পোলার্ড, জানো তো?’

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল জেক।

‘কিন্তু, লুসির বাবা বিয়েটা মেনে নেয়নি। ওহায়ো ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হলো টম আর লুসি। ভাই-ভাবির সঙ্গে এল কার্ক। ওরা তিনজনে মিলে গড়ে তুলল বার স্টিরাপ। কী কারণে জানি না, মাস তিনেক আগে রানশ্ ছেড়ে বিগ বেঙ্গে চলে গেল কার্ক। গতকাল ফিরল। তারপরের ঘটনা তো জানাই আছে তোমার,’ জেক কিছু বলল না দেখে কথা চালিয়ে গেল কলিন্স, ‘টম আর লুসি নিখোঁজ জানতে পেরে কার্কের মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। ওকে চোখে চোখে রেখো ডেপুটি। কখন কী করে বসে, ঠিক নেই। মনে রেখো, কোমরে একটা পিস্তল ঝুলিয়েছে সে। মার্কীর ভদ্রলোকদের মধ্যে ওর চেয়ে ফাস্ট আর কেউ নেই। তবে...’ জেককে অন্যমনস্ক দেখে কথাটা বলবে কি বলবে না, একবার ভাবল কলিন্স। তারপর বলেই ফেলল, ‘রাইফেলে কিন্তু ওর হাত খুব জঘন্য। হাতে একটা উইনচেস্টার দিয়ে দশ ফিট দূর থেকে একটা ঘোড়াকে গুলি করতে বলো ওকে, দেখবে, ঠিক মিস করবে সে।’

জেক ভাবছে অন্য কথা। কার্ক কার রুমে গিয়েছিল অথবা অন্য কে এসেছিল কার্কের কাছে, জানা হলো না।

‘ববি ধরা পড়ল কীভাবে?’ চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এসে কলিন্সকে জিজ্ঞেস করল সে।

‘ওর কথা আর বোলো না,’ হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল কলিন্স। ‘স্প্লিট! এল্ভের তিন জন রাইডার এসে ববির বর্ণনা দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, হোটেলে আছে কি না সে। বললাম, আছে। রুম নম্বর জানতে চাইল। জানালাম, আট। দেরি না করে ওরা উঠে গেল উপরে। তার কিছুক্ষণ পরই মারতে মারতে ববিকে বাইরে নিয়ে গেল ওরা। আহত থাকায় সুবিধা করতে পারেনি ববি। নইলে থ্রিজলির বাচ্চাকে ধরে সাধ্য কার?’

‘আমি বাইরে চলে যাওয়ার পর কার্কের কাছে কোন গেস্ট এসেছিল?’

‘আরে ধুর, ওর কাছে কে আসতে যাবে? মাথা গরম, আধ পাগলার কাছে এসে মরবে নাকি? ও কখন কী করে কোন ঠিক আছে?’

এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলল না জেক। জিজ্ঞেস করল, ‘আজ কোথায় গিয়েছিল ববি? জানো কিছু?’

‘কীভাবে জানব? বিল অসকার বের হওয়ার দশ মিনিট পর দেখলাম, একটা সাইনবোর্ড হাতে নিয়ে ঝড়ের বেগে সে-ও বের হয়ে গেল। যাওয়ার আগে এমনভাবে তাকাল আমার দিকে যে, মনে হলো, ফিরে এসে জানটা কবজ করবে আমার।’

কলিন্সের উদ্দেশে হাত বাড়াল জেক। ‘আট আর পনেরো নম্বর রুমের চাবি দাও।’

এগারো

ধীরে ধীরে চোখ খুলল শেরিফ। একই সকালে তৃতীয়বারের মত।

তার অবস্থা খুব একটা সুবিধার না। আগে দু’বার জ্ঞান ফিরে পেয়ে হারিয়েছে সে। আবারও হয়তো হারাব, ভাবল লুথার। প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করে ঘাড়টাকে ডানদিকে বাঁকাল সে, খোলা জানালা দিয়ে তাকাল মার্কীর অলস রাস্তার দিকে।

কর্মচঞ্চল না শহরটা। আশপাশে রানশ্ আছে একাধিক, সেখান থেকে কাউবয়েরা মাঝেমধ্যে আসে এখানে, সময় কাটিয়ে যায়। ঝামেলাটা হয় তখনই। কিন্তু, সেসব ছোটখাটো, ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। পল জেমিসন গতরাতে যে কাজটা করে গেল, সেগুলোই বড় সমস্যা।

জ্ঞান হারাচ্ছে না দেখে উঠে বসবার চেষ্টা করল লুথার। প্রথমবারে পারল না। সফল হল দ্বিতীয়বার। উঠে বসবার পর তার মনে হল, হঠাৎ রাত হয়ে

গেছে মার্কায়। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল সে, দপ দপ করতে আরম্ভ করল খুলির আঘাতপ্রাপ্ত অংশটা। কিন্তু, কড়া লোক লুথার, পাস্তা দিল না ব্যাথাটাকে। চোখের সামনে থেকে কালো পর্দাটা সরে না যাওয়া পর্যন্ত বসেই রইল।

খিদে টের পেল লুথার। সুলক্ষণ, ভাবল সে। আশপাশে কোথাও তার স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে যতটা সম্ভব গলা চড়িয়ে ডাকল, ‘আগাথা?’

রান্নাঘরে কিছু একটা করছিল পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলাটা। লুথারের ডাক শুনে ছুটে এল। দাঁড়াল স্বামীর সামনে।

জীবনের শুরুতে মানুষকে নির্ভর করতে হয় কারও না কারও উপর, ভাবল লুথার। আবার জীবনের শেষের দিকেও সেই একই নির্ভরতা দরকার হয় তার। স্ত্রীকে ওই মুহূর্তে এতটাই ভাল লাগল লুথারের যে, তার মনে হলো, ‘মানবী নয় আগাথা, দেবদূত। ব্যথা অর্ধেক ভুলে গেল শেরিফ। বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল। বলল, ‘খিদে পেয়েছে আমার। আমাকে ধরো। ডাইনিং টেবিলে নিয়ে চলো।’

টেবিলে বসবার আগে বেসিনটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল লুথার। ভালমত হাত-মুখ ধুলো। তারপর তাকাল সামনের আয়নাটার দিকে। দেখল, তার মাথার চারদিকে পেঁচিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ডান হাত তুলে আঘাতপ্রাপ্ত অংশটা ধরল সে। নরম, মোটা কিছু একটার অস্তিত্ব টের পেল। বুঝল, ঠেসে তুলো ভরা আছে জায়গাটায়।

‘তা হলে ওরা আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে?’ চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল লুথার।

‘কিছুটা,’ স্বামীর প্লেটে খাবার তুলে দিতে দিতে বলল আগাথা।

‘অনেক রক্ত গেছে, তাই না?’

‘না। এত জোরে মারেনি। বেন বলল, এক সপ্তাহ টানা বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে তুমি।’

খেতে খেতে গতরাতের ঘটনা জানতে চাইল লুথার। ‘যতটুকু জানা ছিল, বলল আগাথা। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার ডেপুটি দেখতে এল না কেন তোমাকে?’

‘কার কথা বলছ তুমি? হার্শ?’

‘হার্শ ছাড়া আর কোন ডেপুটি আছে নাকি তোমার?’

‘আছে। হার্শের অনুপস্থিতিতে কাজ করছে। জেক রায়ার নাম। ফোর্ট ডেভিসে গেছে হার্শ, হয়তো আজ রাতে ফিরবে। কিন্তু, আমার খোঁজ নিতে আসেনি জেক? তা হলে ওকেও আবার মারল নাকি পলের লোকেরা? তুমি শুনেছ কিছু?’

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল আগাথা।

জেকের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল লুথার। কিন্তু, কিছু না বলে খাওয়া চালিয়ে

গেল। দু'জনের সমান খাবার খেল সে। তারপর পর পর দু'কাপ গরম কফি গিলল। খেয়াল করল লুথার, এখন আর ব্যথাটা খুব বেশি জ্বালাচ্ছে না তাকে।

নিজের চেষ্টাতেই উঠে দাঁড়াল শেরিফ। হেঁটে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর গেল বেডরুমে, সময় নিয়ে পড়ল গানবেল্টটা। ডাইনিংরুম থেকেই স্বামীর কাণ্ড-কারখানা দেখছিল আগাথা, পায়ে পায়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে।

‘মাথায় বাড়ি খেয়ে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার?’

হাসল লুথার। ‘মার্কার অবস্থা খুব খারাপ, ডার্লিং। আমাকে মেরে এক লোককে বুলিয়ে দিয়ে গেছে পল। টম আর লুসিকে খুন করার দায়ে আমার হাজতে বন্দী আছে আরেকজন। প্রথমে ভেঁরেছিলাম, ঠিক লোককেই ধরেছি আমি। কিন্তু, গতরাতে জেল অফিসে বসে অনেক ভেবে বুঝলাম, যাকে ধরেছি, সে খুনী নয়। এমনকী খুনটাও প্রমাণ করতে পারিনি এখনও। অথচ, বন্দী লোকটার উপর শোধ নেওয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে পাগলা কার্ক। আগে থেকেই খুন খুন বলে চেষ্টাচ্ছে সে। আমার মনে হয়, ভাইয়ের খুনের বদলা নিতে কিছু না কিছু করার চেষ্টা করবেই কার্ক। আমার দশ বছরের শেরিফ জীবনে যা ঘটেনি, এক রাতেই ঘটে গেল সেটা। আমি না থাকলে হয়তো আরও খারাপ কিছু ঘটবে। মারা পড়বে নির্দোষ, নিরীহ লোকজন। কাঁজাই, যেতেই হচ্ছে আমাকে।’

স্বামীকে চেনে আগাথা। জেল অফিসে যাবেই এখন লুথার। তাকে থামানো যাবে না কিছুতেই।

আর কিছু বলল না আগাথা। নিজের বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে এল শেরিফ লুথার।

ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। ঝাঁকি সহ্য করতে পারবে না ভেবে স্যাডলে চড়ল না শেরিফ। হেঁটেই রওয়ানা হলো জেল হাউসের উদ্দেশ্যে।

তাকে দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পথচারীদের কেউ কেউ। রেস্টুরেন্ট মালিক যাচ্ছিল কোথাও, শেরিফকে দেখে এগিয়ে এল কাছে।

‘কী ব্যাপার? ডাক্তার বেন কি আজকাল যাদু করতে শিখেছে?’

হাসল লুথার। জানতে চাইল, ‘শহরের অবস্থা কী?’

‘খুব খারাপ,’ অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লোকটা, ‘চ্যাংড়া ছেলেপেলদের ইচ্ছেমত মদ খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়েছে কার্ক। প্রয়োজনমত অস্ত্র আর ঘোড়াও যোগাড় করে ফেলেছে। তিনজনকে নিজের হাতে কটনউডে বুলানোর কসম খেয়েছে সে—স্যাম ওয়েড, এড রুফাস আর পলের ফোরম্যান ফ্র্যাঙ্ক মেলন। গতরাতে খেল দেখিয়ে গেছে পল জেমিসন, আজ রাতে দেখাবে কার্ক পোলার্ড। পল তো তবুও অনেক সতর্ক, হিসেবী। আর কার্ক যে অর্ধেক পাগল, মার্কার সবাই সেটা জানে। পলের লোক

তোমার খুলি ফাটিয়েছে, আর কার্ক তোমার খুলি উড়াবে। সাবধানে থেকো তুমি, লুথার,' বলে আর অপেক্ষা করল না লোকটা, চলে গেল।

চিন্তিত মুখে জেল অফিসে ঢুকল শেরিফ। তার সাথে চোখাচোখি হওয়ামাত্রই বলল স্যাম, 'তুমি মানুষ না অন্য কিছু?'

না শোনার ভান করল শেরিফ লুথার। গিয়ে বসল নিজের ডেস্কে।

'আমি মুক্তি পাচ্ছি কখন?' হাসি-ঠাট্টার ইচ্ছে লুথারের নেই বুঝতে পেরে সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল স্যাম।

'মুক্তি পাচ্ছ কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না এখনই। তবে, হার্শ ফেরার পর ওর কথা শুনে সিদ্ধান্তটা নিতে হবে আমাকে,' চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ স্যামের দিকে তাকিয়ে রইল শেরিফ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'জেককেও পিটিয়েছে নাকি পল গতরাতে?'

'না।'

'তা হলে তাকে দেখছি না কেন? কোথায় গেছে সে?'

'টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যটার তদন্ত করছে।'

'তুমি জানলে কীভাবে?'

'আমাকে বলে গেছে।'

'তুমি এমন বিশেষ কে যাকে বলে যেতে হবে?'

'আমি হচ্ছি দোষ না করে ফেঁসে যাওয়া এক নিরীহ লোক। গতকালও জিজ্ঞেস করেছিলাম, উত্তর দিতে পারোনি বলে আজ আবার জিজ্ঞেস করছি। ওদেরকে কেন খুন করতে যাব আমি? এমন কী জরুরি দরকার পড়েছিল আমার?'

'সেটা তুমি জানো,' মুখ গোমড়া করে উত্তর দিল শেরিফ।

'বাদ দাও পুরনো কথা। গতরাতে ববির লাশ দাফন করেছে জেক। ববি কে বুঝতে পারছ তো? পল যাকে বুলিয়ে দিয়ে গেছে। যা-ই হোক, লাশটা কবরে নামানোর আগে লোকটার পকেট হাতড়ে দেখেছে তোমার ডেপুটি। যা যা পেয়েছে, রেখে গেছে নিজের ড্রয়ারে। ইচ্ছে হলে দেখতে পারো।'

করবার তেমন কিছু নেই। কাজেই, কাজটা করা যেতে পারে, ভেবে দেখল লুথার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ডেপুটির ডেস্কের দিকে এগুবার সময় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার এত গরজ কেন?'

'গরজ আমার থাকবে না তো কার থাকবে? সাধ করে কি কেউ গলায় দড়ি পড়তে চায়?'

জিনিসগুলো নিয়ে আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়ল শেরিফ লুথার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সবগুলো। চিঠিটা মনোযোগ দিয়ে পড়ল দু'বার। তারপর হঠাৎ কী যেন মনে পড়ল তার। ড্রয়ার টেনে আরেকটা চিঠি বের করল সে।

মিলিয়ে দেখল চিঠি দুটো। একসময় হাত থেকে ডেস্কের উপর রেখে দিল দুটো চিঠিকেই। আরাম করে হেলান দিল চেয়ারে। তারপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল স্যামের দিকে।

লুথারের দৃষ্টিটা কয়েক মুহূর্ত সহ্য করবার পরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল স্যামের। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘যতদূর জানি, আমি কুৎসিত পুরুষ মানুষ আর তুমিও বুড়ো হয়েছ। তাহলে উজবুকের মত তাকিয়ে আছ কেন আমার দিকে?’

‘কার্ক একটা দল গড়েছে, জানো?’

‘না। আমাকে জানিয়ে কাজটা করেনি সে। আর আমাকে তার দলে যাওয়ার আমন্ত্রণও জানায়নি।’

‘শহরের সব উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের দলে নিয়েছে সে।’

‘স্বাভাবিক,’ মন্তব্য করল স্যাম। ‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।’

‘দলটা কেন গড়েছে সে, বুঝতে পারছ?’

‘কেন আবার? দল নিয়ে ভাইকে খুঁজতে বের হবে প্রথমে। আধ ঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করার পর গরমে আর সবকিছুর মত ওর মাথাটাও গরম হবে, তখন খুঁজবে কাকে বুলানো যায় কটনউডে। শেষ পর্যন্ত কাউকে না পেয়ে নিজের ঘোড়াটাকেই বুলিয়ে দেবে পাগলটা।’

‘ভাইকে খুঁজে না পেলে ফিরে এসে তোমাকে নিজ হাতে ফাঁসিতে বুলানোর কসম খেয়েছে সে,’ আসল কথাটা জানাল শেরিফ।

রক্ত সরে গেল স্যামের মুখ থেকে। ফ্যাসফ্যাসে গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘কথাটা আমাকে কেন জানালে, লুথার?’

‘কারণ, আমার মনে হয়, টম বা লুসি নিখোঁজ হওয়ার পেছনে সত্যিই হাত নেই তোমার।’

‘আমিও তোমার সাথে একমত, শেরিফ,’ দরজার কাছ থেকে হঠাৎ ঘোষণা করল একটা মিষ্টি নারী কণ্ঠ।

একই সাথে ঘাড় ঘুরাল লুথার আর স্যাম। দেখল, জেল অফিসের দরজায় কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে লরা জেমিসন।

বারো

আট নম্বর রুমটার ভিতরে পা দিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত, গা শিউরানো ভাব হলো জেকের। মনে হলো, তাকে লক্ষ করছে কেউ একজন। পিস্তলের

বাঁটাতে হাত রাখল সে। ঠাণ্ডা, পরিচিত ধাতব স্পর্শে অপার্থিব অনুভূতিটা দূর করল।

দেখলেই বোঝা যায়, ঘরটা একজন নিঃসঙ্গ, আগোছালো লোকের। অল্প কিছু কাপড়-চোপড় তার, সেগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে এখানে-সেখানে। কাপড়গুলো খেয়াল করল জেক। সব সস্তা, কম দামি।

জিনিসপত্র বলতে দাড়ি কামানোর যন্ত্রপাতি আর তিন বায়ু বুলেট। ঘরটাতে ভালমত আরেকবার নজর বুলাল জেক। একপ্রান্তে একটা রঙের কৌটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল। সাবধানে খুলল কৌটাটা। দেখল, ভিতরে সাদা রঙ। পাশে একটা ব্যবহৃত ব্রাশও দেখতে পেল। ববির মত একজন গানম্যান রঙ আর ব্রাশ দিয়ে কী করতে পারে, মাথায় এল না জেকের।

ববির কাপড়গুলো একটা একটা করে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল সে। কতগুলো কাগজের টুকরো ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই পেল না। সবগুলো কাগজের টুকরো নিয়ে বিছানার উপর বসে পড়ল জেক। সময় নিয়ে দেখল।

একটা চিরকুট, তিন-চারটা রসিদ, আর বেশিরভাগই বাজে হিসাবের কাগজ। হিসাবের কাগজগুলোতে দুয়েকবার করে চোখ বুলিয়ে কিছুই বুঝতে না পেরে সেগুলো দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে দিল জেক।

রসিদগুলো খেয়াল করল সে তারপর। একটা বিগ বেডের জৈনিক উইলবার কর্তৃক স্বাক্ষরিত, নীচে লেখা-উইলবার অ্যান্ড সন্স। বিবরণটা পড়ে বুঝতে পারল জেক, একটা ফোল্ডিং নাইফ বিক্রির রসিদ সেটা।

বাকিগুলোর লেখা প্রায় হলুদ হয়ে গেছে, ঠিকমত পড়তে পারল না জেক। কীসের রসিদ সেগুলো, বুঝতে পারল না।

সবার শেষে চিরকুটটাতে মনোযোগ দিল সে। তাতে লেখা আছে- “দায়িত্ব বুঝে নিয়েছি, মিস্টার অ্যান্থনি মার্জ।” লাইনটার নীচে একটা নাম লেখা- “আর্ট কার্ভেল, পরামর্শদাতা উকিল, বিগ বেড।”

খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করল জেকের। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে একটু আলোক দেখা পাওয়া গেছে। আর্ট কার্ভেল কে, কোথায় থাকে, কী করে জানা গেছে। কিন্তু, ভাবল জেক, অ্যান্থনি মার্জ কে? ববিই নাকি? তাহলে তার আসল নাম কি সেটাই? ববি ডাক নাম? আর্ট কার্ভেলের কাছে খোঁজ নিলেই জানা যাবে।

ভাগ্য আরও সহায়তা করল জেককে। চিরকুটটা থেকে চোখ তুলে জানালার দিকে তাকানোমাত্রই একটা অসঙ্গতি দেখতে পেল সে।

বোর্ডারদের লেখার সুবিধার্থে প্রতিটা ঘরেই একটা করে টেবিল-চেয়ার দিয়েছে কলিন্স। এ ঘরেও আছে। কিন্তু, টেবিলের সাথে নেই চেয়ারটা, সেটাকে সরিয়ে জানালার কাছে নিয়ে রেখেছে কেউ।

নিশ্চয়ই কলিস না, ভাবল জেক। সে ঘাঁটায়নি ববিকে। তাহলে ববিই করেছে কাজটা। কেন?

উত্তরটা জানবার জন্য বিছানা ছেড়ে চেয়ারটার কাছে গেল জেক। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল চেয়ারটার দিকে। লাভ হচ্ছে না বুঝতে পেরে বসে পড়ল চেয়ারটাতে। তাকাল ঘরের ছাদের দিকে।

কাঠের ছাদ। কোন বৈশিষ্ট্য নেই। চেয়ারে দাঁড়িয়ে ছাদটা ধরবার চেষ্টা করত না ববি, নিশ্চিত হলো জেক।

মাথা নামাল সে। এবং তখনই বুঝতে পারল, চেয়ারটা জানালামুখী করে রাখা হয়েছে।

তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা? নিজের কাছেই জানতে চাইল জেক। চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কী দেখত ববি মার্জ?

বাইরে দেখা যাচ্ছে মার্ফার ধূলিধূসর রাস্তা। শহরে ঢুকবার পথটা। সেলুনটার একাংশ। ধীরে-সুস্থে হেঁটে চলা পথচারীদের দুয়েকজনকে। লম্বা সময় পর পর আরোহী পিঠে গন্তব্যের দিকে দৌড়ে যাওয়া বিভিন্ন জাতের ঘোড়া। আরও দেখা যাচ্ছে রৌদ্রদগ্ধ এক অলস দুপুর। পুড়ে যাওয়া আকাশটার পশ্চিমদিক। খেয়াল করল জেক, নীলের মধ্যে হালকা কালো ছোপ লেগেছে আকাশটাতে। টেক্সাসের গ্রীষ্ম হয়তো চাতক পাখির মত প্রার্থনা করেছিল বৃষ্টির জন্য, কবুল হয়েছে সেটা, অত্যন্ত ধীর গতিতে মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে শূন্যতার খালি পাত্রে।

অদ্ভুত এক বেদনা টের পেল জেক। এই বেদনা কাঁদায় না, হাহাকার জাগায়। ওর মনে হলো, কার যেন পাশে থাকবার কথা ছিল; কিন্তু, নেই সে।

স্বপ্নীল দুই চোখের লাগার্ম ছেড়ে দিল জেক। বন্ধাহীন হয়ে একটু ঢুলুঢুলু হয়ে এল তার চোখজোড়া, এবং ধোঁকাটা হয়তো সেজন্যই খেল। মার্ফার প্রধান সড়ক দিয়ে কুচকুচে কালো এক ঘোড়ায় চেপে লরা জেমিসনকে ঢুকতে দেখল সে।

মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল জেকের। দুই হাত দিয়ে চোখ রগড়ে জানালায় কাছে এগিয়ে গেল। দেখল, সোজা জেল হাউয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লরা।

লরাকে আর সব কিছুর মতই পরিষ্কার দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল জেক, ধোঁকা খায়নি সে। খুব ইচ্ছে হলো তার, গিয়ে দেখা করে মেয়েটার সাথে। কিন্তু, নিজেকে শাসন করল জেক, এখন প্রেম-ভালবাসার সময় না। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। দল নিয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কার্ক।

আট নম্বর ঘরটা থেকে বের হওয়ার সময় জেকের মানসপটে আবার ভেসে উঠল লরার আবির্ভাবের দৃশ্যটা। এবং, তখনই বিদ্যুচ্চমকের মত বুঝতে পারল সে, জানালায় সামনে চেয়ার নিয়ে বসে থেকে কী দেখত ববি।

এক সপ্তাহ ধরে কারও অপেক্ষায় ছিল ববি। এ কারণেই রুম ছেড়ে কোথাও যেত না সে, এমনকী সেলুনেও না। রেস্টুরেন্টে যেত, কিন্তু, যত দ্রুত সম্ভব খেয়ে ফিরে আসত।

গতকাল বের হয়েছিল সে, নিজেকে জানাল জেক। কেন? যার জন্য অপেক্ষা করছিল, পৌঁছে গিয়েছিল লোকটা মার্ফায়?

যদি ধরে নেওয়া হয় উত্তরটা হ্যাঁ, তখন আরেকটা প্রশ্ন দেখা দেয়। লোকটা কে?

মার্ফায় গতকাল কে কে এসেছিল? নিজেকে জিজ্ঞেস করল জেক। অনেকেই। কত লোকই তো আসা-যাওয়া করছে প্রতিদিন। তাদের মধ্যে কার জন্য অপেক্ষা করছিল ববি?

কলিসের একটা কথা মনে পড়ে গেল জেকের— “দরজা দিয়ে ঢুকে আমার সামনে দাঁড়াল লোকটা। হোটেলে ঢুকলে লোকে কী করে? হাই, হ্যালো না বললেও জানতে চায় রুম খালি আছে কি না। ববি কী করল জানো? ওহায়ো থেকে স্টেজকোচ কখন মার্ফায় এসে পৌঁছে, জানতে চাইল।”

তারমানে, ববির লোকটা ওহায়ো থেকে এসেছে।

আট নম্বর রুম থেকে করিডরে বের হয়ে এসেছিল জেক, হাঁটছিল লুসির চাচা বিল অসকারের রুমের দিকে। কথাটা মনে পড়তেই থেমে গেল। তাকাল পনেরো নম্বর রুমের বন্ধ দরজাটার দিকে।

বিল অসকার। স্টেজ কোচে চেপে ওহায়ো থেকে গতকাল মার্ফায় এসেছিল। নিজের ঘরে, জানালার সামনে বসে হয়তো তাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল ববি মার্জ।

উনিশ নম্বর রুমের দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ। দুই কোমরে দুই পিস্তল বুলিয়ে বেগ্ন হয়ে এল কার্ক। করিডরে জেককে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়ে গেল সে। তার চেহারায় স্পষ্ট ভীতি দেখতে পেল জেক। তাকে চিনতে না পেরে মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ করল কার্ক, তারপরই সাপের মত ছোবল মারল হোলস্টারে। চোখের পাতাও পড়ল না জেকের, তার আগেই জোড়া পিস্তল বের হয়ে এল কার্কের হাতে। দিনের আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেল জেক, সাদা হয়ে যাচ্ছে কার্কের দুই তর্জনীর নখ। গুলি করতে যাচ্ছে সে।

‘মানতে পারলাম না শেরিফ,’ এ পাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল লরা।

শেরিফ লুথারের সামনের চেয়ারটাতে বসে প্রাণহীন জেল অফিসটাতে প্রাণের সঞ্চার করেছে লরা জেমিসন। এতক্ষণ স্যামের ওকালতি করছিল মেয়েটা, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছিল, টম আর লুসিকে কিছুতেই খুন করতে পারে না স্যাম। গতরাতে বাবার মুখ থেকে স্যামের ঘটনাটা শুনেছে সে, তাই

আজ নিজেই ছুটে এসেছে প্রত্যাশার করতে।

লুথার যখন বলল, ডাকাতি করবার উদ্দেশ্যে কাজটা করে থাকতে পারে স্যাম, তখনই মন্তব্যটা করল লরা।

‘মানতে না পারার কী আছে?’ জানতে চাইল শেরিফ।

‘গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে আমাকে ববি না কী যেন বললে লোকটার নাম, তার কবল থেকে উদ্ধার করছিল মিস্টার স্যাম ওয়েড আর ...’

‘একটা বিকট হাঁচির শব্দে থেমে যেতে বাধ্য হল লরা। ইচ্ছে করে হাঁচিটা দিয়েছে স্যাম; উদ্দেশ্য, মেয়েটা যেন তার কথা শেষ করতে না পারে।

বিরক্ত মুখে স্যামের দিকে তাকাল শেরিফ। তারপর আবার লরার দিকে ঘুরে বলল, ‘হ্যাঁ, কী যেন বলছ তুমি?’

আবার বাধা দিল স্যাম। বলল, ‘লরা কী বলছিল বাদ দাও। আমি কী বলি সেটা শোনো। একজন...আ, কী বলব, সম্মানিত সাক্ষী জুটে গেছে আমার। লরার কথা বিশ্বাস করতে নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা নেই তোমার? সাড়ে চারটার সময় ওয়াটার ট্যাঙ্কে থাকলে ডাকাতিটা কখন করলাম আমি? নাকি বলবে ডাকাতি করে আবার ফিরে গিয়েছিলাম ওয়াটার ট্যাঙ্কে? আসলে আমাকে গায়ের জোরে আটকে রেখেছ তুমি, প্রমাণ বলতে কিছুই নেই তোমার কাছে...’

‘চুপ করো,’ এক ধমকে স্যামকে থামিয়ে দিল শেরিফ লুথার, ‘আগেই বলেছিলাম, একজন সাক্ষী আছে তোমার। সেটা যে ববি মার্জ না, বুঝব কী করে? বার স্টিরাপের প্রবেশপথে দুটো ঘোড়ার ট্রাক নিজ চোখে দেখেছি আমি। এবং, সে ব্যাপারে সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা এখনও দাওনি। তুমি কী ভেবেছ আমাকে? দুধের বাচ্চা? ফিরে এসে হাশ যদি বলেও যে রাত দশটার পর ফোর্ট ডেভিস ছেড়েছিলে তুমি, তারপরও ছাড়ব না তোমাকে। তোমার সঙ্গীর নাম আমাকে জানতেই হবে। সমাধান করে ছাড়বই আমি রহস্যটার।’

‘ওর সঙ্গীর নাম আমি জানি,’ ধীর গলায় ঘোষণা করল লরা।

প্রমাদ গুলল না স্যাম। জানে, গুলে লাভ হবে না। কথাটা এখন বলেই ফেলেছে লরা, সেটা জানবার আগে মরবেও না শেরিফ। কপালে বিপদ লেখা থাকলে সেটা কেউ ঠেকাতে পারে না; কথাটা মনে মনে বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিল স্যাম।

‘বলো কী?’ আশ্চর্য হয়ে গেল লুথার। ‘কে সে?’

‘আরে সেই লোকটাই তো আমাকে বাঁচিয়েছে ববির কবল থেকে, বলতে বলতে গালদুটো লাল হয়ে গেল লরার।

ও, মনে মনে বলল স্যাম, আমি কিছু করিনি? সব জেন্সি করেছে? গুলি করলাম আমি, ববির পিছু ধাওয়া করলাম আমি, হারামি লুথারের হাতে ধরা পড়লাম আমি, আর ননী খেল জেক? এজন্যই তো মেয়েরা নিম্নকহারাম!

‘নামটা বলো আমাকে,’ দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে লরার দিকে অনেকখানি ঝুঁকল শেরিফ।

‘কী, করে কী?’ বিড় বিড় করল স্যাম। ‘চুমু খাবে নাকি? বুড়ো বয়সেও ইতরামি করার স্বভাব যায়নি হারামিটার?’

‘জেক রায়ার,’ বলতে গিয়ে গাল, গলা, কান লাল হয়ে গেল লরার।

নামটা শুনে ছিটকে পিছনে সরে গেল শেরিফ। স্যামের মনে হলো, লরা যেন একটা সাপ, লকলকে জিভ বের করেছে, দেখে ভড়কে গেছে লুথার।

‘কী, কী বললে তুমি?’ এতই আশ্চর্য হয়েছে শেরিফ যে, তোতলাতে আরম্ভ করল সে।

‘জেক রায়ার,’ যেন নামটা অত্যন্ত গোপন, একান্ত আপন-এমনভাবে আবার বলল লরা।

স্যাম বুঝল, জেকের প্রেমে পড়ে গেছে লরা। মেয়েটাকে প্রেমের জালে ফাঁসানোর জন্য মনে মনে জেককে অভিশাপ দিল সে।

কী বলবে বোধহয় ভেবে পেল না শেরিফ লুথার। পঁচাত্তর মত মুখ করে স্যামের দিকে তাকিয়ে রইল। স্যাম তাকাল হাজতের ছোট্ট জানালাটার দিকে, মাটি থেকে চোদ্দ ফিট উপরে। শেরিফের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য তাকিয়েই রইল। অখণ্ড নীরবতা নেমে এল জেল অফিসে।

কেশে গলা পরিষ্কার করল লরা। জানতে চাইল, ‘নামটা শুনে চুপ করে গেলে কেন, লুথার?’

‘গেলাম, কারণ, লোকটা আমার নতুন ডেপুটি,’ ব্যাখ্যা করল শেরিফ।

কথাটা শুনে যার-পর-নাই খুশি হয়ে উঠল লরা। তারপরেও ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করল, ‘কেন? হার্শের কী হয়েছে?’

কী হয়েছে, বলল শেরিফ।

লুথার আর লরার কথোপকথন চলল আরও কিছুক্ষণ। একসময় উসখুস করতে আরম্ভ করল মেয়েটা। মনের কথাটা না পারি কইতে, না পারি সইতে—এমন অবস্থা। ভাবভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল স্যাম, জেক কোথায় আছে, জানতে চায় লরা। কিছু না বলে মুখ বন্ধ রাখল স্যাম।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল লরা। তারপরও জেক এল না দেখে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, ‘তোমার ডেপুটিকে দেখছি না কেন, শেরিফ?’

‘কে জানে কোন নরকে মরতে গেছে?’ মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল লুথার। প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছে সে নিজের উপর। স্যাম আর জেকের কাজটাকে প্রতারণা বলে মনে হচ্ছে তার।

শেরিফের আচরণে দুঃখ পেল লরা। কিন্তু, কিছু বলল না। আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে হতাশ মুখে চলে গেল একসময়। একটু খারাপই লাগল স্যামের

কাছে।

লরা চলে যাওয়ার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লুথার। অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াল জেল অফিসের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত। তারপর বলল, ‘জেককে খুঁজতে অফিস ছেড়ে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই আমার। সে-ই আসবে এখানে। তোমার বন্ধু যখন, একটা দায়িত্ব আছে তার। তা না হলে কেউ টম আর লুসির ব্যাপারে ওর মত যেচে তদন্ত করতে চাইত না। দেখি কতদূর কী করতে পারে ও। আশা করি, তোমার পাশের সেলে তাকে ঢোকানোর দরকার পড়বে না। তোমাদের দু’জনের গলা বাঁচাতে আদাজল খেয়ে কাজ করবে সে নিশ্চয়ই।’

শেষ মুহূর্তে জেককে চিনতে পেরে ট্রিগারের উপর থেকে আঙুল সরিয়ে নিল কার্ক পোলার্ড।

‘তুমি জেক রায়ার না? আমাকে এড রুফাসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে? এখানে ওরকমভাবে দাঁড়িয়েছিলে কেন? আরেকটু হলেই তো ফুটো হয়ে যেতে। ওটা আবার কী? তরা? ওটা ঝুলিয়েছ কেন শার্টে? তুমি কি মার্ক্সার নতুন শেরিফ? কী হয়েছে লুথারের?’

বার কয়েক ঢোক গিলে শুকনো গলাটা ভেজানোর চেষ্টা করল জেক। লাভ হলো না খুব একটা। বুকের ভিতরে ধক ধক করছে, টের পেল সে। গলা দিয়ে কোলাব্যাণ্ডের মত আওয়াজ বের করে বলল, ‘শেষ মুহূর্তে হলেও আমাকে চিনতে পারার জন্য ধন্যবাদ। কল্পনাও করিনি তুমি এতটা ফাস্ট।’ তারপর গতরাতের ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করল জেক। তার ডেপুটি শেরিফ হওয়ার কারণটা বলল।

‘বুঝলাম,’ উপরে-নীচে মাথা নাড়ল কার্ক, ‘খুনীদের ওরকম সাজাই হওয়া উচিত।’

কার্ক কথাটা ববির ব্যাপারে বললেও স্যামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না একবার ভাবল জেক। তারপর জিজ্ঞেসই করে ফেলল, ‘কার কথা বলছ তুমি?’

‘কার আবার? অ্যাঙ্কনি মার্জের।’

‘কার?’ বুঝতে পারল না জেক।

‘ক্যাবলা নাকি তুমি?’ রেগে গেল কার্ক। ‘এত কার কার করছ কেন? বললাম না ববি মার্জের?’

‘ও, আচ্ছা। তো, তুমি কেমন আছ খোঁজ নিতে যাচ্ছিলাম রুমে,’ মিথ্যে বলল জেক, ‘কিন্তু, যে কাণ্ডটা করলে! এরপর থেকে তোমার খোঁজ নিতে হলে অন্য কাউকে পাঠাব, নিজে আসব না।’

হাসল কার্ক। জেককে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল তার জায়গায়। নিজে গিয়ে

দাঁড়াল জেকের মুখোমুখি। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘এবার দেখো। চেহারা দেখা যাচ্ছে আমার?’

আলোটা কার্কের পিছন থেকে আসছে। উজ্জ্বল আলোর পটভূমিতে কার্কের একটা ছায়ামূর্তি তৈরি হয়েছে, কাঠামোটা বোঝা যাচ্ছে, চেহারাটা যাচ্ছে না। ভয়টা কেন পেয়েছে কার্ক, বুঝতে পারল জেক।

‘আমি কেমন আছি, সেটা তো জানতে পারলেই। আর রুমে গিয়ে কোন লাভ হবে? চলো, একসাথে বের হই।’

‘সম্ভব না, কার্ক। টম আর লুসির নিখোঁজ রহস্যটার তদন্ত করার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে লুথার। আমি সত্যিই জানতে চাই কী ঘটেছে তোমার ভাই-ভাবির কপালে। ও, ভাল কথা। লুসির চাচা বিল অসকার যে গতকাল মারফায় এসেছিল, জানো তুমি?’

‘না তো,’ এপশ-ওপাশ মাথা নাড়ল কার্ক।

‘এই হোটলেই উঠেছিল। পনেরো নম্বর রুমে। স্টেবল থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া করে বার স্টিরাপে গিয়েছিল। শুনলে তোমার খারাপ লাগবে, কিন্তু, না বলেও পারছি না, টম আর লুসির মত বিলও নিখোঁজ হয়ে গেছে গতকাল।’

‘তারমানে,’ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কার্ক, ‘স্যাম ওয়েড, এড রুফাস বা ফ্র্যাঙ্ক মেলন এই তিনজনের একজন খুন করেছে ওদেরকে। আমি কী জিনিস, টের পাবে এরা সবাই।’

‘কী করবে তুমি?’ সতর্ক গলায় জানতে চাইল জেক।

‘মারফার বেশিরভাগ লোকই হারামি। দুয়েকজন আছে ভাল। তারা আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ওদেরকে নিয়ে একটা দল গড়েছি আমি, নাম দিয়েছি—দা রিভেঞ্জ পার্টি। এখন যাচ্ছি দল নিয়ে পুরো এলাকাটা চষে ফেলতে। ওদেরকে জ্যান্ত পেলো ভাল, না পেলো...’ কথাটা শেষ না করে জানতে চাইল কার্ক, ‘তুমি বার স্টিরাপে যাবে নাকি?’

‘হ্যাঁ। কেন?’

‘কখন?’ উত্তর না দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল কার্ক।

‘খুব সম্ভবত দুপুরের পর। কেন? কোন দরকার আছে তোমার?’

‘না। এমনি জিজ্ঞেস করলাম,’ বলেই আর অপেক্ষা করল না কার্ক, দুপদাপ পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নীচে।

তেরো

যেরকম ভেবেছিল জেক, বিল অসকারের রুমে ঢুকে সেরকমই দেখতে পেল।

বিছানা ব্যবহার করা হয়নি। একেবারে পরিপাটি, নির্ভাজ আছে চাদরটা। জিনিসপত্র যেটা যেখানে থাকা উচিত, সেখানেই আছে। কোন মালপত্র, কাপড়-চোপড় নেই। জেকের মনে হলো, ওর আগে কেউ ঢুকেইনি পনেরো নম্বর রুমটাতে।

বিল অসকার লোকটা যে সত্যিই এলেবেলে, নিজ চোখে দেখে সেটার প্রমাণ পেল জেক। লোকটা রুম ভাড়া নিল হোটেলে, তা-ও আবার ডাবল, কিন্তু, সেখানে থাকলই না। সঙ্গে জিনিসপত্র না থাকাতে বোঝা যাচ্ছে, হয়তো লুসির সাথে দেখা করেই চলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। তা হলে সে এত বড় রুম ভাড়া নিতে গেল কেন?

আর কিছু দেখবার নেই বুঝতে পেরে তালা লাগিয়ে বের হয়ে এল জেক।

হোটেলের বাইরে এসে পোর্চে দাঁড়িয়ে বাইরের উজ্জ্বল আলোর সাথে চোখকে মানিয়ে নিল সে। এবার কোথায় যাওয়া যায়, ভাবল। প্রথমে ডাক্তার বেন, তারপর পোস্ট অফিস আর সবশেষে বার স্টিরাপ।

এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যগুলো থেকে বুঝতে পারছে সে, বিবি আসলে কেঁচো। ঠিকমত খুঁড়লে সাপটা বের হয়ে আসবে। কিন্তু, সমস্যা হচ্ছে, বেঁচে নেই ভয়ঙ্কর গানম্যান লোকটা। ব্যাপারটা হয়তো জেকের জন্য স্বস্তিরও বটে। তাকে জেরা করবার কোন উপায় নেই, আবার তার কবলে পড়ে প্রাণ হারানোরও ভয় নেই।

ঘাড়ের বাঁধা রুমালটা খুলে মুখটা ভালমত মুছল জেক। হ্যাটটা একটু তেরছাভাবে পড়ে নিল। আকাশে কালোর ছোপটা একটু মোটা হয়েছে, কিন্তু, সূর্য এখনও আগের মতই আগুনের গোলক।

চলতি পথে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে জেল অফিসের দিকে তাকাল জেক। হিচিং রেইলে এখনও বাঁধা আছে লরার ঘোড়াটা।

আচ্ছা, শেরিফ তো নেই অফিসে, ভুল ভাবল জেক, তা হলে কার সাথে কথা বলছে লরা? স্যামের সাথে? হবে হয়তো। অথবা, হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

পা দুটো বার বার বিদ্রোহ করল জেকের বিরুদ্ধে, ডাক্তার বেনের বাড়ির

দিকে না গিয়ে ঘুরে যেতে চাইল জেল অফিসের দিকে। তাদেরকে শাসনে রাখতে নির্মম হতে হলো জেককে।

বেনের দরজায় টোকা দিয়ে মনে পড়ল জেকের, লরার সাথে কথা বলতেই হবে। ওয়াটার ট্যাঙ্কের ঘটনাটা আরও খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে মেয়েটাকে।

জেক আর কিছু ভাববার আগেই খুলে গেল দরজাটা। টাক মাথা নিয়ে উদয় হল ডাক্তার বেন। একবার দেখেই চিনতে পারল জেককে।

‘কী? আজ ঘোড়া চড়েছে কার উপর? তোমার উপরেই নাকি? কোথায়, দেখতে পাচ্ছি না তো? নাকি ঝগড়া করতে গিয়ে সীসা খেয়ে ফেলেছে কেউ?’

বেনকে ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল জেক। বলল, ‘ঘোড়াও চড়েনি, সীসাও খায়নি। তবে তুমি সহায়তা না করলে সন্ধ্যার পর হজম ক্ষমতার বেশি সীসা খেতে পারে যে কেউ।’

জেকের কথাটা হেঁয়ালি বলে মনে হলো বৃদ্ধ ডাক্তারের কাছে। ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, ‘কী বলছ ওলট-পালট? সোজাসুজি বলতে কি কেউ মানা করেছে তোমাকে?’

বার স্টিরাপে যাওয়ার পর থেকে আরম্ভ করে কার্কেঁর দল গঠন করা পর্যন্ত ঘটনাগুলো সংক্ষেপে খুলে বলল জেক। তবে নিজের নাম নিল না একবারও। স্যামের কথা উল্লেখ করল প্রতিবার। সবশেষে বলল, ‘তোমার কাছে একটা ব্যাপার জানতে এসেছি। লুসির ব্যাপারটা।’

‘লুসির ব্যাপারটা?’ ঠিক বুঝল না বেন।

‘পোয়াতি ছিল লুসি। এ ব্যাপারে তোমার সাথে কি যোগাযোগ করেছিল লুসি বা টম?’

‘অবশ্যই করেছিল। আমার সাথে যোগাযোগ করবে না তো কার সাথে করবে? মার্কীর একমাত্র ডাক্তার আমিই,’ বেনের স্বরে স্পষ্ট অহংকার।

‘তুমি কী বলেছিলে তাদের?’

‘প্রথমবারের মত মা হতে যাচ্ছিল লুসি। একটু ঘাবড়ে ছিল মেয়েটা। আমি তাকে অভয় দিলাম। ওদের রানশের সব কাজকর্ম ওরা নিজেরাই করত। টমকে বললাম, লুসির উপর থেকে কাজের চাপ কমিয়ে দিতে। ভারী জিনিস উঠাতে নিষেধ করলাম লুসিকে। ব্যস, এই তো।’

‘লুসিকে চলাফেরা করতে নিষেধ করেছিলে তুমি?’

‘নাহ্, আশ্চর্য মনে হল বেনকে, ‘সেরকম কিছু তো বলিনি!’

‘ভালমত চিন্তা করে বলো। তোমার কাছে অনেকবার এসেছিল ওরা, হয়তো কখনও বলেও থাকতে পারো।’

‘অনেকবার এসেছিল—কথাটা কে বলল তোমাকে? মাত্র একবার এসেছিল।

তাও আবার মাস তিনেক আগে। তখন সবেমাত্র বাচ্চা এসেছে লুসির পেটে।’

‘বলো কী?’ হাঁ হয়ে গেল জেক। মনে মনে একটা হিসাব কষল সে। তারপর বলল, ‘তারমানে, আর মাসখানেক পরে নয়, সামনের শীতের শেষে বাচ্চাটার জন্ম দিতে যাচ্ছিল মেয়েটা?’

‘অবশ্যই,’ জোর দিয়ে বলল বেন।

যা জানবার ছিল, জানা হয়ে গেল জেকের। বের হয়ে এল সে রাস্তায়। সোজা হাঁটা ধরল পোস্ট অফিসের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু, পোস্ট অফিসের বাইরে লরার ঘোড়াটাকে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে থমকে গেল সে। মেয়েটা হয়তো চলে যাচ্ছিল, যাওয়ার পথে একটা চিঠি পোস্ট করবার জন্য ঢুকেছে পোস্ট অফিসে।

ঘন্টাখানেক আগের অজানা বেদনাটাকে বুকের ভিতর টের পেল জেক। কিন্তু, দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট না করে ঢুকল পোস্ট অফিসে।

ওই যে, একটা কাঠের টেবিলের সামনে প্রায় ভাঙা একটা চেয়ারে বসে আছে মেয়েটা। দেখে মনে হল জেকের, ফুল ফুটেছে পোস্ট অফিসের ভিতরে। ধীর পায়ে লরার দিকে এগিয়ে গেল সে।

‘হ্যালো, লরা। শুনলাম, তুমি নাকি আমার খোঁজ করছিলে?’

কিছুটা চমকে উঠল লরা। মুখ তুলে তাকাল। জেককে দেখতে পেয়ে তার সারা মুখ উদ্ভাসিত হলো অনাবিল হাসিতে। হাসিটা শুধু তার মুখে নয়, চোখেও দেখতে পেল জেক। মেয়েটার চোখজোড়ায় হাসির সাথে ফুটে থাকা অন্য একটা ভাবও দৃষ্টি এড়াল না তার।

তা হলে কি লরাও আমাকে...? ভাবনাটাকে সেখানেই গলা টিপে মেরে ফেলল জেক।

‘তুমি ভদ্রলোক না,’ লরার গলায় কৃত্রিম অভিযোগ, ‘যাওনি আমাদের রানশে।’

শার্টে ঝুলানো তারাটার দিকে ইঙ্গিত করল জেক, ‘টিনের এই ছোট্ট জিনিসটা হয়তো ভদ্রতা ভুলিয়ে দেয় লোককে। যা-ই হোক, এখানে অনেক ভিড়। চলো, বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলি।’

এক বাক্যে রাজি হয়ে গেল লরা। ওরা দু’জন গিয়ে দাঁড়াল পোস্ট অফিসের বাইরের এক দালানের ছায়ায়।

লরার কাছে পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল জেক। তারপর বলল, ‘বুঝতেই পারছ, ফেসে গেছি আমি আর আমার বন্ধু স্যাম ওয়েড। হয়তো আমাদের ফাঁসির দড়িতে ঝুলাতে পারবে না শেরিফ লুথার, কিন্তু, আসল অপরাধী ধরা না পড়লে লোকের কাছে আর দাম পাব না আমরা।’

‘তারমানে,’ চিন্তিতভাবে বলল লরা, ‘তুমিও বিশ্বাস করো, খারাপ কিছু

ঘটেছে টম আর লুসির ভাগ্যে?’

‘শুধু ওরা দু’জনই না, সঙ্গে লুসির চাচা বিল অসকারও আছে।’

‘কী জানতে চাও তুমি?’

সময় নিল জেক। কোথা থেকে শুরু করা যায়, ভাবল একবার। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘গতকালের ঘটনাগুলো মনে করো। ওয়াটার ট্যাঙ্কটাতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্প্রিট এক্স ছেড়ে বের হলে তুমি। তারপর আবার সেখানে ফিরে এলে। এই যাওয়া-আসার মাঝখানে উল্লেখযোগ্য যা যা ঘটেছে, সব বলো আমাকে। সেটা যত ছোট বা হাস্যকরই হোক না কেন।’

একটু ভেবে নিয়ে শুরু করল লরা, ‘লুসির সাথে খুব খাতির ছিল আমার। সে বয়সে আমার থেকে বড় হলেও বন্ধুর মত ছিলাম আমরা। ওয়াটার ট্যাঙ্কে গেলে হাতে সময় নিয়ে বের হই আমি। আগে একবার দেখা করি লুসির সাথে, তারপর যাই গোসল করতে। মাঝেমধ্যে আমার সাথে লুসিও আসত। যাই হোক, গতকাল বার স্ট্রাপের পরিবেশটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগল আমার কাছে। রানশের দরজা খোলা, কেবিনের সদর দরজা খোলা, সব কিছু কেমন যেন এলমেলো। কেবিনের বাইরে একটা ঘোড়া গ্রাউন্ড হিচিং করে রাখা ছিল। তারমানে, কেউ একজন এসেছিল বার স্ট্রাপে। আমি...’

‘একটু থামো,’ হাত তুলে লরাকে থামিয়ে দিল জেক। ‘ঘোড়াটা কি বাদামী রঙের বড় একটা রোন? তেল চিকচিকে চামড়া? স্যাডলটা খুব দামি?’

জেকের প্রথম প্রশ্নটা শেষ হওয়ার আগেই মাথা নাড়তে আরম্ভ করেছিল লরা, জেকের শেষ প্রশ্নটা শেষ হওয়ার পরও কিছুক্ষণ মাথা নাড়ল সে। একসময় মাথা নাড়ানো থামিয়ে বলল, ‘মিলল না একটাও। ঘোড়াটা রোন ছিল বটে, কিন্তু, বাদামী না, কালো। আর তেল চিকচিকে চামড়ার তো প্রশ্নই আসে না। হাড় জিরজিরে শরীর ছিল জন্তুটার। আকৃতিতেও মাঝারি। ওটার মালিক ওটাকে কতদিন খেতে দেয়নি কে জানে। আর স্যাডল? মাগনা দিলেও বোধহয় কেউ নিতে চাইবে না জিনিসটা। যা-ই হোক, কেবিনের খোলা দরজাটার বাইরে দাঁড়িয়ে লুসির নাম ধরে টেঁচিয়ে ডাকলাম অনেকক্ষণ। কেউ সাড়া দিল না। কিছুটা ঘাবড়ে গেলাম আমি। ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলাম একবার। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলাম কৌতূহলের কাছে। ঢুকেই পড়লাম ভেতরে,’ দম নেওয়ার জন্য থামল লরা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইল জেক।

‘আমি কেবিনের ভেতর পা রাখামাত্রই রান্নাঘর থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে এল। ভাবলাম, কেউ হয়তো পা পিছলে পড়ে গেছে। তখনই মনে পড়ল, লুসি পোয়াতি, হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে রান্নাঘরে, তাকে সাহায্য করার কেউ নেই। দৌড় দিলাম। কিন্তু, রান্নাঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পেলাম না।

‘গিয়ে ঢুকলাম ওদের বেডরুমে। খুব পরিপাটি, গোছালো স্বভাবের ছিল লুসি। সব সময় সব কিছু সাজিয়ে ওছিয়ে রাখত। কিন্তু, ওদের বিছানায় কোন চাদর দেখতে না পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ক্লিটের একটা ড্রয়ার দেখলাম খোলা...’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও,’ লরাকে আবার বাধা দিল জেক। ‘ক্লিটের মাত্র একটা ড্রয়ার খোলা ছিল, সবগুলো না?’

‘অবশ্যই সবগুলো না। মাত্র একটা।’

‘ট্রান্সটা খোলা ছিল না?’

‘উঁহু, পরিষ্কার মনে আছে আমার। একেবারে বন্ধ ছিল ট্রান্সটা।’

‘কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র এলমেলো ছিল?’

‘না।’

‘আচ্ছা,’ থমথম করতে আরম্ভ করেছে জেকের মুখটা। ‘বলে যাও।’

‘কাউকে না পেয়ে সোজা বের হয়ে এলাম। চড়লাম নিজের ঘোড়ায়...’

‘আচ্ছা, লরা,’ আবার বাধা দিল জেক, ‘ডাইনিং টেবিলটার দিকে তাকিয়েছিলে তুমি?’

‘হ্যাঁ। কেন?’

‘সেখানে কি খাবার রাখা ছিল?’

‘একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার ছিল টেবিলটা। খাবারের প্লেট তো দূরের কথা, একটা গ্লাস পর্যন্ত রাখা ছিল না। লুসি সেরকম মেয়েই না।’

‘সময়টা খেয়াল আছে তোমার?’

অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ল লরা। বলল, ‘জোর দিয়ে বলতে পারব না। তবে যতদূর মনে হয়, চারটা কি তার কিছু বেশি হবে।’

‘কেবিন থেকে বের হয়ে কী করলে তুমি?’

‘সোজা ঘোড়ায় চড়ে গেলাম ওয়াটার ট্যাঙ্কে। এরপরের ঘটনা তোমাকে বলেছি গতকাল বিকেলে।’

‘দুর্বৃত্তটার নাম জানো নিশ্চয়ই?’

‘হ্যাঁ। ববি মার্জ।’

‘পানির কিনারায় বসে কী করছিল ববি বলতে পারবে আমাকে?’

‘কী করছিল, সেটা দেখবার সুযোগ আমাকে দেয়নি সে। ঘোড়ার শব্দ পাওয়ামাত্রই পিস্তল বের করে গুলি করল। কী চালু হাত লোকটার যদি দেখতে! ড্যান্ডি থাকায় বেঁচে গেছি, অন্য কোন ঘোড়া হলে...’ জেক শুনছে না দেখে থেমে গেল লরা।

অন্যমনস্ক হয়ে কিছু একটা ভাবছিল জেক। লরা থেমে যেতেই বলল, ‘তা হলে আর কোনদিনও জানা যাবে না কী করছিল ববি। একবার ভেবে দেখো,

কাজটা তার জন্য এতটাই গোপনীয় ছিল যে, ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়ামাত্রই গুলি করতে বাধ্য হয়েছিল সে।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল লরা, ‘নিশ্চিত করে বলতে পারব না, তবে আমার মনে হয়, উঁকি দিয়ে পানির ভেতরে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছিল সে।’

‘বলো কী?’ দেখে মনে হলো, বোলতা কামড়েছে জেককে।

‘আমি নিশ্চিত না। তা ছাড়া খুব অল্প সময়ের জন্য দেখেছিলাম...’ জেককে ওর দিকে একটানা তাকিয়ে থাকতে দেখে এবার নিজেই থেমে গেল লরা। নীচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল, ‘কিছু বলবে?’

উপরে-নীচে মাথা দোলাল জেক। বলল, ‘ওয়াটার ট্যাক্টা কত ফিট গভীর?’

যে কথাটা শুনতে চেয়েছিল, সেটা শুনতে না পেয়ে দারুণ হতাশ হলো লরা। জেকের উপর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। আবার জেকের দিকে যখন মুখ ঘুরাল সে, তখন তার চোখে স্পষ্ট বিরক্তি আর রাগ দেখতে পেল জেক। কোমল গলায় জানতে চাইল সে, ‘রাগ করলে আমার উপর? আসলে এত কথা জানতে চাচ্ছি, কারণ, ফাঁসির দড়ি ঝুলছে স্যামের উপর। হয়তো আমার উপরও। এখনও শেরিফ আমার পরিচয় জানে না। জানতে পারলে স্যামের কুকর্মের সঙ্গী ভেবে হয়তো আমাকেও...’

বেদনায় ভরে গেল লরার অপূর্ব সুন্দর মুখটা। জিজ্ঞেস করল সে, ‘তোমার পরিচয় জানত না শেরিফ?’

‘না। জানলে তার মত লোক কি আমাকে ডেপুটি বানাত? কখন স্যামের পাশের সেলে...’

‘আমি তাকে তোমার পরিচয় বলে দিয়েছি,’ ভাঙা গলায় বলল লরা।

‘কী?’ জেকের গলায় অবিশ্বাস আর হতাশার স্পষ্ট মিশ্রণ।

শেরিফের সাথে কথোপকথনের প্রায় পুরোটা জেককে খুলে বলল লরা। শুনে হতভম্বের মত কিছুক্ষণ লরার দিকে তাকিয়ে থাকল জেক। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দূরের জেল হাউসটার দিকে। প্রাণের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না সেখানে। দৃষ্টি সরিয়ে নিল জেক। তাকাল অন্যত্র।

ধুকছে মারফা। মুহূর্তের ডানায় ভর করে অনন্তের পানে ধেয়ে চলেছে সময়। গতিটা খুবই কম; এতই কম যে, চোখ বন্ধ করে অনুভব করতে হয়। চোখজোড়া বন্ধ করে ফেলল জেক। তবে সময়ের গতি উপলব্ধি করবার জন্য না, সমস্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভুলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু, ব্যর্থ হলো সে। কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, বয়ে যাচ্ছে সময়।

চোখ খুলল জেক। এখন আর মাঝ দুপুর বলা যাবে না সময়টাকে। ছায়া

দীর্ঘ হতে আরম্ভ করেছে।

ছায়ার সাথে পাল্লা দিয়ে বড় হচ্ছে আকাশের কালো ছোপটা। মেঘের নীচে মেঘের মত ভেসে আছে কয়েকজোড়া শকুন। তাদের ডানা স্থির, চোখ মাটির দিকে। ওরা কি সন্ধ্যার অপেক্ষায় আছে? ভাবল জেক। নাকি আরও আগেই ওদের কপালে জুটবে উপাদেয় নরমাংস? নিশ্চুপ সময় বলবে উত্তরটা। সেটা গুনবার জন্য হয়তো কেউ বেঁচে থাকবে, কেউ থাকবে না। আমি কোন্ দলে? নিজের কাছেই জানতে চাইল জেক।

ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ নামাল জেক। তাকাল সামনে দাঁড়ানো রূপের ঐশ্বর্যের দিকে। জিঙ্কস করল, ‘ট্যাঙ্কটা কত ফিট গভীর, বললে না তো?’

‘বেশি না, পনেরো-বিশ ফিটের মত হবে।’

‘ট্যাঙ্কটা খাড়াভাবে নাকি ঢালু হয়ে নেমেছে নীচের দিকে?’

‘ঢালু হয়ে।’

‘তা হলে পানি ছাড়তে গেল কেন ববি? নেমে এসে তোমাকে ধরল না কেন সে?’

চুপ করে গেল লরা। বোঝা গেল, উত্তরটা জানা নেই তার।

‘ববি মার্জ আমার থেকে অনেক শক্তিশালী ছিল,’ মন্তব্য করল জেক।

‘বুঝলাম না,’ সরল স্বীকারোক্তি লরার।

‘সুইস গেটটা একার চেষ্টায় লাগিয়ে ফেলেছিলাম আমি। খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি আমাকে। কিন্তু, ববিকে দেখে মনে হচ্ছিল, খুলতেই পারছিল না গেটটা। যে কোন ওয়াটার ট্যাঙ্কের সুইস গেট খোলার চেয়ে লাগানো কঠিন। আমি কঠিন কাজটা করতে পারলাম, আর সে আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়েও সহজ কাজটা পারল না? কেন?’

আবারও চুপ করে গেল লরা।

‘পারল না, কারণ, গেটটা খোলার ইচ্ছেই ছিল না তার।’ উত্তরটা দিয়ে দিল জেক নিজেই।

‘বলো কী?’ গলা শুনে বোঝা গেল, দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেছে লরা।

উপরে-নীচে মাথা দোলাল জেক। বলল, ‘তারমানে, আসলে ভান করছিল ববি। তোমাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল।’

‘কিন্তু, আমাকে ভয় দেখিয়ে তার কী লাভ হত? মরে গেলেও পানি ছেড়ে উঠতাম না আমি।’

‘সেটা তো ববির জানার কথা না। সে ভেবেছিল, পানি ছাড়ার অভিনয় করলে ভয় পেয়ে উঠে আসবে তুমি।’

এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল লরা, সে ধরতে পারছে না

ব্যাপারটা। চুপ করে রইল জেক। কোনরকম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল না।

‘সাঁতার কেটে আমাকে ধরতে পারত ববি,’ জেক নীরব দেখে জিজ্ঞেস করল লরা। ‘কাজটা করল না কেন?’

‘হয়তো সাঁতারই জানত না সে। তাই...’

‘ওখানে যাবে তুমি?’ জেককে থামিয়ে দিল লরা।

‘হ্যাঁ। যেতেই হবে। তোমাকে একটা অনুরোধ করি, লরা?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই,’ অতিরিক্ত আগ্রহে এক পা সামনে এগিয়ে এল মেয়েটা, ‘আমি রাখব।’

‘যতক্ষণ পর্যন্ত না এই রহস্যটার মীমাংসা হয়, আমাদের কথাবার্তার বিন্দু-বিসর্গও বোলো না কাউকে। আমি মারা গেলে তোমার যাকে ইচ্ছে জানিয়ো, কিন্তু, তাঁর আগে নয়।’

‘আগেও একবার বলেছি, আবারও বলছি। তোমার অনুরোধ রাখব আমি। এবার আমি তোমাকে একটা অনুরোধ করি?’

একটু বিব্রত বোধ করল জেক। মেয়েটা কী বলে না বলে ভেবে পেল না। আসলে মেয়েদের সাথে তেমনভাবে কখনও মেশিনি সে, তাদের চালচলন ঠিক বুঝতে পারে না। একবার ঢোক গিলে বলল, ‘হ্যাঁ, বোলো।’

‘রাখবে তো?’

‘অসম্ভব না হলে রাখব।’

‘তুমি তো এখন ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাচ্ছ। চলো, একসাথে যাই। আমিও দেখি কী আছে সেখানে।’

মনে মনে প্রমাদ গুণল জেক। লরাকে সাথে নিলে কোন কাজই হবে না। তা ছাড়া বিপদ আসতে পারে যে কোন সময়, অনুভব করতে পারছে জেক। একা হলে বিপদটা হয়তো সামাল দেওয়া যাবে। কিন্তু, লরা সাথে থাকলে... আর ভাবতে চাইল না জেক।

‘আমি দুঃখিত, লরা। আমার পদে পদে বিপদ, তোমাকে সাথে নেওয়ার মানে হচ্ছে জেনেগুনে বিপদে ফেলা। আমি চাই না...’

প্রত্যাখ্যানের বেদনায় আর অপমানের জ্বালায় লাল হয়ে যাওয়া লরার চেহারাটা দেখে থেমে গেল জেক। মেয়েটার হরিণ-চোখজোড়া ভিজতে আরম্ভ করেছে, কাঁপতে আরম্ভ করেছে গোলাপের পাঁপড়ির মত দুই ঠোঁট। মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াল লরা। ছায়ার আশ্রয় ছেড়ে গিয়ে দাঁড়াল জ্বলন্ত সূর্যের নীচে, নিজের ঘোড়াটার সামনে। কিছুক্ষণ পরই ঘোড়ায় চেপে শহর ছেড়ে বের হয়ে গেল। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে লরার চলে যাওয়া দেখল জেক দ্বিতীয়বারের মত। যখন আর দেখা গেল না মেয়েটাকে, তখন একটা দীর্ঘশ্বাস জীবনব্যায়ুর

মত বের হয়ে এল ওর বুক চিরে। জেকের মনে হলো, দীর্ঘশ্বাসটা না বের হয়ে যদি ওর প্রাণটাই বের হয়ে যেত, তা হলেও এতটা কষ্ট পেত না সে।

চোদ্দ

গতকালের মতই আছে বার স্টিরাপ।

রানশ্টাঁর বেড়ার কাছে ঘন হয়ে গজিয়ে উঠেছে ঘাস, গ্রীষ্মের দাবদাহে পুড়ে রঙ কিছুটা হারিয়েছে। দরজাটা লাগায়নি কেউ, দেখে মনে হলো, ভিতরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে হাঁ হয়ে খুলে থাকা গেটটা। আমন্ত্রণটা গ্রহণ করল জেক। ববির ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে দাঁড় করাল কেবিনের সামনে।

পোস্টম্যানের সাথে কথা বলে সরাসরি এখানে এসেছে জেক। জানতে পেরেছে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তিনটা তারও করেছে সে। প্রথমটা ওহায়োতে, লুই মিডোসের কাছে। বিষয়-হঠাৎ একসাথে নিখোঁজ হয়ে গেছে টম, লুসি আর বিল অসকার স্টপ কার্ক পোলার্ড বেঁচে আছে স্টপ গত তিনমাসের ভিতর সে কি তোমার সাথে যোগাযোগ করেছিল স্টপ অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন স্টপ তোমার সাহায্য দরকার স্টপ যত তাড়াতাড়ি পারো যোগাযোগ করো স্টপ নইলে মার্কায় এসো স্টপ ডেপুটি শেরিফ জেক রায়ার স্টপ।

দ্বিতীয়টা বিগ বেন্ডের জনৈক উকিল আর্ট কার্ভেলের কাছে। সেটার বিষয়বস্তু ছিল এরকম-ফাঁসি হয়েছে অ্যাঙ্কনি মার্জের স্টপ লাশ দাবি করেনি কেউ স্টপ তার পকেটে পেয়েছি তোমার নাম স্টপ যত তাড়াতাড়ি পারো যোগাযোগ করো স্টপ নইলে মার্কায় এসো স্টপ ডেপুটি শেরিফ জেক রায়ার স্টপ।

শেষের তারটাও গেছে বিগ বেন্ডে, জেকের এক বন্ধু জিম রাইটের কাছে- আমি এখন মার্কায় ডেপুটি শেরিফ স্টপ বিগ বেন্ডের দু'জনের ব্যাপারে জানতে চাই স্টপ একজন অ্যাঙ্কনি মার্জ বা ববি মার্জ স্টপ আরেকজন কার্ক পোলার্ড স্টপ যত তাড়াতাড়ি পারো যোগাযোগ করো স্টপ নইলে মার্কায় এসো স্টপ জেক রায়ার স্টপ।

তিনটা তার করবার টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জানতে পেরেছে জেক। ফলে, পূরণ হয়ে গেছে সব শূন্যতা। টম, লুসি আর বিল অসকারের ভাগ্যে কী ঘটেছে, সে ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত জেক।

ঘটনাটার জন্য দায়ী কে, সেটাও জানে। কিন্তু, লোকটাকে ফাঁসানোর জন্য প্রমাণ দরকার ওর। শেরিফ লুথার নীতিঘেঁষা লোক, জেকের মুখের কথায় বিশ্বাস করে স্যামকে ছেড়ে দেবে না। তা ছাড়া, এখন জেকের পরিচয় জানে লুথার। কাজেই, অনুমান না, জেকের এখন দরকার প্রমাণ। আদালতের কথাও মাথায় রেখেছে সে। নিখুঁত প্রমাণ না পেলে জাজ ছেড়ে দেবে লোকটাকে।

ঘোড়াটাকে থাউন্ড হিচিং করে কেবিনের ভিতরে পা রাখল জেক। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মূর্তির মত। কেবিনের ভিতরের অন্ধকারটা সইয়ে নিল চোখে। তারপর এগিয়ে গেল ডাইনিং টেবিলটার দিকে। গতরাতে সেখানে একটা ল্যাম্প ছিল। আলোর দরকার জেকের।

কিন্তু, ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে হতাশ হতে হল তাকে। পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে সলতে। কেরোসিনও নেই খুব একটা। ল্যাম্পটা এখন অচল।

তখনই মনে পড়ল জেকের, একটা হারিকেনও ছিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিনিসটার খোঁজ করল সে। দেখল, একধারে পড়ে আছে সেটা। দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল হাতে। কিন্তু, আবারও হতাশ হতে হল তাকে। ল্যাম্পটার মত সেটাও অচল হয়ে গেছে।

দ্রুত মরে যাচ্ছে দিনের আলো। কাজেই, যা দেখবার, তাড়াতাড়ি দেখতে হবে। আলোর আশা বাদ দিয়ে প্রথমেই সোফাগুলোর দিকে এগিয়ে গেল জেক।

সোফাগুলো পুরনো। সেগুলোর মাঝখানে একটা মাঝারি আকৃতির কাঠের টেবিল। টেবিলটার সামনে এসে থেমে দাঁড়াল জেক। এখানেই কোথাও রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছিল কার্ক। পরে শেরিফকে দেখিয়েছিল। হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়ল জেক।

অল্প কিছুদূরে রক্তের দাগ দেখতে পেল সে। শুকিয়ে পুরোপুরি কালো হয়ে গেছে দাগগুলো। সেগুলো এতই হালকা যে, জেক খুঁজছিল বলে চোখে পড়ল তার, এমনিতে তাকালে দেখাই যাবে না।

সময় নিয়ে সোফাগুলোর চারদিকের মেঝে তন্নতন্ন করে খুঁজল জেক। কিন্তু, আর কোন রক্তের দাগ দেখতে পেল না।

কার্কের ব্যাপারটা কী? নিজের কাছে জানতে চাইল জেক। সে-ও কি রক্তের দাগ খুঁজছিল? তা না হলে তো তার চোখে পড়বার কথা না।

উঠে দাঁড়াল জেক। ঘটনাটা কল্পনা করবার চেষ্টা করল।

ভাইয়ের সাথে দেখা করবার জন্য গতকাল বিকেলে এখানে এল কার্ক। দেখল, কেবিনের সদর দরজা খোলা, কেউ নেই ভিতরে, ডাইনিং টেবিলে পড়ে আছে অদ্ভুত খাবার। বেডরুমে এলমেলো হয়ে আছে কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র। কার্ক খুঁজছিল টম বা লুসিকে। কোন জিনিসপত্র না। তাহলে মাটির দিকে তাকানোর কথা নয় তার। কিন্তু, তাকিয়েছিল সে। এবং, দেখতে

পেয়েছিল রক্তের দাগ। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক।

যেখানে ধোঁয়া, আগুনটা ঠিক সেখানে না হলেও কাছাকাছিই থাকে। একইভাবে, যেখানে রক্ত, ক্ষতটা ঠিক সেখানে তৈরি না হলেও কাছাকাছি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। দাগগুলো কার রক্তের, জানে না জেক। জানবার কোন উপায়ও নেই। কিন্তু, মানুষটা ঠিক কোন জায়গায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেটা জানা যেতে পারে। এগিয়ে গেল সে সোফাগুলোর দিকে। সামনে ঝুঁকে দেখতে লাগল। বুলেটের গর্তগুলো খুঁজে পেতে খুব বেশি সময় লাগল না তার।

সোফার কভার ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে গেছে বুলেটগুলো। ছিদ্রের পাশে রক্তের স্পষ্ট দাগ। ছিদ্রগুলো আরও ভালমত খেয়াল করল জেক।

বড় সোফাটায় মোট পাঁচটা বুলেটের গর্ত। পাশাপাশি তিনটা, তার থেকে ফিট দুয়েক দূরে আরও দুটো। প্রথম তিনটা গর্তের পাশে রক্তের মোটা দাগ। পাশের দুটো দাগের সাথে রক্তের ছিটে দেখা যাচ্ছে, মোটা দাগ নেই। বরং, কভারের একপ্রান্তে লেগে আছে রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা।

তারমানে, তিনটা গুলি খেয়ে পিছনে হেলে পড়েছিল কেউ, তার পিঠ থেকে রক্ত বের হয়ে ভরেছে কভারে। আর দুটো গুলি খেয়ে অন্যজন হেলে পড়েছিল পাশে, তার রক্ত ততটা ভরতে পারেনি কভারে।

দু'জন মানুষের খুন হওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়া গেল। প্রশ্ন হচ্ছে, নিজেকেই বলল জেক, কারা? টম আর লুসি? তা হলে বিল অসকার কোথায়? যদি তাকেও খুন করা হয়ে থাকে, তা হলে কীভাবে করা হয়েছে?

বড় সোফাটার পেছনের কাঠের দেয়ালটার দিকে এগিয়ে গেল জেক। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল একপ্রান্ত থেকে। তারপর হাত বুলাতে আরম্ভ করল।

গাছের মোটা কাণ্ড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে দেয়ালটা। সেটাতে বুলেটের গর্ত খুঁজে পাওয়া খুব একটা সহজ কাজ না। ধৈর্য হারাল না জেক। পরিশ্রম করে গেল একটানা। মিনিট বিশেক পর তার ঘামে ভেজা হাত ঠেকল প্রায় গোলাকৃতির একটা গর্তে। সেটাতে ডান হাতের তর্জনী ঢুকিয়ে আলগা কাঠের গুঁড়ো বের করবার চেষ্টা করল জেক। পারল না। তারমানে, গর্তটা পোকাকাজ না।

গর্তটা মাটি থেকে কতটা উঁচুতে, খেয়াল করল জেক। তার মাথা ছাড়িয়ে আরও আধ হাত উঁচুতে হবে। “খুব লম্বা লোকটা”,— থমসনের কথাটা মনে পড়ল জেকের।

ধরে নেওয়া যায়, পাশাপাশি বসে ছিল টম আর লুসি। কেবিনে ঢুকেই তাদের উপর গুলি চালিয়েছে কেউ। ঘটনাটা দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল বিল অসকার, উঠে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার মাথায় গুলি করেছে ঘাতক।

এ পর্যন্ত অনুমান করা সহজ। কিন্তু, কার্কের ভূমিকাটাই প্যাঁচালো। সোফার

কভারে এতগুলো গুলির দাগ দেখতে পেল না সে, কভারে লেগে থাকা রক্তের দাগ দেখতে পেল না, অথচ মেঝেতে রক্তের দাগ ঠিকই দেখতে পেল।

ব্যাপারটা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবল না জেক। ঢুকল বেড়রুমে। চাদরের ব্যাপারটা কী, বুঝতে হবে।

গতকালও দেখেছে নেই, আজ তো থাকবার প্রশ্নই ওঠে না। কার্ক বোধহয় গতকালের পর একবারের জন্যও পা দেয়নি এই কেবিনে।

কেউ গুছিয়ে রাখেনি এলমেলো হয়ে থাকা কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র। কী মনে হতে এগিয়ে গেল জেক, মেঝেতে পড়ে থাকা কাপড়গুলোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আরেকদফা এলমেলো করল সে কাপড়গুলোকে, আঁতিপাতি করে চাদর খুঁজল। একটাও পেল না। আবার তাকাল বিছানার দিকে। দুটো বালিশে কভার আছে ঠিকই, কিন্তু, বিছানাতে চাদর নেই।

এরকম হতেই পারে না। লুসির মত রুচিশীল মহিলা তার বিছানায় চাদর ব্যবহার করবে না—এটা অসম্ভব। তারমানে, বার স্টিরাপ থেকে গতকাল কিছু হারিয়ে গিয়ে থাকলে জিনিসটার নাম—চাদর।

আবার বসবার ঘরে এসে দাঁড়াল জেক। মেঝের দাগটার দিকে তাকাল একবার। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল। দাগটা দেখল আরেকবার।

তুলিতে রঙ নিয়ে ক্যানভাসে একটা দাগ দিলে যেরকম হবে, রক্তের দাগটাও ঠিক সেরকম। তারমানে, ক্ষত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় বা গড়িয়ে পড়েনি রক্তের ধারাটা। রক্তাক্ত অঙ্গটা ঘষা খেয়েছে এখানে, ভাবল জেক, অথবা, কেউ ইচ্ছে করে রক্ত ভরিয়েছে।

কেবিনে আর কিছু দেখবার নেই বুঝে বাইরে বের হয়ে এল জেক। ঘোড়ায় চড়ে বার স্টিরাপ ত্যাগ করল। এগিয়ে চলল ওয়াটার ট্যাঙ্কটার দিকে।

সাইনবোর্ডটার সামনে এসে থামল সে। ভালমত দেখতে লাগল বোর্ডটাকে। বোর্ড আর খুঁটি দুটোই কাঠের। সাদা কালিতে লেখা আছে—মার্ফা, চার মাইল। লেখাটা শেরিফ লুথারকে দেখাতে পারলে ভাল হত, ভাবল জেক। তীর চিহ্নটার দিকে তাকাল সে। কিছুটা উপরে, ডান দিকে বাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে চিহ্নটাকে। যার অর্থ, ডানে মোড় নাও।

চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল জেক, একটা ব্যাপার দেখতে পাওয়ায় থেমে গেল সে। নামতে বাধ্য হলো ঘোড়া থেকে। হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল সাইনবোর্ডটার একেবারে কাছে।

আর সব ঠিকই আছে, তীর চিহ্নটাই অদ্ভুত। খেয়াল করল জেক, “মার্ফা চার মাইল” সাদা রঙে লেখা হলেও একই কালিতে লেখা হয়নি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সম্প্রতি আঁকা হয়েছে তীর চিহ্নটা, যার কারণে যথেষ্ট নতুন দেখাচ্ছে। লেখাটার থেকে বেশি জ্বলজ্বল করছে তীর চিহ্নটা।

সামনের দিকে ঝুঁকল জেক। তীর চিহ্নের নীচে আরেকটা লেখা দেখতে পেল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে লেখাটার একাংশ পড়তে পারল—ছেচল্লিশ মাইল।

অর্থাৎ, সাইনবোর্ডটা সত্যিই ছিল না এখানে। কেউ একজন ইচ্ছে করে লাগিয়েছে। উপকার করবার জন্য না, নতুন লোকদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য।

সাইনবোর্ডটা এমন এক জায়গায় ছিল, যেখান থেকে ছেচল্লিশ মাইল দূরে আরেকটা শহর আছে। কিছুক্ষণ স্মৃতি হাতড়ে বেড়াল জেক। মার্কাস কাছেপিঠে মাত্র দুটো শহর—সিলভার ক্রীক আর বিগ বেভ।

বিগ বেভ! মার্কাস থেকে শহরটার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল। তারমানে...

কিছুক্ষণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল জেক। সাইনবোর্ডটার রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে।

এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগামাত্র সতর্ক হলো সে। আকাশে ঘন হয়ে জমেছে মেঘ। যে কোন মুহূর্তে ঝমঝমিয়ে নামবে বৃষ্টি। কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও অনেক। আর দেরি না করে দৌড় দিল জেক। রেকাবে পা রেখেই চড় কষাল ঘোড়াটার পাছায়। সে স্যাডলে উঠে বসবার আগেই ফিট দশেক অতিক্রম করল ববির বে স্ট্যালিয়নটা।

ওয়াটার ট্যাঙ্কটার কিনারায় যেখানে বসে কিছু একটা করছিল ববি, স্ট্যালিয়নটাকে ঠিক সেখানে দাঁড় করাল জেক। ততক্ষণে আরও কালো হয়ে গেছে চারদিক। অবেলায় ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা। দেরি হয়ে গেছে, বুঝতে পারল জেক। কাজ শেষ করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তারপরেই ছুটতে হবে মার্কাস। কার্ক হয়তো এতক্ষণে...

একের পর এক ঝাপটা দিচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। হ্যাটটাকে বাঁচাতে মাথা থেকে খুলে দুমড়ে-মুচড়ে ঢুকিয়ে রাখল সে স্যাডল ব্যাগে। ব্যাগটার অন্যদিক থেকে বের করল একটা মাঝারি আকৃতির ছুরি। তারপর নেমে পড়ল মাটিতে। গানবেল্ট খুলে নামিয়ে রাখল। এক মুহূর্তও দেরি না করে শার্টের পকেট থেকে টাকা-পয়সা, তামাকের প্যাকেট, পাইপ বের করে ঢুকিয়ে রাখল হ্যাটের পাশে। প্যান্টের পকেট থেকে বের করল দেয়াশলাইয়ের বাস্র, ঢুকাল একই জায়গায়। তারপর লম্বা করে একটা দম নিল। ছুরিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে দৌড় দিল। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওয়াটার ট্যাঙ্কটার বরফ-শীতল পানিতে।

ডুব সাঁতার দিয়ে পানির গভীরে নেমে গেল জেক।

লরার কথাই ঠিক। খাড়াভাবে নীচে নামেনি ওয়াটার ট্যাঙ্কটা। কিছুটা ঢালু হয়ে নেমেছে। ফিট দশেকের মত নেমেই থেমে গেল জেক। চারদিকে ঘন অন্ধকার। দেখা যাচ্ছে না কিছুই। অনুমানের উপর ভর করে হাত চালাতে থাকল সে। প্রথমে কিছুই ঠেকল না হাতে। দম ফুরিয়ে গেল জেকের। উপরে ভেসে উঠতে বাধ্য হলো সে। হাঁ করে কিছুক্ষণ দম নিল। তারপর আবার ডুব

দিল।

এবার একদুবে আরও গভীরে নেমে গেল জেক। আগের মতই হাতড়াতে লাগল। ইঠাৎ ওর হাত পড়ল অন্য কারও হাতে। হাতটাকে শক্ত করে ধরল সে। কোন হাত, বুঝবার চেষ্টা করল। ঠিক তখনই বিদ্রোহ আরম্ভ করল ওর ফুসফুস, তাজা বাতাসের জন্য আকৃতি জানাল। পাত্তা দিল না জেক। লোকটার কোমরে হাত দিল, তারপর কোমর বেয়ে নেমে গেল নীচে, পা দুটো স্পর্শ করল। ডান পায়ের সাথে একটা দড়ি বাঁধা আছে, টের পেল জেক। ডান হাতে নিল ছুরিটাকে। কাটতে আরম্ভ করল দড়িটা।

দপদপ করছে ওর মগজ, ক্রমাগত হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে হৃৎপিণ্ডে। ঠিক তখনই কেটে গেল দড়িটা। ঢালের মাটিতে দুই পা ঠিকিয়ে জোরে একটা ধাক্কা দিল জেক। উপরে উঠবার সময় বাম হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইল কিছু একটা। লোকটার শার্টটা ধরতে পারল। একই সাথে উপরে উঠতে লাগল সে আর মৃত লোকটা।

পানির উপর একই সাথে মাথা তুলল একজন জীবিত আর একজন মৃত মানুষ। তাদের একজন শব্দ করে দম নিতে লাগল, অন্যজন কিছুই করল না।

পানির উপর ভেসে উঠেও জেকের মনে হলো, পানির নীচে আছে সে। চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার, মুশলধারে পড়তে আরম্ভ করেছে বৃষ্টি। বৃষ্টির চাদর ভেদ করে পাঁচ হাত দূরেও দেখা যাচ্ছে না।

হয়তো একারণেই বেঁচে গেল জেক।

পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল লোকটা। পানির নীচ থেকে একটা মাথাকে আবছাভাবে ভেসে উঠতে দেখল সে। প্রায় একই সাথে দম নেওয়ার আওয়াজটাও শুনতে পেল। জেক মাথা তুলেছে, বুঝতে পেরে ধীরে-সুস্থে পিস্তলটা বের করল হোলস্টার থেকে। পানিতে ভাসতে থাকা মাথাটাকে লক্ষ্য করে পর পর তিনবার গুলি করল। প্রতিবার গুলি করবার সময় সামান্য এদিক-ওদিক সরাল পিস্তলটার নল। বজ্রপাতের আওয়াজের সাথে খুব বেশি পার্থক্য করা গেল না গুলির শব্দ তিনটার।

পনেরো

দ্বিতীয় গুলিটা হওয়ার পর আপনা থেকেই দম বন্ধ হয়ে এল জেকের। এক মুহূর্তের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কী করবে।

ওর ডান হাতেই ধরা ছিল ছুরিটা। হাতটাকে মাথার উপর তুলল জেক।

অগ্নি-স্কুলিঙ্গ আগেই দেখেছে সে। লোকটা ডানহাতি এবং কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে অনুমান করে নিয়ে সর্বশক্তিতে ছুড়ে মারল ছুরিটাকে। একই সাথে লম্বা করে দম নিতে আরম্ভ করল।

অদৃশ্য আক্রমণকারী তৃতীয় গুলিটা করবার সাথে সাথেই ভয়াবহ জোরে চিৎকার করে উঠল। তারমানে, লোকটার পেটে গিয়ে বিঁধেছে ছুরিটা। অনুমান ভুল হয়নি জেকের।

কিন্তু, লোকটার তৃতীয় গুলিটাও ব্যর্থ হলো না। জেকের বাম কাঁধের মাংস ভেদ করল সেটা। প্রচণ্ড ব্যথা অগ্রাহ্য করে ডুব দিল জেক। ঘুরল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। যতটা দ্রুত গতিতে সম্ভব, ডুব সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চলল। অল্প কিছুক্ষণের ভিতরেই ওর হাতে ঠেকল মাটি। তারমানে, ওয়াটার ট্যাঙ্কটার অন্যপ্রান্তে এসে গেছে সে। মাথা না তুলে উপায় নেই, কাজেই, মাথা আর ডান হাতটাকে একই সাথে পানির উপর তুলল জেক। ব্যথায় ইতিমধ্যেই প্রায় অকর্মণ্য হয়ে গেছে বাম হাতটা। ডান হাতটাকে কাজে লাগাল সে। কিনারার যত দূর পর্যন্ত সম্ভব তুলে দিল হাতটাকে। সমস্ত দেহের ভর চাপিয়ে দিল সেটার উপর। তারপর তুলল ডান পা, সেটাকেও যত দূর সম্ভব উঠাল। এরপর এক মুহূর্তও দেরি না করে কনুই আর ডান পা-টার সাহায্যে তুলে নিল ব্যাকি শরীরটাকে।

মুহূর্ত চমকাচ্ছে আকাশের বিদ্যুৎ। যে কোন মুহূর্তে ছুটে আসতে পারে ঘাতক বুলেট। কিন্তু, ঝুঁকিটা নিতেই হবে। পানিতে ডুবে থাকা সম্ভব নয়, ভেসে থাকাটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কাজেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাড়ে উঠল জেক।

পাড়ে উঠেই একটা গড়ান দিল সে। তারপর আরও কতগুলো। একটা গাছের সাথে ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে গড়াতেই থাকল। গাছটার উপস্থিতি টের পাওয়ামাত্রই চোখ খুলল সে। দুই হাঁটু আর ডান হাতে ভর দিয়ে উঠল, তিন হাত-পায়ে কিছুটা হেঁটে আশ্রয় নিল গাছটার আড়ালে। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।

মাথা ঠাণ্ডা করে পুরো ঘটনাটা ভাবতে লাগল জেক।

পানির উপর একইসাথে মাথা তুলেছিল সে আর লাশটা। উঠবার সময় লোকটার গালে একবার হাত দিয়েছিল জেক, কিন্তু, দাড়ির স্পর্শ পায়নি। তারমানে, টম পোলার্ডের লাশ ওটা। জেকের বামদিকে ছিল টম। পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে ওর উঠে আসবার অপেক্ষা করছিল আক্রমণকারী। জেক লাশ নিয়ে উঠে আসতে পারে, ব্যাপারটা বোধহয় তার মাথায় ছিল না। লাশের মাথাকেই জেকের মাথা মনে করেছিল লোকটা। তৃতীয় গুলিটা ডুবন্ত জেকের বুকে বিঁধবে অনুমান করে একটু বামে চালিয়েছিল সে। গুলিটা সত্যিই বিঁধেছে

জেকের দেহে। তবে, বুকে নয়, বাম কাঁধে। আর ওর প্রতিপক্ষের? ওর ছুরিটা ঠিকমতই বিঁধেছে লোকটার দেহে, আশা করল জেক।

আশপাশে কোথাও প্রচণ্ড শব্দে একটা বজ্রপাত হলো। চমকে উঠে বসল জেক। ঘাড় থেকে রুমালটা খুলে নিয়ে দাঁত আর ডান হাতের সাহায্যে বাঁধল বাম কাঁধের ক্ষতস্থানে। রক্তপাতের গতি ধীর হলো কিছুটা।

যেভাবেই হোক, ফিরতে হবে মার্কীয়, নিজেকে জানাল জেক। কিন্তু, পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল, কাজটা খুবই কঠিন। স্ট্যালিয়নটা রয়েছে ওই পাড়ে। এবং, ঘাতক লোকটাও নিশ্চয়ই চলে যায়নি। পানির উপরে উঠবার পর থেকে ঘোড়ার শব্দ শুনতে পায়নি জেক। দুঃসংবাদ, মনে মনে বলল সে। তারমানে, খুব বেশি আহত হয়নি লোকটা। এবং, অপেক্ষা করেছে আমার জন্য। ছুরি খেয়ে বুঝে গেছে, খুব বেশি ক্ষতি করতে পারেনি সে আমার।

লোকটার কাছে কী কী অস্ত্র আছে, অনুমান করবার চেষ্টা করল জেক।

তিনটা গুলি করেছে সে। তারমানে, ওর সিক্সশুটারে কমপক্ষে আরও তিনটা গুলি আছে। জেকের পিস্তলটা ওর কাছে। স্যাডলে বুলানো উইনচেস্টারটা চাইলেই নিতে পারে লোকটা। হয়তো নিজেও উইনচেস্টার নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ, অস্ত্রের অভাব নেই তার।

আর জেকের? ঘাড়ের পিছনে লুকানো একটামাত্র থ্রোয়িং নাইফ। বিশ ফিটের বেশি দূরত্বে যা এককথায় অচল।

ভাগ্য ওকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করলেও টিকে থাকতে সাহায্য করবে কি না, সন্দেহ হলো জেকের।

গুলির আওয়াজ হলো একটা। পিস্তলের না, আরও ভারী কিছুর। উইনচেস্টারের, অনুমান করল জেক। কিন্তু, গুলিটা আশপাশে কোথাও এসে বিঁধল না দেখে একটু অবাকই হলো সে। উঁকি দিল গাছের আড়াল থেকে। তাকাল ওয়াটার ট্যাঙ্কটার উল্টো পাড়ে।

থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে। নীলচে-সাদা আলোয় ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে চারদিক। সেই আলোতে ঘোড়াটাকে পড়ে থাকতে দেখল জেক। ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। ঘোড়াটাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে আক্রমণকারী। তারমানে, আরও বড় বিপদ হলো জেকের। আহত অবস্থায় পায়ে হেঁটে মার্কীয় ফিরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ওর জন্য। ঘোড়া নেই, অস্ত্র নেই, এখন লোকটা হামলা করলে স্রেফ মারা পড়বে সে।

ওদিকে মার্কীয় হয়তো এতক্ষণে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে কার্ক। তবে একটাই ভরসা, শেরিফ লুথার আছে জেল হাউসে। গতরাতে শিক্ষা হয়েছে তার। আশা করা যায়, আজ মুখের কথায় চিড়ে ভেজানোর চেষ্টা করবে না সে। গতরাতে আক্রমণ করেছিল পল জেমিসন, পুরো এলাকায় যার দুর্দান্ত দাপট;

আর আজ হামলা করতে যাচ্ছে কার্ক পোলার্ড, যাকে হয়তো চেনে না সবাই। গতরাতে পলের সঙ্গী ছিল দক্ষ কাউবয়েরা, আজ রাতে কার্কের সঙ্গী ভবঘুরে মাতালরা। এদের উপর গুলি চালালে খুব বেশি রাগ করবে না মার্ক্যার লোকজন। হিসাবটা যেন জানা থাকে শেরিফের, প্রার্থনা করল জেক।

নিজের অবস্থাটা আরেকবার চিন্তা করল সে।

কে এই আক্রমণকারী? কেন হামলা চালিয়েছে সে জেকের উপর? লোকটা আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল তার জন্য। সে জানল কীভাবে জেক আসবে এখানে? ওয়াটার ট্যাঙ্কে আসবার কথা শুধুমাত্র লরাকে বলেছিল জেক। আর কেউ জানত না। তা হলে কি লরা দুপুরের অপমানটার প্রতিশোধ নিতে আততায়ী পাঠিয়েছে?

মাথা নেড়ে চিন্তাটাকে বাতিল করে দিল জেক। সেটা হতে পারে না। লরার মত একটা মেয়ে এত জঘন্য একটা কাজ করবে... আবারও মাথা নাড়ল সে। তা ছাড়া লরার চোখে সে ভালবাসা দেখতে পেয়েছে। ভালবাসার মানুষকে কি কেউ...

তা হলে কে? এবং, কেন? আর এই ওয়াটার ট্যাঙ্কেই অপেক্ষা করছিল কেন লোকটা? বার স্টিরাপে খুন করতে পারত সে জেককে। অথবা হয়তো সাইনবোর্ডটার সামনে। ওই জায়গাটা অ্যামবুশ করবার জন্য আদর্শ। সব ঘটনা-দুর্ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু দেখা যাচ্ছে এই ওয়াটার ট্যাঙ্ক!

লরাকে ছাড়া অন্য কাউকে এই মুহূর্তে সন্দেহ করতে পারছে না জেক কিন্তু, মেয়েটার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতেও ইচ্ছে করছে না। অবশ্য, প্রতিশোধপরায়ণ হলে নারী র্যাটল সাপ, শুনেছে জেক। কিন্তু...

আক্রমণকারী কে, সে ব্যাপারে আর কিছু ভাবতে চাইল না জেক। বাঁচতে হবে ওকে, সেটাই হচ্ছে বড় কথা। আরেকবার গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল সে। লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করল। চোখে ঠেকল নিকষ কালো অন্ধকার বিদ্যুচ্চমকের জন্য অপেক্ষা করে রইল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তাকে, আলো জ্বলে দিল আকাশ। মুহূর্তের সেই আলোয় দেখতে পেল জেক, লোকটা ধীর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছে কটনউড জঙ্গলটার দিকে, যেখানে বে স্ট্যালিয়নটাক রেখেছিল ববি। হয়তো আক্রমণকারীর ঘোড়াটাও আছে সেখানে।

ভাগ্যকে আবার ধন্যবাদ দিল জেক। ওয়াটার ট্যাঙ্কে পৌঁছুবার পর কটনউড জঙ্গলটার ধারে নামতে চেয়েছিল সে, দেরি হয়ে যাওয়াতে নেমেছে অন্যত্র লোকটা হয়তো অপেক্ষা করছিল জঙ্গলের ভিতরে। জেক সেখানে নামলেই...

কিন্তু, বেশি দূরে নামেনি জেক লোকটা উইনচেস্টার ব্যবহার করতে পারত নাকি অস্ত্রটা নেই ওর সাথে? আবার উঁকি দিল জেক। মৃত বে

স্ট্যালিয়নটাকে দেখতে চায় সে।

ওই তো, ঘোড়াটার উপরেই পড়ে আছে ওর উইনচেস্টারটা। তারমানে ওটা দিয়ে গুলি করেই জন্তটাকে মেরেছে লোকটা। অর্থাৎ, হয় দূরপাল্লার কোন অস্ত্র নেই লোকটার কাছে, অথবা...

লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না আর হয়তো সত্যিই চলে যাচ্ছে সে। অথবা, চলে যাওয়ার ভান করছে। সে জানে, বেঁচে আছে জেক। আরও জানে, কোন অস্ত্রই নেই জেকের কাছে। সুতরাং, গুরুতরভাবে আহত না হলে চলে যাওয়ার কথা নয় তার। সিদ্ধান্ত নিতে পারল না জেক

একটু পর ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পেল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, ঢাল পার হয়ে মার্ক্যার ট্রেইলে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। তারমানে, সত্যিই চলে গেছে। ছুরিটা বিঁধেছে ঠিক জায়গাতেই।

একটা উইনচেস্টারের জন্য খুব আফসোস হলো জেকের। অস্ত্রটা থাকলে এতক্ষণে দশবার ফেলে দিতে পারত অপরিচিত আক্রমণকারীকে।

থেমে গেছে বৃষ্টি। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে আকাশ। নিকষ কালো অন্ধকার পাল্টে গিয়ে হয়ে যাচ্ছে শুধু অন্ধকার। এখনও একটু পর পর চমকচ্ছে বিদ্যুৎ। আবার মরা ঘোড়াটাকে দেখল জেক। বুকের মধ্যে হ হ করল তার। এই একদিনেই কেমন আপন হয়ে গিয়েছিল জন্তটা।

বে স্ট্যালিয়নটার কাছেই পড়ে আছে ওর উইনচেস্টার আর গানবেল্ট। আশ্চর্য হয়ে গেল জেক। তারমানে, লোকটা ধরে নিয়েছে, মরে গেছে জেক। কিন্তু, কাজটা খুব কাঁচা হয়ে গেল না? আজ হোক, কাল হোক, কেউ না কেউ আসবেই এখানে। অন্তত লরা তো বটেই। দেখবে, মরে পড়ে আছে ঘোড়াটা। সেটার উপর পড়ে আছে একটা উইনচেস্টার, কাছেই গানবেল্ট। খবরটা পেলেই বুঝে যাবে শেরিফ, উইনচেস্টার আর গানবেল্টটা কার। কী ঘটেছিল, সেটা বুঝতেও অসুবিধা হবে না লুথারের।

নাকি ওটা একটা প্রলোভন? লোকটা নিশ্চিত হতে চায় সত্যিই মরেছে কি না জেক? কোথাও ঘাপটি মেরে বসে শকুনের মত চোখ রাখছে লোকটা? দুপুরে দেখা শকুনগুলো মনে পড়ল জেকের।

তাকে চলে যেতে দেখেছে জেক। ঘোড়ায় চড়ে ঢাল পার হয়েছে লোকটা মাত্র মিনিট পাঁচেক আগে।

কিন্তু, যদি এমন হয়, ঢালটা পার হয়েই ঘোড়া থামিয়েছে লোকটা, নেমে পড়েছে স্যাডল ছেড়ে? পায়ে হেঁটে বা হামাগুড়ি দিয়ে হাজির হয়েছে ঢালের মাথায়? অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করছে জেকের জন্য? আড়াল ছেড়ে বের হলেই ফুটো করে দেবে জেককে?

ঝুঁকিটা নিল না জেক। উঠে দাঁড়াল না, আড়াল ছেড়ে বের হলো না তার

বদলে চিন্তা করতে লাগল বিকল্প কোন অস্ত্রের ব্যবস্থা আছে কি না।

আছে! সুইস গेटের কাছে পড়ে আছে ববির জোড়া সিঙ্গ শূটার। গতকাল বিকেলে স্যামের গুলি খেয়ে পালানোর সময় ববি ফেলে গিয়েছিল সিঙ্গ শূটার দুটো। কোথায়, খুব ভালমতই জানে জেক। এখন একবার সুইস গेटটার কাছে পৌঁছতে পারলেই হয়।

একজন গানম্যান কখনোই খালি রাখে না তার পিস্তল। তারমানে, ববির পিস্তল জোড়া হাতে পেলে ছয় যোগ ছয় অর্থাৎ বারোটা গুলিও জুটবে কপালে। গতকাল বলা লরার একটা কথা মনে পড়ে গেল—“তখন দাঁত বের করে হাসল শয়তানটা। ধীরে-সুস্থে গুলি ভরতে আরম্ভ করল ওর সিঙ্গ শূটারদুটোতে।”

কথাটা মাথায় আসামাত্রই আবার গড়াতে আরম্ভ করল জেক, নেমে গেল কিছুটা নীচে। ঘাতকের অস্ত্র থেকে বাঁচতে চায় সে।

কিছুক্ষণ পর থেমে মাথা তুলল জেক। কটনউডের সারির জন্য অদৃশ্য হয়ে গেছে ঢালের চূড়াটা। ওখানে কেউ বসে থাকলেও এখন আর দেখতে পাবে না ওকে।

সুইস গेटটা কোথায় আছে, অনুমান করে নিয়ে তিন হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করল জেক। কষ্ট হল প্রচণ্ড, কিন্তু, বেঁচে থাকবার তাগিদে দাঁতে দাঁত চেপে সব ব্যথা সহ্য করল সে। অর্ধেক দূরত্ব পার হয়ে এল একটানা। তারপর আবার শুয়ে পড়ল মাটিতে। মুখ হা করে দম নিতে লাগল।

ঘোড়া সমস্যার একটা সমাধান করা দরকার, ভাবল জেক। ঠিক তখনই আকাশে চমকাল বিদ্যুৎ। এবং, হয়তো জেকের মাথাতেও।

ঘোড়াও আছে! বার স্টিরাপের পাশে জুনিপারের জঙ্গলে পরম নিশ্চিন্তে ওর জন্য অপেক্ষা করছে ওর নিজের ঘোড়াটা! কিন্তু, বার স্টিরাপ পর্যন্ত যাওয়াটাই একটা সমস্যা।

আবার হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করল জেক। এবার সুইস গेटটার নীচে না পৌঁছনো পর্যন্ত থামল না। থামবার পর দম নিল। তারপর বুকে হেঁটে একটু একটু করে উপরে উঠতে আরম্ভ করল। ওই যে, পাথরটা দেখা যাচ্ছে। ওটার ডান পাশেই আছে একটা সিঙ্গ শূটার। ফিট পাঁচেক দূরে আরেকটা। সামনে এগুল জেক।

জায়গাটা পাথরে। ছোট-বড় পাথর, পাথরের টুকরো পড়ে আছে এখানে-সেখানে। বুকের নীচে পড়াতে কষ্ট হচ্ছে খুব। কিন্তু, চেষ্টা থামাল না জেক। শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল সে বড় পাথরটার কাছে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ভারী সিঙ্গ শূটারটা। তারপর ডান দিকে গড়াল দু'বার। তুলে নিল দ্বিতীয়টাও। এরপর বিনা নোটিশে স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, পাহাড়ি ছাগলের মত দু'বার লাফ দিল এদিক-ওদিক। তারপরই ঘুরল উল্টোদিকে, যত জোরে পারল

ছুট লাগাল সুইস গেটের পাথরের থামটার উদ্দেশে।

ঠিকই অনুমান করেছিল জেক। চলে যায়নি আক্রমণকারী। জেককে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখেই চমকে গেল সে। লোকটা জেককে ওয়াটার ট্যাক্টের অপর পাড়ে উঠতে দেখেছিল। কিন্তু, তখন পেট চেপে মাটিতে বসেছিল সে, প্রচণ্ড ব্যথা সহিতে না পেরে হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল সিক্স শ্যুটারটা। ভেবেছিল, অপর পাড় থেকে মাথা তুলবে জেক, তখন আবার ছিদ্র করা যাবে ওকে। প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও জেকের কোন পান্তা না পেয়ে ধোঁকা দেওয়ার ফন্দি আঁটল সে। কিন্তু, সুইস গেটটার আড়াল থেকে জেককে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে নিজেই ধোঁকা খেয়ে গেল। ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেল লোকটা, নিশানা না করেই গুলি চালাতে আরম্ভ করল। তিনটা বুলেট ছুটে গেল জেকের উদ্দেশে। কিন্তু, তার আগেই থামটার আড়ালে আশ্রয় নিল জেক।

ওর গুলিতে জেক কতদূর আহত হয়েছে, জানে না আক্রমণকারী। অথচ, জেকের ছুঁড়ে মারা ছুরিটা ঠিক বিঁধেছে তার পেটে। বাম দিকের পাজরের নীচে, বেল্ট থেকে ইঞ্চি দুয়েক উপরে। ছুরিটা থ্রোইং নাইফ ছিল না বলে বেঁচে গেছে সে। স্বাভাবিকের তুলনায় ভারী হওয়াতে ছুঁড়ে মারবার সময় হাত স্থির রাখতে পারেনি জেক, কিছুটা নড়ে গেছে। ছয় ইঞ্চির ফলাটা ইঞ্চি দেড়েকের বেশি ঢুকেনি তার পেটে।

অবস্থা সুবিধার না লোকটার। ফলাটা চওড়া ছিল, সে কারণে ক্ষতটাও চওড়া হয়েছে। গায়ের শার্ট খুলে ক্ষতস্থানে রুমাল পেঁচিয়েছে সে, তারপর রুমালের উপর পেঁচিয়েছে শার্টটাকে। কিন্তু, তাতে কাজ হয়নি খুব একটা। রক্তপাতের গতি ধীর হলেও একটানা পড়ছে এখনও। এতক্ষণ সে আশা করে ছিল, মাথা উঠানোমাত্রই খুন করবে জেককে। কিন্তু, সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে আশাটা। নিরস্ত্র হয়েও যথেষ্ট সুস্থ আছে জেক। তা না হলে ওরকমভাবে দৌড় দিতে পারত না। আর আধ ঘণ্টার ভিতর ডাক্তারের কাছে যেতে না পারলে এই ওয়াটার ট্যাক্টের কিনারাতেই মরতে হবে তাকে, জানে আক্রমণকারী। অথচ, খুন করতেই হবে জেককে। কিছুতেই মারফায় ফিরতে দেওয়া যাবে না তাকে। নিজের জীবনের উপর খেলবার সিদ্ধান্ত নিল আক্রমণকারী।

আগে তিনটা, এখন আরও তিনটা। শেষ হয়ে গেছে সিক্স শ্যুটারের গুলি, মনে পড়ল লোকটার। গানবেল্ট থেকে একটা একটা করে গুলি খুলে নিয়ে পিস্তলে ভরল সে। তাড়াহুড়া করল না। ততক্ষণ খাটাল মগজটাকে।

জেক কোথায় আছে, জানা আছে তার। সে নিরস্ত্র, এটাও জানে লোকটা। এবং, এটাই আমার জন্য প্লাস পয়েন্ট, ভাবল আক্রমণকারী।

ওরকমভাবে লাফিয়ে উঠল কেন জেক? নিজেকে প্রশ্ন করল লোকটা। নিশ্চয়ই উইনচেস্টার বা গানবেল্টটা দখল করবার জন্য বুকে হেঁটে এগুচ্ছিল,

আমাকে চোখে পড়ায় পালিয়েছে। ঠিক আছে, আমাকে যখন দেখেই ফেলেছে সে, আর লুকিয়ে থাকব না।

উঠে দাঁড়াল লোকটা। হেঁটে নেমে গেল ঘোড়াটার কাছে। স্যাডলে উঠে বসতে কষ্ট হল তার। তবুও চড়ল ঘোড়াটাতে, হাতে পিস্তল নিয়ে উঠে এল ঢাল বেয়ে। মধ্যম গতিতে এগুল সুইস গেটটার দিকে।

এতক্ষণ সুইস গেটের আড়ালে বসে থাকেনি জেক। কোমরের বেলেটে সিক্স শ্যুটার দুটো গুঁজে নিয়ে আগের মতই গড়িয়ে নীচে নেমে গেছে, তারপর বুকে হেঁটে পার হয়ে এসেছে প্রায় ত্রিশ ফিটের মত। দূর থেকে ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে থেমে গেল জেক, উঠতে আরম্ভ করল উপরে। কিনারায় পৌঁছে খুব সাবধানে মাথা তুলে দেখল, মধ্যম গতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে সুইস গেটটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আক্রমণকারী। তার বেপরোয়া ভাব দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল, দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত লোকটা—সুইস গেটটার আড়ালেই আছে জেক এবং কোন অস্ত্র নেই জেকের কাছে। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য দুই ঠোঁট ডান দিকে বাঁকা করল জেক। এগিয়ে গেল কাছের কটনউড গাছটার দিকে। দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল। কোমরের বেলেটে আটকানো সিক্স শ্যুটারদুটোর একটা নিল ডান হাতে জানে ছয়টা গুলিই আছে, তারপরও চেষ্টার খুলে দ্রুত পরীক্ষা করল একবার। এরপর নিশানা করল। এখন হয় মারতে হবে ওকে, নইলে মরতে হবে।

ততক্ষণে সুইস গেটটার থাম ছাড়িয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে গেছে আক্রমণকারী। জেকের খোঁজে একবার এদিক-ওদিক তাকাল সে। পেল না।

মেঘ সরে গিয়ে প্রায় পরিষ্কার হয়ে এসেছে আকাশ। শেষ হয়ে আসা সন্ধ্যার আলোতে স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি দেখা যাচ্ছে সবকিছু। ঘোড়ার উপর বসে থাকা লোকটার কালো মূর্তি জেকের জন্য একটা সহজ টার্গেট। কটনউডে গাঢ়ে করে নির্দয়ের মত গুলি করল সে। চারটা লোকটার দেহে, দুটো লোকটার ঘোড়ার পেটে। গুলি শেষ হয়ে গেল। হাত থেকে সেটা ফেলে দিল জেক। বেলেট থেকে খুলে নিল দ্বিতীয় সিক্স শ্যুটারটা। কিন্তু, সেটার প্রয়োজন হলো না।

গুলি খেয়ে ঘোড়ার গলার সাথে প্রায় লেগে গেল লোকটার গলা। স্যাডলের উপর প্রায় শুয়ে পড়ল সে। ঘোড়াটাও তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল, ঘুরে দৌড় দিল ফিরতি পথে। ঢাল বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষেই।

তাড়াহুড়ো করল না জেক। ধীরে-সুস্থে আড়াল ছেড়ে বের হলো। তাকাল মৃত স্ট্যালিয়নটার দিকে। বকের ভিতরটা আবার হু হু করে উঠল তার। মৃত্যু কী নির্মম! ভাবল সে। কখন, কোথায়, কাকে তুলে নিয়ে যায়—কোন ঠিক নেই। টম, লুসি আর বিল অসকারের লাশ তুলতে এসেছিল সে। আরেকটু হলে নিজেই লাশ হয়ে যেত। স্রেফ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে। মারা গেছে জেকের

ঘোড়াটা এবং হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবে আক্রমণকারী লোকটাও ।
হয়তো তার ঘোড়াটাও ।

হাঁটা ধরল জেক বে স্ট্যালিয়নটার উদ্দেশ্যে । কাছে গিয়ে তুলে নিল
উইনচেস্টারটা, ঝুলাল ক্ষতহীন কাঁধে । তারপর পরল গানবেল্ট । বহু কষ্টে
ঘোড়াটার নীচ থেকে উদ্ধার করল নিজের স্যাডল । উইনচেস্টারের ফিতের পাশে
ঠাই দিল সেটাকে ।

* বার স্টিরাপের পথে রওয়ানা হওয়ার আগে কিছুক্ষণের জন্য থেমে দাঁড়াল
জেক, গতকাল মারা যাওয়া টম পোলার্ডকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল । ওর জন্যই
সে বেঁচে গেছে এ যাত্রা ।

ওয়াটার ট্যাঙ্ক ছেড়ে চলে গেল জেক । টম পোলার্ডের লাশটা ভাসতে থাকল
পানিতে । একটু আগের রণক্ষেত্র পরিণত হল সুনসান কবরস্থানে ।

ষোলো

মারফার বাইরে যখন নিজের বাকস্কিনটার রাশ টানল জেক, ততক্ষণে রাত নেমে
এসেছে সারা টেক্সাসে ।

পরিস্থিতিটা যাচাই করল জেক । দূর থেকে দেখা যাচ্ছে আলোকিত মারফা,
রাস্তাঘাটে স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছে লোকজন আর মাঝেমধ্যে আরোহী
পিঠে একটা-দুটো ঘোড়া । সবকিছু ঠিকই আছে । জেল হাউসটা আক্রমণ করেনি
কার্ক বা তার দল ।

খুব একটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বাম হাতের তরফ থেকে । কোমর পর্যন্ত
উঠানো যাচ্ছে হাতটাকে, তার বেশি উঠাতে গেলেই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে সারা
শরীরে । হাতটাকে কোলের উপর রেখেছে জেক, মুঠি পাকিয়ে ধরে আছে
উইনচেস্টারের নল । ডান হাতের কনুই দিয়ে বাঁটাটা ডান কোমরের সাথে চেপে
রেখেছে । তর্জনী রেখেছে ট্রিগারে । পা দিয়ে চালাচ্ছে ঘোড়াটাকে । অভ্যস্ত
বাকস্কিনটা আদেশ বুঝতে কোনরকম ভুল করছে না ।

বিপদ দেখামাত্রই মোকাবেলা করতে প্রস্তুত জেক । কিন্তু, আর বিপদ হলো
না । জেল অফিসের সামনে এসে থামল সে, নামল ঘোড়া থেকে । ঢুকল
ভিতরে । শেরিফের আচরণ কেমন হবে, ভাবল একবার । হয়তো ওকে এই
অবস্থায় দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে লোকটা ।

কিন্তু, আশ্চর্য হয়ে গেল জেক নিজেই । তিনজন লোক বসে আছে শেরিফের

সামনে। দু'জন অপরিচিত, আরেকজন জেকের বন্ধু জিম রাইট। ডেপুটি শেরিফের টেবিলের পিছনে নিজের চেয়ারে বসে আছে হার্শ। ফোর্ট ডেভিস থেকে ফিরে এসেছে সে। হাজত থেকে মুক্তি পেয়েছে স্যাম, বসে আছে হার্শের সামনে একটা চেয়ারে।

কেউ কোন কথা বলল না। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল জেককে। ঘটনা কী, মোটামুটি আন্দাজ করে নিল উভয়পক্ষই।

স্যাডল, উইনচেস্টার আর ববির বাড়তি পিস্তলটা একে একে হার্শের টেবিলে নামিয়ে রাখল জেক। তারপর কোন ভূমিকা না করে বলল, 'ডাক্তার বেনকে ডেকে নিয়ে এসো, স্যাম। আমি আর পারছি না।'

কোন কথা না বলে বের হয়ে গেল স্যাম। মিনিটখানেকের ভিতরেই ডাক্তারকে নিয়ে ফিরে এল সে। জেকের ক্ষতটা পরীক্ষা করল বেন, মারাত্মক নয় বুঝতে পেরে একটা কথাও না বলে শুশ্রূষা আরম্ভ করল।

জেক জিজ্ঞেস করল, 'কার্ক কেমন আছে, ডাক্তার?'

'আধ ঘণ্টা আগে মারা গেছে।'

'কীভাবে?' নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করল জেক।

'মারফার বাইরে কোথাও গিয়েছিল, ফিরে এল মারাত্মক আহত অবস্থায়। পাঁজরের নীচে ছুরি খেয়েছিল, আর শরীরে চারটা গুলি। একটা পেটে, দুটো বুকে, একটা গলার নীচে। কলার বোন ভেঙে বের হয়ে গেছে শেষের গুলিটা। ওর ডান দিকের ফুসফুসটা ফুটো হয়ে গেছে খুব সম্ভবত। নিঃশ্বাসের সাথে রক্ত উঠে আসছিল।'

'মনে হয় কিছু বলার আছে তোমার?' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল শেরিফ লুথার।

'কিছু? অনেক, অনেক কথা বলতে চাই আমি। তবে তার আগে জানতে চাই এরা কারা,' অপরিচিত দু'জনের দিকে ইঙ্গিত করল জেক।

'আমি আর্ট কার্ভেল,' বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ আর পোশাকে সাধারণ লোকটা নিজের পরিচয় দিল প্রথমে।

'আর আমি লুই মিডোস,' দামি কাপড়-চোপড় পরা গম্ভীর, উন্মাসিক দ্বিতীয়জন ঘোষণা করল তারপর।

'ভাল,' উপরে-নীচে মাথা দোলাল জেক। 'তোমরা এখানে এসে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছ। ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে। হার্শ, ফোর্ট ডেভিস থেকে কী খবর আনলে তুমি?'

'খবরটা তোমাদের জন্য ভাল, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? তা না হলে বাইরে বসে থাকত না স্যাম। যা-ই হোক, গর্ডন ফেবলস তোমাদের পক্ষেই কথা বলল। স্যাম সত্য বলেছিল। শুধু একটা কথা বাদে—কোন পার্টনার ছিল না ওর।

এবার নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে তুমিই ওর পার্টনার?’

‘হ্যাঁ, আমিই ওর পার্টনার। পরিস্থিতির কারণে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম আমরা। না বললে গতকাল থেকে আটকা পড়ে থাকতে হত এখানে, আর সমাধান করা হত না রহস্যটার।’

অপেক্ষা করে রইল সবাই।

‘সব দোষ কার্ক পোলার্ডের। সম্পত্তির লোভে নিজের বড় ভাই টম পোলার্ড, ভাবি লুসি পোলার্ড আর লুসির চাচা বিল অসকারকে খুন করিয়েছে সে ববি মার্জকে দিয়ে। খুলে বলছি সব। তার আগে আমাকে বলো, এদের কাছ থেকে কী জানতে পারলে তুমি, লুথার।’

‘কিছুই জানতে পারিনি। দশ মিনিট আগে-পরে হাজির হয়েছে এদের প্রত্যেকে। ঠিকমত কথাও বলতে পারিনি সবার সাথে। তবে এটুকু জেনেছি, তার করে সবাইকে আসতে বলেছিলে তুমি। এতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমরা সবাই।’

‘তাহলে তো ভালই হল। কষ্ট করে দ্বিতীয়বার আর বলতে হবে না কাউকে। জিম, তুমিই শুরু করো। ববি মার্জ আর কার্ক পোলার্ড দু’জনেই থাকত বিগ বেঙ্গে। তুমিও কাজ করো সেখানে। নিশ্চয়ই কিছু না কিছু শুনেছ। যা জানো, বলো আমাদের।’

‘ববি মার্জের ভাল নাম হচ্ছে অ্যান্থনি মার্জ। ববি নামেই ওকে চিনত সবাই। বিগ বেঙ্গের কুখ্যাত গানম্যান ছিল সে। কেউ কেউ বলত, ভাল পয়সা পেলে ভাড়াটে খুনী হিসেবেও নাকি কাজ করত। আজ জানলাম, কথাটা সত্য। হাতে কাজ না থাকলে সারাদিন পড়ে থাকত সেলুনে। মদ খেত, জুয়া খেলত আর যখন-তখন চড়াও হত এর-ওর উপর। সাত মাস ধরে আছি আমি মার্কায়, এর মধ্যে দু’জনকে ওর গুলি খেয়ে মরতে দেখেছি। তবে, দুটো গানফাইটই ছিল ন্যায্য। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়েছে ওরা। ববির সামনে পাত্তাই পায়নি লোক দু’জন। পিস্তলে হাত দেওয়ার আগেই মারা গেছে। ববির মত চালু হাত বোধহয় সারা টেক্সাসে ছিল না।’

‘কার্ক পোলার্ডের সাথে খুব একটা খাতির ছিল না আমার। তবে বেশিরভাগ সময়ই সেলুনে কাটাত সে। কাজে যেত না নিয়মিত। পেশাদার জুয়াড়ী হওয়ার চেষ্টা করছিল বোধহয়। আমাদের ক্যাম্পেই কাজ করত। ওর খোঁজে প্রায়ই লোক পাঠাত আমাদের ম্যানেজার...’

‘কী বললে? ম্যানেজার? তাহলে কার্ক কী ছিল? শ্রমিক?’

‘অবশ্যই। তা-ও আবার যাচ্ছে তা-ই মার্কী শ্রমিক। সেরকম হওয়ার কারণও আছে। মদের নেশায় চুর থাকলে কাজ করতে পারে লোকে?’

দৃষ্টি বিনিময় শেরিফ লুথার আর জেক। শেরিফ বলল, ‘তোমার ভুল হচ্ছে

না তো, জিম? হয়তো অন্য কোন ক্যাম্পের ম্যানেজার ছিল কার্ক?’

‘আরে নাহ্,’ লুথারের কথাটা একবাক্যে উড়িয়ে দিল জিম। ‘মাত্র তিনটা মাইনিং ক্যাম্প আছে বিগ বেডে। সবগুলোর ম্যানেজারকে চিনি আমি। কার্ককে ম্যানেজার বানাবে কে? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? আমাদের ক্যাম্পেরই একজন শ্রমিক ছিল কার্ক। ফাঁকিবাজ শ্রমিক। আরে বাবা, মদ খাবি খা, সেটা তো আমিও খাই, সবাই খায়, কিন্তু, তাই বলে দিন-রাত কেন? জুয়া খেলবি খেল, অনেকেই খেলে, কিন্তু, সব সময় কেন? কাজকর্ম বলে কিছু নেই তোর? একদিন ওকে সেলুন থেকে ডেকে আনতে আমাকে পাঠিয়েছিল ম্যানেজার। ওরে বাবা! আমাকে দেখেই পিস্তল বের করল বদমাশটা। পালিয়ে বেঁচেছিলাম সেদিন।’

‘এ-ই যখন অবস্থা, তখন কার্ককে তাড়িয়ে দিল না কেন তোমাদের ম্যানেজার?’

‘অনেকবার দিতে চেয়েছিল। কিন্তু, একটা বড় সমস্যা ছিল। সমস্যাটার নাম ববি মার্জ।’

‘ববি মার্জ?’ প্রতিধ্বনি করল শেরিফ। ‘বুঝলাম না।’

‘ববির সাথে দহরম-মহরম ছিল কার্কের। একেবারে গলায় গলায় ভাব যাকে বলে। অনেকবার কার্কের চাকরি খেয়েছে আমাদের ম্যানেজার, আবার অনেকবার দিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, চাকরি যাওয়ামাত্রই ববির কাছে গিয়ে নালিশ দিয়েছে কার্ক শয়তানটা। আর সাথে সাথেই দলবল নিয়ে ছুটে এসেছে ববি। মারধোর করেছে ম্যানেজার আর ফোরম্যানকে। ক্যাম্পটা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে সে কয়েকবার। তেমন কেউকেটা না হলেও শুধুমাত্র ববির কারণে শহরে পরিচিতি পেয়েছিল কার্ক।’

‘তোমাদের শেরিফ নেই?’ জিজ্ঞেস করল স্যাম।

জবাবে একটা গাল দিল জিম। বলল, ‘আরে সে আবার শেরিফ নাকি? ওর বদলে একটা বুড়ো মহিলাকে শেরিফ বানাতেও অনেক উপকার হত আমাদের।’

কোন মন্তব্য করল না কেউ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার শুরু করল জিম, ‘স্বপ্নের বোঝা মাথায় চাপতে বেশি সময় লাগল না কার্কের। আসলে, তাকে বলির পাঁঠা বানিয়েছিল ববি, হয়তো বুঝতে পারেনি সে। ওর পয়সা দিয়ে খেলত ববি, জিতলে প্রায় কিছুই দিত না কার্ককে, আর হারলে তো যা যেত পুরোটাই কার্কের। ববির ভয় দেখিয়ে এর-ওর কাছ থেকে মোটামুটি ভাল অঙ্কের টাকা ধার করতে পেরেছিল কার্ক। কিন্তু, পুরোটাই হয় সে, নইলে ববি উড়িয়ে দিয়েছিল জুয়ার টেবিলে। লোকের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। শেষে টাকার জন্য তারা চাপ দিতে লাগল কার্ককে। তখন গা ঢাকা দিতে বাধ্য হলো কার্ক। তারপরের কাহিনি শুনব তোমাদের মুখ থেকে,’ যা বলবার ছিল, বলল জিম।

‘কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছ তো লুথার?’ জিজ্ঞেস করল জেক।

কিছু না বলে উপরে-নীচে মাথা নাড়ল শেরিফ।

‘এবার লুই মিডোস, তুমি। তোমার কাছে গিয়েছিল কার্ক, ঠিক না?’

‘ঠিক,’ ভারী গলায় সম্মতি জানাল অভিজ্ঞ উকিল। ‘লুসির বাবা মারা যাওয়ার পর মেয়েটাকে একটা চিঠি লিখলাম আমি। সম্পত্তির হিসেব বুঝে নিতে বললাম। কিন্তু, কোন উত্তর দিল না লুসি। ভাবলাম, এখনও বোধহয় বাবার উপর রাগ করে আছে মেয়েটা...’ শেরিফকে ড্রয়ার খুলতে দেখে থেমে গেল মিডোস। একটা চিঠি বের করল লুথার। মিডোসকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘এটা?’

‘হ্যাঁ। যা-ই হোক, লুসি উত্তর দিল না দেখে চিন্তায় পড়ে গেলাম আমি। মেয়েটার একমাত্র চাচা বিল অসকারের সাথে কথা বলব কি না ভাবলাম। কিন্তু, বুঝতে পারলাম, কোন লাভ হবে না। কী করব ভাবছি, এমন সময় ওহায়োতে গিয়ে হাজির হলো কার্ক পোলার্ড,’ দম নেওয়ার জন্য থামল বৃদ্ধ উকিল। অপেক্ষা করে রইল সবাই।

‘আমাকে বলল কার্ক, চিঠিতে কী লিখেছি, কিছুই নাকি বুঝতে পারেনি লুসি। রেগে গেলাম। এত সহজ ভাষায় লেখার পরও না বুঝতে পারার কারণ কী, জিজ্ঞেস করলাম কার্ককে। পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারল না কার্ক। বলল, সবকিছু বিস্তারিতভাবে তার কাছে বুঝিয়ে বলার জন্য নাকি অনুরোধ করেছে লুসি। আমি কিছুই সন্দেহ করলাম না। যা জানতে চাইল লোকটা, গড়গড় করে বলে দিলাম।

‘বললাম, মারা গেছে লুসির বাবা। মরার আগে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে লুসিকে দিয়ে গেছে। সম্পত্তির হিসেব বুঝে নেওয়ার জন্য মেয়েটাকে ওহায়ো আসতে হবে।

‘লুসি নিজে না এসে কার্ককে কেন পাঠাল, জিজ্ঞেস করলাম। উত্তর দিল সে, সামনের মাসে বাচ্চা হবে মেয়েটার, ডাক্তার বেশি নড়াচড়া করতে নিষেধ করে দিয়েছে। তা-ই আসেনি। বাচ্চা হওয়ার খবর শুনে খুশি হয়ে উঠলাম। আগ্রহ করে জিজ্ঞেস করলাম, কী কী জানতে চায় লুসি।

‘প্রথমেই কার্ক জানতে চাইল, লুসি মারা গেলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কে। বললাম, কোন সন্তান না থাকায় ওর স্বামী টম পোলার্ড। এরপর কার্ক জিজ্ঞেস করল, টমের কিছু হলে তখন কী হবে। বললাম, ওহায়োর নিয়মানুযায়ী, দু’ভাগে-ভাগ হবে সম্পত্তিটা। একভাগ পাবে জনের নিকটাত্মীয়, মানে বিল অসকার, আরেকভাগ টমের নিকটাত্মীয়, অর্থাৎ, কার্ক বিলের বেঁচে না থাকার ক্ষেত্রে আইন কী বলে, জানতে চাইল কার্ক তারপর বললাম, সম্পত্তি ভাগ হওয়ার আগেই যদি দেখা যায়, মারা গেছে না নিখোঁজ হয়ে গেছে বিল, তা হলে

আপাতত অর্ধেক সম্পত্তি পাবে কার্ক। বিল এক বছরের মধ্যে ফিরে না এলে সব সম্পত্তি পেয়ে যাবে কার্ক পোলার্ড। তখন আর বিলের কোন নিকটাত্মীর খোঁজ করা হবে না। সব বুঝতে পেরেছে বলে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল কার্ক। তখন যদি জানতাম ওই ভাল মানুষের মুখোশটার আড়ালে লুকিয়ে ছিল...’ কথাটা শেষ করল না মিডোস।

‘ও, একটা কথা তো জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেছি,’ হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে বলল জেক। ‘কার্কের দলটার কী হলো?’

‘দল?’ ঠোট বাঁকা করে হাসল ডেপুটি শেরিফ হার্শ। ‘মাতালদের আবার দল হয় নাকি? পয়সা দেবে বলে লোভ দেখিয়েছিল কার্ক, অমনি ওরা জুটে গিয়েছিল ওর সাথে। একদিক দিয়ে মরেছে কার্ক, আরেকদিক দিয়ে যার যার মত কেটে পড়েছে ওরা।’

‘আর্ট কার্ভেল?’ অন্যমনস্ক উকিলকে ডাকল জেক। ‘তোমার বক্তব্য কী?’

‘অ্যাছনি মার্জ, ববি মার্জ নামে কুখ্যাতি ছিল যার, আমার মক্কেল ছিল। মাত্র গত এক সপ্তাহের জন্য। একদিন সকাল সকাল আমার অফিসে গেল খুন্সীটা। বলল, একটা বিপজ্জনক কাজে হাত দিতে যাচ্ছে সে। তাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে কেউ। ফলে, মারা পড়বার সম্ভাবনা আছে তার। জানতে চাইল, এমন কোন উপায় আছে কি না যাতে সে সুস্থ দেহে মার্কায় ফিরে এলে কী কাজ করেছিল, সেটা জানবে না কেউ, আর মারা গেলে প্রথমে আমি তারপর আমার মাধ্যমে আইনের লোক জানতে পারবে আসল ঘটনা। বললাম, আছে। ব্যাঙ্কে ওর নামে একটা ভল্ট ভাড়া করতে বললাম। সব কথা একটা সাদা কাগজে লিখে রাখতে বললাম ভল্টে। সে এক মাসের বেশি নিখোঁজ থাকলে বা গোলাগুলিতে নিহত হলে বা যে কোন অস্বাভাবিক উপায়ে মারা গেলে তার নামে ভাড়া নেওয়া ভল্ট খুলে ভেতরের জিনিসপত্র তার মনোনীত ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার আইনগত অধিকার দিতে বললাম আমাকে। আমার কথা অনুযায়ী সেদিনের মধ্যেই সব কিছু করল ববি। আইনের লোক হিসেবে মার্কায় শেরিফকে মনোনীত করল। সে বিগ বেডে ফিরে গেলে বাতিল হয়ে যেত ওই অধিকারটা। বুঝলাম, বিপজ্জনক কাজটা করতে মার্কায় যাচ্ছে দুর্ধর্ষ গানম্যান।

‘কথা ছিল প্রতি দু’দিন পর পর আমাকে তার করবে ববি। ফলে, আমি বুঝতে পারব, বেঁচে আছে সে। তার না পেলো আমি ধরে নিতাম, খারাপ কিছু ঘটেছে। তখন ওর খোঁজ নিতে মার্কায় আসতাম আমি। যা-ই হোক, মিস্টার জেক রায়ার, এই কাগজটা তোমার সামনে এখন শেরিফের হাতে তুলে দিতে চাই। ববির নামে ভাড়া নেওয়া ভল্ট থেকে এই কাগজটাই বের হয়েছে,’ বলতে বলতে শার্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা বড় সাদা কাগজ বের করল আর্ট কার্ভেল। বাড়িয়ে ধরল শেরিফ লুথারের উদ্দেশে। হাত বাড়িয়ে সেটা নিল

লুথার। খুলে পড়তে আরম্ভ করল— ‘ “আমি অ্যাড্বান্সি মার্জ, সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে, বিনা প্ররোচনায় এই জবানবন্দি লিখছি। যদি আগামী দুই মাসের ভিতর হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাই আমি, অথবা, গোলাগুলি বা অন্য কোন অস্বাভাবিক উপায়ে মারা পড়ি, তা হলে এই জবানবন্দিটা মার্ফার শেরিফের হাতে তুলে দেওয়ার আইনগত অধিকার বিগ বেন্ডের জনৈক উকিল মিস্টার আর্ট কার্ভেলকে দিলাম।

‘বিগ বেন্ডে আমার এক বন্ধু আছে, নাম কার্ক পোলার্ড। বাইরে যথেষ্ট ভালমানুষি দেখালেও আসলে আমার চেয়েও খারাপ লোকটা। সম্পত্তির লোভে নিজের বড় ভাই টম পোলার্ড, ভাবি লুসি পোলার্ড আর লুসির চাচা বিল অসকারকে খুন করবার পরিকল্পনা করেছে সে। ওই পরিকল্পনায় আমি হচ্ছি তার সাহায্যকারী; অর্থাৎ, খুনগুলো আমিই করব। নিজেকে নিরাপদ রাখবার জন্য খুনের সময় খুনের জায়গা থেকে অনেক দূরে থাকবে কার্ক পোলার্ড।

‘ওহায়োর জনৈক উকিল লুই মিডোসের কাছ থেকে সব জানতে পেরেছে কার্ক। তারপরই খুনের পরিকল্পনাটা করেছে।

‘লুসিকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখেছিল মিডোস। ওটা আপাতত লুকিয়ে রেখেছি আমরা। টমকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখেছে কার্ক। আরেকটা লিখেছে লুসির চাচা বিল অসকারকে। দুটো চিঠিতে কী লিখেছে, আমাকে দেখতে দেয়নি। আর তখন থেকেই ওর উপর সন্দেহ হয়েছে আমার।

‘আমরা ঠিক করেছি, বিল অসকারকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিটা নিয়ে মার্ফায় যাব আমি। সেখান থেকে পোস্ট করব চিঠিটা। তারপর আমি উঠব মার্ফার একমাত্র হোটেল। অপেক্ষা করব বিলের জন্য। কার্ক আমাকে বলেছে, এমন কিছু সে লিখেছে চিঠিতে যে, মার্ফায় না এসে পারবে না বিল। যা-ই হোক, আমাকে লোকটার বর্ণনা দিয়েছে কার্ক। আরও বলেছে, মার্ফায় হোটেল মাত্র একটা হওয়াতে সেখানেই উঠতে হবে বিলকে। তা ছাড়া, ওহায়ো থেকে স্টেজ কোচে চেপে আসবে লোকটা; কাজেই আমার রুমের জানালা দিয়ে দিনরাত নজর রাখলে তাকে অবশ্যই দেখতে পাব আমি।

‘বিল অসকার মার্ফায় পৌঁছোনোমাত্রই পোস্ট অফিসে গিয়ে কার্ককে তার করব আমি। তার পেয়েই মার্ফার পথ ধরবে কার্ক। সঙ্গে নিয়ে আসবে চিঠিদুটো—লুই মিডোস যেটা লুসিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিল আর টমকে উদ্দেশ্য করে সে যেটা লিখেছিল। চিঠিদুটো দিয়ে কী করবে সে, জানি না।

‘বিল অসকার বার স্ট্রিপের পথ ধরামাত্রই তাকে ফলো করব আমি। ছোট রানশ্ বলে কোন কাউন্টাউ নেই বার স্ট্রিপে, সব কাজ নাকি নিজেরাই করে টম আর লুসি। শুধুমাত্র অ্যানুয়াল রাউন্ড আপের সময় কাউন্টয় ভাড়া করে। কাজেই, কার্ক আমাকে বলল, বিল, টম আর লুসি ছাড়া নাকি আর কেউ থাকবে না রানশ্টাতে।

‘খুন করবার পর চাদরে পেঁচিয়ে লাশগুলো আমি নিয়ে যাব তিন মাইল দূরের কটনউড জঙ্গলের পাশের ওয়াটার ট্যাঙ্কটাতে। মাইনিং ক্যাম্পে কাজ করে কার্ক, সেখান থেকে চারটা ভারী লোহার পাত চুরি করেছে সে, দিয়েছে আমাকে। লাশগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে দড়ির অন্য প্রান্তে বাঁধব ওই পাতগুলো। তারপর ডুবিয়ে দেব পানিতে। কার্কের দাবি, কেউ নাকি কল্পনাও করতে পারবে না ব্যাপারটা। মার্ক্যার শেরিফ নাকি বিপজ্জনক লোক, প্রয়োজনে পুরো এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজবে সে টম, লুসি আর বিলের জন্য। কাজেই, এই বুদ্ধিটা বের করেছে কার্ক।

‘কাজ শেষ করে মার্ক্যায় ফিরে যাব আমি। তারপর সেখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব বিগ বেণ্ডে। আর অবস্থা বুঝে বার স্টিরাপে ঢুকবে কার্ক, তারপর নাকি এমনভাবে সাজাবে সবকিছু, যাতে এড রুফাস আর ফ্র্যাঙ্ক মেলন নামের দুই লোক শেরিফের চোখে সন্দেহভাজন হয়ে যায়।

‘আমার মৃত্যুর পর মার্ক্যার শেরিফ ছাড়া অন্য কেউ যদি এই স্বীকারোক্তিটা পায়, তা হলে যত দ্রুত সম্ভব কার্ককে আইনের হাতে সোপর্দ করবার জন্য অনুরোধ করছি। লোকটা আমার চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমি খুন করি, আর সে খুন করায়— অ্যান্থনি মার্জ (ববি মার্জ)।” ’

সতেরো

কবরের নীরবতা নেমে এল পুরো জেল অফিসে।

মুখ খুলল জেক, ‘ঘটনাটা মোটামুটি জানা হয়ে গেছে সবার। তারপরও আমি কিছু বলতে চাই। হোটেল মালিক কলিন্স, লরা জেমিসন আর পোস্ট অফিসের লোকজনের সাথে কথা বলে অনেক কিছু জানতে পেরেছি আমি। পোস্টম্যান লোকটাও কার্কের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছে আমাকে।

‘ভাই-ভাবির সাথে কিন্তু সুখেই কাটছিল কার্কের দিন। তারপরও বিগ বেণ্ডে গেল সে। কেন? বড় কিছু করার আশায়। হঠাৎ বড় কিছু করার দরকার পড়ল কেন তার? কারণ, পল জেমিসনের মেয়ে লরা জেমিসনকে ভালবাসত সে। কিন্তু, তার মত ভিখিরির কাছে মেয়েকে কিছুতেই দেবে না পল, জানত কার্ক। কাজেই, যে কোন উপায়ে আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ বানানোর দরকার পড়ল তার।

‘মাইনিং ক্যাম্পে কাজ জুটাতে পারল কার্ক কিন্তু, সঙ্গদোষের কারণে নষ্ট

হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। মদ্যপ আর জুয়াড়ী হিসেবে কুখ্যাতি জুটল কপালে আর ঋণের বোঝা চাপল মাথায়। টমের কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য বার স্টিরাপ রওয়ানা হলো সে।

‘গলা ভেজানোর জন্য মার্ফায় এল কার্ক। ঢুকল সেলুনে। সেখানে পোস্টম্যানের সাথে দেখা হলো তার। কার্ক বার স্টিরাপ যাচ্ছে শুনে লুই মিডোসের চিঠিটা সরল বিশ্বাসে ওর হাতে দিয়ে দিল পোস্টম্যান।

‘লুই মিডোসের নাম জানত ধূর্ত কার্ক। মিডোস কী করে, সেটাও জানা ছিল তার। কাজেই, সে বুঝে গেল, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটেছে, যার কারণে চিঠি পাঠিয়েছে লুই মিডোস। বার স্টিরাপে আর ফিরে গেল না সে। মার্ফা থেকেই সোজা ওহায়োর স্টেজ কোচে চাপল। দেখা করল লুই মিডোসের সাথে। ওর সাথে কথা বলে জেনে নিল সব। তারপর নিশ্চয়ই আবার বিগ বেডে ফিরে গিয়েছিল সে। ববির সাথে মিলে খুনের পরিকল্পনাটা করল। আমার মনে হয়, পুরো সম্পত্তিটার একটা বড় অংশ ববিকে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল সে। যার জন্য একসাথে তিনজনকে খুন করতে রাজি হয়ে গিয়েছিল ববি। কিন্তু, কার্কের মতলব হয়তো খারাপ ছিল, তার হাবভাব সন্দেহজনক মনে হওয়াতে স্বীকারোক্তিটা লিখে ব্যাক্সের ভেন্টে রাখল ববি,’ থামল জেক।

‘তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলে তুমি কার্ককে?’ জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

‘সন্দেহ করেছিলাম বললে ভুল হবে। তবে ওর কথাবার্তা, চাল-চলন প্রথম থেকেই কেমন যেন অদ্ভুত আর খাপছাড়া মনে হচ্ছিল আমার কাছে।’

‘কী রকম?’

‘প্রথম থেকেই বলি। তোমাকে নিয়ে কেবিনে গেল সে। আমি পালাবার জন্য গিয়ে ঢুকলাম রান্নাঘরে। হাতল ধরে ঘুরালাম। ছুটে চলে এল সেটা। হাত থেকে জিনিসটা ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেলাম জানালাটার কাছে, লাফিয়ে পড়লাম বাইরে। যতক্ষণ বার স্টিরাপে ছিলে তোমরা, আমিও ছিলাম। কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে তোমাদের সব কথা শুনছিলাম।

‘তোমাকে টম আর লুসির বেডরুমে নিয়ে গিয়ে কী দেখাল কার্ক? এলমেলো হয়ে পড়ে থাকা কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র। অন্য কেউ হলে কী করত? দামি কী জিনিস হারিয়ে গেছে, তার খোঁজ করত। কার্ক কী করল? প্রথমেই খুঁজতে আরম্ভ করল চুক্তিনামাটা। যেন সে জানত, চুক্তিনামাটা নেওয়ার জন্যই পুরো ঘরটা এলমেলো করেছে কেউ। তুমি ধরতে পারোনি ব্যাপারটা, তাই না?’

‘না,’ স্বীকার করল শেরিফ। ‘সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছি আমি। কাজে ইস্তফা দেওয়ার সময় হয়েছে বোধহয়।’

‘রান্নাঘরে ঢুকে একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলল কার্ক,’ লুথারের মন্তব্যটার ব্যাপারে কিছু না বলে নিজের কথা চালিয়ে গেল জেক। ‘বলল, “আমিও আজ বিকেলে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে...”। গতকাল বিকেলে আমাদের আগে একবার বার স্টিরাপে গিয়েছিল সে, স্যামকে বলেছিলে তুমি। সুতরাং, ওর কথাটা শুনে কতগুলো প্রশ্ন জাগল আমার মনে। বিকেলে তাড়াহুড়ো করার দরকার পড়ল কেন তার? কী হয়েছিল? কেউ কি দেখে ফেলেছিল তাকে? দেখলে অসুবিধা কী? ওর ভাইয়েরই তো কেবিন। ওকে চোর মনে করবে না কেউ। আর তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কী করেছিল সে? একটা প্রশ্নেরও উত্তর পাইনি তখন। পরে লরার সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি সব।

‘লরা বলল, লুসি নাকি ওর বান্ধবী ছিল। গতকাল ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাওয়ার আগে বার স্টিরাপে গেল লরা। কিন্তু, তার আগেই খুন হয়ে গেছে টম, লুসি আর বিল। রানশটার পরিবেশ কেমন যেন অদ্ভুত লাগল লরার কাছে। কেবিনের বাইরে একটা ঘোড়া দেখতে পেল সে। বর্ণনা শুনে আমি বুঝতে পারলাম, ঘোড়াটা কার্কের। কৌতূহলী হয়ে লরা ঢুকে পড়ল কেবিনের ভেতর।

‘ওই সময় রান্নাঘরে ছিল কার্ক। লরা ভেতরে ঢুকেছে বুঝতে পেরে দরজা দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বের হওয়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু, দরজাটার হিটকিনি বা পাল্লাতে কোন একটা সমস্যা থাকায় আমার মতই বিপদে পড়ল কার্ক। এ কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিল সে পরে।

‘শুধুমাত্র লরা সাক্ষ্য দিলেই কিন্তু ফেঁসে যেত কার্ক। মেয়েটা টম আর লুসির বেডরুমে ঢুকেছিল। কী দেখতে পেয়েছিল, জানো? ক্লথিটের মাত্র একটা ড্রয়ার খোলা। বিছানায় কোন চাদর নেই। তারমানে, বিছানার চাদর, আর ক্লথিটে রাখা অতিরিক্ত দুটো চাদর প্ল্যানমাফিক সরিয়ে ছিল ববি।

‘ট্র্যাকটা বন্ধ ছিল, আমাকে বলেছে লরা। কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র এলমেলো ছিল না। ডাইনিং টেবিলে রাখা ছিল না খাবার। এমনকী একটা গ্লাস পর্যন্ত নাকি ছিল না টেবিলটার উপর। তারমানে, সবকিছু সাজিয়েছে কার্ক নিজেই। সময়টা কখন, আমি জিজ্ঞেস করাতে বলল লরা, চারটা কি তার কিছু বেশি হবে।

‘গতরাতে কোরালে তুমি দুটো অপরিচিত ঘোড়া দেখেছিলে। বুঝতেই পারছ, একটা স্যামের আর অন্যটাতে চড়ে বার স্টিরাপে গিয়েছিল বিল অসকার। নিজেকে বাঁচাতে মিথ্যে বলতে বাধ্য হয়েছিল স্যাম। কিন্তু, কার্ক কী করল? হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠল। তোমার আপন ভাই-ভাবি যদি নিখোঁজ হয়ে যায়, তা হলে ওরকম করবে নাকি তুমি? ব্যাপারটা আজব লাগল আমার কাছে।

‘মনে করে দেখো, ফ্র্যাঙ্ক মেলনের কথা শুনে কী রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল কার্ক। আসলে পুরোটাই ছিল ওর অভিনয়। নিজেকে মেলনের জায়গায়

বসাও। ধরো, অপহরণ করেছ তুমি লুসিকে। এখন ওকে কি তুমি এমন একটা রানশে নিয়ে যাবে, যেখানে ফোরম্যান হিসেবে চাকরি করো তুমি? এত কাঁচা কাজ করবে কেউ?

‘স্যাম যখন ওয়াটার ট্যাঙ্কটার কাহিনি শোনাচ্ছিল, তখন জোর দিয়ে একটা কথা বোঝানোর চেষ্টা করছিল কার্ক-সেখানে আগে গিয়েছিল লরা, পরে ববি। অথচ, লরা আমাকে উল্টোটা বলেছিল। এরকম কেন করল কার্ক, কিছুই বুঝিনি তখন। পরে ভেবেছিলাম, বোধহয় ববিকে বাঁচাতে চাচ্ছিল সে,’ এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জেক, ‘ভুল ভেবেছিলাম আমি। লরার আগে ববির ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, সেখানে কিছু একটা করছিল সে। এই “কিছু একটা”কে গোপন করার জন্যই আগে-পরে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল কার্ক। ওর জায়গায় অন্য কেউ হলে লরার ব্যাপারটা নিয়ে আহা-উহ করত, ববির ফাঁসি হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করত, আর সে কে আগে, আর কে পরে গেল সেটা নিয়ে তর্ক বাধিয়ে দিল।

‘জেল অফিসে পৌঁছানোর পর কী করলাম আমরা? চিঠিদুটো পড়লাম। একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে। স্যাম, একটু কষ্ট করো তো। ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে একটা খাম পড়ে আছে। ওটা তুলে লুথারের হাতে দাও।’

কাজটা করল স্যাম। দুমড়ে-মুচড়ে প্রায় গোলাকার হয়ে যাওয়া খামটাকে ভাঁজ খুলে সমান করবার চেষ্টা করল শেরিফ। কাজ চলে, এরকম অবস্থায় নিয়ে আসবার পর থামল।

‘কী?’ প্রশ্ন করল সে জেককে।

‘ভালমত দেখে তো, কোন ডাকঘরের ছাপ দেখতে পাও কি না।’

দেখল লুথার। পেল না। ‘তারমানে...’ বলতে আরম্ভ করল সে।

‘হ্যাঁ,’ তার মুখের কথা কেড়ে নিল জেক, ‘তারমানে হচ্ছে, চিঠিটা নিজের হাতে লেটার বক্সে রেখেছিল কার্ক। সে জানত না কবে মারফায় পৌঁছুবে বিল অসকার। কাজেই, চিঠিটা পোস্ট করার ঝুঁকি নিতে চায়নি সে। ডাকঘরের ছাপ নেই, দেখতে পেলে তাকে সন্দেহ করবে তুমি, জানত কার্ক। কাজেই, খামটা খুলেই দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে দিয়েছিল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। পোস্টম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, গত তিনমাসের ভেতর বার স্টিরাপে কোন চিঠি নিয়ে গিয়েছিল কি না সে। উত্তরে লোকটা না বলেছে আমাকে।

‘আজ সকালে ববি মার্জ আর বিল অসকারের ব্যাপারে জিজ্ঞেসাবাদ করার জন্য গিয়েছিলাম হোটেলে। প্রথমে কলিন্সের সাথে কথা বললাম। তারপর গেলাম ববির রুমে। সেখান থেকে বের হয়ে বিলের রুমে ঢুকব, এমন সময় বের হয়ে এল কার্ক। আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে বের করল পিস্তল। আমার ভাগ্য ভাল যে, আমাকে চিনতে পেরে গুলি করেনি সে। যা-ই

হোক, আমি কী করছি না করছি, জানতে চাইল। তখনই বলে বসল আরেকটা বেফাঁস কথা। তারপর সন্দেহ করলাম ওকে।

‘ববির ফাঁসি হয়েছে শুনে বলল সে, খুনীদের ওরকমই সাজা হওয়া উচিত। খটকা লাগল আমার। ববি উদ্ভ্যাক্ত করেছিল লরাকে, খুন করেনি। তা হলে কথাটা বলল কেন কার্ক? কার ব্যাপারে মন্তব্যটা করল সে জানতে চাইলাম। সে বলল, অ্যাভুনি মার্জ। ববি মার্জের ভাল নাম যে অ্যাভুনি মার্জ, সেটা আমি আর স্যাম ছাড়া মার্ফার আর কেউ বোধহয় ওই সময় জানত না। তা হলে কার্ক জানল কীভাবে? তারমানে নিশ্চয়ই আরও কিছু জানে সে, অনুমান করলাম। কিন্তু, কিছু বললাম না।

‘হোটেল থেকে বের হওয়ার পর দেখা হলো লরার সাথে। ওর সাথে কী কথা হয়েছে আগেই বলেছি। পোস্ট অফিসে গিয়ে চারটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জানতে পারলাম।

‘এক, লুসিকে উদ্দেশ্য করে লেখা লুই মিডোসের চিঠিটা সরাসরি বার স্টিরাপে না দিয়ে কার্কের হাতে দিয়েছিল পোস্টম্যান। দুই, গত তিনমাসের ভেতর কার্কের লেখা কোন চিঠি বার স্টিরাপে নিয়ে যায়নি সে। তিন, ববি মার্জ সপ্তাহখানেক আগে একটা চিঠি পোস্ট করেছিল ওহায়োতে। প্রাপকের নামের প্রথমটা মনে ছিল পোস্টম্যানের, বিল। চার, প্রতি দু’দিন পর পর পোস্ট অফিসে যেত ববি মার্জ, বিগ বেডে জৈনেক আর্ট কার্ভেলের কাছে তার পাঠাত। প্রতিটা তারে একই কথা থাকত—আমি ভাল আছি, অ্যাভুনি মার্জ।

‘এরপর তার করলাম লুই মিডোস, আর্ট কার্ভেল আর জিমকে। গতরাতে হোটেলের ভাড়া দেওয়ার জন্য কার্কের পকেট থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলাম আমি। তার করার মাশুল দিতে সেগুলো বের করলাম। টাকার সাথে বের হয়ে এল আরেকটা জিনিস,’ উঠে গিয়ে হার্শের টেবিলের উপর রাখা স্যাডল থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল জেক। দিল সেটা শেরিফের হাতে। বলল, ‘পড়ে দেখো, লুথার।’

পড়ল লুথার, ‘বিল মার্ফায় বি এম।’

‘অর্থাৎ, মার্ফায় এসে পৌঁছেছে বিল অসকার। তারটা পাঠিয়েছে বি এম মানে ববি মার্জ। ববি মার্জের সাথে যে কার্কের যোগাযোগ ছিল, আজ বার স্টিরাপে রওয়ানা হওয়ার আগেই সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

‘লরার সাথে কথা বলে আর দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে বুঝতে পারলাম, ওয়াটার ট্যাঙ্কে কী করছিল ববি। লাশগুলো পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছে সে, অনুমান করে সেগুলো উদ্ধার করতে গেলাম। টম পোলার্ডের লাশটা তুলতে পারলাম। পানির উপরে মাথা তোলামাত্রই গুলি করতে আরম্ভ করল এক লোক। হাতে একটা ছুরি ছিল আমার, সেটা ওর দিকে ছুঁড়ে মেরেই পালালাম।

‘প্রথমে ভাবলাম, অপমানের প্রতিশোধ নিতে কোন আততায়ীকে পাঠিয়েছে লরা। কারণ, আমি যে ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাব, সেটা একমাত্র লরাই জানত। বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা। তখন ভাবলাম, আমি মারা গেলে লাভবান হবে কে। উত্তরটা খুব সহজ, কার্ক পোলার্ড। তার বিরুদ্ধে আমি জেনে ফেলেছি অনেক কিছু, সবাইকে বলে দিলে ফেঁসে যাবে সে।

‘বুঝলাম, ট্যাঙ্কটার পাশের কটনউড জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল কার্ক। আমাকে পানিতে ডুব দিতে দেখামাত্রই বুঝতে পারল, খেল খতম তার। কিনারায় এসে গুলি চালান আমার, মানে নিজের ভাইয়ের উপর।

‘মনে পড়ল, আমি বার স্টিরাপে যাব কি না, জানতে চাইছিল সে। আমার বার স্টিরাপে যাওয়ায় মানে হচ্ছে ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাওয়া, সেটা বুঝে নিতে খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। আর কার্কের মত ধূর্ত কারও পক্ষে ব্যাপারটা মোটেও কঠিন না। কলিন্স একটা কথা বলেছিল আমাকে—পিস্তলে দারুণ চালু হাত ববির, কিন্তু, উইনচেস্টারে আবার একদমই কাঁচা। কটনউডের জঙ্গল থেকেই আমার উপর গুলি চালাতে পারত কার্ক, কিন্তু, তা হলে উইনচেস্টার ব্যবহার করতে হত তাকে। একবার ভাবলাম, বোধহয় উইনচেস্টার নেই আক্রমণকারীর সাথে। পরে কলিন্সের কথাটা খেয়াল হওয়ামাত্রই বুঝতে পারলাম, আক্রমণকারী কে। ওর উপর গুলি চালানো ছাড়া উপায় ছিল না আমার, শেরিফ।’

‘বুঝতে পারছি,’ উপরে-নীচে মাথা দোলান লুথার।

‘আচ্ছা, কার্ভেল,’ বিগ বেন্ডের উকিলের দিকে ঘুরল জেক। ‘ভি এন ২২ মানে কী?’

‘ভল্ট নাম্বার ২২। ব্যাঙ্কে এই ভল্টেই স্বীকারোক্তিটা রেখেছিল ববি মার্জ।’

‘তা হলে,’ উঠে দাঁড়াল জেক, ‘আর কিছু বলার আছে কারও?’

‘আছে,’ পিছন থেকে বলল হার্শ। ‘সাইনবোর্ডটার ব্যাপারটা কী? বার স্টিরাপ ছাড়িয়ে যেখানে দেখলাম সেটা, সেখানে কোনকালেই ছিল না জিনিসটা। যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। একই কথা বলবে সবাই।’

‘ব্যাপারটা কার্কের আরেক ভেক্সিবাজি। আমার মনে হয়, ববি যেন খুনগুলো নিশ্চিন্তে করতে পারে, সেজন্য ওকে দিয়েই বোর্ডটা ওখানে বসিয়েছিল কার্ক। ববির রুমে সাদা রঙের কৌটা আর ব্রাশ দেখেছি আমি। বিগ বেন্ড থেকে মার্ফায় আসার সময় যখন চার মাইল দূরে ছিল ববি, তখন সাইনবোর্ডটা খুলে নিল সে। বড় কোন ঝুলিতে ভরে বা অন্য কোন উপায়ে লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এল। সাইনবোর্ডটাতে লেখা ছিল, মার্ফা চার মাইল, বিগ বেন্ড ছেচলিশ মাইল। শেষের লেখাটা রঙ দিয়ে মুছে ফেলল ববি। একটা তীর

চিহ্ন এঁকে সেটাকে উপরে, ডানদিকে বাঁকিয়ে দিল। তারপর বার স্টিরাপে ঢুকবার আগে জায়গামত বসিয়ে দিল বোর্ডটাকে।

‘আরেকটা কথা,’ বলল শেরিফ, ‘তোমরা স্ট্রেঞ্জার বলে ধোঁকা খেয়েছ। কিন্তু, মার্ফা চেনে, এমন কেউ, যেমন ধরো আমি যদি ওই সময় দেখে ফেলতাম বোর্ডটাকে, জিজ্ঞেসাবাদ করার জন্য যেতাম বার স্টিরাপে, তা হলে কী করত ববি?’

‘প্রশ্নটার উত্তর পড়ে আছে ওয়াটার ট্যাঙ্কের কিনারায়।’

‘মানে?’

‘টম, লুসি, বিল অসকার—তিনজন মানুষ। তিনজনকে পায়ে ভারী লোহার পাত বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিল ববি। কিন্তু, ওর সাথে একটা অতিরিক্ত পাত আর যথেষ্ট দড়ি ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন নিয়ে এসেছিল সে জিনিসটা। যেন জেক রায়ার আর স্যাম ওয়েড দেখতে পায়? না। খুন করার বা লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় যদি কেউ দেখে ফেলত ববিকে, তা হলে তাকেও খুন করত সে। তারপর পায়ে লোহার পাত বেঁধে ডুবিয়ে দিত ওয়াটার ট্যাঙ্কে। সুতরাং, গতকাল খুনের সময় বার স্টিরাপে গেলে আজ আর এখানে তোমাকে বসে থাকতে হত না, লুথার।’

‘লাশগুলো কোন্ রাস্তা দিয়ে ওয়াটার ট্যাঙ্কে নিয়ে গেল সে? নিশ্চয়ই ফোর্ট ডেভিসের ট্রেইল ধরেনি। যে কেউ যখন-তখন আসতে পারত ওই পথে।’

‘আমার মনে হয়, কটনউড জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোন না কোন একটা রাস্তা আছে। কার্ক খুব ভালমত চিনত রাস্তাটা। ববিকে সেটার ব্যাপারে জানিয়েছিল সে। স্যামের তাড়া খেয়ে ওই জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছিল ববি। কিন্তু, ঠিকই মার্ফায় ফিরতে পেরেছিল। কাজেই, জঙ্গলটার ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা না থেকে পারেই না।’

‘আমি একটা জিনিস বুঝলাম না,’ বলল স্যাম। ‘ওয়াটার ট্যাঙ্কটার সুইস গেট খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল ববি। উদ্দেশ্য ছিল লরাকে ধরা। কিন্তু, সব পানি বের করে দিলে লাশগুলো তো স্পষ্ট দেখা যেত। তা হলে?’

‘আসলে গেটটা খুলতই না ববি,’ ব্যাখ্যা দিল জেক। ‘লরাকে ভয় দেখাচ্ছিল সে। অল্প একটু খুলেই এমন ভান করছিল, যেন খুব কষ্ট হচ্ছিল তার। পরে আমি নিজে লাগালাম গেটটা। খুব বেশি শক্তি প্রয়োগের দরকার হয়নি। অথচ, শক্তিমত্তার দিক দিয়ে ববি ছিল আমার প্রায় তিনগুণ। তারমানে, অভিনয় করছিল সে।’

‘স্বীকারোক্তিতে লিখেছে ববি,’ আবার বলল স্যাম, ‘কাজ সেরেই বিগ বেভে ফিরে যাবে সে। তা হলে গেল না কেন?’

‘আমার মনে হয়, কার্কের সাথে দেখা করার জন্য রয়ে গিয়েছিল সে

মার্কীয়। ওয়াটার ট্যাঙ্কে ওদের পরিকল্পনার বাইরে ঘটনা ঘটেছে, বোধহয় সেটা কার্ককে জানাতে চাইছিল।' এরপর দরজার নীচে কাগজ দেওয়ার ব্যাপারটা সবাইকে খুলে বলল জেক। তারপর বলল, 'কাগজটা পড়ে থাকার মানে হচ্ছে, হয় কার্ক বাইরে গিয়েছিল, অথবা অন্য কেউ ঢুকেছিল ওই রুমে। কলিসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কার্কের কাছে কোন গেস্ট এসেছিল কি না বা কার্ক হোটেল ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল কি না। দুটো প্রশ্নের উত্তরেই না বলেছে কলিস। তারমানে, বোর্ডারদের কেউ কার্কের রুমে গিয়েছিল, অথবা, কার্ক বোর্ডারদের কারও রুমে গিয়েছিল। ববির পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, কত নম্বর রুমে উঠেছিল কার্ক অথবা আদৌ হোটেলে উঠেছিল কি না। অথচ, টলার ভান করে কার্ক হয়তো ববির রুম নম্বরটা দেখে থাকতে পারে। তখন হয়তো খেয়াল করেছিল সে, হোটেল ছেড়ে চলে যায়নি ববি। ঘটনাটা কী, জানার জন্য পরে আট নম্বর রুমে ঢুকল।'

'কিন্তু, গতরাতে তো তুমি কার্ককে সন্দেহ করনি। তা হলে কাগজের টুকরোটা দরজার নীচে রাখতে গেলে কেন?'

'সন্দেহ করিনি ঠিক, কিন্তু, প্রথম থেকেই কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল ওর আচরণ। ওকে সন্দেহ করা যায় কি না, আসলে সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম আমি।'

'ববির প্যান্টের পকেট থেকে যে চিঠিটা তুমি পেয়েছ, সেটাই তো লুসির নামে বিল অসকারকে লিখেছিল কার্ক?'

'হ্যাঁ।'

'চিঠিটা ববির কাছে গেল কীভাবে?'

'আমার মনে হয়, চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে বার স্টিরাপে গিয়েছিল বিল অসকার। খুন করার পর তাকে সার্চ করে চিঠিটা পেয়ে যায় ববি। পরে ভালমত পড়বে ভেবে হয়তো ঢুকিয়ে রেখেছিল পকেটে। পড়তে পেরেছিল কি না কে জানে।'

'আরেকটা কথা,' বলল শেরিফ। 'চাদরের ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ? ওগুলো কী করল ববি?'

'ওয়াটার ট্যাঙ্কের পাশের কটনউড জঙ্গলটাতে ঢুকিনি আমি বা স্যাম। আমার মনে হয়, চাদরগুলো ওখানেই ফেলে রেখেছে ববি। একটু ভেতরের দিকে। তবে খুঁজলেই পাওয়া যাবে বোধহয়। টমের লাশটা উঠানোর সময় ওর গায়ে হাত দিয়েছিলাম। চাদরের স্পর্শ পাইনি।'

'লোহার পাত,' নাছোড়বান্দা শেরিফ প্রশ্ন চালিয়ে গেল। 'আর দড়ি। বোঝাই যাচ্ছে, মার্কীয় আসার সময় ওগুলো সাথে করে নিয়ে এসেছিল ববি। কিন্তু, ওগুলো সে রাখল কোথায়? তা ছাড়া, সাইনবোর্ড? ওটাকে লুকিয়ে রেখেছিল কোথায়?'

‘লোহার পাত আর দড়ির ব্যাপারটা আমি নিজেও জানি না। তবে নিশ্চয়ই লোকের চোখ এড়িয়ে কোথাও না কোথাও রেখেছিল। বার স্টিরাপের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার সময় সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। স্টেবলম্যান থমসনকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে। আর কলিন্স তো বলেছে যে, বিল অসকার রওয়ানা হওয়ার দশ মিনিট পর সাইনবোর্ডটা নিয়ে ববিও বের হয়ে গিয়েছিল। তারমানে বোর্ডটা সে হোটেলে নিজের রুমেই রেখেছিল।’

আবার নীরবে কাটল বেশ কিছুক্ষণ। একসময় জেক বলল, ‘আর কারও কিছু জানার না থাকলে এখন রেস্টুরেন্টে যাব আমি। খিদে পেয়েছে খুব। স্যাম, যাবে তুমি আমার সাথে?’

উঠে দাঁড়াল স্যাম।

‘এরপর কী করবে তোমরা?’ জানতে চাইল লুথার।

‘আপাতত পেট ভর্তি করে খাব। তারপর কার্ককে কবর দিয়ে সোজা যাব হোটেলে, নাক ডেকে ঘুমাব। জিম যখন এসেই পড়েছে, তখন কাল ভোরে আমরা তিনজন রওয়ানা হব বিগ বেঁডের পথে...’

‘ফালতু কথা বাদ দিয়ে আসল কথা বলো। লরা কিন্তু তোমাকে...’ কথা শেষ না করে জেকের উদ্দেশে একটা চোখ টিপল শেরিফ।

আবার একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল জেকের। বলল, ‘না, লুথার, তা হয় না। আমি ভবঘুরে, চাল-চুলো কিছুই নেই আমার। গুনলে অবাক হবে, এই দু’দিনের সব খরচ কার্কের পকেট থেকে নেওয়া টাকা দিয়ে চালিয়েছি আমি,’ এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জেক। ‘লরাকে আমি কিছুই দিতে পারব না। মেয়েটা ধনীর দুলালী, ওর পৃথিবী আর আমার পৃথিবী সম্পূর্ণ আলাদা। স্বীকার করছি, ওকে ভালবেসে ফেলেছি আমি। কিন্তু, ওর ভালর জন্যই এই ভালবাসাকে ববি আর কার্কের মত মার্ক্যার কবরস্থানে রেখে যেতে হচ্ছে আমাকে। আমি নিরুপায়,’ হার্শের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল জেক। ভাল কাঁধটাতে তুলে নিল স্যাডল, স্যামের হাতে দিল উইনচেস্টারটা। তারপর এগিয়ে গেল শেরিফের দিকে। শার্ট থেকে তারাটা খুলে নিয়ে ধরিয়ে দিল লুথারের হাতে। বলল, ‘তোমার মার্ক্যার, তুমিই সামলাও। আর,’ গলাটা একটু ধরে এল ওর, ‘ভাল থেকো।’ স্যামের দিকে ঘুরে আবার বলল, ‘চলো, স্যাম। পথ ডাকছে আমাদের।’
